আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
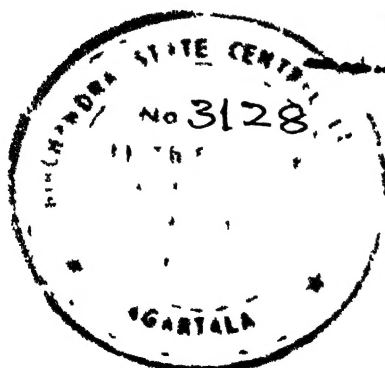
মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

---একশো কুড়ি টাকা---

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায

সর্বাণী মুখোপাধ্যায

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন---অমিয ভট্টাচার্য

মুদ্রণ---সান লিথোগ্রাফী

ASUTOSH MUKHOPADHYAYA RACHANAVALI VOL IV
An anthology of collection of works vol 4 by Asutosh Mukherjee
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd
10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta 70073

Price Rs 120/-

ISBN: 81 7293-188 X

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাগচী এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কোলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

'ছোটোগল্প' বাংলা সাহিত্যে নবাগত কথাশিল্প। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে এই শিল্পরীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যদিও আজ বিষয়-বৈচিত্র্যে রীতি-প্রকরণে ছোটোগল্প বিস্ময়কর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই সমৃদ্ধির অনেকটা কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তিনি বাংলা ছোটোগল্পের সফলতম শিল্পী।

ছোটোগল্পের একটা নিজস্ব পরিবেশ ও পটভূমি আছে। এ হল বেদনার ফসল। জীবনের পুরোনো মূল্যবোধ যখন অর্থহীন বলে মনে হয়, ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার যখন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না, এই অবস্থায় "গীতিকবির সগোত্র গল্প-লেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখি। সে পাখি আহত বক্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—রক্ত-কর্দমের মধ্যে তাকে ছটফট করতে হয়।" একথা বলেছেন অগ্রণী কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

অর্থাৎ ছোটোগল্পে আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকলেও দুঃখ-বেদনার পাল্লাটাই ভারি হয়ে থাকে। অবশ্য দুঃখ-বেদনার মধ্যেও কারো কারো লেখায় আবার আশার আলো বিচ্ছুরিত হতেও দেখা যায়।

সাহিত্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই দ্বিতীয় ধারার সার্থক রূপকার। বিশ্বাস ও আদর্শের জগৎ থেকে তিনি কখনই অন্যপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াননি। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মূল সুর একটাই—সুস্থতা ও শুভবোধ। গল্প লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন কিছুটা রক্ষণশীল বা প্রাচীন পন্থী। এটা লেখার জগতে কঠিন ব্যাপার। কারণ স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দেওয়া সহজ, তাতে তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হওয়া যায়, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে পারে কজন? আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পেরেছিলেন, তাই তিনি নমস্য!

বর্তমান সংকলনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'রাপ্তির ডাক', 'জানালার ধারে', 'প্রতিহারিণী', 'কুমারী মাতা', এই চারটি গল্প-গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। পাঠকের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি যেতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার তার প্রায় সবগুলিই এই সব গল্পে আছে। যে গুণের সবচেয়ে প্রধান হল অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা, চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা, আর গল্পে বিচিত্র পটভূমির আমদানী করা। এসব গুণ ছাড়াও তাঁর চোখ দুটি ছিল বিশাল বুকের উপর বসানো। সেই হৃদয়ের চোখ দিয়ে তিনি মানুষকে দেখতেন এবং গল্প লিখতেন। যে সব গল্পে বাঙ্গালী তার নিজের মনের ছবি, আশার ছবি, ঘরের ছবি দেখতে পেয়েছে—বর্তমানকালে যার একান্ত অভাব।

'রাপ্তির ডাক'-এ গল্পের সংখ্যাও আট। এর প্রথম গল্প 'রাপ্তির ডাক'। এক নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পের সূচনা। রোমান্টিক প্রেমের গল্প এটি। তাই অন্তহীন বেদনার

সুর গল্প শেষ হবার পরেও পাঠকের হৃদয়ে বেজে চলে। শুভেন্দুর মানুষী দুর্বলতার ফলে কর্তব্যনিষ্ঠ অভিমানী ললিতার আত্মহননে যে শিল্প-সমৃদ্ধ গল্পের সৃষ্টি তা বুঝি গল্প-ইতিহাসের স্বর্ণশিখরকে স্পর্শ করে যায়। 'ভ্রূসেরা' গল্পের সবচেয়ে বড়ো শিল্প সৌন্দর্য হল নারীর মোহিনী মায়াকে ভ্রূসেরা পাতার সিম্বল হিঁসেবে ব্যবহার। এ ছাড়াও আছে আরও বিচিত্র রসের অনবদ্য ছটি গল্প। এগুলি হল: 'বশীকরণ', 'মস্তি', 'মালা', 'সন্দেশ', 'বট জাঙলের বাঁক' এবং 'সম্ভাষণ'।

দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থের নাম জানালার ধারে। এতে আছে তেরোটি গল্প। এগারো নম্বর গল্প 'জানালার ধারে'। এই গল্পের নামেই এর নামকরণ। বাসের এক জানালাও যে গল্পের নায়কের ভূমিকায় উঠে আসতে পারে, একথা কে ভাবতে পেরেছিল! সেই সঙ্গে আপাত স্নেহহীন এক প্রৌঢ়ের হৃদয়ে যে কি প্রবল স্নেহের ধারা লুকিয়ে থাকতে পারে তা আবিষ্কার করেও চমক লাগে। 'শর' গল্পে খুব সহজ ভঙ্গিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দম্পতীর ঔদার্য-মানবিকতার চিত্র উপস্থিত করেছেন লেখক। এর বাকি এগারোটি গল্প হল: 'একটি প্রাচীর', 'বউধার', 'রিষ্টি', 'নতুন নায়িকা', 'খণ্ডিতা', 'ভাগফল', 'শাড়ি', 'প্রত্যাখ্যান', 'অসবর্ণ', 'আহ্বান', এবং 'পঞ্চম অঙ্কের পর'। প্রত্যেক গল্পই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

প্রতিহারিণীর অন্তর্গত গল্প হল: 'মিঠা বিল', 'চোখ', 'বোরখা', 'আরোগ্য', 'সিদ্ধিপোখরী', 'কর্তা', 'একটি নেপথ্য নাটক', 'শোক', 'দ্বীপ', এবং 'প্রতিহারিণী'। কতো বিচিত্র বিষয় এই সব গল্পের অঙ্গীভূত হয়েছে, তেমনই প্রসারিত হয়েছে গল্পের পটভূমি। কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ, নেপাল-সীমান্ত, পোর্টব্লেয়ার নিকোবর পর্যন্ত এই সব গল্পেব পটভূমি প্রসারিত। গল্পগুলির বিষয় প্রেম-ঈর্ষা অতি সাধারণের মধ্যে মহত্ত্বের হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ছোটো ছোটো ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, বা সেন্টিমেন্ট—"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল—" এই সব গল্পে ফুটে উঠেছে। বিগত-যৌবন যুগলকিশোর আর কিশোরী মেয়ে বিলির (বিলাসীর) প্রেমকথা অমরত্ব লাভ করেছে 'মিঠা বিল' গল্পে। প্রেমের অঙ্গীকার রক্ষা করতে নির্দিষ্ট সময় "...বিলি এসেছে। মাটিতে শুয়ে আছে। নারীর অঙ্গে তীর বিঁধে আছে বিশ-পঁচিশটা। ঐ বিষাক্ত তীর তার চেনা। পিছনে তিরুর জঙ্গল।" গল্পের শেষে এক সর্বনাশা নির্মম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ও যুগলকিশোরের মতো যেন আকাশ ফাটানো অন্তিম চিৎকার করে মাটির ওপর আছড়ে পড়ে। 'চোখ' হল শিল্পীর যাদু-মন্ত্র আবিষ্কারের

গল্প। শিল্পীর যান্ত্রিক শিক্ষার সঙ্গে নিষ্ঠা আর সাধনা যুক্ত না হলে শিল্প যে প্রাণহীন হতে বাধ্য—পাশকরা শিল্পী গগন আচার্যকে বাবা জীবন আচার্যের কাছে এই পাঠই গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ভাবে প্রতিহারিণীর দশটি গল্পে বিচিত্র ভাবের ও রসের দশটি শিল্প সমৃদ্ধ নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

'কুমারী মাতা'র অন্তর্গত গল্প হল: 'কুমারী মাতা' 'সদয় সংহার', 'ভাদ্রের রবি', 'জ্যোতির্ময়', 'রোগচর্যা', 'আত্মনিগড়', 'প্রতিনিধি', 'শেষ পর্যন্ত'।

'কুমারী মাতা' গল্পের নামে এই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। তন্ত্রের কুমারী পূজাকে নাটকীয় এবং শিল্প সমৃদ্ধরূপে এই গল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে। গল্পের বড়ো ঐশ্বর্য হল এর নাটকীয় চমক। দাম্পত্য প্রেমের এক করুণ মধুর আলেখ্য উপস্থিত হয়েছে 'সদয় সংহার' গল্পে। পরিবারিক জীবনের অম্লমধুর রসের অতি সাধারণ কিন্তু অসাধারণ চমকে ভরা 'শেষ পর্যন্ত' গল্পটি। এই ভাবে 'কুমারী মাতা'র অন্তর্গত আটটি গল্পই অষ্টবসুর মতো স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এই সব গল্পে অসহায় মানুষের জেতার কাহিনী রচনা করেছেন। তাই অন্ধকার আর পতনকে সরিয়ে সরিয়ে আমরা তাঁর লেখায় সাধারণ মানুষকেই জয়ী হতে দেখি। আমরা অতি সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে, নিচের মধ্যে মহত্ত্বকে আবিষ্কার করতে চাই। গল্পে-গল্পে তিনি সেই বাসনা পূরণ করে পাঠকের হৃদয় সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন।

প্রায় চার দশক ধরে তাঁর সাহিত্য সেবার ফসল দুশোর বেশি উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ। এই সুবিপুল গল্প সংগ্রহের ভেতর থেকে চারটি গল্প-গ্রন্থের এক সংকলন প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে মিত্র ও ঘোষ পাঠকের ধন্যবাদার্হ হলেন।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? তোম'র কি শীত নেই? একটা কম্বল এখনো আমার কাছে আছে। এনে দেব? ঢেকে দেব? না কেন? না না-না—আর কত না করবে? আমার জীবনে তুমি শুধু একটা মস্ত না হয়ে থাকবে? সেদিনও এনেছিলাম। তোমাকে ঢেকে দেবো বলে এনেছিলাম। তোমার কোনো কথা শুনবই না ভেবেছিলাম পুরোনো না-না-না! তোমার আর্ত আকুতি বাতাসে হিসহিসিয়ে ওঠার শব্দ হয়। শিমুলের পাতাগুলি নড়ে উঠেছিল। কম্বল হাতে করে ফলে আস্তে কাঁপতে চোরের মত ফিরে গেছি। তোমার সেই শব্দ-শূন্য বায়বীয় কান্না আমাকে বাড়ি পর্যন্ত তাড়া করেছিল। মিথ্যে বলব না, ঘরে ঢুকে সব ক'টা দরজা বন্ধ করেছিলাম। না করে করব কি। তোমার কান্না এর আগে আর কখনো দেখেছি না শুনেছি? তোমাকে শুধু হাসতে দেখেছি। গোটা গোরখ্‌পুরের লোক শুধু হাসতেই দেখেছে তোমাকে। আমি ছাড়া কেউ তোমার কান্না দেখেনি কান্না শোনেনি।

আবারও হাসছ যে খুব। তোমার সেই কান্নাটা বেশি ভয়ের না এই হাসিটা ভেবে পাই না। কান্না হাসি দুই-ই সমান ভয়েব। অত আস্তে, অমন ফিসফিসিয়ে কথা কেন? এখানে আর কে আছে শুনবে? হাসি রাখো, বলো শুনি আনব না? আগের শীত বাঘের গায়ে আর সক্কলের শীত তোমার গায়ে?

কেন? তোমার গা-টা কি গা নয়?

আর আমার? আমার শীত কে নেবে? সক্কলের জন্যে তোমার এত দরদ আর আমার জন্যে তোমার মায়া হয় না? রাতে শুতে গিয়ে এই ভবা শীতে এক টুকরো কাপড়ও গায়ে রাখতে পারি না সে কি তুমি দেখ না? অন্ধকার ঘরে খাট থেকে নেমে সারা রাত কনকনে মেঝের ওপর পড়ে থাকি সে কি তুমি জানো না? বাপ্তির জলভরা শনশনে বাতাস সমস্ত রাত ধরে ছুঁচের মত আমার হাড়ে গিয়ে বেঁধে সে কি তুমি টের পাও না? এরই মধ্যে দু-দুবার তো বিছানা নিলাম, ডাক্তারে ডাক্তারে বাড়ি ভরে গেল। আর একবার পড়লে হয়েই যাবো—বোধহয়। এ-বেলায় তোমার মন কাঁদে না? নাকি এমনি হাসো বসে বসে? এত ঠাণ্ডা তোমার কি করে সয় তুমিই জানো। কিন্তু আমি যে আর পারিনে। আমার সর্বাঙ্গ জমে গেল, হাড় পাঁজর পাথর হয়ে গেল।

রাত-জাগা পাখি ডানা ঝটপটিয়ে সমাধি আঙিনার নিশ্চল ডানা দুখানা করে চিরে দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। ঘাসের ওপর মুখ গুঁজে স্থাণুর মত পড়েছিল একজন। উঠে বসল সোজা হয়ে। স্নায়ুগুলো নাড়াচাড়া খেয়ে সজাগ হল।

না, কেউ কোনো কথা বলেনি এতক্ষণ। কোনো পুরুষও না, কোনো রমণীও

না। কোনো বমণী নেইও এখানে। অন্তত কথা বলতে পারে এমন কেউ নেই। এটা সমাধি-ভূমি। এই বিশাল এলাকার সবটাই। চারদিক একতলা সমান উঁচু ধপধপে দেযাল ঘেরা। ....কেউ কথা বলেনি, কেউ টুঁ শব্দটি করেনি, কেউ হাসেনি, কেউ নিষেধের তর্জনী ঠেকিয়ে ফিসফিসিযে ওঠেনি। বসে বসে একজনের মাথাটা শুধু নুয়ে পড়েছিল মাটির ওপর। ঘুমিয়ে পড়েছিল কিনা বলা শক্ত।

উঠল। অনেকগুলো ঘাসের সমাধি পেরিয়ে, অনেকগুলো বাঁধানো সমাধির পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলে লাল কাঁকরের রাস্তা। এখন আর সাবধানে পা ফেলে এগোতে হয় না, কোনো সমাধির ওপর পা পড়ার ভয নেই, কোনো স্মৃতিস্তম্ভে ঠোক্কর খাবার সম্ভাবনা নেই, কোনো ফুলের গাছ মাড়িয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। দু'পা অভ্যস্ত তবু খুব সন্তর্পণে পা ফেলেই এক পা দু'পা করে সমাধি-ভূমি মাঝের ওই রাস্তাটায় এসে দাঁড়াবে সে।

শান্তি ভঙ্গেব ভয়। এতটুকু শব্দ হলে এই সমাহিত স্তব্ধতায ছেদ পড়ার আশঙ্কা। সেটা অপরাধের মত। গাছেব একটা পাতা নড়লে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পায়ের নিচে শুকনো পাতা পড়লে চমকে ওঠে। তাকে আসতে হয বলে সে আসে। মাটির নিচে যে হাজার মানুষ ঘুমিয়ে তারা আপত্তি করে না। এই মহামৌন শান্তির শুচিতা নষ্ট হলে তারা যেন নড়েচড়ে তাকাবে ওর দিকে। দু'হাজার চোখ নীরব অভিযোগে ছেঁকে ধরবে।

এবারে রাস্তা ধবে অনেকটা এগোলে সমাধি-ভূমির পুরোনো আমলের অর্ধবৃত্তাকাবের ফটক। রাবাব সোলের জুতোর শব্দ হয় না। তবু পায়ের নিচে কাঁকরগুলো কড়কড়িযে ওঠে। ফলে আস্তে আস্তে পা ফেলে সেই ফটকে আসতে সময় লাগে বেশ।

একদিকের দেয়ালে ঠেস দেওয়া মোটর সাইকেল একটা। চুবিব ভয নেই। এই অসময়ে জনপ্রাণী নেই ধারে কাছে। দরোয়ান আর মালিরা খুব ভোরে আসে, সন্ধ্যাব আগে চলে যায়। আধ মাইলের মধ্যে লোক বসতি নেই একটিও।

মোটব সাইকেলটা টেনে নিল। এখানে উঠবে না। এখানে স্টার্ট দিলে শান্তির নৈঃশব্দ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে খানখান হয়ে যাবে। মোটর বাইক অনেকটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর উঠবে। আসার সময়ও তাই করে। অনেক আগে নেমে হেঁটে আসে।

পশ্চিমে কাশিয়া রোড ধরে স্টেশান রোডে পড়বে। দেড়মাইল পথ। সেখানেই বাড়ি। এর মধ্যে সমাধি-ভূমির পাঁচিলের পাশ ধরে আধমাইল হাঁটবে। ফটকের বাইরে বাঁয়ে বিরাট ধূ-ধূ প্যারেড গ্রাউণ্ড। পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে দূরে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের কেরোসিন ল্যাম্প পোস্টের আবছায়ায় রাত্রিতে অতবড় মাঠটাকে নদীর মত মনে হয়। সকালে ওখানে পুলিস প্যারেড হয়, অন্যদিকে দুই একজন সাহেব আসেন গল্‌ফ খেলার মহড়া দিতে।

কাশিয়া রোডের ডাইনে পঁয়ত্রিশ বর্গ মাইল জোড়া বিশাল রামগড় লেক। বদ্ধ জলাশয় নয়, রাপ্তির সঙ্গে যোগ তার। হিমালয়ের উৎস থেকে প্রায় চারশ মাইল

রাপ্তি নদীর খাস দখলে। সেই রাপ্তির সঙ্গে যোগ রামগড় লেকের। রাপ্তির যৌবনের সঙ্গেই যোগ বিশেষ করে। পাহাড়ী পার্বত্য রাপ্তি ফুলে উঠলে ফুসলে উঠলে রামগড়ের ভ্রূকুটিও ধারালো হয়ে ওঠে।

*　　　　*　　　　*

সমাধি-ভূমির দেয়ালের গা ঘেঁষে মোটর সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। দেয়ালের ওপাশে ঘেঁষে সারি সারি শিমুলের ছায়া পড়ে আছে, আবছা অন্ধকারে মনে হয়, সারি সারি কালো কালো লোক বসে আছে দেয়ালের ওপর। জানা না থাকলে নতুন লোক ভয়ে আঁতকে উঠবে।

এবারে লোকালয়ের কাছাকাছি। দূরে দূরে পথের কুকুর দেখা যাচ্ছে একটা দু'টো, আর মেহনতী মানুষদের কুটীর। ভেতরটা মোটামুটি সজাগ হয়েছে এবারে। আর হাঁটবে না। আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। কিন্তু না। এরাও সব ঘুমিয়ে। শান্তির ঘুম, খুব সুলভ নয়। এরা তা অর্জন করেছে। পথের ওই কুণ্ডলী পাকানো কুকুর ক'টারও যেন ঘুমের দাবি আছে। রাত বেশি হয়নি হয়ত, হাত ঘড়ির দিকে তাকালে দেখবে ন'টাও নয়। কিন্তু এখানে অনেক রাত।

মোটর বাইকে উঠে বসেছিল, প্যাডেলে পা লাগিয়েছিল। নেমে পড়ল। আবারও হেঁটেই চলতে লাগল।

*　　　　*　　　　*

উঁচু-মহলের মেয়ে-পুরুষেরা বেশ একটা রোমান্সের আঁচ পাচ্ছিলেন অনেক দিন ধরেই। আর, বেশ একটা বড় দরের অসবর্ণ বিয়ের প্রত্যাশায় ছিলেন। গোরখপুরের মত জায়গায় সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, পাঁচমিশেলি লোকের মেলা-মেশায় এখানে খুব একটা জাত-বর্ণের ধার ধারে না কেউ। বিশেষ করে বড় ঘরের ছেলে মেয়েরা। তা হলেও ব্যানার্জী সাহেবের ছেলে ওই ক্রিশ্চিয়ান মেয়েটিকে বিয়ে করবেই শেষ পর্যন্ত, আর ব্যানার্জী সাহেব নিজেই মত দেবেন তাতে, সেটা খুব প্রত্যাশিত ছিল না বোধহয়।

ব্যানার্জী সাহেব রাশভারী সাহেব বটে, কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরের আবহাওয়ায় পরিচিতজনেরা গোঁড়ামীর গন্ধ পেতেন। মস্ত সরকারী অফিসার ব্যানার্জী সাহেব। রিটায়ারমেন্টের পরেও ক'বছর ধরে এক্সটেনশান্ পেয়ে চলেছেন নিজের কাজের গুণে। বেশ-ভূষায় খাঁটী সাহেব, বাড়িতে পার্টি দেন, পার্টিতে যান, খানা-পিনা করেন। কিন্তু অসময়ে কেউ দেখা করতে এলে শুনবেন, সাহেব আহ্নিকে বসেছেন। তার পরেও বসে থাকলে তাঁকে ধুতি-চাদর পরা দেখা যাবে, কপালে ফোঁটা-তিলকও চোখে পড়তে পারে। অনেকে বলেন, মাসে-দু'মাসে একবার করে ট্রেনে ব্যানার্জী সাহেবের গঙ্গাজল আসে।

বাড়িতে গৃহিনীর প্রভাব বেশি হলে এরকম হতে পারে। কিন্তু ব্যানার্জী-গৃহ অনেকদিন গৃহিনীশূন্য। কর্ত্রী বলতে বড় দুই ছেলের বউ। তারাও বাইরে আধুনিকা, অন্দরে

[illegible]। বাড়ির পুজো-পার্বণ সাগ্রহে কোমর বেঁধে কাজে নামে। কিন্তু বউদের এ ধরনের আগ্রহ না উৎসাহ রাশভাবী শ্বশুরের কারণে বলেই সকলের অনুমান।

ছেলে তিনটি। বড় দুই ছেলেও আধা-সাহেব। এখানেই ভালো চাকরি করে। ছোট ছেলে শুভেন্দু পুরোপুরি সাহেব। শহরের এই প্রকাশ্য প্রণয়-অধ্যায়ের নায়ক সে ই। বেকার, সর্বদা ব্যস্ত তাই। শুধু শহরের নয়, শহর থেকে অনেক দূরের লোকেরাও ঘরে বসে শুধু শব্দ শুনেই বলে দেবে কার মোটর বাইক চলল এবং কে চলল।

দাদারা চেষ্টা চরিত্র করে বার দুই চাকরিতে জুতে দিয়েছিল তাকে। লেখাপড়া করেছে। বাপের নাম-ডাক আছে। খুব বেগ পেতে হয়নি। আর সে চাকরিও দাদাদের মতে মন্দ চাকার নয়। কিন্তু ক্লাব আর সামাজিক অনুষ্ঠান আর মোটর বাইক ছোটানোর সময়ে টান পড়ে বলে চাকরি করা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মাথায় তাব অনেক প্ল্যান। চাকরি করছে না বলে কি ভাবছে না? দিন রাতই ভাবছে---প্ল্যান কবছে। সময় এলে অমন চাকরি সে নিজেই যে দু'দশটা দিতে পারবে একদিন সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল। সেই চেষ্টা কবতে গিয়ে অর্থাৎ প্ল্যান কাজে লাগাতে গিয়ে বাবার মন্দ টাকা লোকসান দেয়নি এ পর্যন্ত। কিন্তু নতুন প্ল্যানের তাপে সেটা ভুলতেও সময় লাগে না। এক বাবা ছাড়া সব চাকুরে লোককেই মনে মনে সে একটু অনুকম্পাব চোখে দেখে।

দাদাদের আর বউদিদের মনে মনে ধারণা, অমন মেজাজী কর্তাও তাঁর ছোট ছেলেটিকে একটু বেশি প্রশ্রয় দেন। এবং এই মতিগতি তারই ফল। কথাটা মিথ্যে নয়। শুভেন্দুর তিন বছর বয়সে ভদ্রলোকের স্ত্রী বিযোগ হয। বড় দুই ছেলের সঙ্গে ছোট ছেলের বয়সের বেশ তফাত। ভাইয়েরা সেই তফাত একেবারে ঘোচাতে পারেনি। কিন্তু তিনি পেরেছিলেন। নিজে তাকে খাইয়েছেন, পরিযেছেন, ঘুম পাড়িযেছেন। অন্য দুই ছেলের মাস্টার ছিল, কিন্তু এই ছেলের পড়াশুনার ভার নিজে নিযেছিলেন।

ফলে নিজের প্রাপ্তির ব্যাপারেও ব্যতিক্রম হয়েছে একটু। তাঁকে একটু বেশি গম্ভীর অথবা চিন্তান্বিত দেখলে অন্য দুই ছেলে যখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ছোট ছেলের চোখে পড়লে সে সরাসরি এসে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি হয়েছে? ছোট-খাটো অসুখ-বিসুখ হলে দিনরাত মাথার কাছে চেয়ার টেনে বসে থাকতে একজন। রাতে নার্স থাকুক আর না থাকুক, শুভেন্দু ঘর ছেড়ে নড়বে না।

অন্তরঙ্গ জনেরা জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের বিয়ে কবে দিচ্ছেন ব্যানার্জী সাহেব?

ব্যানার্জী সাহেব কখনো বলেন দেখি, কখনো জবাব দেন, এইতো সেদিন অতবড় অসুখের থেকে উঠল মেয়েটা, যাক কিছুদিন, আর ছেলেটাও একটু কাজে কর্মে মন দিক।

বিয়ে যে হবে সেটা গোপন নেই।

শুভেন্দুর বাঙালী-অবাঙালী সঙ্গীর দঙ্গলও এক-একসময় ছেঁকে ধরে শুভেন্দুকে।

কিহে ননীগোপাল, ললিতাসখি ঘরে আসছেন কবে?

ননীগোপাল অর্থাৎ শুভেন্দু ননী-মুখ করে হাসে মিটিমিটি। একজন টিপ্পনী কাটে, ললিতাসখি ননীগোপালের ঘরে না আসুক মোটর বাইকে তো আসছে।

কেউ ফোড়ন দেয়, অসুখে ললিতাসখির তবিয়ত দেখিয়ে তো বছর ঘুরিয়ে দিলে, এখন যা হয়েছে দেখলে যে আমাদেরই হাড়পাঁজর টনটনিয়ে ওঠে, আর কত তবিয়ত চাই তোমার?

আর একজনের ভ্রূকুটি, আমরা শুধু দেখি বলে টনটনিয়ে ওঠে, ননীগোপাল কি শুধু দেখে? সাতদিনে যে একদিন দেখা মেলে না ওর—কোথায় যায়? কি করে? সব নিরেমিষ যায় ভাবো নাকি!

শুনব! শুনব! সঙ্গীদের উল্লাস, কি রকম আমিষ আমাদের বলতে হবে ননীগোপাল!

পকেট হাতড়ে শুভেন্দু গম্ভীর মুখে পকেট-বই বার করে একটা। সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে আবার পকেটে ফেলে।—ওর অসুখের পর থেকে এই সাড়ে ন'মাসে আমি দু'শ তিরেনব্বুইটা চুমু খেয়েছি।

হিযার—হিযার! আর ললিতাসখি?

সাতশ একাত্তরটা।

উঃ! আঃ! জল! মরে গেলাম!

আর কি? আর কি বলে ফেলো ননীগোপাল---আর প্রতীক্ষায় রেখো না---তারপর কী?

হাসতে হাসতে মোটর বাইকের দিকে এগোয় শুভেন্দু।—আর যা, শুনলে পরে ঠাণ্ডা হবার জন্যে তিন দিন বামগড়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে তোমাদের।

ননীগোপাল আর ললিতাসখি নামের পিছনেও ছোট একটু প্রহসন আছে। শুভেন্দু শুধু ফরসা নয়, লালচে গোছের ফরসা। তার ওপর মুখখানা মিষ্টি, কচিকচি। ননীগোপাল নামটা ললিতা ডাট্ এর দেওয়া। একবার বাপের বদলে ছেলের হাত থেকে উইমেন্স্ অ্যাসোসিয়েশানের চাঁদা নিয়ে বিসিটে ওই নাম লিখেছিল। তার আগেও আলাপ পরিচয় ছিল একটু আধটু। আলাপের ছলে ছেলের দঙ্গল মেয়েদের জ্বালাতো অনেক সময়। মিস্টার ডাট্ শুভেন্দুর বাবার অধীনস্থ অফিসার। ললিতার কাকা তিনি। কাকার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাটা প্রায়ই ভারী দরকার হয়ে পড়তো শুভেন্দুর। মোটর বাইক হাঁকিয়ে প্রায়ই যেত। পরে, যে সময়ে ভদ্রলোকের বাড়ি থাকার সম্ভাবনা কম, ওর হাজিরাটা বিশেষ করে সেই সময়েই হয়ে পড়তো।

ললিতা ডাট্ তখন ওকে ডাকত মিস্টার ভট্ভট্। বলত, কাকা কখন বাড়ি থাকেন না থাকেন পরের দিন এলে একটা চার্ট করে দেব, রোজ মোটর সাইকেলের ওই ভট্-ভট্ শব্দ শুনলে মাথা ঝিম ঝিম করে।

নাম-করণের এখানেই শেষ নয়, ননীগোপালের আগে বলেছিল বোতাম-বাবু। সোনার ওপর মিনে করা সেকেলে আমলের বড় বড় চারটে ঝকমকে সোনার বোতাম জামায় পরত শুভেন্দু। বাবার ছিল, ওকে দিয়ে দিয়েছেন। বোতাম কটা

চোখে পড়ার মতই, কিন্তু সকলের পরার মত নয়। শুভেন্দু পরত, পরলে ওকে কেমন মানায় জেনেই পরত। বউদিরা অনেকদিন বলেছে, ওই বোতাম ছাড়া তোমাকে ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। তোমার জন্যেই দিদিশাশুড়ী ওটা তৈরি করিয়েছিলেন আসলে।

চোখে ললিতা ডাট্-এরও পড়ত। কখনো আগে মুখের দিকে তাকাতো পরে বুকের দিকে, কখনো বা আগে বুকের দিকে পরে মুখের দিকে। শুভেন্দু সেটা টের পেয়েছে বুঝে একদিন বলেছে, বোতাম-বাবুর বোতাম ক'টা বেশ ওজনে ভারী বলে মনে হয়, পেলে কাজ হত—অ্যাসোসিয়েশানের এখন অনেক টাকার দরকার।

শুভেন্দু পটাপট বোতাম ক'টা খুলে নিয়ে তার হাতে দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশানের টাকা বা চাঁদা আদায়েব ব্যাপারে এই মেয়ের চোখে পর্দা নেই জেনেও দিয়েছে। ললিতা যেন প্রাপ্য জিনিসই পেয়েছে। বোতাম হাতে নিযে কারুকার্য পরখ করতে করতে বলেছে, পুরুষ মানুষের এর কোনো দরকার নেই, অথচ আমাদের খুব কাজে লাগবে। ধন্যবাদ।

কিন্তু কাজে লাগেনি। পরদিন আর তার পরদিনও ওর মুখের থেকে বুকের দিকে আর বুকের থেকে মুখের দিকে চোখ গেছে ললিতার। শেষে বোতাম ক'টা এনে আবার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আপনার কাছেই রাখুন এটা, কাউকে নিরাভরণ করার ইচ্ছে নেই।

কেন ফেরত দিচ্ছে শুভেন্দু অনুমান কবতে পারে। আনন্দের আভাস গোপন করতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, কেন পুরুষ মানুষের এই ঝিনুকের বোতামই তো বেশ—

আচ্ছা, পরুন দেখি কোন্‌টা বেশ, তারপর বিবেচনা করব।

তাকে দেখাবার জন্যেই যেন ঝিনুকের বোতাম খুলে ওই বোতাম পরা শুভেন্দুর। ললিতা দেখেছে, দেখে অবিবেচনাও করতে পারেনি। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে রায় দিয়েছে, না এটাই বেশ...বোতাম ফেরত দিয়েছি জানতে পেলে অ্যাসোসিয়েশান এবার তাড়াবে আমাকে।

শুভেন্দু চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, কাঞ্চনমূল্য ধরে দেব তাহলে?

পাবেন কোথায়? ...বেকার মানুষেরা অবশ্য বাবার কাঞ্চন কাচের মতই দেখে শুনেছি।

মিস্টার ভট্ভট্ বা বোতাম-বাবু তেমন অপছন্দ হয়নি শুভেন্দুর, কিন্তু ননীগোপাল পছন্দ নয়। তাও মুখে নয়, একেবারে রিসিটের ওপর। সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেও লিখেই প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিল একটা। তাতে সম্ভাষণ করেছিল, ললিতাসখি।

জবাবের প্রত্যাশায় ছিল কয়েকটা দিন। জবাব মেলেনি। অতএব সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। সুযোগ মিলেছে।

নিরিবিলি রাস্তায় মোটর বাইকের শব্দে অনেক দূর থেকে ললিতা ডাট্ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে চকিত ভয়ের ছায়া পড়েছে মুখে। যে ভাবে সরাসরি

ওকে লক্ষ্য করে আসছে, মোটর বাইকটা কি হুড়মুড়িয়ে ওর গায়ে এসেই পড়বে নাকি! কি আশ্চর্য, পাগল নাকি লোকটা—

সামনা-সামনি আধ হাতের মধ্যে এসে মোটর বাইকটা দাঁড়িয়ে গেল। ললিতা হতভম্ব হয়েছিল বটে, কিন্তু এক পাও নড়েনি। রেগেই উঠল প্রায়, আর চার আঙুল এগোলেই তো হত, থামলেন কেন?

ইচ্ছে ছিল, শুভেন্দু হাসছে, চিঠির জবাব কই?

কিসের চিঠি?

আমি ননীগোপাল?

আমি ললিতাসখি?

তুমি আগে লিখেছ।

আপনি পরে লিখে শোধ দিয়েছেন। মোটর বাইকে চাপা দেবার চেষ্টাটা বাড়তি।

তুমিও পিছনে উঠে পড়ে শোধ দাও।

ললিতা হেসে ফেলেছে, থাক, আমি ক্ষমাশীলা মহিলা।

তুমি ললিতাসখি।

আপনি ননীগোপাল।

তাহলে চাপা, দেব....

ললিতার ভ্রূকুটি, মোটর বাইকে তো?

মোটর বাইকে হলে রাজি আছে যেন। শুভেন্দুর ফর্সা মুখ লাল।

মনে মুখে লাগাম নেই, গোটা গোরখপুর শহরের লোক চেনে এই এক মেয়েকে। ললিতা ডাট্, অন্যথায় ললিতা দত্ত। তিন-চার পুরুষ ধরে এখানে বসবাসের ফলে দত্ত ঘুচে ডাট্-এ দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাটা ভালোভাবে রপ্ত হবার পর ললিতা নিজের নাম স্বাক্ষরের সময় ডাট্কে দত্ত করে নিয়েছে। লোকের মুখে মুখে প্রচার, এই পরিবারটির কোনো এক পূর্ব-পুরুষ সৈন্য বিভাগে নাম লিখিয়েছিলেন। বেপরোয়া মানুষ ছিলেন তিনি, সৈন্য বিভাগে নাম কিনেছিলেন, সেই সঙ্গে দুর্নামও। প্রচুর মদ খেতেন এবং খোলাখুলি খেতেন। সেই সময়ের বাঙালী সমাজে সেটা বিষম ব্যাভিচারের তুল্য। তাঁকে একঘরে করা হয়েছিল, সেই রাগে সরাসরি গিয়ে মানুষটি ক্রিশ্চিয়ান হয়ে বসেছিলেন।

শুভেন্দুর মনে হত সেই পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে ললিতা দত্তর। এমনিতে হাসিখুশির অন্ত নেই, ভোরবেলার আলোর দোসর যেন। যা বলার মুখের ওপর বলবে, যা করার সকলের চোখের ওপর করবে। গোড়ায় গোড়ায় তাকে নিয়ে অনেক কানাকানি হয়েছে, অনেক ভ্রূকুটি দেখা গেছে। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপও নেই। এখানকার উইমেন্স্ অ্যাসোসিয়েশানের সকল কাজে মূর্তিমতী প্রেরণা ওই একজন। কখনো প্রেসিডেন্ট হতে চায়নি, সেক্রেটারী হয়ে আছে। মেয়ে ভর্তি করার জন্য অথবা ডোনেশন আদায়ের জন্যে একবারের জায়গায় পাঁচবার হাঁটাহাঁটি

করতে প্রস্তুত। মেয়ে ভর্তি না করেও উপায় নেই, ডোনেশন না দিয়েও নিস্তার নেই। বছরে কম করে গোটা তিন চার সাহায্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে, টিকিট যা ছাপা হয় তার একটাও বেশি হয় বলে শোনেনি কেউ। এ ছাড়া মেয়েদের ছোট ছোট দল নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে কল্যাণ অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম করে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর আধা-মধ্যবিত্ত মেয়েদের জড়ো করে সমাজ চেতনা আর স্বাস্থ্য চেতনার মহড়া দেয়।

বাবা মা নেই, কাকার কাছে বড় হয়েছে। নিজের দাদা আছেন একজন, মস্ত চালের ব্যবসা তাঁর। সেই দাদার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। গত বছরে মাত্র তাঁব সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। ললিতা কেসএ হেরেছে। সেবারে দুর্ভিক্ষের মত হয়েছিল। দূরের দূরের দুঃস্থ মানুষেবা আর্তত্রাসে শহরে এসে ভেঙ্গে পড়েছিল। বন্যায় অজন্মায় এ-রকম অঘটন এখানে নতুন নয়। দাদার চালের দাম তখন আগুন হয়ে উঠেছিল।

সেই সময়ে ললিতা দত্তর আর এক মূর্তি দেখেছে এখানকাব লোক। দলবল নিযে দাদার চালের আড়তে হানা দিয়েছে, ধারালো বক্তৃতা করেছে, কালো দামে যারা চালের প্রত্যাশায় এসেছে তাদেব ধমকে ফিরিয়েছে, আর অ-লাভে চাল না ছাড়লে বিপদ হবে দাদাকে সেই হুমকি দিয়েছে।

বিপদ হয়েছিল। সেই ঘা তার দাদা আজও সামলে উঠতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কালো বাজাবীর দুর্নাম তাঁব এখন ঘোচেনি। তার ওপর ললিতা মামলা রুজু করেছিল দাদার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মাতৃধনের অংশ আছে দাদার মূলধনে, অতএব সে অংশের ভাগ তাব প্রাপ্য। সে-টাকাটা দুর্গতদের সাহায্যার্থে ব্যয় কবতে হবে।

এত সবের পরেও আবার হাসিমুখে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আপত্তি ছিল না তাব, কিন্তু সে মুখ দেখতে দাদারই আপত্তি।

ললিতা দত্ত রূপসী কিনা সে প্রশ্ন তুললে থমকাতে হবে। নারীরূপের কেতাবী সংস্কার সঙ্গে ওর রূপটা আদৌ মিলবে কিনা সন্দেহ। গায়ের রঙ টেনেটুনে ফর্সা, মাথার চুল হাঁটু ছোঁয়া দূরে থাক, পিঠ ছাড়াযনি। পটল চেরা চোখ নয, বাঁশীর মত নাক নয়, তুলির আঁকা ভুরু নয়। কিন্তু এসব ছাড়াও মেয়েদের আর এক রূপ আছে যা দুরন্ত অথচ স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল অথচ অপ্রগল্‌ভ। ললিতা দত্তর মুখে হাসি ধরে না, আর অঙ্গ সৌষ্ঠব অনুশাসনে ধরে না। তবু কোনটাই বেশি নয কোনটাই বাড়তি নয। পুরুষের নিভৃত বাসনায় এই রূপেরই আঁচ বেশি। এ-পর্যন্ত ললিতা দত্ত প্রেম-পত্র কত পেয়েছে লেখাজোখা নেই, বিয়ের প্রস্তাবও কম আসেনি। ভীরু পত্রালী আর ভীরু প্রস্তাব সব—সাড়া দেবার মত নয।

কানাকানি দানা বাঁধতে সময লাগেনি। ব্যানার্জী সাহেবের ওই সাহেবের মত ছেলেটা খোলাখুলি ঝুঁকেছে মেয়েটার দিকে—প্রথম প্রথম কৌতুক আর কৌতূহলে হাবুডুবু নতুন বয়সের ছেলে মেয়েরা। বয়স্করা পরিণাম ভেবে কিছুটা চিন্তিত। ব্যানার্জী সাহেব ললিতা দত্তকে অবশ্য স্নেহ করেন খুবই, তার চাঁদার চাহিদা হাসি মুখে

মেটান, ভালো কাজে উৎসাহ দেখে যেচে পাঁচটা পরামর্শ দেন। এক বন্ধুর কাছে একবার মন্তব্য করেছিলেন, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ শক্তি....

কিন্তু তা বলে তিনি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেবেন সেটা সকল সম্ভাবনার বাইরে বলেই ধরে নিয়েছিল সকলে। ব্যাপারটা তাঁর কানেও উঠল। শুভেন্দুর বড়দাই আভাসে ইঙ্গিতে জানালো তাঁকে। আগে বউরা শুনেছে। এনিযে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে দেওরকে। ব্যানার্জী সাহেব চুপচাপ শুনেছেন আর শুনেও চুপ করেই ছিলেন। বউদের আর ছেলেদের ধারণা বাপের কানে খবরটা আগেই কেউ দিয়েছে।

শুভেন্দু বাবাকে একটু গম্ভীর দেখছে। কিন্তু এবারে আর বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, তোমার কি হয়েছে। কি হযেছে সেটা আঁচ করতে পেরেছে। ফলে বাড়িতে সেও কিছুটা গম্ভীর এবং দাদা বউদিদের প্রতি একটু বিরূপ।

বাবা কিছু বলবেন একদিন সেটা মনে মনে অনুমান করেছিল, কিন্তু যেদিন বললেন সেদিন শুভেন্দু প্রস্তুত ছিল না। আর, যা বললেন, তার জন্যেও না।

উপলক্ষ্য জামার বোতাম। শুভেন্দু মাঝে মাঝে চার ছ'পয়সা দামের আলগা বোতামও পরত জামায। ললিতা দু'দিন সেগুলি খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা হলেই সে আগে চেয়ে দেখে বুকের ওপর মিনে করা সেই সোনার বোতাম ঝল ঝল করছে কিনা। না থাকলেই এই কাণ্ড। আর কাণ্ডটা ভালো যে লাগত সন্দেহ নেই। তারপর ওকে জব্দ কবার জন্য ঝিনুকের বোতাম এনে ছুঁচসুতো দিয়ে নিজের হাতে সেলাই করে নিল একদিন। ললিতা পটাপট তাও টেনে ছিঁড়ল। এটাই বেশি ভালো লাগল শুভেন্দুর, আর এই কাণ্ডটারই পুনরাবর্তন হতে থাকল প্রায়ই।

নিজের ঘরে বসে নিবিষ্ট চিত্তে জামার বোতাম সেলাই করছিল সেদিন। টেবিলের ওপর ডজন তিনেক ঝিনুকের বোতামের পাতা। ঘরে ঢুকল মেজবউদি। ওরই সমবয়সী। তার দেখে ফেলাটা শুভেন্দুর ভালো লাগল না। আগেও দেখেছে, জামা টেনে নিজেই সেলাই কবে দিয়েছে দু একদিন।

কি ব্যাপার, এত ঘন ঘন বোতাম ছিঁড়ছে কি করে আজকাল? টেবিলে বোতামের পাঁজা, ছুঁচ, সুতো—প্রায়ই দেখি বোতাম লাগাচ্ছ। সোনার বোতাম পর না আজকাল।

পরি।

তবে?

এও পরি।

কিন্তু বোতামগুলি চিবোও নাকি, এত ছেঁড়ে কি করে?

ছেঁড়ে বলে।

যে ছেলে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায় না, তাকে দু একদিন পরে পরে এত মনোযোগ সহকারে বোতাম সেলাই করতে দেখে খট্‌কা লেগেছিল মেজ বউদির। বিকেলের সেলাই করা বোতাম রাতে উধাও হয়েছে তাও লক্ষ্য করেছে। মেজবউদি

থমকালো একটু, কে ছেঁড়ে?

একজন মহিলা। শুভেন্দু নির্লিপ্ত।

ও, দেখাদেখি মেজবউদিও গম্ভীব, মহিলার জামার বোতাম পর্যন্ত হাত গেছে তাহলে। তা ছেঁড়ে কেন?

সোনার বোতাম পরি না বলে।

সোনার বোতাম না পরলেই ছিঁড়বে?

তাই তো ছিঁড়ছে।

সেলাই না করে এমনি আলগা বোতাম পর না কেন তাহলে, জামাগুলো যে গেল।

আলগা বোতাম পরলে ছেঁড়া হয় না।

বুঝলাম। বেশ খেলা। পরদা সরিয়ে বাইরে আসতেই মেজবউ অপ্রস্তুত। দরজার কাছে শ্বশুর দাঁড়িয়ে। তিনি বাড়ি আছেন জানতো না। একবার তাকিয়েই বুঝলো ঘরের কথাবার্তা কানে গেছে। মেজবউ পালিযে বাঁচল।

ব্যানার্জী সাহেব ঘরে এসে দাঁড়ালেন। শুভেন্দু জামা গায়ে গলিযে বোতাম লাগাচ্ছিল। চকিতে তাকালো একবার।

ওই মেয়েটি যে ক্রিশ্চিয়ান জানা আছে তো?

শুভেন্দু জবাব দিল না। মাথা নাড়ল শুধু। জানা আছে।

ব্যানার্জী সাহেব আর একটি কথাও বললেন না। এটুকুই বলার দরকার ছিল যেন, আর এটুকু বলেই নিশ্চিন্ত।

একই ভাবে মাস দুই কেটেছে আরো। বড় ভাইয়েরা জানে ছোট ভাইটিকে বাবা কিছু বলেছেন। কিন্তু তাতে ফল কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। উল্টে মাখামাখি বেড়েছে, ভাইটি আরো একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

শুভেন্দু ললিতা দত্তকে অবশ্য একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করা যায় বলো তো?

কিসের?

এই তোমার আমার ব্যাপারটা—

ললিতার নিরুদ্বিগ্ন জবাব, আগে বেকারত্ব ঘোচাও, করার কথা তার পরে ভাবা যাবে। আমিও দেখি কিছু করতে পারি কিনা।—

শুভেন্দুর এইটাই সমস্যা ছিল না, তাই পরামর্শটা মনঃপূত হল না।

একটু বাদে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে বলে রেখেছ?

আসল আলোচনার বিষয় এটাই। শুভেন্দু জবাব দিল, বলি নি ...জানে।

জানে তো সবাই, ললিতা হাসল, তবু অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট একটা দরকার তো।

যদি আপত্তি করে?

আপত্তি করলে তোমার মাথা ব্যথা। ললিতা নিশ্চিন্ত। একটু থেমে হাসি মুখে

নিজেই মন্তব্য করল আবার, তোমার বাবা বুদ্ধিমান মানুষ, আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।

অর্থাৎ আপত্তি করা না করা সমান যখন, বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে তিনি আর আপত্তি করতে যাবেন কেন।

কথাটা কেন জানি ভালো লাগল শুভেন্দুর। কথাটা ঠিক নয়, কথার পিছনে ওর এই নিশ্চিন্ত জোরটা। ললিতা সেই এক কথাই স্মরণ করিয়ে দিল আবারও, যাই হোক, তোমার বাবার টাকার ভরসায় বসে না থেকে নিজে কিছু করতে চেষ্টা করো, তা না হলে লজ্জার কথা হবে।

শুভেন্দু জবাব দিল, আমার দ্বারা চাকরি বাকরি পোষাবে না!

যা পোষাবে তাই করো।

ততদিন আমি হাঁ করে বসে থাকব নাকি! শুভেন্দুর ভ্রূকুটি।

হাঁ করে বসে আছ? বেইমান কোথাকার। ললিতার পাল্টা তর্জন।

এরপরের এক ঘটনা শুভেন্দুর একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। গেল বটে কিন্তু তার আগে ধকলও গেল প্রচুর।

ললিতা অ্যাসোসিয়েশানের কাজে কোন্ একটা গাঁয়ে গিয়েছিল দিনকতকের জন্যে। শুভেন্দু সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, ললিতা রাজি হয়নি। গাঁয়ের লোকেরা এ লীলা বরদাস্ত করবে না, ফলে যাওয়াটাই মাটি হবে। কিন্তু যাওয়া মাটি এমনিতেই হলো। ললিতা ফিরল শক্ত জ্বর নিয়ে, প্রায় বেহুঁশ অবস্থায়।

তারপর যমে-মানুষে টানাটানি একটানা ক'টা দিন। ডাক্তাররা মুখ গম্ভীর করে চিকিৎসা করে চলেছেন। বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের ভিড় সর্বদা। শহরের যৌবন নিভতে চলেছে। যারা আসেনি তারাও ঘরে বসে উৎকণ্ঠিত প্রহর গুনেছে।

শুভেন্দু দিনে দু-একবার বাড়ি আসে। নইলে সমস্ত দিন রাত এক-রকম সেখানেই কাটে। দাদারা বউদিরা খোঁজ নেয় কেমন আছে। শুভেন্দু কখনো মাথা নাড়ে, কখনো চুপ করে থাকে, কখনো জোর করে বলে, ভালো আছে—। এদের কুশল প্রশ্ন খুব আন্তরিক মনে হয় না তার। সেদিন বাবাও জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে?

শুভেন্দু দুই এক মুহূর্ত চুপচাপ চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। গাম্ভীর্যের আবরণের নিচে কোন্ জবাব প্রত্যাশা সেটাই উপলব্ধির চেষ্টা।

ভালো না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়ায়নি আর, চলে এসেছিল।

ব্যানার্জী সাহেব সেই বিকেলেই ললিতাকে দেখতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ বসেও ছিলেন। ললিতা টের পায়নি, জ্বরের ঘোরে সে অর্ধ অচেতন।

একদিন বাদে আবার এলেন ব্যানার্জী সাহেব। রোগিনীর পাশে তার খাটের ওপরেই শুভেন্দু বসে। ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে বাবাকে দেখল একবার! কিন্তু উঠল না, বসেই রইল। মাথার দিকের দরজার কাছে ললিতার কাকা আর ব্যানার্জী সাহেব বসে।

চিকিৎসা প্রসঙ্গেই দুই এক কথা বলছেন তাঁরা। নয়ত বেশির ভাগ সময় চুপচাপ।

সমস্ত ঘরে থমথমে ভাব একটা।

ললিতা জ্বরের ঘোরেই চোখ মেলে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। শূন্য আচ্ছন্ন দৃষ্টি। বিষক্রিয়ার যাতনা। শিয়রের দিকে দরজার কাছে যে দু'জন লোক বসে আছেন, এমনিতেই তাঁদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়, ওকেও ভালো করে করে দেখেছে বা চিনেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই শেষের বার যেন দেখেছে, চিনেছেও। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। কিছু চায় কিনা বোঝার জন্যে শুভেন্দু কাছে ঝুঁকে এল একটু।

ওদিকে পা-টিপে ললিতার কাকা আর ব্যানার্জী সাহেবও উঠে শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কাঁপতে কাঁপতে একখানা হাত উঠল ললিতার। কিছু ধরতে চায়, কিছু ধরবে। শুভেন্দু ব্যগ্র হয়ে কাছে ঝুঁকল আরো। যা ধরতে চায় ললিতা সেটা পেল। ধরেও ফেলল। শুভেন্দুর জামার বুকের ঝিনুকের বোতাম একটা। ছেঁড়ার ইচ্ছে। ছিঁড়ে জব্দ করার ইচ্ছে। নিষ্প্রভ মুখে হাসির আভাস।

গলা ঠেলে একটা শব্দ উঠে আসতে চাইছিল শুভেন্দুর। বাপের চোখে চোখ পড়ল। ব্যানার্জী সাহেব ওর দিকেই চেয়ে আছেন। গম্ভীর। আস্তে আস্তে বোতাম থেকে ললিতার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বালিশের ওপর রাখল শুভেন্দু। শান্তিতে আর কিছুটা তৃপ্তিতেও ললিতা চোখ বুজেছে আবার।

শয্যা ছেড়ে শুভেন্দু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

খানিকবাদে পায়ের শব্দে সচকিত হল। বাবা। একটি কথাও না বলে গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠলেন তিনি। গাড়িটা বাড়ির দিকে না গিয়ে অন্য দিকে চলল।

কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল শুভেন্দুর খেয়াল নেই। বেশ কিছুক্ষণ হবে। বাবার গাড়িটা আবার সামনে এসে দাঁড়াতে চমকে উঠল। গাড়িতে বাবা একা নন।

যে-দু'জন ডাক্তার ললিতাকে দেখছেন তাঁরা। আর সেই সঙ্গে রেল কলোনীর মস্ত নামজাদা ডাক্তার। ডাঃ খোশলা, বাবার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওদেরও পরিচিত। ডাঃ খোশলাকে আনার কথা শুভেন্দু অনেকদিন ভেবেছে, কিন্তু এই নিয়মবিরুদ্ধ কাজটা এক বাবা ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয় ভেবেই চুপ করে ছিল।

সকলকে নিয়ে বাবা ভিতরে চলে গেলেন। নির্বাক মূর্তির মত শুভেন্দু পায়ে পায়ে অনুসরণ করল তাঁদের।

ললিতা সেরে উঠল সে-যাত্রা।

দিন সাতেক পরে শুভেন্দুকে নিরিবিলিতে পেয়ে ডাঃ খোশলা তার পিঠে চাপড়ে অভয় দিলেন, ডোণ্ট ওয়ারি মাই বয়, শী উইল বি অল্ রাইট!

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করে বসল, বাবা আপনাকে কি বলেছেন?

ডাঃ খোশলা হা-হা করে হেসে উঠলেন প্রথম। তারপর অকপটে

জানালেন বাবা কি বলেছেন। বাবা বলেছেন দু'দিন বাদে ঘরের বউ হয়ে আসার কথা মেয়েটার, যে করে পারো ওকে বাঁচাও ডাক্তার, নইলে জীবনের শুরুতেই ছেলেটা বড় দাগা পাবে।

না, শুভেন্দুর চোখে জল বড় আসে না। কিন্তু থেকে থেকে সে দিন বিড়ম্বনার একশেষ, কোথায় যে মুখ লুকোবে ভেবে পায়নি।

যে অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টের কথা ললিতা দত্ত একদিন বলেছিল, সেটাই এরপর আপনা থেকে হয়ে গেল যেন। সকলেই জানল ওই ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গেই ব্যানার্জী সাহেব ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, এবং তার নিজের আগ্রহটা ছেলের আগ্রহের থেকে কিছু কম নয়।

অসুখের ধকল কাটিয়ে আগের মত সুস্থ হয়ে উঠতে আরো মাস দুই লেগেছিল ললিতার। তার পরেও মাসের পর মাস তাকে কড়া শাসনে রেখে আসছে শুভেন্দু। কোথাও বেরুবার নাম করলে চোখ রাঙায়।

মোটর বাইকের সঙ্গে সাইড্-কার একটা অনেকদিনই জুড়ে নিয়েছিল। বাপের ছাড়পত্র পাওয়ার পর এখন বুক ফুলিয়েই ললিতাকে সাইড্-কারে বসিয়ে গোটা গোরখপুর চষে বেড়ায়। অবশ্য লোকজন কম যেদিকে সেদিকেই যায়। বন্ধুরা বলে, আগের থেকেও ললিতার চেহারা ভাল হয়েছে অনেক। শুভেন্দু চোরা চোখে দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারও মনে হয় মিথ্যে বলে না। ললিতার মুখে কাঁচা রঙ লেগেছে নতুন করে।

নিরিবিলি বলতে রামগড় লেকের পাশ দিয়ে এই কাশিয়া রোড। এদিকেই বেশি আসে। কোনদিন লেকের ধারে এসে বসে, কোনদিন সমাধি আঙিনায় ঢোকে, কোনদিন বা শুধু এগিয়েই চলে। যেখানেই যাক ললিতার কোন আপত্তি নেই। যত জোরে চালাক ওকে ভয় পাওয়ানোর জন্য, সে হাসে—ভয় ডরের লেশ মাত্র নেই।

একদিন আপত্তি করেছিল। কাশিয়া রোড ধরে প্রায় কুশিনগরের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল। বুদ্ধের দেহত্যাগের স্মৃতি ভূমি কুশিনগর। ইচ্ছে সেখানেই যাবে। কিন্তু ললিতার হঠাৎ আপত্তি। বুদ্ধের স্মৃতি তীর্থে গিয়ে হাজির হবার কোন বাসনা নেই। তার থেকে নেপাল বর্ডারে ঢুকে পড়তে রাজি।

নেপাল বর্ডার প্রায় আশি মাইল।

ললিতার সব থেকে ভাল লাগে সমাধি আঙিনার মধ্যে ঘুরতে। সপ্তাহে দুই-একদিন আসাই চাই সেখানে। তার বাবা মায়ের সমাধিও সেখানেই। ঘাসের কবর নয়, স্মৃতি স্তম্ভ আছে। অবস্থাপন্নদের তাই থাকে। চারপাশে গোলাপ ম্যাগনোলিয়ার গাছ, সমাধি-স্মৃতিতে সুন্দর কারুকার্য, নাম ধাম পরিচয় খোদাই করা। দুঃস্থদের কবরের ওপর ঘাস বিছানো, টিনের ফলকে নাম লেখা শুধু। ঘুরে ঘুরে ওরা সব ক'টি কবর দেখেছে। শুনেছে—হাজার খানেক।

ললিতা বলে, ওই ঘাসের সমাধিই তার ভাল লাগে। মরে গেলেও কেন যে

লোক ভাব চাপায় বোঝে না। একদিন বলেওছে, মরলে পর সে ওসব স্তন্ত্র-টন্ত্র চায় না।

শুভেন্দু জবাব দিয়েছে, তুমি চাইলেই বা কি আর না চাইলেই বা কি, মরলে পরে তোমাকে তো পোড়ানো হবে।

ললিতার আগে খেয়াল ছিল না, শুভেন্দুর কথা শুনে তাৎপর্যটা বুঝলো। হেসে ঠাট্টা করল সেও, জ্যান্তই পোড়াচ্ছো, মরলে তো ঘটা করেই পোড়াবে।

ওদের আনন্দে গা ভাসাতে দেখে যে-যাই ভাবুক, শুভেন্দু মনের তলায় কিন্তু একটু ভাবনার মত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সম্প্রতি। কিছু করা দরকার, অথচ দিনের পর দিন যায়, কিছুই করা হচ্ছে না। বাবা ওর নামে ব্যাঙ্কে মন্দ টাকা রাখেননি এপর্যন্ত, কিন্তু তার সিকির সিকিও যে অবশিষ্ট নেই সেটা জানেন না বোধহয়। এবই মধ্যে একদিন তিনি ওকে ডেকে বলেছেন, এভাবে সময় নষ্ট না কবে কাজ-কর্মে মন দাও, এই করেই চলবে?

আর একদিন ললিতা বলেছিল, এই বেডানো ফেডানো বন্ধ কবা দবকার, ভাবনা নেই চিন্তা নেই নিষ্কর্মার গোঁসাই হচ্ছ দিনকে দিন। লোকে এবপর আমাকেই দুষবে। এদিকে বসে বসে নিজেও মুটিযে যাচ্ছি দিনকে দিন, পুবানো ব্লাউজ আর একট'ও গায়ে হয না।

রামগড লেকের জনশূন্য এক ধারে বসে ছিল দু'জনে। শুভেন্দুব চোখে চোখ পড়তে চট্ করে উঠে দূরে গিযে দাঁডিযেছে। ওব মোটা হওযাটা লোলুপ চোখে মাপছে, এরপর হাত বাড়াবে জানা কথা।

কিন্তু বাবার কথা বা ললিতার কথা শুভেন্দু এখন আব উডিযে দিতে পাবে না একেবারে। চাকরি তাব দ্বারা হবে না, ব্যবসা হতে পারে। কিন্তু কি ব্যবসা? ললিতাকে ডাকে, আচ্ছা এসো, কি করা যায পবামর্শ করা যাক।

ললিতা সেখানেই বসে পডে। বিশ্বাস করে ব্যবধান ঘোচাতে রাজি নয। পবামর্শটা দূরে দূরে বসেই হোক্। কিন্তু হয় না শেষ পর্যন্ত। পবামর্শেব মাঝপথে দেখা যায, শুভেন্দু সরতে সরতে গা ঘেঁষে এসে বসেছে কখন। ললিতা হেসে ফেলে জোরেই চাঁটি বসিয়ে দেয় একটা, সরো বলছি।

শীতের মুখটাতে গোটা গোরখপুর চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ। ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার অবকাশ কারোই আর থাকল না বড়।

রাপ্তির ডাক শোনা যাচ্ছে।

রাপ্তির ডাক শুনে লোকজন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে, রাপ্তি ডাকছে, না এসে করব কি!

বন্যা বলে না কেউ, রাপ্তির ডাক, রাপ্তি ডেকেছে।

দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা রামগড় লেক ভয়াল যৌবনে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। আর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্ত মুখ থমথমিয়ে উঠল ললিতা দত্তর।

এই বন্যার বিভীষিকা শুভেন্দু আগেও বাব-কতক দেখেছে। প্রায় দু'শ আড়াইশ গ্রাম ভেসে যায়, অসুখ লাগে, মড়ক লাগে, শীতে হাড় জমে যায়, ইস্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ কাজকর্ম বন্ধ হয়—সমস্ত গোরখপুর রিলিফ সেণ্টার হয়ে উঠে। পাঁচ হাত জায়গা খালি পড়ে থাকে না কোন প্রতিষ্ঠান আঙ্গিনায়।

এই বন্যার সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিনী সম্ভবত গোরখপুরের উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশান। সকল বাড়ির প্রাপ্ত বয়স্ক সব মেয়েকে জড়ো করবেই ললিতা দত্ত। টাকা তোলা, শুশ্রূষা করা, পথ্য জোগানো—জল না নামা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেবে-না কাউকে।

ললিতার তখন ভিন্ন মূর্তি।

রামগড়ের জল রাস্তার কাছাকাছি উঠে এসেছে। পাথরের মত মুখখানা করে ললিতা সেদিন তাই দেখছিল চেয়ে চেয়ে। একসময় শুভেন্দুকে বলল, রাপ্তি এবারে আর অল্প-স্বল্পয় ছাড়বে না—বেশ ঘটা করে ডাকবে মনে হচ্ছে।

এমন আত্মবিস্মৃত ক্ষোভ শুভেন্দুর খুব ভালো লাগছিল না। তবু চুপচাপই শুনছিল।

বন্যা প্রসঙ্গে ললিতা তার বাবার কথা বলেছে। রাপ্তি ডাকছে শুনলেই মাথা খারাপ হয়ে যেত তাঁর। এখানকার সব থেকে বড় অভিশাপ এই বন্যা। অভিশাপ ঠেকানোর জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন তিনি। আশ-পাশের নিচু জমি আটকানোর জন্যে এই যে এত বাঁধ হয়েছে এখন, এর অর্ধেক অন্তত তার বাবার চেষ্টায় আর বাবার লেখালিখি হৈ-হুলস্থূলুর জন্যে হয়েছে। কিন্তু বাবা চোখ বোজার পরেই কারো যেন আর গরজ নেই তেমন, শেয়াল কুকুরের মত লোক মরছে, তবু বিপদ এসে যাওয়ার আগে কারোই আর হুঁশ নেই।

ললিতা আরো বলেছে। রাপ্তি ডাকছে শুনলেই কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সকলে। যারা মরে তারাও, যারা চলে আসে তারাও, আর যারা বন্যা ঠেকানোর জন্যে মেতে ওঠে তারাও। রাপ্তির ডাক নেশা ধরায়।

পরের দু'দিনের মধ্যেই শহরের শান্তি লণ্ডভণ্ড। রামগড় রাস্তায় উঠে ওধার দিয়ে ভেসে চলেছে। আঠেরো বিশফুট উঁচু পুরোনো বাঁধ ভেঙেছে কয়েকটা। পশু মরেছে অনেক, লোকজনও নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিছু। জলে জলে একাকার চারদিক। নৌকায় নৌকায় লোক আসছে তো আসছেই। মত্ত রাপ্তি ঘটা করেই ডাকতে লেগেছে। রাপ্তি নেশা ধরিয়েছে। মরণের নেশা, বাঁচার নেশা, প্রতিরোধের নেশা।

বহু চেষ্টা করে ললিতাকে দু'দশ মিনিটের জন্যে নিরিবিলিতে পাওয়া গেল সেদিন। শুভেন্দু জানাল দূরের কোন্ ডিস্‌পোজালের কম্বলের অক্‌শান্ থেকে সে বেশ কয়েক হাজার কম্বল ধরতে পাবে হয়ত, ধরবে কিনা—

শোনা মাত্র ললিতা যেমন বিরক্ত তেমনি ব্যগ্র।—এ আবার জিজ্ঞাসা করছ কি,

পারো তো এক্ষুনি গিয়ে ধরো—শীতেই তো অর্ধেক লোক মরে!

বাবাকে জানাতে তিনি বললেন, পেলে তো খুব ভালই হয়, দেখ্ চেষ্টা করে, রিলিফ অফিসারকে আমি একটা চিঠি দিযে দেব'খন, ডিস্ট্রিবিউশানের ভার তাঁরাই নিতে পারেন। ....টাকা লাগবে?

শুভেন্দু জানালো লাগবে কিছু।

সেই দিনই ব্যানার্জী সাহেব ছেলের নামে একটা মোটা অঙ্কেব টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন। আর বললেন, আরো লাগলে চেয়ে নিস।

কম্বল এল। ছেলের কর্মতৎপরতা দেখে ব্যানার্জী সাহেব মনে মনে খুশি, আব ললিতা দত্ত আনন্দে আটখানা। দশ হাজার কম্বলের একটা গাঁট পাওয়া গেছে। তাব মধ্যে হাজার দুই কম্বল ছেঁড়া-ফাঁড়া, বাকি আট হাজার ভালো। রিলিফ অফিসাবেব সঙ্গে বসে দাম ফেলে আঁক কষে স্থির হল কম্বল পিছু তিন টাকা দাম হবে, ক্রেতা দেবে অর্ধেক অর্থাৎ দেড় টাকা, আর সরকাব দেবেন বাকি দেড-টাকা। দু'হাজাব ছেঁড়া কম্বল ললিতার দখলে চলে গেল, সে সেগুলো বিনি পয়সায় বিলোবে। যাদেব দেড় টাকাও দেবার সামর্থ্য নেই তাদেব।

চার দিনের মধ্যে দশ হাজার কম্বল উধাও। দুর্গতরা সব হুমড়ি খেযে পডল কম্বল নেবার জন্যে। সকলে প্রশংসা করল শুভেন্দুর, এই দুঃসমযে একটা কাজের মত কাজ করল বটে। ললিতা সানন্দে একদিন চুপি চুপি বললে, তুমি তো দেখি ফেমাস হযে গেলে!

শুভেন্দু তখন ভাবছে, আর কোথাও থেকে আবাব এক-গাঁট কম্বল আনা যায় কিনা। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না খুব। জল কমছে একটু একটু, রামগডেব পাশেব রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে আবার। শীত অবশ্য প্রবল, কিন্তু বাইরে থেকে কম্বল নিযে আসতে কতদিন লাগবে আরো কে জানে, ললিতার সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে সে উপায় নেই, তার দেখা পাওয়াই ভার।

পরের কযেকটা দিনে জল আরো কিছুটা নামল। ঝড়েব পর থমথমে প্রশান্ত ভাব একটা। লোকজন নড়তে মাসখানেকের ধাক্কা এখনো। তাছাড়া বাপ্পির মত কৌতুক এরই মধ্যে যে থেমে গেছে সেটা বিশ্বাস করতেও ভয়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শুভেন্দু নিজেব ঘরেই বসে ছিল। বাবা বা দাদারা বাড়ি নেই। বউদিরা যে যার ঘবে। হঠাৎ শুভেন্দু হকচকিযে গেল একেবারে। একখানা ছুরির ফলার মত এসে ঘরে ঢুকল ললিতা দত্ত। সমস্ত মুখ লাল, দু'চোখ কি রকম চকচকে।

কি ব্যাপার? শুভেন্দু ঘাবড়েই গেল।

বাইরে এসো, কথা আছে।

শুভেন্দুর মনের তলায় অশুভ ইশারা কি একটা। ফ্যাকাশে মুখে তার সঙ্গে রাস্তায় এসেই আবার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে, কি হযেছে?

ললিতা মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। জবাব দিল না, দেখছে শুধু। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন।

কি দেখছ?

তোমাকে। ....যে দু' হাজার ছেঁড়া কম্বল আমি বিলি করেছি, তার জন্যে তোমাকে কত দিতে হবে?

শুভেন্দুর সমস্ত মুখ বিবর্ণ, শুকনো। —কি বকছ পাগলের মত?

ললিতা দেখছে। দেখছেই। —এখানে কেউ কেউ বলছেন, তলায় তলায় ধরাধরি করে ওই দশ হাজার কম্বল তুমি চার হাজার টাকায ডেকে নিযেছ, তার মধ্যে আট হাজাব কম্বল তুমি চব্বিশ হাজার টাকায বিক্রি করেছ, কুড়ি হাজার টাকা তোমাব থোক লাভ হয়েছে। সত্যি?

মনে মনে প্রমাদ গুনছে শুভেন্দু। সহজভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল, চার হাজাব টাকা তো আব সত্যই দাম নয়, আমি চেষ্টা করে—

সেই চেষ্টার দাম নিলে?

তা কেন, যারা কিনেছে তাদেব তো দেড টাকা দিতে হযেছে মাত্র, বাকি দেড টাকা তো গভর্ণমেণ্ট দিচ্ছে।

ললিতার পাযেব তলা থেকে মাটি সবে যাচ্ছে, মাথাব ভিতবে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ কবে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথরিয়ে। ভয পেয়ে শুভেন্দু তাডাতাডি হাত ধবতে গেল তার।

ললিতা ছিটকে সরে দাঁডিযে গর্জে উঠল প্রথম, কাছে এসো না!

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল তারপর, সকলে রাপ্তিব ডাক শুনলে, শুধু তুমি শুনলে না? তুমি এই করলে? তুমি শুনেছ বলেই সব থেকে বেশি গর্ব ছিল আমার, তুমি এইভাবে ভেঙে দিলে সব? এইভাবে অপমান করলে আমাকে?

বলতে বলতে ললিতা প্রায় ছুটেই চলে গেল সেখান থেকে। শুভেন্দু হতভম্বেব মত দাঁডিযে।

এরপর আট দশ দিন ক্রমাগত চেষ্টা করেছে ওকে ধরতে। পারেনি। অ্যাসোসিযেশন আব বাডিতে গিয়েও ধর্ণা দিযেছে। উপস্থিত থাকলে ললিতা ভিতর থেকে খবব পাঠিযেছে, দেখা হবে না।

শুভেন্দুর মেজাজ চড়ছে ক্রমশ। ললিতা আর একটু কম কঠিন হলে সে লজ্জাই পেত, লজ্জাই পেয়েছিল প্রথম। এখন মেজাজ চড়ছে। অত ভাবপ্রবণতা নিয়ে বসে থাকলে পুরুষ মানুষের চলে না। এমন কিছু অন্যায় করে নি সে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওই দামে কম্বল সংগ্রহ করেছে। পেলে এক্ষুনি আর এক লট্ কেনে, আরো চড়া দামে বিক্রি করে। বন্যাটা আরো কয়েকদিন থাকলে হত।

রাপ্তির কৌতুক বোঝা গেল আরো দিন পনের পরে। দিন সাতেক আবার অবিরাম বর্ষণের পর সংহার নটী হঠাৎই যেন থমকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, ত্রাস দেখছিল।

প্রতিরোধের চিরাচরিত রণসজ্জা দেখছিল। দ্বিগুণ উল্লাসে সে ফুলে উঠল আবার, রামগড়ের বুকও আবার ফেঁপে উঠল।

এক মাসের মধ্যে দু-দুবার বন্যা অনেক বছরের মধ্যে দেখেনি কেউ। হতচকিত দিশেহারা অবস্থা আবারও। বাঁধ ভাঙল কটা, নতুন করে ঘর বাড়ি ভাঙল, দিকে দিকে নৌকো ছুটল। কনকনে শীত হাড়ে গিয়ে বেঁধে।

শুভেন্দু চেষ্টার ত্রুটি করেনি। আর এক লট্ কম্বল সংগ্রহ হবে হয়ত। দশ হাজার না হোক্—হাজার পাঁচেক পাওয়ার সম্ভাবনা। শুভেন্দু সেই ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। সেও রাপ্তির ডাক শুনেছে বই কি। সবাই যে এক রকম শুনবে তার কি মানে?

কিন্তু একই রকম শুনতে হল তাকেও। ললিতা দত্ত শোনালো।

সবাই বলাবলি করছে, মেয়েটা আত্মহত্যাই করল। কতদিন কতবার কতজনে নিষেধ করেছে কানেও তোলেনি। জলকুম্ভীতে চেপে খাবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আত্মহত্যা না তো কি? রোজ যেখানে বাঁধ ভাঙছে, ধস নামছে! তিন দিন খাবার পাঠানো হয়নি শুনে এমন রেগে গেল যে নৌকা আসাব তর সইল না, জলকুম্ভী নিযে চলল খাবার পৌঁছে দিতে। আঁট কচুরি পানার তলায় বাঁশেব চাঁচড়ি দিয়ে তৈবি ভেলাকে স্থানীয় লোকেরা বলে জলকুম্ভী। নৌকার অভাবে বিপদ তুচ্ছ করে ললিতা আগেও দুই-একবার এতেই চেপে খাবার দিয়ে এসেছে—কাবো নিষেধ শোনেনি, জেদের বশেই গেছে যেন।

কে গেল? বন্যায় কতই তো গেল, কাব কথা বলছ তোমরা? কে আত্মহত্যা করল? জলকুম্ভীতে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে কে ভাঙা বাঁধের মুখে পড়েছে? কে? কে? কে? কে?

শুভেন্দু নিস্পন্দ কাঠ।

রাপ্তির ডাক শুনেছে। শুনছে। যে-ভাবে শুনবে বলে ললিতা আশা করেছিল সেই ভাবেই শুনেছে। ললিতার গর্ব করার মত করেই শুনেছে।

তারপর আর্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটেছে ললিতাকে দেখতে। দেখেছে, সকলে ওকে পথ করে দিয়েছে। জ্ঞান বোধের অতীত দুই চোখ দিয়ে শুভেন্দু হাঁ করে শুধু দেখেছে।

নিস্পন্দ বিস্ময়ে ললিতার শান্ত ঘুম দেখেছে শুভেন্দু।

* * *

মোটর বাইকটা শেষ পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। দাদারা ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত, শুধু বাবার পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে। ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করেছে, বাবার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন না তিনি। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, বই পড়েন। যতক্ষণ জেগে থাকেন—চোখের সামনে বই খোলা।

শুভেন্দুকে একটি সান্ত্বনার কথাও বলেননি এ-পর্যন্ত। দু'বার দুটো বড় অসুখ

হয়ে গেল শুভেন্দুর, বাড়িতে ডাক্তার এসেছে। চিকিৎসা হয়েছে—কিন্তু পারতপক্ষে ঘরে আসেননি তিনি, একদিনের জন্যেও কাছে এসে বসেননি, একটি বারও মাথায় হাত রাখেননি।

শুভেন্দু দরজার কাছে দাঁড়াল একটু। তিনি মুখ তুললেন। প্রায় রূঢ় গাম্ভীর্যে বইয়ে চোখ নামালেন আবার। আচ্ছন্নের মত শুভেন্দু নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে আলো জ্বালতে প্রথমেই চোখ পড়ল স্যুটকেসের ওপর ভাঁজকরা কম্বলটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা। সমস্ত স্নায়ুগুলো কেঁপে উঠল এক সঙ্গে। বদ্ধ আচ্ছন্ন চেতনার দরজাটা যেন সপাট খুলে গেল চোখের সামনে। ...করছিল কি সে এতদিন বসে বসে? ভাবছিল কি?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন এক ঝলক জীবনের আলো দেখতে পেল। আশ্চর্য, কিছু তার মনেই ছিল না। কম্বলটা বিছানায় রেখে ব্যগ্র হাতে স্যুটকেস্ খুলল শুভেন্দু। চেক্ বইটা ওপরেই ছিল, সেটা নিয়ে টেবিলে এসে বসল।

বাবার ঘরে এসে দাঁড়াল প্রায় আধঘণ্টা বাদে।

ব্যানার্জী সাহেব মুখের সামনে থেকে বই সরালেন।

শুভেন্দু কিছু বলল না, সদ্য লেখা চেক্খানা তাঁর সামনে ধরল।

সেটা তুলে নিয়ে দেখলেন তিনি। তাঁর নামে চেক্। বিশ হাজার টাকার চেক্। চেক্ থেকে খরখরে চোখ দুটো ছেলের মুখের ওপর এসে থামল।

এটা কেন?

শুভেন্দু নিরুত্তর।

এটা আমার নামে কেন? এ দিয়ে কি হবে? কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা কিন্তু কঠিন।

রিলিফে দিয়ে দেবে।

ব্যানার্জী সাহেবের মুখ থেকে রূঢ় কঠিন ছাপটা যাচ্ছে একটু একটু করে, খরখরে দুই চোখ কোমল হয়েছে। চকচক করছে।

আচ্ছা। ড্রয়ার খুলে চেক্টা রাখলেন তিনি। কিন্তু রাখতে গিয়ে চোখে কি পড়ল। প্যাডের টাইপ করা চিঠি একখানা। সেটা টেনে নিয়ে ছেলের সামনে ধরলেন।

শুভেন্দু সেটা হাতে নিল। পড়ল। চিঠিতে বাবা চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছেন। চিঠির নিচে বাবার সই পর্যন্ত হয়ে আছে। বোবা চোখে শুভেন্দু তাকাল তাঁর দিকে।

ব্যানার্জী সাহেব হাসছেন মৃদু মৃদু। হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে চিঠিখানা নিলেন। তারপর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন সেটা।

হাসছেন। চোখ দুটো আরো বেশি চক চক করছে। চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক, তারপর খুব নরম করে অনুযোগ করলেন, এই ঠাণ্ডায় একটা গরম জামা পর্যন্ত পরিসনি কেন—দু-দুবার অমন শক্ত অসুখে ভুগে উঠলি—

উঠে নিজের গায়ের চাদরটা খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিলেন।— খাওয়া হয়েছে?

ঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ে নেগে যা।

পরদিন।

কাক-ডাকা অন্ধকারে সমাধি আঙিনায় এসে কাজে লাগে দারোয়ান আর মালীরা। একটু ফর্সা হতে এক অভাবিত দৃশ্য দেখে প্রথমেই হকচকিয়ে গেছে সবাই, তারপর দিশেহারার মত চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু করেছে।

নতুন ঘাসের সমাধির ওপর আধখানা কম্বল বিছিয়ে আর বাকি আধখানা নিজের গায়ে জড়িয়ে একটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শ্বাস প্রশ্বাস বইছে বটে, কিন্তু এত চেঁচামেচি ডাকাডাকিতেও একটু জ্ঞান ফেরেনি, একেবারে বেহুঁশ।

ফটকের গায়ে মোটর বাইক দেখে তারা চিনেছে তাকে। দু'জন বাড়ির দিকে ছুটেছে খবর দিতে।

বাকি ক'জন হতভম্বের মত তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে।

ভ্রূসেরা

এ-ঘরে নীল আলো জ্বলছিল। সামনের ঘরটায় জোরালো শাদা আলো। মাঝের দরজার পুরু নীল পরদা। দু'ঘরে পুরো দমে পাখা ঘুরছে। পরদাটা একটু একটু নড়ছে, দুলছে। এ ঘরটা ঠাণ্ডা নীল। ও-ঘরটা খরখরে শাদা। পরদার ফাঁকে নীলের ওপর শাদাব ঘা পড়ছে।

এ-ঘরে দত্তসাহেবের মুখে অতিকায় একটা চুরুট পুড়ছে। ও-ঘরে রাগে অপমানে এক মেয়ের বুকের ভিতরটা পুড়ছে। খানিক আগে অসহিষ্ণু পায়ের শব্দ কানে আসতে দত্তসাহেব বুঝেছেন কে এল। মা নয়, মেয়ে। মাযের ফিরতে এখনো ঢের দেরি। ক্লাবে তাস খেলা বা পার্টি-টার্টি সেরে তাঁর ফিরতে বাত হয়।

দত্ত সাহেব একবার উঠে এসে পরদা সরিয়ে দেখে গেছেন। মেয়ে নিজের ঘরেও যায়নি। মায়ের বিছানাতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দত্তসাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে দেখেছেন খানিকক্ষণ। কি হয়েছে বুঝেছেন। আজ তাহলে স্পষ্ট করেই কিছু জেনে এসেছে, স্পষ্ট করেই কিছু শুনে এসেছে

দত্তসাহেবের [illegible] ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে দাঁড়ান, গায়ে পিঠে হাত রাখেন, বলেন, [illegible] ওঠ, —। মেয়েকে তিনি ভালবাসেন বইকি, একটি মাত্র মেয়ে—[illegible] বাপ ভালো না বেসে পারে। কিন্তু ফল বিপরীত হবে। রাগে আর [illegible] ঝলসে উঠবে। মেয়ের মেজাজ জানেন। মায়ের মেয়ে। মায়ের মনের মত মেয়ে। এই মেয়ের মধ্যে মা নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করছেন, নতুন করে সা[illegible] করছেন। নতুন করে আর জোরালো করে। বাবা একজন আছেন এই পর্যন্ত—মা-ই
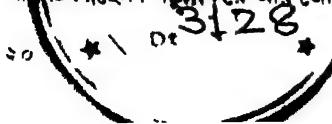
সব। এই রাগ আর জ্বলুনীর খানিকটা ঘুরে ফিরে তাঁর ওপরেও এসে পড়বে বইকি।

তাছাড়া, সান্ত্বনা দেবারই বা আছে কি। সান্ত্বনা কেউ চায় না। হৃদয়ের ব্যাপারে ঘাটতি পড়লে ওটা চলে। সেখানকার কোনো বাঁধন ছিঁড়লে সান্ত্বনার প্রশ্ন ওঠে। এ-ক্ষেত্রে হৃদয় বস্তুটা মান অপমানের পালিশে ঢাকা। ওতে আঁচড় পডলে হৃদয় নড়ে না, স্নায়ু চড়ে। সান্ত্বনার বদলে দত্তসাহেব এখন যদি গিয়ে বলেন, যা হয়েছে তার বিহিত তিনি করবেন, ভালো হাতে শিক্ষা দেবেন—তাহলে বরং কাজ হতে পারে। মেয়ের জ্বালা জুড়োবে প্রতিশোধের আনন্দে মুখখানা ঝকমকিয়ে উঠবে।

কিন্তু দত্তসাহেব তাও করলেন না। চুপচাপ ভিতরে এসে বসলেন আবার। চুরুট টানতে লাগলেন।

খানিক বাদে আবারও পায়ের শব্দ কানে এল। পায়ে পায়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার এ-শব্দটাও চেনা। মা-ও তাহলে আজ তাড়াতাড়িই ফিরলেন দেখা যাচ্ছে।

কান খাড়া করার দরকার নেই। সুমিতার প্রতিটা কথা আপনিই এ-ঘরে পৌঁছুবে। স্ত্রীটির রাগ যেমন, কথাও তেমনি। দুই-ই জোরালো। প্রায় কর্কশ।

—তুই এভাবে মুখ গুঁজে পড়ে আছিস কেন? ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস নাকি! সুড়সুড় করে ওকে ঘাড় গুঁজে আসতে হবে দেখে নিস—চাকরির মায়া নেই? চাকরি করতে হবে না? অপমানের শোধ নিয়ে তবে ছাড়ব—

অপমান। অপমানটাই আসল। দত্তসাহেবের কানের ভিতরটা জ্বালা করছিল। এখন হাসি পাচ্ছে। মা-মেয়ে দু'জনেই অপমানে জ্বলছে। অনীতা ঠিক যে-কথা এখন শুনতে চায় সেই কথাই সুমিতা বলছে। এই অপমানের ভয়টা দূর করার জন্যে আর একটা মেয়ের কল্‌জে ছিঁড়ে আনতেও দ্বিধা নেই কারো। সে-দিকটা এরা ভাবছেও না। ভাবার শক্তি নেই।

তুই কাঁদছিস কেন! অসহিষ্ণু বিরক্তিতে মায়ের কণ্ঠ চড়ল আরো। কালই সোজা ওর কাছে যা—গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় সত্যি কি না। রাগ করার দরকার নেই, কান্নাকাটিরও দরকার নেই—শুধু সত্যি কি না জিজ্ঞাসা করে আসবি, তারপর দেখা যাবে।

এ-ঘরে বসে শশধর দত্ত বিষম অবাক। অনীতা কাঁদছে! অনীতা কাঁদতেও পারে! ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর থেকে এই এতগুলো বছরের মধ্যে কখনো কাঁদতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না তো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত কি একটা স্মৃতি ঝলসে উঠল দত্তসাহেবের মনের তলায়। এই এক পরিস্থিতিতে সব মেয়েই কাঁদতে পারে। একদিনের জন্যে, একবারের জন্যে অন্তত পারে। শশধর দত্ত নিজের চোখে দেখেছেন, পারে।

উঠে এলেন। অনীতা সত্যিই কাঁদছে কিনা দেখার জন্যে পরদা সরিয়ে এ-ঘরে এলেন। কাছে এলেন। সুমিতা ফিরে তাকালেন। অনীতাও। তার চোখের পাতা জলে ভেজা। চেয়ে আছে। তাঁর দিকেই চেয়ে আছে।

আবারও হঠাৎই বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন দত্তসাহেব। শাদা আলো, নীল আলো, ঘরে আসবাব-পত্র ঘর বাড়ি সব কিছু চোখের সামনে মুছে

একাকার হয়ে যাচ্ছে। এক নিমেষে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছেন তিনি ঠিক নেই।—পাথুরে রাস্তা, দুধারে ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল পাহাড় পাথর—ড্রসেরা! বাতাসে হেলছে দুলছে, পড়ন্ত সূর্য-ছটায় নির্যাস-সিক্ত কেশরগুলো দল মেলে নতুন বর্ণালীতে চকচকিয়ে উঠেছে। ড্রসেরার পাতায় পোকা-মাকড়কীট-পতঙ্গ...সামনে পাথরের ওপর নারীর কান্না-ভেজা চোখের তারায় বিস্মিত মন্ত্র-মুগ্ধ পুরুষের ছায়া। ড্রসেরার রস-সিক্ত চকচকে কেশরগুলোর মত রমণীর নেত্র-পক্ষ্ম সপ-সপে ভেজা।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

দত্তসাহেব আত্মস্থ হলেন, এক নজর দেখেই বুঝেছেন, মায়ের কথা-মত অনীতা যায় যদি সেখানে, অনীতা কাঁদবে। একটা দিনের জন্য একান্ত সান্নিধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁদবে।

না—!

মা মেয়ে দুজনেই ঈষৎ বিস্মিত। সুমিতা জিজ্ঞাসা কবলেন, কি না?

অনীতা যাবে না।

প্রায় আদেশের মত শোনাল। আদেশ শুনতে সুমিতা অভ্যস্ত নন্। বিরক্ত হযে বললেন, তুমি খবব রাখো কিছু? মিসেস ভঞ্জ ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিয়েটা কবে হচ্ছে, তপন তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এখানে বিয়ে করবে না—শুনেছ?

শুনিনি, বুঝেছি।

বুঝেও কি করছ? মজা দেখছ বসে বসে? এতবড় স্পর্ধা তার হয় কি করে?

দত্তসাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ-রকম যে হতে পারে সে আভাস তোমাকে আমি আগেই দিয়েছিলাম।

মিসেস দত্তর সব রাগ স্বামীর ওপরে গিয়ে পড়ল বুঝি। কটুকণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তবে আর কি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এখন তাহলে তোমার ওই আদরের ছেলের সঙ্গে সেই কেরানী মেয়ের বিয়ে দাও গে যাও। যেমন নজর তেমনি রুচি—শুনলেও গা স্বলে।

অনীতা অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছিল। এবারে বাবার ওপরেই অসহিষ্ণু ক্ষোভে উঠে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। দত্তসাহেব সেদিকে চেয়ে দেখলেন একটু। এক ছেলে জায়গা ছাড়লে আর পাঁচজন ছুটে আসবে তাতে তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। বললেন, অমন নজর আর ওই রুচি যে-ছেলের তার জন্য তোমাদের এত আক্ষেপ কেন? অন্য ছেলে ঠিক করো—

আর কত সহ্য হয় মিসেস দত্তর। এত অবুঝও হয় মানুষ! তিক্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, তোমার মাথা খারাপ হল? এতদিন বাদে এখন অন্য ছেলে ঠিক করব আমি! এমনিতেই ক্লাবের সবাই তলায় তলায় হাসাহাসি কানাকানি করছে নিশ্চয়—মিসেস ভঞ্জ কি আর কথা পেটে চেপে বসে আছেন ভাবো? অনির বন্ধুরাই বা বলবে কি, তাদের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

এ-সমস্যার সমাধান দত্তসাহেবের জানা নেই। জবাব দিতে পারেন কিছু, কিন্তু

তাতে অশান্তি। তিনি নীরব।

—বোসো। যা বলি মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। মিসেস দত্ত যা করণীয় ঠিক করে ফেলেছেন। —অনি না যায় না-ই যাবে, তার না যাওয়াই ভালো, কালই তুমি তপনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো এ-সব কথা কেন আমাদের কানে আসে! তোমার ভালোমানুষিতেই এত আশকারা পেয়েছে, নইলে এত সাহস তার হয় কি করে? ওকে ডেকে বেশ করে সমঝে দাও, বিহিত যা করার তুমি করো।

দত্তসাহেব স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। চেয়ে থাকতে ভয় নেই। ....কারণ, সুমিতার চোখে জল নেই। জ্বালা আছে। চেয়ে থাকা সহজ। নিজের অগোচরেই দত্তসাহেব মাথা নাড়লেন বোধহয়। বিহিত করবেন।

সুমিতার কথা নরম হল একটু। অবুঝ স্বামীকে আরো একটু বোঝানো দরকার মনে করলেন তিনি। বললেন, তাছাড়া একটা মাত্র মেয়ে, ছেলের অভাব নেই জানি—কিন্তু যে-কোনো এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেয় কবলেই তো হল না—বুঝছ না কেন?

বুঝেছেন। নীল পরদা ঠেলে নীল আলোর আশ্রয়ে এসে বসলেন দত্তসাহেব। ...একটা মাত্র মেয়ে কেন, সে-তর্ক তোলার দিন গেছে। দেশের ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর শোরগোলের অনেক আগেই সুমিতা তার মর্ম বুঝেছে। তার প্ল্যানিংএ কোনো প্রশ্রয় নেই, প্রতিবাদ অচল। ....একটা মাত্র মেয়ে, সুমিতা কন্যা দান করবে না—মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলে আনবে। দত্তসাহেব ভাবছেন, সুমিতার রাগ হবারই কথা, পশু-পাখি পোষার মত মেয়ের জন্য সে মনে মনে পুরুষ পুষেছে একটি। মনে মনে কেন, প্রকাশ্যেই পুষেছে। সেই পোষা-পুরুষ হঠাৎ এমন বেঁকে বসলে সহ্য হবে কেন—স্পর্ধা মনে হবে না?

ভাবতে গেলে স্পর্ধাই বটে। বাঙালীদের মধ্যে বিলিতি তেল কোম্পানীর সব থেকে উচ্চপদস্থ অফিসার দত্তসাহেব। অনেকগুলো বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বাঙালী ছেড়ে কত সাহেব তাঁর অধীনে কাজ করছে ঠিক নেই। তাঁর একটা কলমের খোঁচায় বহুজনের ভবিষ্যত জ্বলে যেতে পারে, ঝলসেও উঠতে পারে। সেদিক থেকে ভাবলে ওই সেদিনের এঞ্জিনিয়ার ছোকরার প্রচণ্ড দুঃসাহস বইকি। এতটা দুঃসাহস তিনিও আশা করেননি। করেননি বলেই কিছু খবর তাঁর কানে আসা সত্ত্বেও একটুও ভাবেননি তিনি। পরে অবশ্য ভেবেছেন। ভেবে স্ত্রীকে বলেছেন। স্ত্রী আমলই দেননি। কোথায় তাঁর মেয়ে আর কোথায় এক কেরানী মেয়ে। শুনে বরং মুখচোরা লাজুক ছেলেটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা বেড়েছে তাঁর। একেবারে গো-বেচারা নয় তাহলে। তা বলে চাঁদ ধরতে পেলে আর চন্দ্রাবলী ধরতে যায় না কেউ। সুমিতা নিশ্চিন্ত।

ছেলেটার ওপর গোড়া থেকেই চোখ পড়েছিল দত্তসাহেবের। পার্সোন্যাল ফাইল দেখেছেন, প্রথম শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ার, আগাগোড়া ভালো রেকর্ড। নম্র, বিনয়ী, মুখে বুদ্ধির ছাপ—কাজেও চটপটে। যোগনাথ হাজরাকে খোঁজ-খবর নিতে বলেছিলেন ছেলেটার সম্বন্ধে। যোগনাথবাবু দত্তসাহেবের পার্সোন্যাল অ্যাসিসট্যান্ট—তাঁরই সমবয়সী।

অফিসের সকল খবর আর সকলের খবর রাখেন। অন্তত রাখতে পারেন। তিনিও একবাক্যে প্রশংসা করেছেন ছেলেটার। এত প্রশংসা সচরাচর করেন না।

নতুন ইনস্টলেশন অথবা সাইট দেখার ব্যাপারে ছেলেটাকে মাঝে মধ্যে দত্তসাহেবের বাড়িতে আসতে হত। বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরুতেন দু'জনে। দত্তসাহেব স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সুমিতারও পছন্দ হল। পছন্দ হবারই কথা। ছেলেটা মেয়ের বশেই থাকবে মনে হল তাঁর। বড় চাকরির সঙ্গে এই গুণটা খুব সুলভ নয়।

এরপর দত্তসাহেব দায়মুক্ত। যা করার সুমিতাই করবেন। করলেনও। ছেলেটাকে ঘষে-মেজে আর একটু অন্তত চৌকস করে তোলা দরকার—বড় বেশি কাঁচুমাচু ভাব সব সময়। আর সেই সঙ্গে বড় সমাজে সচল করা দরকার। সুমিতা প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে লাগলেন ওকে। নিজে চাঁদা দিয়ে ক্লাবে ভর্তি করে দিলেন। দু'দিনের বেশি তিন দিন ক্লাব কামাই হলে মিষ্টি করে চোখ রাঙাতে লাগলেন। ক্লাবের সকলেই সুমিতার ভাবী জামাই চিনল। অনীতার বন্ধুরাও জানল। বাড়িতে অনেকদিন দত্তসাহেব অনীতাকে কড়া মেজাজে কর্তৃত্ব করতে দেখেছেন ছেলেটার ওপর।

কিন্তু এরপর থেকে তাঁর সামনে এলেই ছেলেটা যেন মিইয়ে যেত কেমন। ভয়ানক বিব্রত বোধ করত। সঙ্কোচটা ভাবী সম্পর্কের কারণে ভাবতেন দত্তসাহেব। এত মাথা নীচু করে থাকাটা পছন্দ হত না তা বলে। যোগনাথবাবু শিগগীরই একদিন এসে মাথা চুলকে জানালেন, ছেলেটি তো খুবই ভালো সাব, তবে একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা শুনলেন দত্তসাহেব, কিন্তু তেমন গোলমেলে কিছু মনে হল না তাঁর। এই অফিসের একটি কেরানী মেয়ের সঙ্গে ভাবী জামাই তপনকে নাকি একটু ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতে দেখেছেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, অনেকদিনের হৃদ্যতা দু'জনের।

এই অফিসের মেয়ে? কেমন মেয়ে, খুব সুন্দরী? তেমন কিছু না? তাহলে আর কি। তাছাড়া কোথায় তাঁর মেয়ে আর কোথায় কেরানী মেয়ে। সুমিতার মত চাঁদ আর চন্দ্রাবলীর উপমা মনে আসেনি তাঁর, তফাতটা মনে হয়েছে।

কিন্তু নিজের চোখেই একদিন একটা দৃশ্য দেখলেন তিনি। রাস্তা ছেড়ে ময়দান ঘেঁষে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে চলেছে। ছেলেটি তাঁর অফিসের তপন মজুমদার। মেয়েটি কে জানেন না। দত্তসাহেবের কৌতূহল হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে ড্রাইভার খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামিয়েছিল। দত্তসাহেব ঘুরে বসে দেখছিলেন। ওরা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে গেল। দুনিয়ার আর কোনোদিকে চোখ নেই দু'জনার, কারো। এই মুখের হাসি আলাদা। এই চলার ছাঁদ আলাদা। ভাগ করে চলা, পরস্পরের নির্ভরশীল হয়ে চলা।

যোগনাথবাবু আর একদিন জানিয়েছেন, রেস্তরাঁয় দু'জনকে চা খেতে দেখেছেন একসঙ্গে। অদূরে তিনি ছিলেন কেউ লক্ষ্যও করেনি। আর কারো প্রতিই লক্ষ্য ছিল না তাদের। অতএব তাঁর মনে হয় একটু ভাবনার কারণ আছে।

ভাবনার কারণ যে আছে সেটা দত্তসাহেব সেইদিন গাড়িতে বসেই বুঝেছিলেন। ভেবেও ছিলেন। ছেলেটার কেন এমন দ্বিধাগ্রস্ত ভাব সব সময় সেটা এখন অনুমান করতে পারেন। ....মেয়েটাকে সেদিন খুব ভালো করে দেখলেন তিনি। অবকাশ সময়ে মাঝে-সাজে সমস্ত বিভাগে টহল দেওয়ার অভ্যাস আছে। কোনো অ্যাসিসট্যান্ট-এর ধারে কাছে যান না অবশ্য। মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে যান শুধু, তাইতেই সমস্ত বিভাগ তটস্থ।

সেদিন একজনের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটা মুখ গুঁজে কাজ করছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দত্তসাহেব দেখলেন। মেয়েটা ভয়ে কাঠ একেবারে, মুখ ফ্যাকাশে। সুন্দরী নয়। তাঁর মেয়ের কাছে অন্তত কিছুই নয়। তবু সুশ্রী। আর সমস্ত মুখখানায় কমনীয়তা মাখানো। মেয়েটা ভয় পেয়েছে বুঝতে পারছেন। কেন ভয় পেয়েছে তাও বুঝতে পারছেন। দত্তসাহেব অভয় দেবার মত করে হেসেছিলেন হয়ত একটু—কিন্তু মেয়েটির তা চোখে পড়েনি। সে চোখ তুলে তাকায়নি।

সেই দিনই দত্তসাহেব সুমিতাকে আভাস দিয়েছিলেন কিছু। সুমিতা আমল দেননি। তাঁর মেয়ের সঙ্গে কেরানী মেয়ে পাল্লা দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। বিশেষ করে ছেলেটা যখন এই অফিসে চাকরি করে। কিন্তু সেই থেকে দত্তসাহেব ভিতরে ভিতরে ভারী একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ তার ফয়সালা হয়ে গেল।

ঘরের নীল আলো নিভিয়ে দিয়েছেন অনেকক্ষণ। রাত অনেক বোধহয়। কেউ আর জেগে নেই, শুধু তিনি ছাড়া। মাথাটা বিষম ভার হয়ে আছে। দেরাজের ওপর অনেক রকমের ওষুধ মজুত আছে। প্রেসারের ওষুধ, মাথার যন্ত্রণার ওষুধ, ঘুমের ওষুধ। হাত বাড়িয়ে শিয়রের কাছে বোতাম টিপলে ও-ধারের এক ঘরে কড়কড়িয়ে বেল বাজাবে। প্রৌঢ়া পরিচারিকা আর তার পিছনে জনা দুই চাকর দৌড়ে আসবে। দত্তসাহেবের শরীরের ওপর কড়া নজর সুমিতার। পয়সার বিনিময়ে যতটা সেবা-যত্ন কেনা যেতে পারে সে-রকম সব ব্যবস্থা পাকা। রাত্রিতে দত্তসাহেব পারতপক্ষে বিরক্ত করতে চান না তাদের। শুধু ওদের চাকরি রাখা আর কর্ত্রীর সুনজরে রাখার জন্যেই কখনো-সখনো বেল টেপেন।

রাতের এই নির্জনতার একটা চাপ বোধ করেছেন আজ তিনি। কাউকে ডেকে কিছু ওষুধ খাবেন কিনা ভাবলেন। শেষে নিজেই উঠে শুধু জল খেলেন এক গেলাস।

...অনীতাকে তপনের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তিনি। তিনি করেননি, কেউ যেন তাঁকে দিয়ে করিয়েছে। সুমিতার একটা বিহিত করার হুকুম হয়েছে। ছেলেটাকে ডেকে বেশ করে সমঝে দিতে হবে। কৈফিয়ত নিতে হবে। স্পর্দ্ধা ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু কি করবেন তিনি? কি করার আছে? নরম-সরম ছেলেটার মধ্যে এত জোর আশা করেননি। সেই জোরের ওপর জোর খাটাবেন? কি করবেন?

কিছুই করলেন না। পরদিন শুধু অফিসে নিজের ঘরে ডেকে দু-দিনের জন্য মফঃস্বলের একটা প্ল্যাণ্ট ইনস্পেকশনে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। এই করলেন। তাও

করতেন·না হয়ত। অনীতাকে কাঁদতে না দেখলে কিছুই করতেন না। ....ছেলেটার জোর আছে বটে, কিন্তু অনীতার চোখেও জল আছে।

....একবার একটা বোল্‌তা বসতে দেখেছিলেন ড্রসেরার পাতায়। বোল্‌তার হুল আছে। কিন্তু আছে যে সে-কি আর ওটারই মনে ছিল তখন?

দুটো দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। দু-দিনের ভাববার অবকাশ। সেই দিনটা শনিবার। পরের দিন রবিবার। ছেলেটাকে বাইরে না পাঠালে এই শিথিল দিনে বা কাল ছুটির দিনে সুমিতার তলব পড়তই। স্ত্রীটি মুখে বললেও আদৌ নির্ভরশীল নন তাঁর ওপর। নিষেধ না শুনে অনীতাও হয়ত ছুটে যেত। তার মান-অপমানের প্রশ্ন, বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানোর প্রশ্ন।

আর দত্তসাহেব নিঃসংশয়, অনীতা গেলে অনীতা কাঁদবে।

বাড়ি ফিরতেই সুমিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

সে নেই এখানে, বাইরে গেছে।

কবে ফিরবে?

সোমবার নাগাদ।

তাঁর দিকে চেয়ে মা-মেয়ে দু'জনেরই হয়ত মনে হল তিনি কিছু করবেন। কি-যে করবেন তাই ভাবছেন দত্তসাহেব। মেয়েটা তো কম আদরের নয়। সবই তো করা যায় তার জন্যে।

তবু দত্তসাহেব খুব বেশি ভাবতে পারছেন না কি করবেন। ভাবনায় বার বার ছেদ পড়ছে। মনটা মুহুর্মূহু উধাও হচ্ছে কোথায়। অনেক দিনের একটা পরিচিত জায়গা অবিশ্রান্ত টানছে তাঁকে। টানছেই।

...পরিচিত পাথুরে রাস্তা, দুধারে ঝোপঝাড় আগাছা, জঙ্গল, পাহাড়, পাথর—

ড্রসেরা!

নীল আলো নিভিয়ে দত্তসাহেব শাদা আলো জ্বাললেন। ড্রাইভারকে ডেকে আদেশ দিলেন, গাড়িতে তেল মজুত রাখতে—পরদিন খুব ভোরে বেরুবেন, সেদিন না-ও ফিরতে পারেন।

অবাক হবার মত নয় কিছু। নতুন কোথাও ইনস্টলেশনের কাজ শুরু হলে মাসের এমন তিন-চার দিন বাইরে কাটাতে হয়। সঙ্গে যোগানন্দবাবু থাকেন।

সকালের আবছা আলোয় বেরিয়েছেন। ফাঁকা রাস্তায় বেগে গাড়ি ছুটেছে। সামনে ড্রাইভার। পিছনে দত্তসাহেব একা।

বেলা বাড়ছে। ....নটা, দশটা, এগারোটা। বাংলাদেশের পশ্চিমের সীমা ছাড়িয়েছেন। বেলা বারোটা নাগাদ উৎসুক নেত্রে পথের দু'দিকে তাকাতে লাগলেন দত্তসাহেব। সেই পরিচিত রাস্তা। পাথুরে রাস্তা, দু'ধারে ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল পাহাড় পাথর। কতদিনের কতকালের নাড়ির যোগ...কেমন করে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি থামাতে। নামলেন।

পায়ে চলা পথ ধরে এক জায়গায় এসে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়লেন দত্তসাহেব।

এই জায়গাটাই বটে। মাথার ওপর পাহাড়। নিচের প্রশস্ত জমিতে কতগুলো পাথর ছড়ানো। ও-ধারে সংকীর্ণ জল-ধারা। উৎসুক নেত্রে এদিক-ওদিক তাকালেন। ...ওই পাথরটাই। পাটাতনের মত বিরাট পাথর—নিরেট, নিরন্ধ্র, তাম্রাভ-কৃষ্ণবর্ণ। তার সামনে ড্রসেরা! বাতাসে নড়ছে কাঁপছে হেলছে দুলছে। তাঁকে যেন ডাকছে, অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

পাথরটার ওপর এসে দাঁড়ালেন দত্তসাহেব। রোমে রোমে রোমাঞ্চ। দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ফারিত নেত্রে সেই ছেলেবেলার মতই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আরো ক'টা গাছ আছে, কিন্তু এই পাথরে দাঁড়িয়ে এই গাছটাই দেখতেন তিনি। পাতাগুলো দেখছেন। পাতার চার ধারে লম্বা লম্বা চকচকে কেশরগুলো দেখছেন—রসসিক্ত, পিচ্ছিল।

গিরিডিতে মামাদের ছোট বাড়ি ছিল একটা। মামাদের কাছেই মানুষ শশধর দত্ত। মামাদের সঙ্গে বছরে চার পাঁচবারও আসতেন। এই জায়গাটায় মেজ মামা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম। তখন ইস্কুলের ছাত্র তিনি। মামা এই ড্রসেরা গাছ চিনিয়েছিলেন। কাটা ঝোপের মত ছোট গাছ, পাতাগুলো লম্বা লম্বা, পাতার চার ধারে কেশর। কেশরগুলো থেকে শাদা আঠার মত রস বেরোয়, তাতে রোদ পড়লে অদ্ভুত চকচক করে। কি বিচিত্র মাদক শক্তি এই পাতাগুলোর। কিসের লোভে পোকামাকড় কীট-পতঙ্গ এই পাতাগুলোর ওপরে এসে বসে। কেশরগুলো তখন সজাগ হয়ে উঁচিয়ে উঠতে থাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে, পাতা বুজে যায়—সব শেষ। অমোঘ, আশ্চর্য।

দিনের পর দিন দেখেছেন। এই দেখাটা যেন নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গিরিডিতে এলেই এখানে আসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ড্রসেরার গ্রাসে পতঙ্গ মিলিয়ে যেতে দেখতেন। ছেলেবেলায় একবার আঙুল বাড়িয়েছিলেন তিনি—পাতা সজাগ হয়েছিল, কেশরগুলো সজাগ হয়েছিল। মানুষের আঙুল-পতঙ্গ দেখে অন্য পাতাগুলো সাহায্যে এগিয়ে আসছিল—মামা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে এনেছিলেন তাঁকে। বকেছিলেন।

কিন্তু তিনি ইচ্ছে করে আঙুল বাড়ান নি। ড্রসেরার যেন ডেকে নেবার শক্তি আছে, টেনে নেবার শক্তি আছে। পতঙ্গেরা সেই ডাক শোনে। এসে আত্মসমর্পণ করে। সেই অভ্যর্থনা তিনি দেখেন, বোঝেন। তাইতেই বিভ্রম।

স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে পা দিয়েছেন, কলেজ ছাড়িয়ে য়ুনিভার্সিটিতে। কিন্তু তখনো জায়গাটার সঙ্গে যেন নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন তিনি। না এসে পারতেন না। মামারা হাসতেন, মামীরা ঠাট্টা করতেন।

গিরিডিতে তাঁদের ছোট বাড়ির লাগোয়া একটা বড় বাড়ি ছিল। ছোট বাড়িটার অস্তিত্ব ঢেকে দেবার মত বড়। বনের পশুরাজকে এড়িয়ে চলার মত ছেলেবেলার এই সিঙ্গীবাড়ি এড়িয়ে চলতেন তিনি। এ-বাড়ির হালচাল জাঁকজমক দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন।

সিঙ্গীবাড়ির মেয়ে সুমিতা সিংহ।

শশধর দত্ত এম-এ পড়েন যখন, কলকাতায় এই বাড়িরই একটা ছোট ছেলেকে মোটা টাকার বিনিময়ে পড়াতেন। সুমিতাকে দূর থেকেই দেখতেন কখনো সখনো—এ-বাড়ির গৃহ শিক্ষক তো প্রায় করুণার পাত্র। কোণের একটা ঘরে নিজের

পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন, সময় হলে ভিতরে পড়াতে যেতেন।

কি ছিল তাঁর? চেহারা? তা ছিল অবশ্য। সকলে সুন্দর বলত, মিষ্টি ছেলে বলত। কিন্তু টাকায় কত কন্দর্প-কান্তি কেনা যায় তিনি কোন ছার। তবু এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুতে তাঁর দিকেই চোখ গেল গৃহ-কর্তার আর গৃহ-কর্ত্রীর। পরীক্ষায় তো অমন ফি বছরেই একজন করে প্রথম হয়, কিন্তু এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ক'জন? কলকাতার বাড়িতে উমেদার মোসাহেবের ছড়াছড়ি, কথাটা তাঁদেরই মারফত কানে এল তাঁর। সিঙ্গীমশাই নিজের মতই মস্ত অবস্থা দেখে বড মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি। এবারে তিনি জামাই আনবেন না, জামাই কিনবেন। আর সেই সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনা তাঁরই।

আদর যত্ন বেড়ে গেল। সুমিতা ছলে কৌশলে কাছে আসতে লাগলেন। ফাঁক পেলে জোর জুলুমও করতেন। শশধর দত্ত ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এই বাড়ি, এই বাড়ির হালচাল, এই বাড়ির পুরুষ মেয়ে—সবই প্রায় রহস্যের মত তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে, তাঁর মামারবাড়ির সঙ্গে যোজন তফাত। মামাদের কাছে প্রস্তাব যেতেই তাঁরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন। সিঙ্গীবাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা! ভাগ্য ছাড়া আর কি! বিয়ের পরেই আবার সিঙ্গীমশাই জামাইকে বিলেত পাঠাবেন শুনলেন। তারপর ভবিষ্যতের কি কূলকিনারা আছে কিছু?

এক সকালে শশধর দত্ত পালালেন সেই বাড়ি থেকে। সোজা গিরিডিতে। আসার আগে সুমিতার এক কাকাকে জানিয়ে এলেন এ-বিয়েতে অপারক তিনি। নিতান্ত গরীব ঘরের ছেলে তিনি, তাঁকে যেন ক্ষমা করেন তাঁরা।

মামারা অনেক করে বোঝালেন তাঁকে। কিন্তু তিনি অনড। কলেজে মাস্টারী করবেন। সিঙ্গীমশাইয়ের জামাই হবার বাসনা নেই, বিলেত যাবারও না। অগত্যা মামারাও ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে দিলেন।

কিন্তু ক্ষমা তাঁরা করলেন না। যা তাঁরা চান সেটা তাঁরা পেয়েই অভ্যস্ত।

সেদিনও শশধর দত্ত এসেছিলেন এই পাহাড়ের নিচে। এই চওড়া পাথরটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে ড্রসেরা পাতায় একটা ফড়িংয়ের জীবনান্ত দেখছিলেন। কেশরগুলো সজাগ হয়েছে, এবারে আস্তে আস্তে বুজে যাবে।

চমকে ফিরে তাকালেন। পাথরের ওপর তাঁর পিছনেই সুমিতা দাঁড়িয়ে। বড় বাড়িতে আজ লোকজন এসেছে টের পেয়েছিলেন। সুমিতা এসেছেন জানতেন না। কখন এখানে এসেছেন তাও টের পাননি।

শশধর দত্ত হতভম্ব বিমূঢ় খানিকক্ষণ। কিন্তু তারপরই হকচকিয়ে গেলেন একেবারে। সিঙ্গীবাড়ির মেয়ে সুমিতার চোখে জল! সুমিতার দু চোখে টলটল করছে জল। নিজের অগোচরে কাছে এলেন তিনি—সুমিতার কাঁধে হাত রাখলেন। চোখে চোখ রাখলেন। তারপরই আর্ত বোবা আকুতিতে শিউরে উঠলেন হঠাৎ। সুমিতার জল-ভরা চোখের কালো তারায় তারই ছায়া। সুমিতার দু চোখ বুজে আসছে আস্তে আস্তে, চোখের তারায় তাঁর ছায়া আটকে আছে। ড্রসেরার কেশরের মত সুমিতার আর্দ্র নেত্র পক্ষ্ম

নিমীলিত হচ্ছে, তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন। প্রাণপণ শক্তিতে শেষ বারের মত নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা তাড়না অনুভব করলেন তিনি। কিন্তু পারা গেল না। ছায়াটা আটকেই থাকল। সুমিতার দু চোখ বুজে গেল। তিনি হারিয়ে গেলেন।

হঠাৎই এক সময় হুঁশ ফিরল দত্তসাহেবের। চমকে উঠলেন তিনি। সামনেই ড্রসেরা পাতায় একটা প্রজাপতি এসে বসেছে। চটচটে চকচকে কেশরগুলো সজাগ হয়েছে। আর ওটার অব্যাহতি নেই। হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি। যেতে যেতে ঘড়ি দেখলেন। দু ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজকের দিনটা গিরিডির মামারবাড়িতে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন। মামারা নেই, মামাতো ভাইয়েরা আছে। তারা অবাক হবে খুশি হবে। কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হবে না দত্তসাহেবের। তাঁর বিষম ফেরার তাড়া। একটু দেরি হলে একেবারে দেরি হয়ে যেতে পারে যেন। কাল নয়, আজই ফিরতে হবে তাঁকে।

অনীতা দেখা করতে পারে তপনের সঙ্গে। দেখা করলে অনীতা কাঁদবেও। তপন হাঁ করে সেই জল দেখবে। কাছে এসে দেখবে। ...ওই বয়সের সুমিতার থেকে এই বয়সের অনীতা দেখতে অনেক সুন্দর।

ফিরতি পথে দ্বিগুণ বেগে ছুটেছে গাড়িটা।

পরদিন।

অফিসে নিজের কামরায় তপনকে ডেকে পাঠালেন দত্তসাহেব। ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছে তাঁর। হাসছেন না অবশ্য। অবাধ্য গোঁয়ার ছেলের মত মুখ গোঁজ করে টেবিলের ওধারে বসেছে। হাসি পাবার কথা দত্তসাহেবের। ড্রসেরা দেখেনি, দেখলে মুরোদ কত বোঝা যেত।

বিনা ভণিতায় ট্রান্সফার অর্ডারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। পড়ে ছেলেটা অবাক একেবারে। কানপুরে ডিভিশন্যাল এঞ্জিনিয়ার করে পাঠানো হচ্ছে তাঁকে। সৌভাগ্য বইকি! ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

দত্তসাহেব বললেন, দু-একদিনের মধ্যে স্টার্ট করো, সেখানকার ডিভিশন্যাল এঞ্জিনিয়ার রিলিভড্ হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। থামলেন একটু, গম্ভীর মুখে হাসির আভাস। বললেন, এখান থেকে নিজের ইচ্ছেমত একজন অ্যাসিসট্যান্টও নিয়ে যেতে পারো....তবে আমার মতে নিয়ে গেলেও তাকে অফিসের কাজে পাঠানো দরকার নেই, ইউ ডোন্ট রিকোয়ার দ্যাট। অচ্ছা, উইশ ইউ গুড্ লাক——

নিজেই আগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত মানুষ। কাজে চললেন কোথাও।

গিরিডির সেই পাহাড়ের নিচে বেড়াতে এলে এদিক-ওদিকের কুঁড়ে ঘরগুলোর অধিবাসীরা নিজে থেকেই আলাপ করতে এগিয়ে আসবে আপনাদের সঙ্গে। দু-চার কথার পরেই তারা জানাবে, গোটা কতক অদ্ভুত পতঙ্গ-ভুক গাছ ছিল ওখানে। আর বলবে, কি খেয়াল হল, হঠাৎ একদিন কলকাতার এক সাহেব-বাবু জনাকতক লোক নিয়ে এসে সেই গাছগুলো কেটে সাবাড় করে দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খাবার টেবিলে বসে মিনতি কিছু বলবে বলে উসখুস করছে সেই থেকে। মানুষটাকে আড়চোখে দেখছে থেকে থেকে। অমরেশের হাত নড়ছে, আহার্য মুখে উঠছে, মুখ চলছে—অথচ মনটা যে আর কোথাও উধাও, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। রোগীর কথা ভাবছে? নার্সিং হোমের কথা ভাবছে? টাকার কথা ভাবছে? না কি, আর কারো কথা ভাবছে? ঘরের কথা বা মিনতির কথা যে ভাবছে না, সেটা ঠিক। কিন্তু মিনতি তাই ভাবাবে।

আসল কথায় পৌঁছুবে বলে পাঁচ-কথা সে-ই বলে যাচ্ছে। আজ আসতে এত দেরি হল কেন, ক'টি রোগী দেখা হল, এত খাটলে ডাক্তারকেই রোগী হতে হবে, নার্সিং হোমের নতুন এক্সটেনশন কদ্দুর, বাবুর্চিটা আজকাল রান্নায় ফাঁকি দিচ্ছে, বাড়ির কর্তা একটা কথাও না বললে এ-বকমই হয়, ইত্যাদি।

অমরেশ দু-এক কথায় জবাব দিয়েছে, দরকার মত একটু-আধটু হেসেছে, কিন্তু এ রাজ্যে যে সে নেই সেটা মিনতি অনেকক্ষণই জানে। চোখদুটো দু-একবার খর খরে হয়ে উঠেছে তার, দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখাও পড়েছে দুই একটা। বেশ অনেকদিন হয়ে গেল মিনতি এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে আবার। কিন্তু লক্ষ্য যে করছে সেটা জানতে দেয়নি, বুঝতে দেয়নি। আজও দিল না।

জিজ্ঞাসা যে একেবারে করে না তাও না। কিন্তু করা না-করা সমান। বড় ডাক্তারের পেশাটাই জোরালো কৈফিয়ত।' রোগীর জ্বালায় অস্থির, নার্সিং হোমের সতেরো ঝামেলায় হিমশিম। রোগীর হিড়িকও মিথ্যে নয়, নার্সিং হোমও বাড়ছেই। কৈফিয়তে ফাঁক নেই, তবু ফাঁক চোখে পড়ে মিনতির। সেই ফাঁক মিনতি জানবে না তো কে জানবে?

খাওয়া প্রায় শেষ হযে এসেছিল। আর পাঁচটা কথার মতই খুব সাদামাটা ভাবে মিনতি কথাটা বলল। যেন মনেই ছিল না এতক্ষণ। ভালো কথা, শানুর জন্য দেখে শুনে একজন টিউটর রাখতে হবে, পারো তো একটু খোঁজখবর কোরো...আমিও দেখছি। ব্যস্। এই একটি কথাতেই অমরেশের ভাবনা-চিন্তার সব ক'টা সুতো যেন একসঙ্গে ছিঁড়ে গেল। চড়া রোদের মুখে কুয়াশার মত অন্যমনস্কতার আবরণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মিনতির দিকে প্রায় ঘুরে বসল সে। কৌতূহলের জবাবটা ওর মুখেই লেখা যেন।

রমেশবাবুর কি হল?

চলে গেছে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই মিনতি তাড়াতাড়ি উঠে হাত-মুখ ধুতে চলে গেল। অমরেশ খানিক হাঁ করে চেয়ে রইল সেই দিকে। এমন সংবাদ আশা করেনি, সেটা সুস্পষ্ট। লোকটি আজ পাঁচ বছর ধরে এই বাড়িতে আছেন। মাঝবয়সী সাদাসিধে

মানুষ। মিনতিরই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ছেলেটাকে ভালবাসতেন, যত্ন করে পড়াতেন। সাত থেকে এই এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে কোনদিন প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় হয়নি। ভদ্রলোক শনিবার বাড়ি যান আর সোমবার ফেরেন। বছরে এক-আধমাস ছুটিছাটাও নেন। কিন্তু সে-সময়ের জন্যেও অন্য মাস্টার রাখার প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর এবারের যাওয়াটা সে-রকম যাওয়া নয়।

হাতমুখ ধুয়ে অমরেশও ঘরে এল। মিনতি মশলার কৌটো থেকে মশলা খুঁটে তুলছে। অমরেশ সিগারেট ধরলো। —রমেশবাবু চলে গেলেন কেন?

এই জেরার বিড়ম্বনাই যেন এড়াতে চেষ্টা করেছিল মিনতি। বিব্রত মুখে হেসে ফেলল, গেলে আমি কি করব, তার ঘর-সংসার আছে না, চিরকাল তোমার ছেলে আগলে বসে থাকবে নাকি!

অমরেশ চেয়েই আছে। সিগারেট টানছে। হাসির আভাসটুকুও গোপন করছে না। নিরীহ কৌতুকে বলল, পাঁচ বছর তো ছিল—

ছিল তো ছিল, মিনতি প্রায় রাগ করেই বিছানার একধারে বসল, তুমি ভালো দেখে একজন লোক ঠিক করো, নইলে ছেলেটার ক্ষতি হবে।

অমরেশ তার সামনের ছোট টেবিলটায় আধ-বসা হয়ে সিগারেট টানছে আর হাসছে মিটিমিটি। —লোকের জন্যে ভাবনা নেই, বেশ ভালো লেখাপড়া জানা একটি ছোকরা আমার হাতেই আছে, আসতে বলব'খন।

দেখ, ভালো হবে না বলছি!

তর্জনে তেমন ভ্রূক্ষেপ করল না অমরেশ, তেমনি হালকা কৌতুকে বলল, তোমার কাণ্ডই আলাদা, একটু-আধটু সহ্য করলেও তো পারতে, কোথায় খুশি হবে, না দিলে একেবারে সরিয়ে।

মিনতি ভুরু কোঁচকালো, একটু-আধটু সহ্য করিনি তোমাকে কে বললে? তোমার চোখ আছে কোনো দিকে?

আপাতত আছে, আর সেটা মিনতির দিকে। সেই চোখে নতুন করে আবার কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা, যা সে অনেকদিন দেখেনি, যা তার অনেকদিন দেখার কথা মনে পড়েনি। সেই জন্যেই আনন্দ আর সেই জন্যেই পরিতাপ। খুশিমুখে বলল, ব্যাপারটা তলায় তলায় তাহলে অনেক দূর গড়িয়েছিল?

মিনতির চোখে রাগ, ঠোঁটের ফাঁকে নিরুপায় হাসির আভাস। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে অমরেশ বিছানায় এসে সটান শুয়ে পড়ল। মিনতি অবাক, শুয়ে পড়লে যে, এক্ষুনি না নার্সিং হোমে ছুটতে হবে বলছিলে?

অমরেশের একটুও তাড়া নেই। —ভালো লাগে না আর দিন রাত।

কিন্তু তার দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু একটা দুরভিসন্ধি আঁচ করল যেন মিনতি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, অর্থাৎ দুর্জনের সমুখ থেকে প্রস্থান করাটাই সমীচীন বোধ করছে। কিন্তু অমরেশও ওর মতলব বুঝে প্রস্তুতই ছিল। খপ করে হাত ধরে ফেলে টেনে বসিয়ে দিল আবার, হাতখানা ধরাই থাকল। হাত-বন্দী মিনতির

হালছাড়া বিরক্তি, যাও, দিনকে দিন কি যে হচ্ছ তুমি।

আমাকে তো আর তাড়াতে পারবে না—

মিনতির চোখে অমরেশ নির্লজ্জ। —তোমাকে সব থেকে আগে তাড়ানো উচিত।

বেলা পড়ে আসছে। অমরেশ অনেকক্ষণ চলে গেছে। উঠবে উঠবে করেও মিনতির ওঠা হচ্ছে না। একটু ঘুমের মত এসেছিল, এখন তাও নেই। শিথিল আলস্যে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। অনেক দিনের একটা জমাট গুরুভার নেমে যাওয়ার শ্রান্তি আর তৃপ্তি। ...মানুষটা এখন আর কিছুকাল অবহেলা করবে না ওকে, বরং প্রগল্‌ভ অবকাশে অতিরিক্ত মনোযোগ দেবে মাঝে মধ্যে। তারপর? তারপর আবার কি তেমনি একার মধ্যে তলিয়ে যাবে মিনতি? ...মনে হয় না। এবারের মত এত অবাক আর একবারও হয়নি, শুনেই যে-ভাবে চেয়েছিল ওর দিকে মনে হলে মিনতির হাসি পায়। ...শানুর এই মাস্টারটিকে জিতেন্দ্রিয় গোছের পুরুষই ভাবত বোধহয়। এর আগে বাড়ির সরকারকে বিদায় দেবার ফলে অনেকটাই চোখ খুলেছিল, আশাতিরিক্ত ফল হতে দেখেছিল মিনতি—আর এই কাণ্ড করা দরকার হবে ভাবেনি।

কিন্তু এই তৃপ্তির তলায় তলায় একটা অস্বস্তিও থিতিয়ে আছে যেন। মিনতি সেটা দেখতে চায় না, মিনতি সেই অস্বস্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না। কিন্তু তবু দেখতে হচ্ছে, দাঁড়াতে হচ্ছে। অস্বস্তিটা বিবেকের ওপর আঁচড় কাটছে এখন।

সকলেই জানে রমেশবাবু ভালো লোক, খাঁটি লোক। মিনতিও জানে। মুখের দিকে চেয়ে কথা বলেন না, তেমন দরকার না পড়লে ধাবে-কাছে আসেন না পর্যন্ত, গীতা-উপনিষদ পড়েন আর ছেলে পড়ান। ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করছিল, ও-রকম লোক পাওয়া শক্ত হবে।

একজন নির্দোষ লোককেই অযথা সরিয়ে দিয়েছে মিনতি। ....মিনতির কি পাপ হবে? মিনতির পাপের বড ভয়, যত টাকার ছড়াছড়িই হোক এখন, ছেলেবেলা থেকে বিয়ে পর্যন্ত মায়ের পূজোআর্চার পরিবেশে কাটিয়েছে। মিনতি জোর করেই যেন পাপ বোধটাকে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। পাপ কেন হবে? লোকটার মাথায় তো আর অপবাদ কিছু চাপাতে যায়নি। বরং সকাতরে বিদায় দিয়েছে তাকে। চার মাসের মাইনে জোর করে গুঁজে দিয়েছে। আর বলেছে, ছেলেকে এবার থেকে নিজে পড়াবে, নিজের মন-মত মানুষ করবে—শুয়ে-বসে তার সময় কাটে না। কাটে নাই তো, না হয় মাস্টার আর রাখবেই না, সত্যি-সত্যি নিজে পড়াবে....মা কি নিজের ছেলেকে পড়ায় না নাকি।

অবশ্য, অমরেশের কাছে তাকে এ-ভাবে বিদায় করার হেতুটা বিকৃত করে বলতে হয়েছে। কিন্তু সেটা তো অমরেশেরই একটা বিকৃতি সারানোর জন্যে, সে-অপবাদ ওই ভদ্রলোককে স্পর্শ করবে কেন! রোগ ছাড়াতে হলে অমরেশ নিজে তেতো ওষুধ দেয় না রোগীকে? এও ওষুধ ছাড়া আর কি! ঠাকুর পাপটাই দেখবেন, আর

কোন্ প্রাণের দায়ে সে করছে এই কাজ, সেটা দেখবেন না? ওর কি মনের তলায় এতটুকু পাপ আছে? শুধু নিজের স্বামীটিকে একান্তভাবে নিজের কাছে ধরে রাখতে চেয়েছে। স্বামীর মঙ্গল চেয়েছে। সেটা কি পাপ?

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে হালকা হবার চেষ্টা মিনতির।

মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে মিনতি। তিনটি বোন ওরা, ভাই নেই। তাই বাপের আদর একটু বেশি মাত্রায় পেয়েছ। তেমন সুন্দর নয় দেখতে, কিন্তু সাজলে-গুজলে একেবারে খারাপও দেখাত না। বিশেষ করে মিনতির স্বাস্থ্যটি বরাবর ভালো। রূপ না থাক, বাঙালী মেয়ের অমন সুঠাম তনু-প্রাচুর্যও খুব বেশি চোখে পড়ে না। রূপ নেই বলেই হয়ত মিনতির এদিকে নজর ছিল, যত্ন ছিল।

অমরেশ ডাক্তারী পাস করে বেরুবার এক বছরের মধ্যে বিয়ে। অবস্থার দিক থেকে সেটা অসম বিয়েই বলা যেতে পারে। বৃত্তিপাওযা ছেলে না হলে অমরেশের ডাক্তারী পড়া হত না হয়ত। পাস করার পর এক আত্মীয় মুরুব্বী শ্বশুর ধরে দিয়েছিলেন ওকে।

অমরেশের তখন বাড়ি-গাড়ি ছিল না এমন, বিযের পরেও অনেক দিন টেনে-হিঁচড়ে দিন কেটেছে। সেই সময় মিনতি লোকটার মধ্যে একটা দুর্বলতা আবিষ্কার করেছিল। মিনতি ভিড়ের মধ্যে ট্রামে-বাসে উঠতে চাইত না, অমরেশ তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। মিনতি বলত, তোমরা পুরুষেরাই ভারী অসভ্য!

মিনতি তখনই লক্ষ্য করেছে, ওকে নিয়ে পুরুষদের ভদ্রগোছের একটু-আধটু দুর্বলতার আঁচ পেলে অমরেশের ভারী আনন্দ। কেউ জায়গা ছেড়ে দিলে, কেউ একবারের বেশি তিনবার ওর দিকে তাকালে, কোন দোকানদার ওকে একটু বেশি খাতির করলে—ওর প্রতি অমরেশেরও যেন আগ্রহ বাড়ে। ঠাট্টা করুক আর যাই হোক, ভিতরে ভিতরে খুশি হয়।

অমরেশ বিলেত গিয়েছিল মিনতির বাবার টাকায়। ভদ্রলোক একটু কষ্ট করেই জামাইয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাঁর আশা সার্থক। অমরেশ বিলেত থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যস্থানে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়েছে। এখন তো সেটাই পূর্ণদৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছে। টাকা যে মানুষকে এভাবে তাড়া করতে পারে সেটা নিজের চোখে নিজের ঘরে এভাবে না দেখলে মিনতি বিশ্বাস করতে পারত না।

কিন্তু অমরেশ বিলেত থেকে ফেরার পর পরিপূর্ণতার সূচনাতেই মিনতি একধরনের রিক্ততা অনুভব করতে লাগল। অমরেশের তখন অনেক কাজ, অনেক উৎসাহ, মাথায় অনেক প্ল্যান। কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে মানুষটাই কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। অমরেশ শিশুরোগের বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছে। আগে বাড়িতেই রোগী দেখার চেম্বার ছিল। মিনতি লক্ষ্য করত, অসুস্থ ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক অভিজাত সুন্দরী মহিলারা আসে। মিনতি জানে, সেটা খুবই স্বাভাবিক—অসুস্থ শিশুর সঙ্গে মেয়েরাই সাধারণত এসে থাকেন। কিন্তু তবু কেমন লাগত। নিজের যা নেই, সেটাই এক এক-সময় বড় হয়ে উঠত মিনতির চোখে। রূপ নেই। কোনদিন ছিল না। কিন্তু নিজের কাছে

নিজেকে আগে এত নিষ্প্রভ লাগত না। এখন লাগে। মনে হয়, ঘরের প্রতি আর তেমন আকর্ষণ নেই বলেই সর্বক্ষণ এমন কাজের ঝোঁকে মেতে থাকে মানুষটা। ঘরে আনন্দ কম বলেই বাইরে এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা।

এরই মধ্যে সেই পুরুষ-বৃত্তির বৈচিত্র্যটা মিনতির চোখে পড়েছে। বাড়িতে মাঝে-মধ্যে পার্টি দিতে হয়, বাইরের পার্টিতেও যোগ দিতে হয়। এর মধ্যে ওর প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে দেখলে অমরেশ আগের মতই খুশি হয়, তারও আকর্ষণে নতুন করে রঙ ধরে। কেউ একটুখানি প্রশংসা করলে নিরিবিলি ঠাট্টা-তামাশায় অমরেশ সেটা তিনগুণ ফাঁপিয়ে তোলে। এই লঘু-প্রহসনে সব থেকে বেশি ইন্ধন জুগিয়েছে অমরেশের সতীর্থ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু আলোক সেন। রসিক লোক, যা মুখে আসে তাই বলে। সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে মিসেস চক্রবর্তীর জন্যে কোন্‌দিন বন্ধুটিকে গুমখুন করে বসে ঠিক নেই। প্রায়ই বাড়িতে আসে, মিনতির গা-ঘেঁষে বসে, কখনো বা সকলের সামনেই ওর একটা হাত জোর করে নিজের মস্ত হাতের থাবায় দখল করে রাখে, অমরেশের সামনেই ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি আমার সর্বনাশ করে ছাড়লে ম্যাডাম, আহার-নিদ্রা ঘুচতে বসেছে, ব্যবসা-পাতি ডুবতে বসেছে—নিজের স্ত্রীটিও ডাইভোর্স করবে বলে শাসাচ্ছে।

মিনতি সত্যিই রেগে গেছে এক একদিন, অন্তত সেই রকমই মনে হয়েছে। বলেছে, আচ্ছা, আমি কুৎসিত আছি তো আছি, তার জন্যে আপনার এত ঠাট্টার কি আছে!

জবাবে আলোক সেনের প্রসারিত চোখে অব্যক্ত হতাশা। —এই হল শেষে! তুমি যে কি, ওই গাধাটা কি কোনদিন বুঝতেও দেয়নি তোমাকে!

আলোক সেন ওকে বলত শ্যামাঙ্গিনী-ভেনাস। মিনতির গায়ের রঙ তেমন কালো নয় বলেই তার দুঃখ।

নিছক অন্তরঙ্গ হাসি-কৌতুকের ব্যাপার। কিন্তু মিনতি এরও সুবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে। রং-বদল দেখেছে।

মিনতি প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করে বসেছিল বছর চারেক আগে। অমরেশ তখন ব্যতিব্যস্ত, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। জনা-কতক বন্ধু মিলে মস্ত একটা পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছে। জমি কিনেছে, নার্সিং হোমের বিল্ডিং উঠছে সেখানে। সে-ই প্রধান উদ্যোক্তা। মাথায় শুধু প্ল্যান আর নক্সা আর টাকা-পয়সার হিসেব। মিনতির নিজেকে সব থেকে বেশি পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল তখনই। এতবড় একটা ব্যাপার হচ্ছে, মিনতিরও আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দের ওপরে থেকে থেকে বিমর্ষ ছায়া পড়েছে একটা। কাজের মত কাজ পেলে অমরেশ যে ওকে তুচ্ছ করতে পারে সেই সত্যটা যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছে।

—একটা কথা বলব কানে যাবে? দিন দিন যা হচ্ছ তোমাকে তো কিছু বলাই দায়।

নিস্পৃহ গলায় বললেও প্রায় নির্মম একাগ্রতায় মিনতি অমরেশের চিন্তার সুতোটা

ছিঁড়ে দিয়েছিল।

—ঠাকুরপোর চট্ করে একটা বিয়ে দাও, মেয়েটি সুন্দরী হলে ভালো হয়....তারপর বুঝতে না পারে এ-ভাবে আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা করো ওদের, সুবিধেমত চাকরি যতদিন না হয় ততদিন তুমিই না হয় খরচ চালাবে। তাছাড়া, কাঁধে ভার না চাপালে ও-রকম গাছাড়া লোকের দ্বারা চাকরির জোগাড় হবেও না কোনদিন।

শেষের কথাক'টা শুধু বলার জন্যেই বলেছে। ওটা যে আসল কথা নয়, অমরেশেরও বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। প্রস্তাব শুনে অমরেশ আকাশ থেকে পড়েছিল।

উপলক্ষ অমরেশের ছোট ভাই সমরেশ। এম. এ. পাস। একসঙ্গেই থাকত, খবরের কাগজ দেখে চাকরির দরখাস্ত করত, আর শুয়ে বসে ইংরেজি নভেল পড়ে কাটাত। বউদি আর ভাইপোর ওপর টান দেখে অমরেশ তার ওপর খুশি ছিল। তাছাড়া ভাইকে ভালও বাসে।

হতভম্ব অমরেশ গোপনে মিনতিকে অনেক জেরা করেছে তারপর। মিনতি বেশির ভাগই জবাব দেয়নি। যা-ও বলেছে, আভাসে বা ছদ্ম-বিড়ম্বনায় হেসে ফেলে বলেছে। সরাসরি বলার থেকেও এই অস্পষ্টতার ইঙ্গিত অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

তিন মাস না যেতেই সমরেশর চাকরি হয়েছে। চাকরিটা অমরেশই সংগ্রহ করে দিয়েছে, কর্মস্থলে কোয়ার্টারও আছে। সমরেশ চাকরি নিয়ে কোয়ার্টারে চলে গেছে, কিন্তু বিয়েতে রাজি হয়নি তাকে কেন্দ্র করে মিনতি বেশ কিছুকাল ঘরের মানুষটিকে ওর প্রতি সচেতন রাখতে পেরেছিল।

এরপর একই উপলক্ষে একে একে বিশ্বস্ত চাকর মথুর আর বিশ্বস্ততর বিষ্ণু সরকারকে বিদায় দিয়েছে। কারো ওপর অবিচার করেনি, দু'জনকেই দু'মাসের করে মাইনে আগাম দিয়ে কাজ দেখে নিতে বলেছে। অন্যদিকে অমরেশের জেরায় পড়ে নিরুপায় ঝাঁঝে জবাব দিয়েছে, আমার খুশি তাড়িয়েছি, তোমার কী? রাগের মুখেই হেসেও ফেলেছে আবার।

ব্যর্থ হয়নি। এক-একবার এমনি এক-একটা ঘা খেয়েই যেন চোখ খুলেছে অমরেশের। ঘরে-বাইরে সকল কাজের ডান-হাত বিষ্ণু সরকারকে খুইয়ে হতাশ কণ্ঠে বলেছিল, বাড়িতে আর আশি বছরের নিচে লোক ঢুকতে দিচ্ছিনে আমি। শেষে সেই বিতাড়িতদের পক্ষ নিয়েই প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চোখ রাঙিয়েছে মিনতিকে, ওদেরও তো চোখ আছে, ওদের কি দোষ।

সব শেষে শানুর মাস্টার রমেশবাবু। তিনিও গেলেন। সরাবার মত আর কেউ নেই। না থাক, মিনতি অনেকটা নিশ্চিন্ত, আর বোধহয় দরকারও হবে না। ঠাকুর যেন মুখ তুলে চান, এ-পর্যন্ত মিনতি যা কিছু করছে সবই প্রাণের দায়ে করেছে—এ কাজ সে করতে চায়নি।

ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন।

অমরেশের কাজের চাপ দিনে দিনে বাড়ছে। পসার বাড়ছে, নার্সিং হোমের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। তবু মিনতির মনে আনন্দ আছে। প্রতিটি প্ল্যান নিয়ে অমরেশ ওর

সঙ্গে আলোচনা করে, পরামর্শ করে। সকালে চায়ের টেবিলে বসে গোটা দিনের প্রোগ্রাম মিনতির চোখের সামনে তুলে ধরে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ওর কাছে আসার ফাঁক খোঁজে। এক একটা কাজের ঝামেলার পর একান্ত করে শুধু দু'জনের জন্যেই এক-আধটা প্রোগ্রাম করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

ছ'মাস না যেতে ঠাকুর গোটাগুটি মুখ তুললেন সম্ভবত।

ভরা তৃপ্তির মধ্যে মিনতির হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, স্বামীর এতবড় নার্সিং হোম, এত নাম ডাক, অথচ সেই নার্সিং হোম সে নিজে গিয়ে ভালো করে একটাবার দেখেও এল না। সেই ভিত্তি-স্থাপনের উৎসবে যা একদিন গিয়েছিল। অবশ্য শহরেব আর একপ্রান্তে নার্সিং হোম, তবু গাড়িতে যেতে আসতে কতক্ষণ আর। ইচ্ছে থাকলে রোজ একবার করে যেতে পারে। ইচ্ছেটা এতদিন হয়নি বলেই অনুশোচনা। স্ত্রীর কর্তব্যে এটা মস্ত ক্রুটি বইকি।

সেদিন দুপুরে গাড়ি নিয়ে নার্সিং হোমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। অমরেশকে কিছুই বলেনি। এর্তদিন বাদে বলাটাই লজ্জার। ফিরে এসে বলবে। আর সেখানে যদি দেখা হয়ে যায়, আনন্দের ব্যাপারই হবে। প্রোগ্রাম যা শুনেছে দেখা হওয়াই সম্ভব।

নার্সিং হোম দেখে মিনতির দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে মনে গর্ব বোধ করতে লাগল সে। তাব পরিচয় পেয়ে হাসপাতালের দু'জন কর্মচারী দৌড়ে গেছে ম্যানেজারকে খবর দিতে। সেই দেখাবে শোনাবে। ডিরেক্টর—সাহেব, অর্থাৎ তার স্বামীটি কোথায় কাজে বেরিয়েছে শুনল।

ম্যানেজার সামনে এসে দাঁড়াতে মিনতি হতভম্ভ। ম্যানেজার মিনতির দেওর সমরেশ।

শুকনো মুখে মিনতি হাসতে চেষ্টা কবল একটু, এখানে চাকরি তোমার, আর এখানে কোয়ার্টার?

সমরেশ অবাক, কেন তুমি জানতে না?

মিনতি মাথা নাড়ল, জানত না।

সোৎসাহে সমরেশ নার্সিং হোম দেখাতে লাগল মিনতিকে। কত কি করেছে, আরো কত কি করবে।

কিন্তু মিনতি কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না।

কারণ, আরো কিছু তার দেখা হয়েছে। আরো কিছু শোনা হয়েছে।

বাড়ির চাকর মথুরকে দেখেছে, আর শুনেছে সে এখানকার হেড জমাদার।

বিষ্ণু সরকারকে দেখেছে, আর শুনেছে, সে এখানেও প্রধান সরকার।

শানুর মাস্টার রমেশবাবুকেও দেখল, এখানকার যাবতীয় আয়ব্যায়ের হিসেবের দায়িত্ব নিয়ে আছেন তিনি।

সমরেশ গল্প করেছে, বাড়িতে আর ভালো লোক একটিও রাখতে পারবে না বউদি, কাজ পছন্দ হলেই দাদা তাকে হাসপাতালে এনে ঢোকাবে।

বাড়ির দিকে মোটর ছুটেছে আবার।

মিনতি পাথরের মত বসে। এতবড় আঘাত জীবনে এই প্রথম। মানুষটা সব জানে, ওর সব ছলনা জানে। জেনেও বিশ্বাসের ভান করেছে। বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করেনি বলেই সব ক'টা লোককে কাজে বহাল রেখেছে, একজনকেও ছাড়েনি। আর সম্প্রতি তার এই কাছে আসাটাও নিছকই ওকে তুষ্ট রাখার জন্য?

বাড়ি ফিরে মিনতি আত্মহত্যার চেষ্টা করবে কিনা তাও ভেবেছে। এতবড় লজ্জা নিয়ে জীবনে আর মুখ দেখাবে কেমন করে।

বাড়ি ফিরে মিনতি বিছানা নিল। ক্রোধ আর ক্ষোভ চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। মিনতি কাঁদতে লাগল। এত কান্না মিনতি জীবনে কাঁদেনি।

কিন্তু আশ্চর্য! কেঁদে কেঁদে মিনতির হালকা লাগছে। যাতনাটা আর তেমন করে বিঁধছে না। লজ্জাটা ততো আর প্রাণঘাতী মনে হচ্ছে না। মুখ দেখানোটা একেবারে অসম্ভব হবে ভাবছে না। তবু কাঁদছে মিনতি। কাঁদছে আর তলায় তলায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে।

মিনতির রোগ সেরেছে। অনেকদিনের রোগ।

মিনতি এতদিন যা করে এসেছে, আর তা কোনদিন করতে হবে না।

মস্তি

হরিমতীকে নিখুঁত সুন্দরী দেখে জয়বাহাদুর। তার চোখে হরিমতীর মত অমন নিটোল পরিপুষ্ট সুন্দরী আর কেউ নয়। মনের আবেগে অনেকদিনই তাকে সেটা ঘোষণা করতে শোনা গেছে। এমন কি মেমসাহেবকেও বলেছে। এই বয়সে কতই তো দেখল, কিন্তু হরিমতীর মত কেউ না। এই রূপ দেখলে তার চোখ জুড়োয়, মন জুড়োয়। এক উত্তাল রূপের তরঙ্গ যেন ওর দেহতটে এসে স্থির হয়ে আছে। হরিমতী নড়লে চড়লেও সেই রূপ উছলে ওঠে। জয়বাহাদুর চেয়ে চেয়ে দেখে। মনের আবেগে তখন যা মুখে আসে তাই বলে বসে। সাহেব কাছে কি মেমসাহেব কাছে—সব সময় তার খেয়াল থাকে না।

ওর কথা শুনে আর স্তুতি শুনে পার্বতী ব্যাস এক একদিন হেসে বাঁচে না। অশিক্ষিত আধ-বুড়ো লোকটার সেই নগ্ন স্তুতির ছিটে ফোঁটা কানে আসতে অনেকদিন তার নিজেরই মুখ রাঙিয়েছে। বাংলোর বারান্দায় একটা বই বা মাসিক পত্রের আড়াল থেকে পার্বতী আড়ে আড়ে জয়বাহাদুরের কত রকমের আদরের নমুনা দেখেছে ঠিক নেই। জয়বাহাদুর হরিমতীর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে কপালের কাছটায় আঁচড় কেটে সুড়সুড়ি দেয়। আর, ওই বজ্জাতও আদর খেতে ওস্তাদ। যতটা পারে মাথা নুইয়ে এমন দাঁড়িয়ে থাকে যেন শরীরে প্রাণটাও নেই। পার্বতীর এক একসময়ে মনে হয় আদরে

আদরে ওর রূপ যেন গলে গলে পড়ছে। কতদিন যে বই কোলে হুড়মুড় করে ছুটে পালিয়েছে পার্বতী ঠিক নেই। ঘরের মধ্যে হেসে গড়িয়েছে। রাজীবকে বলেছে, জয়বাহাদুর নিজেই হরিমতীর প্রেমে পড়ে গেছে।—দেখ গে যাও কি করছে, গলা জড়িয়ে ঝুলে গালে গাল ঘষছে।

রাজীব ব্যাসের হাতে ভারী কাজ থাকলে একটু হাসত শুধু, তারপর আবার কাজের মধ্যে ডুবে যেত। মাথায় কাজ চাপলে তার কান দুটো কোনদিনই সজাগ থাকে না খুব। আর সেই কানের ভিতর দিয়ে মরমে খুব বেশি কিছুও পৌঁছয় না তখন। এ-জন্যে পার্বতী তাকে অনেকদিন অনেক রকমে আক্কেল দিয়েছে। কিন্তু কাজের মধ্যে লোকটা হারিয়ে না গেলে তখন আবার উল্টো ব্যাপার। রাজীব ব্যাস মুখ তুলে শুধু কান দুটো নয়, দুই চোখের সবটা ঢেলে দিয়ে পার্বতীর বাঁধ-ভাঙা হাসির কারণ শুনত। সেই হাসির তরঙ্গ সামলে ওঠার আগেই পার্বতীর হঠাৎ আবার খেয়াল হত, লোকটা শুনছে যত না—তার থেকে দেখছে ঢের বেশি। পার্বতী চকিত হয়ে উঠত। দরজাগুলো সব সপাট খোলা। আর, এই লোকটার চোখেও জয়বাহাদুরের মতই কিছু একটা করে বসার মতলব। হাতের কাছে যা পায় সজোরে তার গায়ে ছুঁড়ে মেরে তাকে ছুটে পালাতে হত আবার। ও ধরা পড়লে রক্ষা নেই, দিন দুপুরে স্থান নেই লোকটার।

কিন্তু এই সবই স্মৃতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগে এই রকম হত, এখন হয় না। পার্বতীর মনে হয় কত কাল আগে। যখন অন্য অন্য জঙ্গলের কাজে ঘুরত তখন। তাদের সঙ্গে তখনও এই জয়বাহাদুর ঘুরত, আর এই হরিমতী ঘুরত।

জয়বাহাদুর বদলায়নি, হরিমতীও বদলায়নি। জয়বাহাদুরের আদর আর সোহাগ ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু পার্বতী বদলেছে, বদলাচ্ছে। এখনো জয়বাহাদুরের কাণ্ড কারখানা দেখলে এক এক-সময় হেসে ফেলে। কিন্তু হাসির শেষে কোথায় যেন জ্বালা ধরে। নিজের অগোচরে যে ক্ষতটা লালন করেছে তাতে যেন আঁচড় পড়ে। এই সেদিনও হরিমতীকে সঙ্গী জুটিয়ে দেবার আশ্বাসের কথাগুলো কানে আসতে প্রথম দফা হেসে বাঁচেনি পার্বতী। শুধু কি আশ্বাস, ভদ্রগোছের সঙ্গী জোটানোর ব্যাপারে অনেক সমস্যার কথাও বলছিল জয়বাহাদুর। হরিমতীকে বোঝাচ্ছে না তো কোনো অবুঝকে বোঝাচ্ছে যেন। সঙ্গীর জন্যে যে লজ্জাহীনা একেবারে গোঁ ধরে বসেছে, তেমনি কাউকে। মেমসাহেব শালের সারির পিছন দিক দিয়ে এসেছিল জয়বাহাদুর টের পায়নি। পেল্লায় শেকল বাঁধা শালের গুঁড়ির পিছনেই এসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাও জানতে পায়নি। তাই হরিমতীর সঙ্গে তার এক তরফা গুরুগম্ভীর আলাপে বিঘ্ন ঘটেনি। জয়বাহাদুর বলছিল, সঙ্গী জুটিয়ে দেবে বলেছে যখন ঠিকই দেবে। কিন্তু জোটানো কি অত সহজ, যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ওদের জাতের। ভিতর থেকে যতক্ষণ না চাহিদার আগুন জ্বলল, মরদগুলোর যেন তপস্বী এক একটি। পাশ দিয়ে উর্বশী মেনকা রম্ভা যোয়ানী উপচে নেচে গেলেও ফিরে তাকাবে না। কিন্তু আগুন জ্বলল কি অমনি মত্ত পাগল। প্রেম জাগল না তো মাথায় খুন চাপল যেন। তবু এরই মধ্যে সঙ্গিনী খুঁজছে এমন

একটু আধটু ভদ্রসভ্র মরদের সন্ধানে আছে জয়বাহাদুর। দূরে দূরের জঙ্গলে গিয়েও তা কটা পোষা মরদের কপাল শুঁকে এসেছে সে। সঙ্গিনী লাভের তাগিদে মরদগুলো ভিতর আনচানিয়ে 'উঠলে ওদের কপাল দেখলেই বুঝতে পারে জয়বাহাদুর। কপালের অজস্র ছিদ্র দিয়ে সুগন্ধ স্বেদের আভাস পেলেই বুঝতে পারে, কার সময় ঘনাল—কোনটা মত্ত হবে এবার। কিন্তু জয়বাহাদুর কি করবে, কোনোটার যে কোনোরকম লক্ষণ দেখছে না সে—হরিমতীর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কী?

শাল গুঁড়ির আড়ালে মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পার্বতী। নিঃশব্দ হাসির আবেগে তার সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছিল। হরিমতীর অবুঝপানা দেখেই জয়বাহাদুর যে ধমকাচ্ছে তাকে।—তা বলে বুনোগুলোর হাতে হরিমতীকে ছেড়ে দিতে পারে না সে। বুনোগুলো কেমন ডাকাতে বজ্জাত হরিমতীর জানা নেই। হরিমতী ছেলেবেলা থেকে ভদ্রলোকের আলোবাতাসে আছে— জানবে কেমন করে। একটুখানি মন বুঝে চলতে না পারলেই হাডগোড গুঁড়িযে মাটিতে পুঁতে ছাডবে একেবারে। বুনো মরদের সেই উন্মাদ প্রেম সামলানো হরিমতীর কাজ নয়।

পার্বতী আর দাঁড়াতেও পারেনি, এগিযে আসতেও পারেনি। শাল সারির ভিতর দিযেই সোজা বাংলোর দিকে ছুটেছে। হাসির দমকে পেটে খিল ধরার দাখিল। দূরে দূরের ডেরা থেকে কুলি কামিনরা হাঁ করে তাদের মেম সাহেবের সেই ত্রস্ত প্রগল্ভ দৌড দেখেছে। একেবারে বাংলোব বারান্দায উঠে তবে দম ফেলেছে পার্বতী। দম ফেললেও হাসি সামলাতে পারেনি। অদূরে থামের পাশে রাজীব ব্যাসের আদরের খাস আরদালী রঙ্গু দাঁডিযে আছে তাও খেযাল করেনি। টেবিলে বড় একটা নক্সা বিছিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কি সব নিশানা বসাচ্ছিল রাজীব ব্যাস, আর ফাইলে নোট করছিল।

প্লীজ! নট্ নাও—

লোকটার আচমকা নিবিষ্টতা ভঙ্গ হযেছে। অনুনয়ের থেকেও বিরক্তি মেশানো অনুশাসনটুকুই বেশি স্পষ্ট। যে ভাবে তাকিযেছে তার একমাত্র অর্থ, দেখছ মুখ তোলার ফুরসত নেই, তা সত্ত্বেও এভাবে আস কেন?

একটানা ক'টা নিঃসঙ্গ দিনের ক্ষোভ ভুলে পার্বতী হঠাৎ সেই আগের দিনে ফিরে গিয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল এতটা দৌড়ে এসে। রুদ্ধ হাসির আবেগে সামনের চেযারটা একটু শব্দ করেই টেনে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কানে গলানো সীসে এক ঝলক। প্লীজ! নট্ নাও—

পার্বতী দাঁডিয়ে গেল। হাসি গেল। হাসির তরঙ্গ মিলিয়ে গেল। একটা বিপরীত তাপে মুখখানা খরখরিযে উঠতে লাগল। থামের ওপাশে রঙ্গুর দিকে চোখ পড়ল। ভাবলেশহীন মুখে মেমসাহেবকেই দেখছিল সে, এবারে দু'চোখ শালগাছগুলোর দিকে ফেরাল।

পার্বতীর দৃষ্টিটা সামনের লোকটার মুখের উপরেই এসে থামল আবার।

রাজীব নিজেও অপ্রস্তুত একটু। ঈষৎ শঙ্কিতও। সে আঘাত দিতেও চায়নি, অপমান

করতেও চায়নি। কাজের ঝোঁকে ছিল। কাজের ঝোঁকে থাকলে এই রকমই হয় তার। তাছাড়া কাজটা জরুরী। এই নক্সার চিহ্ন ধরে কাছে দূরের অনেকগুলো জঙ্গলে কুড়ুলের ঘা পড়েছে, আরো অনেকগুলোতে পড়বে। কিন্তু লোকটা এ-ধরনের পারিবারিক দুর্যোগ ঘটাতে যেমন পটু, মনোরঞ্জনে তেমন নয়। রঙ্গুর সামনেই একটা অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কায় তার হাতের লাল পেন্সিল থেমে গেল।

পার্বতী একটা কথাও বলল না। নিঃশব্দে ঘরে চলে গেল। চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। না, এখন আর সে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে না। লোকটার হয়ে আর কৈফিয়ত খাড়া করায় না। করে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে না। এখন শুধু বুকের ভেতরটা জ্বলে। জ্বলে জ্বলে জ্বলে।

আগে করেছে বিচার বিশ্লেষণ। অনেক করেছে। অনেক দিন অনেক বিনিদ্র রাত। মানুষটার কাজের অমন নীরস নিবিষ্টতার মধ্যে নিষ্ঠাটাকেই বড করে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। ওকে ছাড়িয়ে কোনো কিছু বড় হয়ে উঠতে পারে সেটা অবশ্য বরদাস্ত করা সহজ নয়। কোনো দিন করেনি বরদাস্ত। করতে পারলে আজ তার এই একজনের জীবনে আসার কথা নয়। করেনি বলেই এসেছে। নিজের ইচ্ছায় মাথা উঁচিয়ে একটা শহরের সাত বছরের অবিমিশ্র স্তুতির অর্ঘ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে এসেছে। পনেরো থেকে বাইশ। সাত বছরের পুরুষ বাসনাতপ্ত যৌবনের স্রোতে নির্লিপ্ত অবহেলায় শুকনো টান ধরিয়ে এসেছে। আর, তাদেরই মধ্যে স্বেচ্ছাচারী বিশেষ এক প্রবল পুরুষকে সদর্পে জীবন থেকে ছেঁটে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যে এই এক জনের কাছে পার্বতী কি এত পুরনো হয়ে গেল! পুরুষের তাপ জুড়নোর মত পুরনো হয়ে গেল!

নিঃসঙ্গ অবকাশে অনেক দিন ঘরের বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পার্বতী। অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে নিজেকে। তন্ময় হয়ে দেখেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। স্রস্ত বসন প্রায় বিচ্যুত করে দিয়ে দেখেছে। গোড়ায় গোড়ায় হেসেছে তারপর।

ঘরের লোকটা তার কানা না রোগগ্রস্ত! মাস ছয় হল প্রমোশন পেয়ে পুরোপুরি ফরেস্ট অফিসার হয়েছে। এত কম বয়সে কাজের এমন সুনাম কম লোকই পায় নাকি। সেই প্রমোশনের হার যেন। কাজ শেষ হলে মনের আনন্দে সাহেবের সঙ্গে সেও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে একযোগে তল্লাসীতে লেগে যেত। তারাও জানত তাদের সাহেবকে হারাতে চেষ্টা করছে মেমসাহেব—সাহেবের হার হলে তাদেরও লজ্জা না! মহা উৎসাহে তারা সন্ধানে লেগে যেত। শুধু গাছ গাছড়া ফল ফুল কেন, সাহেবকে জব্দ করার জন্যে মেমসাহেব অনেকভাবে চেষ্টা করেছে। টিয়া ময়না শাদা খরগোশ বারো শিঙ্গা হরিণ এমন কি সজারুর বাচ্চা পর্যন্ত চেয়েছে। জ্যান্ত, মরা নয়। কিন্তু রঙ্গুর দল ঠিক জুটিয়েছে। মাঝে মাঝে পার্বতীর রঙ্গুর ওপরেই রাগ হত এই জন্যে।

কিন্তু এখন সে আনন্দ গেছে। সেই রেষারেষির উত্তাপ গেছে। কি চাই জিজ্ঞাসা করলে পার্বতী প্রায়ই বলে না কিছু। বললেও দরকারী জিনিসের কথাই বলে। সেটা

সংগ্রহের জন্যে আর দল বেঁধে বা কোমর বেধে নামতে হয় না।

পার্বতী দেখছে তাকে। এখন এই কথাও শুনতে হল। বলল, আমার মন মেজাজ ঠিকই আছে। আমি থাকলে তোমার যদি কিছু অসুবিধা হয় তো বলো।

ভণিতা করে কথা বলতে জানে না রাজীব ব্যাস। শাদা-সাপটা বলে বসল, হয় তুমি এভাবে থাকলে অসুবিধে হয়।

কি ভাবে থাকতে হবে?

সেটা আমার থেকে তুমি ভালো জানো। অন্তত আগে জানতে।

আগের সঙ্গে এখন কিছু তফাত হয়েছে। এখন তুমি মস্ত অফিসার হয়েছ। তোমার কর্মচারীদের মত এখন আমাকেও তোমার মন বুঝে আর মুখ চেয়ে চলতে হয়।

রাজীব ব্যাস জোরেই হেসে উঠল। বলল, এমনিই মন বুঝে চলছ যে আমি ভেবে অস্থির।

পার্বতীর ঠাণ্ডা মুখে একটা নরম রেখাও দেখা গেল না। কিন্তু কথা বলতে এসে রাজীব ব্যাসেরই মনে হল, সত্যিই বড় একা বড় নিঃসঙ্গ ও। আপসের সুরে বোঝাতে চেষ্টা করল, কেন মন থেকে দুঃখ সৃষ্টি করে দুঃখ পাচ্ছ বলো তো। আমি তোমাকে আমার মন বুঝেও চলতে বলিনে, মুখ চেয়েও থাকতে বলিনে। কিন্তু তুমি নিজে তাই চাও—তোমার খুশির আর তোমার ইচ্ছের একটা লাগাম পরিয়ে দিতে চাও আমার গলায়। কিন্তু কেন চাও বলো তো? বিয়ের আগে কত লোক তো কত ভাবে তোয়াজ করত তোমায়, তোমার একটা ইঙ্গিতে উঠত-বসত চলত-ফিরত, অথচ তুমি তাদের একজনকেও ভাল বাসতে পারলে না কেন? তাদের মত আমিও সর্বদা তোমার মন জুগিয়ে চলব? সেটা সত্যি হবে না কৃত্রিম কিছু হবে?

ঠিক এইখানেই ক্ষোভ পার্বতীর, এইখানেই ক্ষত। আর, ঠিক সেই কারণেই ফল বিপরীত। আগোচরে নিভৃতের এই ক্ষতটাই খুবলে এনে চোখের সামনে তুলে ধরা হল যেন। জ্বালা যেমন, গ্লানিও তেমনি।

পার্বতী আর একটা কথাও বলল না। দুই চোখে তার গোটা মুখখানা একবার ঝলসে দিয়ে সবেগে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

আপস হল না।

বনভূমির রঙ বদলাচ্ছে। কাছে দূরে যেদিকে চোখ যায় ঘন বন। বাংলো থেকে খানিকটা এগোলে পাহাড়ী ইনডং নদীর পরিখা। তার ওধারে ঘাস কাশ আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। তার পরেই শাল শিমুল গাম্ভারীর নিবিড় বন। সমস্ত বনভূমির শিরায় শিরায় নিঃশব্দ একটা ঋতু-লীলা শুরু হয়েছে। গাছের পাতায় নতুন-সবুজ আর কাঁচা-হলুদের শিহরণ লেগেছে। বাতাসের মৃদু সড়-সড়ানিতে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার ইশারা। আর সর্বদাই আমেজ-লাগা বুনো গন্ধ একটা। দূরের ধূসর পাহাড়ের সারিতেও যেন কাঁচা-সবুজের তুলি ঘষছে কেউ।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চিরকালের নাড়ির যোগ বুঝি। কিন্তু চারদিকের

এই ভরা মুহূর্ত থেকে শুধু পার্বতীই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কেমন করে। বোবা দ্রষ্টার মত দেখে চেয়ে চেয়ে। কি এক অগোচরের বোঝার ভারে বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠতে চায় থেকে থেকে। আর, সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু ক্ষোভে পার্বতী চোখ রাঙায় নিজেকে। দুর্বল অনুভূতিটা আছড়ে ফেলে সবলে মাড়িয়ে যেতে চায়।

সেদিনও ঝোলানো কাঠের পুল পেরিয়ে ঘাস-বন কাশ-বনের কাছাকাছি গিয়েছিল। কিছুদিন আগেও একা এদিকটায় আসত না বড়। এলে ঘরের লোকটার বকাবকি আর উপদেশ শুনতে হত। আর আসবে না কবুল করতে হত। ওই ঘাস-বনে আর কাশ-বনে হিংস্র জানোয়ারের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। অবশ্য লোক চলাচলের দরুণ এ ভয়টা ক্রমশই কমছে। পার্বতীর এক-একদিন ভারী লোভ হয়, ভিতরে ঢুকে পড়ে। এই নিঃশব্দ প্রাণ সমারোহের একটা নীরব আমন্ত্রণ আছে। পার্বতী না এসে পারে না। এলেও এখন আর বকাবকি বা উপদেশ শুনতে হয় না। এলে কেউ লক্ষ্যও করে না হয়ত।

বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। এ-প্রাচুর্যও বুকের ওপর বোঝার মত চেপে বসে। ঝোলানো পুল পেরিয়ে পার্বতী ফেরার পথ ধরল। বন্য জানোয়ারের ভয়ে রাতে ওদিক থেকে শিকল টেনে পুলটা তুলে রাখা হয়।

শাল তলায় হরিমতীর সামনে দাঁড়িয়ে জয়বাহাদুর হাত-মুখ নেড়ে তার সাহেবকে কি-সব বোঝাচ্ছে। পার্বতীকে দেখেনি তারা। তাদের অগোচরেই পাশ কাটানো যেত। হরিমতীর জন্যে গেল না। প্রভু-পত্নীকে দেখলেই সে শুঁড় কপালে তুলে সেলাম করবে। দিনের মধ্যে যতবার দেখবে ততবার। সেলামটা জয়বাহাদুরই শিখিয়েছে বটে, কিন্তু অমন নির্লজ্জের মত তোয়াজ করতে শেখায়নি।

শুধু সেলাম করে না, সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে হৃষ্ট চাপা শব্দও বার করে একটা। সেলাম দেখে আর শব্দ শুনে দু'জনেই একবার ঘুরে দেখল তারা। আর পার্বতী হরিমতীর উদ্দেশে নির্বাক কটূক্তি করল একটা।

হাত বাড়িয়ে রাজীব দু'খানা চিঠি দিল তাকে। চিঠি দুটো নিয়ে পার্বতী দু'পা এগিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা পোস্ট-কার্ড—বাবার। খামের চিঠিখানা কার ঠিক ঠাওর করতে পারল না। পোস্ট কার্ডটাই পড়ার মত করে দেখছে। কিন্তু পড়ছেও না, দেখছেও না। শুনছে। জয়বাহাদুরের কথা ক'টা কানে গেছে। তাই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জয়বাহাদুর সাহেবের কিছু একটা সংশয় নিরসনের চেষ্টা করছে। বলছে, বুনো মস্তি কোনো সন্দেহ নেই, অনেকে টের পেয়েছে, কেউ কেউ ডাকও শুনেছে—অবশ্য কাছে নয়, এই তল্লাটেও নয়, কিন্তু বুনো মস্তির কাছে দূর আর কত দূর?

রাজীব ব্যাসের মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছে এক। পোস্ট কার্ড পড়ার ফাঁকে পার্বতী লক্ষ্য করেছে। খুব সাবধানে থাকার নির্দেশ দিতে দিতে সে এগিয়ে গেল। জয়বাহাদুরও সঙ্গ নিয়েছে।

চিঠি দুটো হাতের মুঠোয় রেখে পার্বতী মুখ তুলল এবার। কেন সাবধানে থাকা

দরকার, কার জন্যে সাবধানে থাকা দরকাব পার্বতী জানে। এই পোড়ারমুখী হরিমতীর জন্যে। আস্তে আস্তে হাতীটার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে আর শুঁড় উচিয়ে সেলাম। জবাবে রাগের চোটে পার্বতী সত্যি সত্যি মুখ ভেঙচে উঠল তাকে। তারপর দেখতে লাগল। জয়বাহাদুরের চোখ নিয়েই খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল। আগেও করেছে। কিন্তু পার্বতী একটা হাতীর সঙ্গে আর একটা হাতীর তফাত বুঝে উঠতে পারেনি কিছুতে। আজও পারল না।

আজ হাতীটার ওপরেই কেন জানি বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে। পিছনের একটা পা মোটা শিকল দিয়ে শাল গুঁড়িতে বাঁধা। ইচ্ছা হল শেকলটা খুলে দেয়, ওদের চিন্তা ভাবনা করাটা বাব করে দেয়।

দু'বছর ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে, ওদের চিন্তা কেন পার্বতী জানে। বুনো মস্তির সমাচার তারও অজ্ঞাত নয়। পুরুষ হাতীর সঙ্গিনী লাভের মত্ততা জাগলে মাহুতেরা মস্তি বলে তাকে। মস্তি হলে পোষা হাতী পর্যন্ত উন্মত্ত পাগল। বুনো মস্তি তার দশগুণ ভয়াল, করাল। সঙ্গিনী লাভের তাড়নায় ক্ষিপ্ত আক্রোশে একটা গোটা বনভূমি লণ্ডভণ্ড করে বেড়ায। পোষা হস্তিনীর সন্ধান পেলেও তার পেল্লায শেকল ছিঁড়ে শুঁড় দিযে টেনে বা দাঁতের ঘায়ে ঘায়ে তাড়িযে তাকে বনে নিয়ে চলে যায়। অনিচ্ছুক সঙ্গিনীকে প্রাণে মেরে ফেলে পর্যন্ত।

পার্বতী বাংলোব বারান্দায় এসে বসল। এক ধরনের চাপা আক্রোশ আর চাপা উত্তেজনায় হাতের দ্বিতীয় চিঠিখানার কথা মনে ছিল না। মনে পড়ল। খাম না খুলে উটে পাল্টে দেখল। কার আবার!

এবারে সত্যিকারের উত্তেজনা। পার্বতী চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। কি আশ্চর্য, খামের লেখাটা দেখেই তার চেনা উচিত ছিল। কিন্তু লোকটাকে একেবারে গোটাগুটি ভুলে বসেছিল বলে মনে পড়েনি।

চিঠি অর্জুন নায়েক লিখেছে।

ধমনীর রক্তে একটা নতুন তরঙ্গ দেখা দিল। উদ্দীপনার আঁচ লাগল। নিঃশ্বাস ঘন হল। অনেক দিনের একটা নিষ্প্রাণ নিষ্ক্রিয়তার হঠাৎ যেন অবসান।

অর্জুন নায়েক লিখেছে মাস তিনেক হল আফ্রিকা থেকে ফিরেছে। আর তিন মাসে অন্তত তিনশ বার শুনেছে পার্বতীর কথা। সকলে বলাবলি করছে, সে নাকি বনদেবী হয়ে গেছে। বনদেবীকে একবার দেখার বাসনা। তার এবং মিস্টার লোটাসের আপত্তি না থাকলে দিন কয়েকের জন্যে সে ঘুরে যাবে। আফ্রিকার জঙ্গলে থেকে সেও জঙ্গল ভালো বেসে ফেলেছে।

অর্জুন নায়েক রাজীবের নামকরণ করেছিল মিঃ লোটাস। বলা বাহুল্য এর পিছনে ঈর্ষার জ্বালা কম ছিল না। রাজীব কথাটার অর্থ পদ্ম। পদ্ম স্ত্রী-বাচক কি পুরুষ-বাচক সশ্লেষে সেই সংশয় অনেক বারই প্রকাশ করতে দেখা গেছে তকে। শেষে শাণিত কৌতুকে নিজেই আবার সংশয় ঘুচিয়েছে লোটাসের সঙ্গে মিস্টার জুড়ে দিয়ে।

পার্বতী উঠে তখুনি কাগজ আর প্যাড এনে লিখতে বসে গেল। লিখল, তিন মাসে একটা বার খবর নাওনি বলে শাস্তি পেতে হবে। তোমার বীরত্বের ঝুলি এখনো শূন্য হয়নি নিশ্চয়, বীরের মতই শাস্তি নিতে চলে এসো। অবশ্য এসো। আমি সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকলাম।

কি ভেবে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলল। নতুন করে ওই এক কথাই লিখল আবার। শুধু 'আমির' বদলে লিখল 'আমরা'। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

রাজীবকে সংবাদটা দিল খাবার টেবিলে। নিস্পৃহ-মুখে বলল, অর্জুন চিঠি লিখেছে...কয়েক দিনের জন্য বেড়িয়ে যাবার ইচ্ছে। আসতে লিখে দিলাম।

রাজীবের বিস্ময় আর খুশি দুই কৃত্রিম মনে হল পার্বতীর। অথচ ভিতরে ভিতরে জানে ওটা নিজেরই মনের জ্বালা। লোকটা আর যাই হোক মুখোশ পরতে জানে না। আনন্দে আর উৎসাহে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ল সে। কবে আসছে? আফ্রিকা থেকে ফিরল কবে? একা আসছে না সস্ত্রীক? নাকি বিয়েই করেনি এখনো? কোথায় আছে এখন? কোথা থেকে লিখল?

পার্বতী একটা কথারও জবাব দিল না। ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়। খাওয়ায় মন দিয়েছে। কিন্তু আহার্য তেমন মন-মত হয়নি বলেই হয়ত ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা। অদূরে বাবুর্চি সশঙ্কে দাঁড়িয়ে। রান্নার জন্যে আজকাল রোজই প্রায় মেম সাহেবের ধমক খেতে হয়।

সাড়া না পেলেও রাজীবের উৎসাহ কমেনি। বলেছে, নিশ্চয় আসতে লিখবে। এভাবে আমারই হাঁপ ধরে গেছে, তোমার অবস্থা বুঝতেই পারছি, তবু ক'টা দিন ভালো কাটবে।

পার্বতী মুখ তুলে নির্লিপ্ত চোখে একবার তাকাল শুধু, তারপর আহারে মন দিল আবার।

দুপুরে একটু একটু ঘুমনো অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন ঘুম এল না। বিকেলে অনেকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে মানুষটাকে। কিন্তু এতটুকু চাপা অস্বস্তির আভাসও পায়নি। ফলে নিজেরই অন্তস্তলের দাহটা উগ্রতর হয়ে উঠেছে। ভাবতে চেষ্টা করেছে, সব অভিনয়। দুর্বল ভীরু কাপুরুষ কোথাকার! মস্ত শিকারী ছিলেন নাকি এক কালে। সব ভাঁওতা। শ্বশুর বাড়ির ঘরের আনাচে কানাচে শিকারের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু পয়সায়ও মেলে ওসব। উপহার দেবারও লোক আছে। রঙ্গু অবশ্য সাহেবের শিকারের গল্প অনেক করেছে। অনেক রোমাঞ্চকর গল্প। এ যাবত অনেক জঙ্গলসাহেবের সঙ্গে কাজ করেছে রঙ্গু কিন্তু এত অল্প বয়সে এমন স্নায়ুর জোর আর বুদ্ধির জোর সে দেখেনি। যত বিপদ তত যেন মাথা ঠাণ্ডা তার সাহেবের। সেদিন কিছুই অবিশ্বাস করেনি পার্বতী। বরং যতটা শুনেছে তার থেকেও বেশি বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করে উৎফুল্ল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তারপর ওই অর্জুন নায়েকের জ্বালাধরা ব্যাঙ্গের জবাব দিতে পেরেছিল। বাক্যবাণে ঝলমলিয়ে উঠতে দেখা গেছে তাকে, বলেছে, মিস্টার লোটাসের বন্দুকের মুখে পড়ে অনেক বুনো মোষ মাটি নিয়েছে, তুমি বাপু

একটু সামলে সুমলে চোলো, আর যা বলার আড়ালে বোলো—।

অর্জুন নায়েকের মুখ অপমানে কালো হয়েছিল।

কিন্তু রাগে আর বিতৃষ্ণায় আজ পার্বতীর নিজেরই সব কিছুতে অবিশ্বাস—লোকটার কাঁধে বাঘের গভীর থাবার দাগটাতেও। রঙ্গুর মুখে যে কালান্তক যমের মুখ থেকে ফেরার গল্প শুনে কতবার শিউরে উঠেছে—তাতেও। পিসীর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে শিকার ছাড়তে হয়েছিল নাকি। আর মরবার আগেও পিসী নাকি সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে গেছেন। এখন পার্বতী ভাবতে চেষ্টা করে, বাঘের ওই এক থাবাতেই শিকারের শখ গেছে, জাত শিকারীর অত সহজে শিকারের নেশা ছোটে না। বেঁচেছে, প্রতিজ্ঞা করতে পেয়ে চাকরির জাঁতায় নিশ্চিন্ত মনে মুখ গুঁজে দিতে পেরেছে।

পার্বতী ভাবছে, সত্যিকারের শিকারী হলে চোখ-কান সজাগ হত একটু। দুর্বল ভীরু কাপুরুষ না হলে খবরটা শুনে টনক নড়ত একটু। অর্জুন নায়েক আসছে শুনে অমন আগ্রহ দেখাত না। তারপরেও অমন নির্লিপ্তভাবে কাজে ডুবে থাকতে পারত না।

এই লোকটাকেই পার্বতী সদর্পে জীবন থেকে বাতিল করে দিয়ে এসেছিল একদিন। এই অর্জুন নায়েককে। পার্বতীর মামার বাড়ির দিক থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার যোগ ছিল একটু। কিন্তু সেটা এত দূরের যে স্বীকৃতির আওতায় পড়ে না। তবু সেটাই সযত্নে লালন করে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন পার্বতীর মা। তার মায়ের একান্ত সুনজরের পাত্র অর্জুন নায়েক। কিন্তু যা তিনি আশা করেছিলেন তা হল না। হল না বলে মায়ের এখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে বোধহয়।

অর্জুন নায়েকের স্বভাব চরিত্র নিয়ে পাঁচ রকমের ইঙ্গিত কানে আসত। শুনে পার্বতীর মা জ্বলে উঠতেন। তাঁর বদ্ধ ধারণা ওর হাতে মেয়ে গছাবার জন্য মেয়েদের মায়েরাই প্রশ্রয় দিয়ে জাল বিছোত। সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেই ছেলেটার যত দোষ আর যত দুর্নাম।

মায়ের ধারণাটা যে একেবারে মিথ্যা নয় পার্বতীও জানত। মেয়ে থাকলে ও-রকম ছেলের প্রতি মায়েদের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তার মায়ের আগ্রহটাও একই কারণে। লোকের বিশ্বাস নায়েকবাড়ির ঘর-দোর ঝাঁট দিলেও যে সোনা-দানা বেরুবে তা সাত পুরুষ বসে খেলে ফুরোবে না।

সোনার গায়ে কালি লাগে না। অর্জুন নায়েকের গায়েও লাগত না। অমন দুরন্ত বেপরোয়া সমস্ত তল্লাটে আর একটিও ছিল না। পার্বতীর মনে হত ছোটখাটো মূর্তিমান ঝড় একখানি। তেমনি আবার দাম্ভিক। তার সে দম্ভ কিন্তু পার্বতী চূর্ণ করেছিল। একবার নয়, দু বার।

প্রথম বার স্টীম লঞ্চের পার্টিতে। অর্জুন নায়েকেরই আয়োজন। তার ও-রকম খুশির জোয়ারে ঘরের অনেক সোনা ভেসে গেছে। পার্বতীর মায়ের চেষ্টাটা পুরোপুরি সফল হয়নি তখনো, আশার সঞ্চার হচ্ছিল শুধু। বাড়িতে যখন-তখন আসত যেত।

চোখে ঘোর লেগেছে বোঝা যেত। শেষ পর্যন্ত ওই ঘাটেই নোঙর ফেলবে ভাবত সকলে।

লঞ্চে ঢালা ব্যবস্থার সঙ্গে রাঙা জলের ব্যবস্থাও ছিল সেবার। মেয়েদের জন্যে ছিল সফট ড্রিঙ্ক। দেখা মাত্র পার্বতীর মেজাজ বিগড়েছিল। রঙিন-জলের ক্রিয়ায় সেই বিগড়নো মেজাজ আরো বেশি ভালো লেগেছিল অর্জুন নায়েকের। মাত্রাটাও ঠিক আয়ত্তের মধ্যে ছিল না হয়ত। বন্ধু-বান্ধবের তরল ইশারায় সকলের সামনেই পার্বতীকে একটু আদর করার বাসনা হয়েছিল তার।

না, ডুবে মরে নি অর্জুন নায়েক। কিন্তু মরতে পারত। বন্ধুরাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেছে। বন্ধুরাই শুধু নয়, খালাসী ক'জনও।

অর্জুন নায়েকের রঙিন নেশা ছুটে গিয়েছিল।

সকলে ভেবেছিল পার্বতীর মায়ের আশা ভরসা গেল। কিন্তু যা ভেবেছিল তার উল্টো হল। ভদ্রমহিলা এতদিন এত স্নেহের বন্যায় যা পারেননি, পার্বতী একবার তাকে জলে চুবিয়ে তাই করল। অনিশ্চয়তা বলতে গেলে ঘুচিয়েই দিল। রঙিন জলের নেশাটা হতে খড়িতেই বাতিল করে দিল অর্জুন নায়েক। তার থেকে আরো জোরালো নেশায় পেয়ে বসল তাকে।

পার্বতীর খারাপ লাগত না। দুরন্ত দুর্জয়কে পোষ মানানোর মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

যে-কোনো দিন একটা শুভ ঘোষণার প্রত্যাশায় ছিল সকলে। কিন্তু আবারও এক আচমকা বিস্ময়ে অবাক সবাই।

পার্বতীর বিয়েই বটে। কিন্তু অর্জুন নায়েকের সঙ্গে নয। পার্বতী মিসেস ব্যাস হতে চলেছে। মিসেস রাজীব ব্যাস।

কে লোকটা? ওই যে জঙ্গলে চাকরি করে গো-বেচারী গোছের লোকটা। মাঝে মাঝে পার্বতীর বাবার কাছে আসত, দু-একদিন থাকত। পার্বতীর বাবার প্রিয় ছাত্র ছিল শুনেছে। তার বেশি কিছু কেউ জানে না।

কিন্তু কেন? রাজীব ব্যাস কেন? অর্জুন নায়েক নয কেন?

কিন্তু তাও কেউ জানে না। এমন কি পার্বতীর মা-ও না। শুধু পার্বতী জানে আর অর্জুন নায়েক জানে আর লীলা জানে।

লীলা চতুর্বেদী।

পার্বতীর বান্ধবী, অনুরাগিনীও। লীলা চতুর্বেদী গোপনে এসেছিল তার কাছে। গোপনে কেঁদেছিল। আর পার্বতী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মুখটা মাটির সঙ্গে থেঁতলে দেয়। কিন্তু সে-রকম কিছু করেনি, শুধু বলেছে, যা এখান থেকে, আর তোর মুখ দেখতে চাইনে।

সেই রাতেই অর্জুন নায়েকের সঙ্গে দেখা করেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, স্টীম-লঞ্চে লীলাকে নিয়ে সফরে বেরুনোটা সত্যি কিনা।

জবাবের দরকার ছিল না। সেটা তার অতর্কিত-আক্রান্ত মুখেই লেখা ছিল। তবু

জোর দিয়েই জবাব দিয়েছে অর্জুন নায়েক,—ফ্রক-পরা খুকী নয় লীলা যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে জোর করে নিয়ে যাবে কোথাও। সে নিজেই বরং অনেক তোষামোদ করে সঙ্গিনী হয়েছিল।

তারপর?

কি তারপর?

আর কি কৈফিয়ত দেবে?

মুখ কালো করে অর্জুন নায়েক জবাব দিয়েছিল, কৈফিয়ত সে কাউকে দেয় না।

পার্বতী কৈফিয়ত চায়ও নি আর। এর দিন দশেকের মধ্যেই রাজীব ব্যাসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তার। সকলের বিস্ময় জুড়োবার আগেই। বাবা ভিতরে ভিতরে কোনো দিনই পছন্দ করতেন না অর্জুন নায়েককে। মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি নয় শোনার সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে ছাত্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আর একেবারে বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছিলেন।

অর্জুন নায়েক বিয়েতে এসেছিল। সদম্ভে হৈ-চৈ করেছে। নিজে এগিয়ে এসে রাজীবের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক পাতিয়েছে। করমর্দনের নামে সকলের সামনেই ধরে গোটা কতক ঝাঁকুনি দিয়েছে তাকে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে তার পরেই। —হি লুক্স সো সিম্পল্ সো ওয়ান্ডারফুলি গুডিগুডি—কি নাম জানি—ইয়েস রাজীব—মানে পদ্ম—লোটাস—বাট ম্যাসকুলিন অর ফেমিনাইন? কি শব্দ ওটা, স্ত্রী না পুরুষ? আই ওয়াণ্ডার! ওয়েল, লেট মি কল্ মিস্টার লোটাস—দ্যাট্ সল্ভস্।

এক পার্বতী ছাড়া সকলেই হেসে সারা। এমন কি রাজীব ব্যাসও হেসেছিল। তারপরও যে ক'দিন ছিল এখানে প্রত্যহ আসত। রাজীবের সঙ্গে অত হৃদ্যতা পার্বতীর ভালো লাগত না। দিল-দরাজ মুরুব্বীর মত অর্জুন নায়েক তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিত, আর বলত, বুকের ভিতরটা একেবারে সাহারা করে দিয়ে গেলে বন্ধু—বাট উইশ ইউ গুড লাক্—ভেরি ভেরি গুড লাক্! পার্বতীকেও বাহবা দিত, বলত, মেয়েরা লোক চেনে, কোথায় আধিপত্য খাটবে ঠিক বুঝে নেয়। আই অ্যাডমায়ার ইউ ম্যাডাম।

রঙ্গুর মুখে শিকারের গল্প শোনার পর একদিনই মনের মত জবাব দিতে পেরেছিল পার্বতী। সেই বুনো মোষের জবাব।

বিয়ের মাস দুয়ের মধ্যে খবর পেয়েছিল অর্জুন নায়েক আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছে।

দু'বছর বাদে এই চিঠি।

অর্জুন নায়েকের কথাবার্তা চাল-চলন বদলায়নি। তামাম দুনিয়ায় একমাত্র সে-ই যেন মাটির ওপর দুটো পা ফেলে চলা ফেরা করছে। তবু আগের থেকে কিছু একটা তফাত উপলব্ধি করছিল পার্বতী। বাইরে থেকে আনন্দের ঢেউগুলো যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলুক মূল উৎসটার কোথায় একটু টান ধরেছে।

প্রাথমিক হৈ-চৈ অভ্যর্থনা আপ্যায়নের পর রাজীব ব্যাস কাজে বেরিয়েছে। লাঞ্চের আগে ফিরবেই কথা দিয়ে গেছে। বাংলোর বারান্দাতেই পার্বতী মুখোমুখি বসল অর্জুনকে নিয়ে। ঘরে গিয়ে বসা যেত, কিন্তু এই দু'ঘন্টার মধ্যেই ঘরের পরিসর কেমন ছোট মনে হল পার্বতীর।

অর্জুন সরাসরি চেয়ে দেখছে তাকে। এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্তে দেখার অবকাশ পেল। এ দেখার মধ্যে ছলনা নেই, দেখার স্তুতির মধ্যে ভেজাল নেই।

পার্বতীর খারাপ লাগছে না খুব। নারীর রূপ পুরুষের নিত্য নতুন আবিষ্কারে সার্থক। ঘরের লোকটার সে আবিষ্কারের চোখ নেই। জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

বনদেবী।

বুনো হয়ে গেছি?

না, একটু বন্য গোছের হযেছ। গায়ের রঙ শামলা হয়েছে, বয়েস কমেছে, আগের থেকে ঢের ঢের তাজা দেখছি—ভালই তো আছ তাহলে, তোমার মায়ের অত দুঃখ কেন?

পার্বতী হাসছিল, থমকে তাকলে তার দিকে। তিন চারমাস আগে মা এসেছিল। মাস খানেক ছিল। মা যা দেখার দেখে গেছে যা বোঝার বুঝে গেছে। জামাইযের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে যাওয়ারও ইচ্ছে ছিল তার। মেয়ের ভ্রূকুটি দেখে পারেনি। অবজ্ঞা সইবে পার্বতীর, অনুকম্পা অসহ্য—জামাইকে কিছু বলা মানেই তার অনুকম্পা ভিক্ষে করা।

কিন্তু মা যে সেটা বাইরেও এভাবে বলে বেড়াবে ভাবেনি। মায়ের বলার ধবন জানে। হয়ত বলেছে, মেয়ের জীবনটাই অযোগ্য হাতে পড়ে বরবাদ হযে গেল। পার্বতীর কেমন মনে হল, মায়ের মুখে দুঃখের কথা শুনেই একটা চাপা উল্লাসে লোকটা দেখতে এসেছে তাকে। আর দুঃখের আভাস না পেয়ে ভিতরে ভিতরে নিরাশ হয়েছে একটু।

বলল, মায়ের কথা ছেড়ে দাও, ভালো থাকব না কেন?

অর্জুন নায়েকের চোখ দুটো তার গায়ের ওপর আর মুখের ওপর আটকে আছে যেন। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি ভালো আছ?

পার্বতী সদর্পে ফিরে তাকাল, কি দেখছ, ভালো নেই?

জবাবে অর্জুন নায়েক হাসতে লাগল অল্প অল্প। তারপর বলল, দেখলে তো চোখ ফেরানো যায় না, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেই তো কেউ?

স্থানীয় লোকদের জলা থেকে আচমকা খপ্ করে এক-একটা জ্যান্ত মাছ তুলে ডাঙার ওপর ছুঁড়ে দিতে দেখেছে পার্বতী। এই লোকটাও যেন ঠিক তেমনি তৎপরতায় বুকের ভিতরের জ্যান্ত ক্ষতটা খপ করে তুলে নিয়ে তারই মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলে। মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে আলাপ এ পর্যায়ে আসবে একবারও ভাবেনি। কিন্তু এত দুর্বল লাগছে কেন পার্বতীর, বিয়ের আগের সেই জোরটাই যেন হারিয়ে গেছে।

ছদ্ম কোপে চোখই রাঙাল তবু, দেখো ভালো হবে না—আমার রাগ মনে নেই

বুঝি? বোসো বাবুর্চিটাকে একবার তামিল দিয়ে আসি।

তামিল দেবার জন্যে ভিতরে এসে পার্বতী দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। —মনে হল, মা তাকে দেউলে করে দিয়েছে একেবারে।

বিকেলের দিকে ঝোলানো পুল পেরিয়ে ঘাস-বনের দিকে এল দু'জনে। পার্বতী এর মধ্যে অনেক কথা বলেছে, অনেক হেসেছে। কিন্তু অর্জুন নায়েকের চোখের আওতা থেকে কিছুতে যেন ছাড়িয়ে নিতে পারছে না নিজেকে। খুব যে চেষ্টা করছে তাও না। নিজেরই অন্তস্তলের কোথায় যেন প্রশ্রয় আছে একটু। স্মৃতির জাল ফেলে নিজেকেই উদ্ধার করার মত লাগছে। ও যেন হারিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু অর্জুন নায়েকের দৃষ্টি-ভোজের সঙ্গে রসনার যোগটা বরদাস্ত করা সহজ হচ্ছিল না। সে যেন প্ল্যান করেই স্তুতির দিকটা বেছে নিয়েছে। পার্বতীর দাবড়ানী খেয়ে অর্জুন নায়েক দুপুরে হেসেছিল। রাজীবকেই সালিশ মেনেছিল, মহৎ আর্ট মাত্রেই স্তুতি কি না বলো!

রাজীবের নির্বোধ সমর্থন শুনে গা জ্বলছিল পার্বতীর। রাজীব বলেছে, নিশ্চয়, নিশ্চয়—!

কাজেই যতটা সম্ভব এখন একাই অনর্গল কথা বলছিল পার্বতী। জঙ্গলের গল্প করছিল, গাছ-গাছড়া পশু পাখির গল্প। কিন্তু গল্প যেন দ্রুত নিঃশেষ হবে আসছে। সে থামলেই সঙ্গীর বদ্ধ মুখ আলগা হবে। সে অবকাশ না দিয়ে ফেরার পথে পার্বতী জিজ্ঞাসা করে বসল, লীলার খবর কি বলো, কেমন আছে?

যাক্ পার্বতী অব্যাহতি পেল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিটাও বদলেছে একটু। হাসির আভাসটুকুও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হল না খুব। নির্লিপ্ত জবাব দিল, খবর নেই কিছু, একরকমই আছে।

দেখা হয়?

হয় না। সে করে।

বেচারী! মেয়েটাকে অত ভোগাচ্ছ কেন?

যে যার বরাতে ভোগে। একটু থেমে অর্জুন নায়েক বলল, তুমিও খুব সুবিচার করোনি আমার ওপর, তোমাকে যা সে বলেছিল তার সবটাই অন্তত সত্যি নয়।

পার্বতী থমকাল। —কি বলেছিল তুমি জানলে কি করে?

তোমাকে যা বলেছিল তা সে আর একটি মেয়েকেও বলেছে।

সেই আর একটি মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলে?

না। তবে লীলা তাই ভেবেছিল...।

লীলার সেই কথা সত্যি কি এখনকার এই কথাগুলো সত্যি আগে হলে পার্বতী তার চোখে চোখ রেখেই বুঝে নিতে পারত। কিন্তু এখন সে চেষ্টাও করল না। এই লোকটার ওপর সে অবিচার করেছে তাই বিশ্বাস করতে ভালো লাগল। ভাবতে ভালো লাগল। লীলাটা অতি নীচ।

বাড়ি এসে অকারণে ছট্‌ফট্ করল খানিকক্ষণ। যেন কারো নীচতার মাশুল তাকেই

দিতে ইচ্ছে। আরদালি খানসামাগুলোকে প্রায় অকারণেই বকাবকি করল একপ্রস্থ। রাতে খাবার টেবিলে রাজীবকে শুনিয়ে অতিথিকে বলল, আমি তোমার সঙ্গেই গিয়ে মায়ের কাছে দিন কতক থেকে আসব কিনা ভাবছি।

অর্জুন বলল, অনুমতি মেলে তো চলো।

শুনে যে-ভাবে তাকাল পার্বতী তার একমাত্র অর্থ, তাকে অনুমতি দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে এমন মানুষের সে ঘর করেছে না।

অতিথির আদর অভ্যর্থনার কোথাও ত্রুটি রাখেনি রাজীব ব্যাস। সে নিজে দেখা শুনার খুব সময় না পেলেও পরিচর্যা-রত লোকেরা তটস্থ। কোথাও কোনোরকম অসুবিধে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি সকলের।

সেদিন অর্জুন নায়েকই বলেছিল, তোমার ওই পাঁচটা জমাদার আর তিনটে আরদালির তোষামোদে কাজ নেই আমার। ওদেরও রেহাই দাও, আমিও বাঁচি। যে ক'দিন আছি তোমার গিন্নিটিকে শুধু আমার হেপাজতে ছেড়ে দিলেই হবে।

বলার মত করে বলতে না পারলে রসিকতাটা কানে লাগত। কিন্তু অর্জুন নায়েক বলার মত করেই বলেছে। রাজীব ব্যাস হেসে জবাব দিয়েছে, সেই সঙ্গে বাড়তি কিছু দিচ্ছিলাম—

অর্জুন নায়েক মাথা ঝাঁকিয়েছে, আই ডোণ্ট রিকোয়ার বাড়তি।

ফিরে ঠাট্টাই করেছে রাজীব, আমার দিক থেকে সেটা ভয়ের কথা না?

পরিহাসের এই সামান্য ইঙ্গিতটা নিযেই রাত্রিতে তাকে অনেক ঝাঁঝালো কথা শুনিয়েছে পার্বতী। প্রায় অপমানকর কথা। রাজীব অবাক প্রথমটা, শেষে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়েছে।

একটা করে দিন যায়, আর মেজাজ চড়ে পার্বতীর। সকাল বিকেল দু'বেলাই অর্জুন নায়েকের সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। তার দুপুরের অবকাশও অনেকটাই সে-ই দখল করেছে। ক্রমশ কি একটা মোহ যেন পেয়ে বসছে তাকে। সকালে ফিরে এসে ভাবে বিকেলে আব যাবে না, বিকেলে ভাবে পরদিন আর না। কিন্তু সকলের চোখের ওপর দিয়েই ওই লোকটার অনাবৃত প্রতীক্ষা যেন অতি সহজে টেনে নিয়ে যায় তাকে। ফিরে এসে কর্মরত মানুষটাকে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। এতটুকু প্রতিক্রিয়ার আঁচ পেলে পার্বতী জ্বলে উঠতে পারে, ঝলসে উঠতে পারে।

কিন্তু তাও পায় না। দাহ শুধু জমে। একদিনের দাহর ওপর আর একদিনের দাহ।

ফিরে এলে রাজীব বড় জোর খোঁজ খবর নেয়, কোথায় বেড়াল, কোন্ পর্যন্ত গিয়েছিল। সেও তাকে নয়, অতিথিকে জিজ্ঞাসা করে। সতর্ক করে দেয়, ও দিকটায় যেও না—সে দিকটা ভয়ের। তার কথা শুনলে এক শাল বনের লোকালয়ের দিকটা ছাড়া আর কোনো দিকে পা বাড়ানো চলে না।

অর্জুন নায়েক হেসে উড়িয়ে দেয়, বনে জঙ্গলে বাস করেও তুমি আচ্ছা ভীতু দেখছি।

পার্বতীও একদিন ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। গম্ভীর, অনুশাসনে অর্জুন নায়েককে চোখ পাকিয়েছিল, ভীত বোলো না, মস্ত শিকারী ছিল, তাই ভয়ের ঘাটি গুলো মখস্থ একেবারে।

এই বেড়ানোর ব্যাপার নিয়েই দুর্যোগ সেদিন।

দু'জনে ঝোলানো পুলের উত্তর দিকের রাস্তা ধরে সামনের ছোট পাহাড়টায় গিয়ে উঠেছিল সেদিন। পার্বতী নিষেধ করা সত্ত্বেও অর্জুন নায়েক শোনেনি। সামনে বলতেও মাইল দেড়েক দর।

দু'জনে যতটা সম্ভব উঠেছে। সীমানা লঙ্ঘন করতে পেরে পার্বতী খুশিতে আটখানা। ঘেষাঘেষি করে পাহাড়ে উঠেছে। অর্জুন নায়েক হাত ধরে আটকে না রাখলে আরো উঠত। একটা বড় পাথরে বসে তার হাতের উপরেই দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে হাঁপিয়েছে খানিকক্ষণ আর হেসেছে। দু'জনে হাত ধরাধরি করেই নেমেছে তারপর। নামার ধকলে পার্বতী হেসে আকুল আরো। তার ফলেই পদস্খলন হতে পারত, অঘটন ঘটতে পারত। অর্জুন নায়েক শক্ত হাতে আগলে রেখেছে তাকে। তাকে নিরাপত্তার বেষ্টনে এমনি আগলে রাখার গুরু দায়িত্বটা যেন শুধু তারই। তাতেও ভ্রূ-ভঙ্গি আর হালকা তর্জন করতে ছাড়েনি পার্বতী, বলেছে, তোমার মতলব ভালো না, আমি ঠিক নামছি।

খব স্বাভাবিক উচ্ছলতা নয়। নয় বলেই আর এক জোড়া চোখ খুশিতে কতটা চকচকিয়ে উঠেছে পার্বতী দেখেও দেখল না।

পার্বতীর নেশা ধরেছিল। নেশা ছুটে গেল।

নিচে টাঙ্গি হাতে বঙ্গ দাঁড়িয়ে। নির্বিকার, নির্লিপ্ত।

দু' দশ হাত নামতে বাকি তখনো, পার্বতীর কাঁধ সঙ্গীর নিরাপত্তার বেষ্টনে শাহ নয় তখনো। থমকে দাঁড়িয়ে গেল পার্বতী। দু চার মুহূর্ত। সঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে শান্ত পদক্ষেপে আগে আগে নেমে এল।

বঙ্গ জানালো, মেম সাহেব আর নতুন সাহেব এদিকটায় এসেছেন শুনে সাহেব তাকে পাঠিয়েছেন। দিন কয়েক আগে এই পাহাড়টায় ভালুক দেখা গেছে।

তাকে বিদায় দিয়ে দু'জনে বাংলোর দিকে ফিরেছে। সমস্ত পথ একটিও কথা বলেনি পার্বতী। বাড়ির কাছে এসে অর্জুন নায়েক আরো খানিক হাঁটার জন্যে শালতলা দিয়ে এগিয়ে গেছে। পার্বতী সোজা বাংলোয় এসে উঠেছে।

তার সে মূর্তি দেখে রাজীব ব্যাস অবাক। কথা শুনে স্তম্ভিত। কথা নয়, এসেই পার্বতী যেন তরল আগুন উদ্গীরণ করল একপ্রস্থ। তুমি এভাবে লোক লাগিয়ে রেখেছ কেন পিছনে?

রাজীব ব্যাস হতভম্ব। জঙ্গল ফেরত দুটো লোকের মুখে শুনে বঙ্গুকে পাঠিয়েছিল সেকথাও বলা হল না।

পার্বতীর শোনার ধৈর্য নেই। সে কৈফিয়ত নিতে এসেছে। চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল আবারও, আমি জানতে চাই কেন তুমি এভাবে লোক লাগিয়েছ পিছনে? পাহাড়ে যার আগে থাকতেই জেনে বসে বঙ্গুকে পাঠিয়েছ ভালুক তাড়াতে কেমন?

ঘৃণায় বিদ্বেষে দু'চোখ ধক্‌ধকিয়ে উঠেছে পার্বতীর। রাজীব ব্যাসের দিশা ফিরল যেন। স্থির চোখে দেখল খানিক। কাছে এগিয়ে এল তারপর। খুব কাছে। তার দুই কাঁধে দু'খানা হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল পার্বতী। কিন্তু পারল না, হাত দুটো যেন থাবার মত কাঁধে বসে গেছে।

কি বললে?

পার্বতী আবারও তার মুখের ওপর তরল আগুন ছিটোল এক ঝলক।—কি বললাম তুমি বোঝো নি?

বুঝেছি। আর বোলো না। অনেক নীচে নেমেছ।

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে রাজীব ব্যাস বাইরের বারান্দায় এসে বসল। ঘরের মধ্যে পার্বতী দাঁড়িয়ে তেমনি। কাঁধ দুটো জ্বালা করছে। ভিতরটাও জ্বলছে।

পরদিন। সকালে রঙ্গুকে নিবিষ্ট মনে বাইরে বেরুনোর সরঞ্জাম গোছাতে দেখে পার্বতী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এই গোছানোর অর্থ ভালই জানে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়া হবে?

রঙ্গু জানাল সাহেব জঙ্গলের কাজে বেরুচ্ছেন।

ক'দিনের জন্যে?

রঙ্গু জানে না ক'দিনের জন্যে।

সোজা অফিস-ঘরে এসে ঢুকল পার্বতী। ঘরে লোক রয়েছে, তুমি বাইরে বেরুচ্ছ মানে?

ওদিকের দরজা দিয়ে অর্জুন নায়েকও শিস দিতে দিতে এসে হাজির। কাগজ-পত্র গোছাতে গোছাতে রাজীব ব্যাস্ হেসেই জবাব দিল, ঘরে লোক রয়েছে বলেই তো বেরুনো যাচ্ছে—তোমাকে নিয়েই তো সমস্যা।

অর্জুন নায়েকের নির্ভেজাল বিস্ময়, সে কি হে, হঠাৎ জরুরী কিছু নাকি?

রাজীব ব্যাস বলল, তুমি না এসে গেলে এর মধ্যে অন্তত বার দুই বেরুতে হত। হেসে পার্বতীর দিকেই হালকা ইঙ্গিত করল একটা, বেরুবার কথা শুনলেই মুখের ওই অবস্থা...।

দাঁড়িয়ে নিজের মুখের অবস্থার কথা শোনবার অভিরুচি নেই পার্বতীর। একটা কথা বলারও না। গত কালের জের টেনে এমন ভীরু প্রতিশোধ নিতে পারে কল্পনাও করেনি। কাজের আড়ালে পালাচ্ছে লোকটা। পালিয়ে বিশ্বাসের উদারতা দেখাচ্ছে।

দুপুরে তার যাবার আগেও বাইরে আসেনি পার্বতী। অর্জুনকে ঘরে ডেকে নিয়ে গল্প করেছে সেই থেকে। রাজীব নিজেই এল। জানাল, দিন দুইয়ের মধ্যে ফিরবে। যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। বরাবরকার মতই পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করল, কি আনব বলো, চাই কিছু?

পার্বতী ফিরেও তাকায়নি আগে। এবারে তাকাল, চাউনিটা সরাসরি তার মুখের ওপর বিঁধিয়ে দিল যেন। তারপর বলল, চাই। জ্যান্ত বাঘের বাচ্চা একটা। আনবে?

অর্জুন নায়েক হেসে উঠল। রাজীব ব্যাস হকচকিয়ে গিয়েছিল। একজনের হাসির

আশ্রয় পেয়ে সেও হাসতে চেষ্টা করল একটু। তারপর বেরিয়ে গেল।

দুটো দিন নিরুপদ্রবে কাটে। এত নিরুপদ্রবে কাটবে পার্বতী আশা করেনি। অতিথি অভ্যর্থনায় কোনোরকম ত্রুটি ঘটেনি বটে, কিন্তু সকালে বিকেলে একাই বেড়াতে বেরুতে হয়েছে অর্জুন নায়েককে। পার্বতী জোরালো কৈফিয়তও দিতে পারেনি কিছু। কিন্তু অর্জুন নায়েক পীড়াপীড়ি করেনি! তার হাতে যেন অখণ্ড অবকাশ। তার তাড়া নেই কিছু।

তৃতীয় দিন সকাল হতে পার্বতী নিশ্চিন্ত কিছুটা। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জ্বালা। যে লোকটা এভাবে দু'দিন দু'রাত ফেলে রেখে যেতে পারল তাকে, আজ তার মুখ দেখতেও বিতৃষ্ণা। দু-দুটো রাত পার্বতীর চোখে ঘুম ছিল না। ঘরের সব ক'টা দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। তন্দ্রার মধ্যেও দু'কান সজাগ ছিল।

কিন্তু সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল—লোকটার দেখা নেই। বিকেলে আসবেই ধরে নিয়ে বেড়াতেও বেরিয়েছিল।

এল না।

অবসন্নের মত বারান্দার একটা চেয়ারে বসে পড়ল পার্বতী। আর তার নিজেকে রক্ষা করার দায় নেই, সামর্থ্যও নেই। একটা চেয়ার টেনে অর্জুন নায়েকও গা ঘেঁষে বসেছে। তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। পার্বতী বাধা দিতে পারেনি। হাতের ভিতর দিয়ে একটা পিচ্ছিল অনুভূতি সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করেছে। তবু না। পার্বতী ভাবতে চেষ্টা করেছে, একদিন এই লোকটাকেই সে স্টীম লঞ্চ থেকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তবু না।

ঠিক এমনি এক অনুকূল মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিল বুঝি অর্জুন নায়েক। দু'দিন আগে হোক্ পরে হোক্ এই একটা মুহূর্ত আসবেই জানত যেন। মোলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ এত?

পার্বতী অস্ফুট জবাব দিল, কিছু না।

কিন্তু মুহূর্তটা আজও খুব অনুকূল নয় বোধহয়। অর্জুন নায়েক হেসে বলতে যাচ্ছিল কি। দূর থেকে অনেক লোকের একটা শোরগোল কানে আসতে বাধা পড়ল। শোরগোলটা ঝোলানো পুলের দিকে। বহু লোক একসঙ্গে হৈ হৈ চিৎকার চেঁচামেচি করছে, সজোরে টিন আর কানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কি ব্যাপার না বুঝে দু'জনেই বাংলো থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় পার্বতীর বুকের ভিতরটা কাঁপছে।

প্রায় পনের বিশ মিনিট ধরে চলল এমনি হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি টিন-বাজানো।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে দু'চোখ কপালে তুলে জয়বাহাদুর এসে খবর দিল, পরিখার ওধার থেকে একটা বিরাটকায় বুনো মস্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এধারে আসার মতলব আঁটছিল। অনেক করে ওটাকে তাড়ানো হল।

খবরটা দিয়েই হরিমতীর নিরাপত্তার ব্যবস্থায় ছুটল সে। সাহেব সেদিন তাকে ডবল শেকল লাগাতে বলে গিয়েছিলেন।

অর্জুন নায়েকের কিছুই বোধগম্য হয়নি। জিজ্ঞাসা করল, মস্তি কী?

পার্বতীব সম্বিত ফিরেছে। কিন্তু একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কেটেছে মাত্র, কাঁপুনি থামেনি। ক্ষুদ্র জবাব দিল, কাল শুনো। শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি শুযে পড়ছি। তুমি খেয়ে নিও।

কিন্তু এ রাতেও চোখে ঘুম নেই পার্বতীর। বদ্ধ দরজার ওধার থেকে আজ পায়েব শব্দ কানে এসেছে অনেকবার। কাঠের মেঝে ধরে শব্দটা দরজার কাছে এসে এসে থেমেছে। বদ্ধ দরজার ওধারে একটা সর্বগ্রাসী সরীসৃপের নিঃশ্বাস যেন অমোঘ আকর্ষণে টানছে তাকে। ঘা পড়লে পার্বতী নিজেই হযত দরজা খুলে দেবে।

ঘা পড়েনি।

পরদিন। সকালের প্রথম দর্শনে অর্জুন নায়েক নির্নিমেষে তাকে খানিক দেখল চেয়ে চেযে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি হযেছে?

সকালের আলোয পার্বতীর জোর বেড়েছে একটু, তবু সুস্থ বোধ করছে না খুব। লোকটাব দৃষ্টি অসহিষ্ণু, অনাবৃত।

পার্বতী অসুস্থতার কথা বলে পাশ কাটাল।

আবারও সকাল গিয়ে দুপুব গড়াল একটা। এখনো দেখা নেই ঘরের একজনের। সমস্ত দুপুর আরদালি দুটোকে নিয়ে ঘর ঝাড়া মোছা করিযেছে পার্বতী। কিন্তু রাতে কি করবে?

আজ বন্ধ দরজায় ঘা পড়বে, পার্বতী এক নজরে বুঝে নিযেছে।

হঠাৎ এক অন্ধ আক্রোশ নিজেকেই জ্বালিয়ে পুড়িযে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে চাইল সে। নিজেকে রক্ষা করাব জন্যে এমন একটা হাস্যকর তাগিদ কেন তাব? কার জন্যে কার কাছ থেকে রক্ষা করবে সে নিজেকে? দরজা বন্ধই বা রাখবে কেন? কার জন্যে? আর, এই লোকটারই বা দোষ কী? সে যদি আব কারো মত অন্ধ না হয, তার অপরাধটা কোথায়? পার্বতী নিজেই তো মোহ ছড়িয়েছে, জাল বিছিয়েছে!

ধমনীর রক্তে উষ্ণ স্রোত বইছে একটা। নিজের অবুঝপনায নিজেরই সর্বাঙ্গ জ্বলছে পার্বতীর। হাসিও পাচ্ছে। হাসি মুখেই বাইরে আসছিল। হাসি মুখেই অর্জুন নায়েককে জিজ্ঞাসা করবে, কি গো, সেই থেকে মুখখানা অমন করে বসে আছ কেন?

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই কাঠ একেবারে। রঙ্গু ফিরেছে। তার সামনে মাল পত্র। উস্ক-খুস্ক মূর্তি। একা রঙ্গুই, আর কেউ না।

আনত অভিবাদন জানিয়ে রঙ্গু কি বলতে যাচ্ছিল পার্বতী ডাকল ভিতরে এসো।

নিজের ঘরে এসে শয্যায় বসে পড়ল। আবারও অজ্ঞাত কাঁপুনি একটা। রঙ্গুব ওই মূর্তি দেখেই হয়ত। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাহেব কোথায়?

রঙ্গু জানাল, দূরের জঙ্গল থেকে সাহেব হেড-কোয়ার্টারএ গেছেন আগামী কাল এসে পৌঁছবেন।

আবার সমস্ত মুখ ধারালো কঠিন হযে উঠছিল পার্বতীর। কিন্তু তার আগেই রঙ্গু

অবসন্নের মত তার পায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়ল প্রায়। ধরা গলায় বলে উঠল, আর তুমি সাহেবের কাছে ও-রকম বায়না কোরো না মাইজি, সাহেব সত্যিকারের বীর, কিন্তু খোদ বীরেরও বিপদ হয় মাইজি, সাহেবেরও প্রাণ যেতে পাবত। সাহেব প্রাণের পরোয়া করেন না, কিন্তু তুমি আর কখ্খনো তাকে বিপদে ফেলো না মাইজি।

রঙ্গুর এই মূর্তি আর কখনো দেখেনি পার্বতী, এমন আকুতি আর কখনো শোনেনি। কখনো আর সে মাইজি বলেও ডাকেনি। পার্বতী চেতনাহত, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। তারপরেই ধক্ করে উঠল ভিতরটা কি যেন চাই বলেছিল সে? ....বাঘের বাচ্চা....জ্যান্ত।

আতঙ্কগ্রস্তের মত তাকাল রঙ্গুর দিকে।—কি হয়েছে?

স্থির নিস্পন্দের মত বসে শুনল কি হয়েছে। একদিনের মধ্যে দরকাবী কাজ সেরে সেই থেকে রঙ্গুকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুবছে। বঙ্গুকে বলেছে, বাঘের জ্যান্ত বাচ্চা চাই একটা —মেমসাহেবের বাযনা। বাতাস টেনে কোন্ জঙ্গলে বাঘ আছে তার সাহেব বলে দিতে পারে, কিন্তু কোথায কোন্ জঙ্গলে বাচ্চা নিয়ে বাঘ লুকিয়ে আছে জানবে কি করে! খুঁজে খুঁজে তারও হদিস বার কবেছে। এই খুঁজতে গিয়েই বাঘের হাতে সাহেবেব প্রাণ যেতে পাবত। দুটো বাচ্চা ছিল বাঘিনীটার। জাযগা মত নিচে ছাগল বেঁধে প্রায রাতভোব গাছে বসে কাটিযেছে দু'জনে। বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী সেযানা খুব, বাঁধা ছাগল ছোঁবে না। কিন্তু বঙ্গুর সাহেবও সেয়ানা কম নয়। ছাগলের পাযেব কালো দড়িটা গজালে বেঁধে সেটা মাটিব নিচ অবধি পুঁতে দিয়েছিল। দেখলে কেউ বুঝবে না বাঁধা ছাগল। রঙ্গুর হাতে রাইফেল ছিল সাহেবের হাতে টর্চ আর জালেব ফাঁস। প্রতিজ্ঞা করে শিকার করা ছেড়েছে বলে রঙ্গুকেও গুলি করতে নিষেধ কবেছে সাহেব, টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাবার জন্যে শুধু আশ পাশে গুলি চালাতে বলেছে।

বাঘিনী এসেছিল। মায়ের পাশে পাশে লাফাতে লাফাতে বাচ্চা দুটোও এসেছিল। একেবারে পুচ্কে বাচ্চা, মাযের সঙ্গে সবে বেরুতে শুরু করেছিল বোধহয। তারা টোপের কাছে আসতেই সাহেবেব সেই বন-ধাঁধানো টর্চটা ঝলসে উঠেছিল, আর হাতের জালের ফাঁস ছোঁড়া হযে গিয়েছিল। আলোর আর গুলির শব্দে হক্চকিযে গিয়ে বিকট গর্জন করে বাচ্চা নিয়ে বাঘিনী পালাবার আগেই একটা বাচ্চা জালের ফাঁসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল সাহেব।

কিন্তু বাচ্চা পেয়ে সাহেব কেমন যেন হয়ে গেল। আর টর্চ জ্বালা উচিত নয়, তবু টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগল, বাঘের বাচ্চা হলে কি হবে, বাচ্চা বাচ্চাই—একদম অসহায়। থর থর করে কাঁপছিল বাচ্চাটা। ওদিকে বাচ্চা খোয়া গিয়ে বাঘিনীটার সে কি গর্জন। বন তোলপাড় করে ফেলবে যেন। ...অনেকক্ষণ ধরে সাহেব একমনে সেই ডাক শুনল আর বাচ্চাটাকে দেখল। তারপর হঠাৎ বলল, ওটা ছেড়ে দেব।

শুনে রঙ্গু অবাক। কিন্তু সাহেবের যে-কথা সেই কাজ। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে বাঘিনীটাকে বাচ্চা কোথায় আছে সেই নিশানা দেখাতে লাগল যেন। বাচ্চার খোঁজে বাঘিনী আসবেই জানে। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করেও আসবে। ঠিক এল। অদূরে গর-গর শব্দ শোনা

গেল একটু বাদে।

সাহেব বাচ্চা ছেড়ে দিল।

স্তব্ধ মূর্তির মত কতক্ষণ বসেছিল পার্বতী ঠিক নেই। রঙ্গু পায়ের কাছে তেমনি বসে চুপচাপ।

চমক ভাঙল একসময়। রঙ্গুকে বিশ্রাম করতে বলল। আর রাতে তাকে বাংলোতেই থাকতে বলল।

রঙ্গু চলে যেতে মনে হল, দরকার ছিল না। আজ আর যেন কিছুরই দরকার নেই। রাত্রিতে ঘরের দরজা বন্ধ করারও দরকার নেই। পার্বতীর অবসাদ কেটে গেছে, আচ্ছন্নতা কেটে গেছে—জ্বালা যাতনা সব গেছে। কেউ যদি আসেও, স্টীম বোট থেকে জলে ঠেলে ফেলে দেবার মত করে আজও এই দুটো হাতেই তাকে বাংলো থেকে ঠেলে নামিয়ে দিতে পারবে সে।

সে রকম দরকার হল না। তার আগেই শাল-তলায় খণ্ড প্রলয় একটা।

রাত দশটাও নয় তখন। কিন্তু জঙ্গল এলাকার নিশুতি রাত সেটা। গত সন্ধ্যার সেই বুনো মস্তি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে আজ সশরীরে একেবারে শালতলায় এসে হাজির। পরিখার কাঠের গজাল আর তক্তাগুলো পা দিয়ে ভেঙে, মাটি ঠেলে গর্ত ভরাট করে এপারে উঠেছে। তাকে ফেরানো সহজ নয়।

গত সন্ধ্যার চতুর্গুণ চেঁচামেচি আর হট্টগোল আজ। কিন্তু চেঁচামেচি আজ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। ওই ভীষণ দাঁতাল ক্ষেপে গিয়ে যে-দিকে দৌড়বে সে-দিক ধ্বংস। এমনিতেই উন্মত্ত। টিন বাজছে, কানেস্তারা বাজছে, ঢোল বাজছে, সম্মিলিত কণ্ঠস্বর আকাশ ছুঁয়েছে, মশাল জ্বালা হয়েছে, রঙ্গুরা এধার থেকে সেই জোরালো টর্চ ফেলে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে তাকে। কিন্তু সব বৃথা।

উন্মত্ত গর্জনে হাতীটা গোটা এলাকা কাঁপিয়ে তুলেছে এক-একবার। বিপুল বলে হরিমতীর পায়ের শিকলটা টেনে ছিঁড়তে চাইছে। আর মত্ত আক্রোশে এক-একবার চেষ্টা করছে দাঁতে তুলে হরিমতীকে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে। ভয়ে ত্রাসে আত্মরক্ষার তাগিদে হরিমতীও আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে।

একটা শিকল ছিঁড়ল। আর একটাও যে ছিঁড়বে কোনো ভুল নেই। ওধার দিয়ে ঘুরে জয়বাহাদুর দিশেহারার মত ছুটে এসে বাংলো থেকে বন্দুক নিয়ে গেল।

বারান্দায় সিঁড়ির মুখে পার্বতী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এতবড় ব্যাপারটা দেখেও কালকের মত বুকের ভিতরে কাঁপুনি ধরেনি অমন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে শুধু। পাশে গা ঘেঁষে অর্জুন নায়েকও দাঁড়িয়ে। পার্বতী ভয় পাচ্ছে তবে এক হাতে তার বাহু বেষ্টন করে আছে। পার্বতী ঘাড় ফিরিয়ে তাকে শুধু দেখেছে একবার। ভয় পায়নি। বাধাও দেয়নি।

বন্দুক নিয়ে জয়বাহাদুর কি করবে এখন পার্বতী জানে। একটাই উপায়। দ্বিতীয় শেকলটা ছেঁড়ার আগে বুনো হাতীটার কান ফুটো করে দিতে হবে। অন্যথায় হরিমতীকে নিয়ে যাবেই ওটা, তাকে রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু সে চেষ্টা করতে হলেও কাছে

এগোনো দরকার। কে এগোবে! বন্দুক নিতে দেখে পার্বতী বুঝল জয়বাহাদুর এগোবে। প্রাণ গেলেও হরিমতীকে এ-ভাবে ছেড়ে দেবে না সে।

শাল-তলার দিকে জয়বাহাদুরের চিৎকার শোনা গেল একটা। সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছে সে, তফাতে হটতে বলছে। খুব সম্ভব ওই শালগুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়েই গুলি করেছে তারপর। পর পর চারবার। দুই কানই ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

প্রথম গুলির ঘায়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বুনো হাতীটা। তারপর যন্ত্রণায় আকাশ ফাটানো হুঙ্কারে পরিখার দিকে ছুটেছে। সেই গাঁ-গাঁ হুঙ্কারে গোটা বনভূমি কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

নিজের অগোচরে অর্জুন নায়েক কাঁধের ওপর আঙুলের চাপে আরো একটু কাছে টেনে নিয়েছে পার্বতীকে। পার্বতী আবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে তাকে। এবারেও বাধা দেয় নি। তারপর পরিখার দিকে তাকিয়েছে। বুনো হাতীটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ছিল। পরিখার ওধারে জঙ্গলের মধ্যে ওটার হুঙ্কার না মিলানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।

তারপর কাঁধ থেকে তার হাত সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আস্তে আস্তে। ভয় করছে?

অর্জুন নায়েক এ-প্রশ্ন আশা করে নি। কোনো পুরুষ আশা করে না। শান্ত কণ্ঠে পার্বতী ডাকল, এসো—।

বারান্দায় চেয়ার দেখিয়ে বলল, বোসো।

পার্বতীর হাব-ভাব হঠাৎ কেমন যেন লাগছে অর্জুন নায়েকের। দুর্বোধ্য লাগছে। বসল। পার্বতী সামনে দাঁড়িয়ে।

—কাল মস্তি কি জিজ্ঞাসা করছিলে, দেখলে?

অর্জুন নায়েক চেয়ে আছে।

স্থির চোখে পার্বতীও। একটু থেমে আবার বলল, কান ফুটো না করে দিলে বুনো মস্তি শায়েস্তা হয় না। জয়বাহাদুর ছাড়ার লোক নয়, সে হরিমতীকে ভালবাসে—কান ফুটো করে দিয়েছে।

অর্জুন নায়েক হাঁ করে চেয়ে আছে পার্বতীর দিকে, সহজ কথাগুলোও ততো সহজ লাগছে না যেন।

পার্বতীর বক্তব্য শেষ হয় নি। তেমনি ধীর, তেমনি শান্ত। বলল, তোমার বন্ধু লোকটাও অনেকটা এই রকমই। এদিক থেকে জয়বাহাদুরের সঙ্গে খুব তফাত নেই তার। সে কাল ফিরেছে। তুমি এখান থেকে যাচ্ছ কবে?

অর্জুন নায়েক নির্বাক। অন্ধকারে তার পাংশু মুখ ভালো দেখা গেল না, কিন্তু অনুমান করা গেল। পার্বতী জবাব চায় নি, শুধু জিজ্ঞাসাই করেছে।

পরদিন।

রাজীব ব্যাস বাংলোয় ফিরল সকাল দশটারও পরে। সকাল থেকে ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল পার্বতী।

সাহেবের দর্শন পেয়ে অনেকে বাংলোর দিকে ছুটে এসেছিল। জয়বাহাদুর হন্ত-দন্ত হয়ে এসেছে গতকালের উত্তেজনার ব্যাপারটা জানাতে। পার্বতী এক-কথায় বিদায় করেছে সকলকে।—এখন না। সাহেব ক্লান্ত। পরে কথা হবে।

রাজীব ব্যাস কাপড় বদলাতে বদলাতে জিজ্ঞাসা করল, কি হল, ওদের তাডালে কেন?

পার্বতী জবাব দেয় নি। তাকে চা খাইয়েই স্নানের তাগিদ দিয়েছে। ঈষৎ বিস্ময়ে রাজীব ব্যাস আড়ে-আড়ে ঘরনীটিকে দেখছে। যেমন দেখে অভ্যস্ত তেমন লাগছে না। বলল, এত তাড়া কিসের—

উঠে গিযে পার্বতী একটা ছোট আযনা এনে মুখেব কাছে ধবল। গম্ভীর মুখে বলল, এই জন্যে।

স্নান করে আসতে হল। স্নান সেরেই খেতে বসতে হল। আসা অবধি পার্বতী পাঁচটা কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু গৃহস্বামীটিব বিস্ময উত্তবোত্তব বাডছে। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করল, অর্জুনকে দেখছি না, বেরিয়েছে নাকি?

জবাব পেল না। কানেও যায নি হযত। খাবারটা এনে নিজেই দিচ্ছে আর বাবুর্চিকে এটা-সেটা বলছে।

খাওয়া শেষ হতেই পার্বতী সোজা শোবার ঘরে বিছানায চালান করল তাকে। দরজা জানলাগুলো নিজের হাতে বন্ধ করে দিতে লাগল। ঘরে আলো এলে দিনে ঘুমুতে অসুবিধে।

হকচকিয়েই গেছে রাজীব ব্যাস। বলল, কাগজ-পত্রগুলো একটু গুছিযে বেখে এলে হত না।

পার্বতী ধমকে উঠল, তুমি চুপচাপ শোবে এখন?

ধমক খেয়ে সত্যিই শুযে পড়ল।—এ যেন সেই পার্বতী নয। এই পার্বতীকে রাজীব আর কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। অনেক সুন্দর, অনেক লোভনীয়। আবারও জিজ্ঞাসা করল, অর্জুন গেল কোথায়?

পার্বতী শয্যায় এসে বসল। ঈষৎ তপ্ত সুরে বলল, অর্জুনকে কি দরকার এখন তোমার? বুকে হাত বুলিয়ে দিল একটু। তারপর ঝুঁকে তার বুকের ওপর নিজেব থুতনিটা ঘষতে লাগল। অস্ফুট শব্দ করে হেসেও উঠল।

—জানো, কাল রাতে একটা বুনো মস্তি এসেছিল। হরিমতীকে না নিযে গিযে ছাড়বে না। তুমুল কাণ্ড একেবারে। জয়বাহাদুর ছাড়বার পাত্র নাকি, দিয়েছে বন্দুকের গুলিতে দু-কান ফুটো করে।

আসতে আসতে খবরটা শুনেছিল রাজীব ব্যাস। কিন্তু সে শোনার সঙ্গে এই শোনার অনেক তফাত। হঠাৎ কেমন মনে হল, এটাই একমাত্র খবর নয়। এই ক'দিনের আরো খবর আছে কিছু। হালকা ভ্রূকুটিতে পার্বতীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই অনুক্ত খবরটাই খানিকক্ষণ ধরে আঁচ করতে চেষ্টা করল সে।

একই প্রশ্নের পুনরুক্তি, অর্জুন কোথায়?

এবারে আর এড়িয়ে গেল না পার্বতী। হাসি মুখে চটপট জবাব দিল, কান ফুটো হবার ভয়ে পালিয়েছে।

উদ্‌গত হাসির বন্যায় বুকে মুখ গুঁজে দিল।

কিন্তু আরো একটু বিস্ময় বাকি ছিল রাজীব ব্যাসের।

ফুলে ফুলে হেসে উঠতে গিয়ে দুই বাহুতে সবলে তাকে আঁচড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল পার্বতী।

মালা

ইদানীংকালের সাহিত্যিকদেব মধ্যে বিশ্বম্ভরবাবুর মত এত মালা বোধকরি আর কেউ পান না।

বর্তমানের তিনি সর্বাগ্রগণ্য সাহিত্যিক এমন কথা কেউ বলবে না। অনেক সমালোচক বরং তাকে টাইপ-সাহিত্যিক বলতে রাজি আছেন। কারণ তিনি শুধু হাসির গল্প লেখেন।

কিন্তু এই স্পেশালাইজেশনেব যুগে বিশেষজ্ঞের কদর কম নয়। হাড-ভাঙা বা দন্তশূলে অতি বড সামগ্রিক চিকিৎসককে এড়িয়েও লোকে দাঁত বা হাড-বিশারদের কাছে ছোটে। সাহিত্যও এ-ব্যাপারের ব্যতিক্রম নয় খুব। সৎ-সাহিত্যের গুমোটে হাঁসফাঁস করে অনেক সময়েই পাঠক জানালা-দরজা খোঁজেন।

বিশ্বম্ভরবাবুর লেখা পড়ে লোকে হাসে, তাঁব কথা শুনে হাসে, তাঁকে দেখেও হাসে। গডতে বসে স্বয়ং বিধাতাও বেপরোয়া কারুকার্য চালিয়েছেন ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, তামাটে গায়ের রঙ—বাঁশের ডগায়-বসানো উল্টো হাঁড়ির মত এক বিঘত সরু গলার উপর মস্ত একটা মাথা। হাঁড়ির গায়ে কাকতাড়ানো নক্শার মত নাকমুখ চোখগুলো যথাস্থানে আছে এই পর্যন্ত। উঁচু চোয়াল, ফলে ছোট চোখ জোড়া গর্তের মধ্যে। কানের এক মাথা রগ ঠেলে ওপরের দিকে উঠেছে, অন্য মাথা গাল বেয়ে নিচের দিকে নেমেছে, এক রাশ কাঁচা পাকা ঝাঁকডা চুলে ছ'মাসে একবার কাঁচি পড়ে কিনা সন্দেহ।

সাহিত্য-মহীরুহের সবগুলো ডাল-পালায় বিচরণ না করলেও সব থেকে বড় রস-কাণ্ডটিতে যে তিনি বসে আছেন, অতি বড় বে-দরদী মান-নির্ণয়কেরও সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় নেই। সেই শাখাটিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমি সমালোচকের নিক্তির ওজন বুঝিনে, নতুন বয়সের লেখার ঝোঁকে দুই-একজন অগ্রজ সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য অনুসরণে লোভ হত। বিশ্বম্ভরবাবু সেই দুই-এক জনের বিশেষ এক জন। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসি নি তখনও। তাঁর লেখা পড়ে ভাল লাগত। মনে হত জীবন-রস-ভাণ্ডারের

দক্ষিণ-দুয়ারের চাবিটা এই ভদ্রলোক পেয়েছেন। সেই চাবির ওপর আমার লোভ ছিল। সাহিত্যপথে নব যাত্রার উদ্দীপনায় তাঁর কাছ থেকে পাথেয়-সঞ্চয়ের বাসনা ছিল। সেই তাগিদে যোগাযোগ।

কিন্তু যোগাযোগের প্রথম ধাক্কায় হতভম্ব হয়েছিলাম। বিশ্বম্ভরবাবুর ধারণা, আজ পর্যন্ত তিনি একটিও হাসির গল্প লেখেননি, একটিও হাসির কথা বলেননি। সত্যি যা দেখেছেন, সত্যিই যা করেছেন, বা সত্যি যা ভেবেছেন—একটুও না বাড়িয়ে একটুও রং না ফলিয়ে তাই শুধু লিখেছেন, তাই বলেছেন। তাই পড়ে লোকে হেসেছে আর হাসে, তাই শুনে লোক হেসেছে আর হাসে। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে বড় হাসেন-টাসেন না, যেটুকু হাসেন—নিয়ম রক্ষার্থে। কিন্তু এই এক ব্যাপার দেখে মাঝে মাঝে তাঁর হাসি পায় বটে।

জীবনে প্রথম গল্প লেখার বাসনা হয়েছিল তাঁর এক বন্ধুর সদ্য-বিয়ে-করা বউকে দেখে। কবিতা লেখার ইচ্ছেই হয়েছিল প্রথম, কিন্তু বউটিকে দেখে যা কিছু ভেবেছেন তিনি, কবিতায় ভাবা হয়নি বলে সেই ভাবনাগুলো সব গদ্যাকারে লিখেছিলেন। লেখক হবেন ভাবতে গিয়ে ভাব আর রোমাঞ্চ-জোয়ারে যে-ভাবে খাবি খেয়েছেন আর সাঁতার কেটেছেন সেই প্রথম লেখায় তাও উল্লেখ করেছেন। তারপর সেই লেখা নিয়ে এক লেখক-বন্ধুকে দেখাতে তিনি গল্পের রিয়েলিস্টিক টাচ প্রসঙ্গে যা যা উপদেশ দিয়েছেন, ফিরে এসে লেখা আর কাটাছেঁড়া না করে সেগুলো শুধু হুবহু জুড়ে দিয়েছেন। শেষে লেখা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এক মাসিক পত্রের সম্পাদকের কাছে। তিনি লেখাটি পড়ে কিভাবে গালাগাল করে তাড়িয়েছেন ওঁকে পরে তাও যোগ করে দিয়ে লেখাটির কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। সবশেষে সেই লেখা নিয়ে এসেছিলেন এক প্রাচীন সম্পাদকের কাছে। পড়ে তিনি হেসেছেন খুব, বলেছেন, বেশ মজার লেখা আর রসালো লেখা—তিনি ছাপাবেন।

ছেপেছিলেন। সেই থেকে বিশ্বম্ভরবাবু হাসির গল্প-লেখক।

কিন্তু হাসির গল্পের রসদ সংগ্রহের জন্য কখনো ভাবতে হয়নি তাঁকে, কল্পনারও আশ্রয় নিতে হয় নি। নতুন বয়সের ছেলেমেয়েদের পথে-ঘাটে যে-ভাবে প্রেম করতে দেখেছেন তাই লিখেছেন, প্রেমের পর বিবাহ-প্রসঙ্গে যে-ভাবে হোঁচট খেতে দেখেছেন তাই লিখেছেন, যারা প্রেম করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের নিয়ে তিনি যা ভেবেছেন তাই লিখেছেন। ট্রামে-বাসে ভদ্রলোকদের যে ভাবে বা যে কারণে বচসা বা মারামারি করতে দেখেছেন সেই রকমটি লিখেছেন, লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে যে-পদ্ধতিতে রেষারেষি করে থাকেন সেই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, পেটের আগুনে বেগুন-পোড়া হয়ে বাড়িতে গিন্নীটি যে-ভাষায় অগ্নি-উদ্‌গিরণ করে থাকেন হুবহু সেই ভাষাটি কাগজে বসিয়েছেন। ক্ষিধের সময় মিষ্টির দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্ষীর-সাগর দুধ-সাগর আর সন্দেশের দেশের কথা ভাবতে পারলে মনে কেমন ক্ষুন্নিবারণী আনন্দ জাগে সেই অনুভূতি পরিবেশন করেছেন। নিজের দেখা নিজের জানা নিজের শোনা এমনি অজস্র ব্যাপার তিনি শকুনির দৃষ্টিতে দেখেছেন আর যুধিষ্ঠিরের সততায় লিখেছেন।

আর, এই সব কিছুই পাঠকের কাছে হাসির খোরাক হয়েছে।

তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। ঘরের কোণ থেকে তারাই তাঁকে বক্তৃতামঞ্চে বা সাহিত্য-বৈঠকে টেনে এনেছে। বিশ্বম্ভরবাবু খুশি হয়ে যান, ভাল জলযোগের ব্যবস্থা থাকলে আর মোটা মালা মোটা ফুলের তোড়া পেলে আরও খুশি হয়ে ফেরেন। সব থেকে খুশি হন পাঁচ-সাত দশ মাইল দূরে ট্যাক্সিতে অনুষ্ঠানাসরে যোগদানের ব্যবস্থা হলে। কর্মকর্তাদের কেউ এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সেটা একেবারেই পছন্দ করেন না, যেখানে যান একমাত্র অনুচর ভাগ্নে ঝন্টুকে সঙ্গে নিয়ে যান। ঠিকানা রেখে আর যাতায়াতের ট্যাক্সিভাড়া রেখে আমন্ত্রণকারীদের বিদায় দেন। নিজের এক লেখায় এর কারণও খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন। হাঁটার নাগালের বাইরে দূরের পথ ট্রাম বাসেই পাড়ি দিয়ে থাকেন তিনি—শুধু আসরের কাছাকাছি এসে খানিকটা পথ ট্যাক্সিতে চাপেন আর ফেরার সময় খানিকটা পথ ট্যাক্সিতে আসেন। হিসেব করে ঠিক এক টাকায় যাতায়াত সারেন— যা বাঁচে সেটুকু নিজের উপার্জন বলে মনে করেন। একটুও রোজগারের সম্ভাবনা না থাকলে কোন আসরে যোগদানের প্রেরণা অনুভব করেন না তিনি।

এটা পড়েও লোক হেসেছে। আর, নেমন্তন্ন করার সময় যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটা (আনুমানিক ভাড়া আসল ভাড়ার থেকে বেশিই হয়ে থাকে) দিয়ে যাওয়া একরকম নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

বক্তৃতার ব্যাপারেও তাঁর এতটুকু আড়ম্বর বা আত্মাভিমান নেই। বক্তৃতা তিনি করতে পারেন না সে-কথা নিজেই অনেকবার বলেছেন। বক্তৃতার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে তিনি কতটুকু জানেন আর কতখানি জানেন না, তাও খোলাখুলি বলে দেন। তেমন বড় আসরে ডাক পড়লে কি ভাবে তিনি ভাষণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, কত রাত জেগে কত কথা মুখস্থ করেছেন, আসরের জন-সমাগম দেখে নার্ভাস হয়ে তার কতটা ভুলে গেছেন আর কতটা মনে আছে—এর কোন কিছুই গোপন করেন না। প্রসঙ্গত একবারের কথা মনে পড়ছে। প্রধান অতিথির বক্তৃতার পর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বম্ভরবাবু জানিয়েছিলেন, তিনি কিছু বলতে পারবেন না, কারণ, সে-দিনের ভাষণের জন্য অনেক পরিশ্রম করে মাত্র বারোটি পয়েন্ট তিনি তৈরি করে এসেছিলেন, কিন্তু প্রধান অতিথি মশাইয়ের পালা আগে আসার ফলে তিনি ওই বারোটি পয়েন্টই একে একে বিশদভাবে বলে চলে গেছেন —অতএব তাঁর আর নতুন করে বলার কিছু নেই, তাঁর বক্তৃতার ঝুলি শূন্য।

শুধু এই নয়, ঘরোয়া বৈঠকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শুনেছি, বাপের আমলে চেহারাটা তার এত খারাপ ছিল না, গায়ে তখন বেশ মাংস ছিল, গায়ের রঙ ফরসাই ছিল—ঠাকুমা বলতেন কালো মেয়ে বিয়ে করাবেন, ব্যাটাছেলের অত ক্যাটকেটে ফরসা হওয়া ভাল নয়—গালদুটো ভরাট ছিল বলে নাকের দু-পাশের হাড়দুটো অত উঁচিয়ে থাকত না, ফলে চোখ-দুটোও তখন এমন গর্তে ঢুকে থাকত না বা এমন ছোট দেখাত না—সাহিত্যে লোক হাসানোর বায়না নিয়ে নিয়ে এই

হল তাঁর। শুনে বৈঠকী লোকেরা হেসেছেন, আর এও হাসির কারণ হল দেখে বিশ্বম্ভরবাবু যে-ভাবে চাইছিলেন সকলের দিকে তাতে তাদের হাসি আরও বেড়েছে।

সব দেখেশুনে বিশ্বম্ভরবাবুর ধারণা, বাস্তবে যা-কিছু ঘটছে বা ঘটতে পারে সবই নিছক হাসির ব্যাপার। বাস্তবের ওপর রং না ফলালে বা স্নায়ুজ উত্তেজনা না চড়ালে জীবন বা সাহিত্য কোন কিছুরই গুরুত্ব বাড়ে না—সব কমিক হয়ে যায়।

রস-সাহিত্য পরিবেশনের পরিণামে নিজের অবস্থা-প্রসঙ্গে তাঁর সেই উক্তি যথার্থই যে এমন অনতিরঞ্জিত সত্যি একবারও ভাবি নি। ভারী শক্তও। এত যাঁর কদর, সাহিত্য-সভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য কোথাও না কোথাও থেকে ফি সপ্তাহেই যাঁর ডাক পড়ে, এত এত তোড়া-মালা পান যিনি—তাঁর এমন অবস্থার কথা কে আর ভাবতে পারে?

নিজের অনেকগুলি ছেলেপুলে, এর ওপর ভাগ্নে ভাগ্নী ভাইপো ভাইঝিও আছে দুই-একটি করে। অথচ তাঁর ওই রোগা-হাতের সরু কলমটার ফলন-শক্তি পরিমিত। এ-বাজারে লেখনীর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হলে নাকি লেখকের নিজের ওজনের খানকতক উপন্যাস থাকা দরকার। তার ওপর বারো মাসে তেবো-ফসলী হওয়া চাই। বিশ্বম্ভরবাবুর কোন ফসলই গোটা ফসল নয়—ফসল কণিকা বলা যেতে পারে। ওতে পাঠকের তৃপ্তি নেই। মোটাসোটা ছেড়ে বিশ্বম্ভরবাবু ছোটখাটো উপন্যাসও তেমন লিখে উঠতে পারেন নি। আস্ত একখানা উপন্যাস লেখার মত এত রসদ মাথা খুঁড়েও তিনি কোন একজীবনে খুঁজে পান না। উপন্যাস লিখতে বসে এই রসদ খুঁজে না পাওয়ার উপন্যাস তিনি লিখেছেন। সেও পলকা দামের হাসির বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও বা নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে বেশ গোটাকতক সিঁড়ি টপকে, বেশ খানিকটা প্রতিশ্রুতির জাল বুনে হয়ত বেশ কিছুটাই অগ্রসর হয়েছেন। তার পরেই আচমকা ধৈর্যচ্যুতি। অসহায়ভাবে লেখার ভিতর দিয়ে পাঠককেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, চোখের জলে নায়ক-নায়িকার মিলন হতে বা নায়কের আত্মহত্যা করতে বা বাপের রক্ত-চক্ষুর সামনে জুজু হয়ে অন্য বিয়েয় বসে নায়িকাকে চির বিরহ-বাষ্পের মধ্যে ঠেলে দিতে বা নায়িকার বিশ্বাসঘাতকতায় নায়কের পাগল হতে বা মদ ধরতে বা দেশ-প্রেমিক হতে বা দার্শনিক হয়ে উঠতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? এই একটা না একটা পরিণতির মুখে এসে পৌঁছুতে এই বেগ-মন্ত্রের যুগেও এত সময় তিনি নষ্ট করবেন কেন, এত পাতাই বা খরচ করবেন কেন?

নিজেই নিজের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন তারপর। আর সময় নষ্ট বা পাতা নষ্ট না করে জুতসই একটা পরিণতির মুখে এসে থেমে গেছেন। ফলে যে-বইয়ের দাম দশ টাকা হতে পারত, আর যে বই পড়ে পাঠক-পাঠিকা কেঁদে ভাসাতে পারত, সেই বইয়ের দাম দু টাকায় দাঁড়িয়েছে, আর, কান্না-বাঁচানো সময়-বাঁচানো টাকা-বাঁচানোর বিনিময়ে পাঠক-পাঠিকারা অকৃতজ্ঞের মত শুধুই হেসেছে।

বিশ্বম্ভরবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন, লোকসানের প্রতি মানুষের এক ধরনের রহস্যময় দরদ আর নিষ্ঠা আছে। হাসির থেকেও কান্নার কাঞ্চন-মূল্য অনেক বেশি।

অতএব এদিক থেকে বিশ্বম্ভরবাবুর দুর্ভাগ্য ঠেকানো শক্ত। সেটা নিজেও তিনি জানেন, জানেন বলেই নিরাসক্ত আর নির্বিকার। বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর যেন। নিজের অবস্থার সঙ্গে এমন নির্বিবাদ আপস সচরাচর দেখা যায় না।

সেইটুকুই কাহিনী।

আমি ভবিষ্যতের কোন্ আশায় তাঁর ভক্ত এবং শরণাপন্ন সেটা তিনি ভাল করেই জানতেন। অভিলাষ শুনে কোটরগত চোখদুটো মুখের ওপর খানিক ফেলে রেখে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, দেখে তো মনে হয় সন্দেশের খোসা ফেলে খাও, তুমি হাসির গল্প লিখবে কি করে?

অর্থাৎ হাসির খদ্দেরের পক্ষে হাসির ময়রা হওয়া শক্ত। কিন্তু ইদানীং আমার লেগে থাকার নিষ্ঠা দেখে তাঁর সংশয় কিছুটা গেছে বোধহয়। এক-দেখায় পরিহার, দশ-দেখায় গলার হার। দশ-দেখার ফলে গলার হার না করুন মনে মনে আজকাল একটু পছন্দ করেন বলেই বিশ্বাস। সেদিনের একটা সামান্য ঘটনায় বিশ্বাসটা আরও বেড়েছিল।

খুপরি ঘরে ইটে ঠেকা-দেওয়া নড়বড়ে চৌকিটার এক ধারে মূর্তির মত বসেছিলাম। মূর্তির মত কারণ, বেশি নড়লে চৌকিটাও নড়বে আর তার ফলে লক্ষ্যের সূচিমুখ থেকে বিশ্বম্ভরবাবু লেখার সুতোটাও নড়ে যাবে।

কিন্তু লেখক আর ভক্তের একাগ্রতা সত্ত্বেও লেখা হচ্ছিল না। বিশ্বম্ভরবাবু এক-একবার কলম তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসছিলেন, আবার কলম রেখে দিয়ে তালপাতার ভাঙা পাখা চালিয়ে বাতাস খাচ্ছিলেন।

কেন লেখা হচ্ছিল না জানতুম।

গরমের দরুণ নয়, গরমের তাতেই তাঁর লেখা বরং খোলে আরও। তপ্তখোলা থেকে খই ছিটকানোর মত ছেলেমেয়েগুলো স-কলরবে ছিটকে-ছুটকে হামেশা এই ঘরে চলে আসছে, সেই কারণেও নয়। বিশ্বম্ভরবাবু হাটের মধ্যেও বসে লিখতে পারেন।

হাঁড়িতে জল ফোটার মত পাশের ঘরে বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীটি ফুটছেন ক্রমাগত। অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার, নিজের প্রতি ধিক্কার, আর এই সব কিছুর মূলে যিনি, তাঁর প্রতি ধিক্কার। কিন্তু এত ধিক্কারের মধ্যেও তো নির্বিকার চিত্তে বসে লিখতে দেখা গেছে বিশ্বম্ভরবাবুকে। অথচ এই দিনে মুখখানি কেমন যেন শুকনো আর বেশ একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে।

তার কারণ, বড় ভাগ্নে ঝন্টুবাবুর অসুখটা বাড়াবাড়ির দিকে গড়াচ্ছে। লজ্জার কথা, এই অসুখের কথা শুনে প্রথমে মনে মনে একটু খুশি হয়েছিলাম। উঠতে বসতে এই ভাগ্নেটি যেভাবে মামাকে আগলে থাকেন, নিরিবিলি অন্তরঙ্গতায় ওঁকে দখল করার ফাঁক কমই মেলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে মনে ভেবেছিলাম, দিন-কতক উনি শুয়ে থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু দিনকতক বাদেই দ্বিগুণ অনুশোচনা হয়েছে। কি অসুখ জিজ্ঞাসা করতে বিশ্বম্ভরবাবু বিড়বিড় করে বলেছিলেন, পেটের পুরনো

ঘা, এবারে আর টেনে তোলা যাবে না বোধহয়।

পাশের ঘরে বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীর মেজাজ ক্রমশ চড়ছিল। একটু বাদে বাদেই ছেলেমেয়ে ঠ্যাঙাচ্ছিলেন তিনি। একটা লোক ধুঁকে ধুঁকে শেষ হতে চলেছে, ওদিকে ওষুধের শিশি খালি—সকাল থেকে পথ্য পর্যন্ত পড়ল না, এর মধ্যে বসে বসে সঙের কথা লিখতে লজ্জাও করে না, এখন মরণ হলেই হাড় জুড়োয়, ইত্যাদি—।

কিন্তু এদিকে চেষ্টা করেও কাগজের ওপর একটা সঙের আঁচড় ফেলতে পারছিলেন না বিশ্বম্ভরবাবু। এই পারিবারিক সমস্যায় আমাকে একটু-আধটু আপনজন ভাবলে কৃতার্থ হতাম, চক্ষু-লজ্জায় আমার নিজের থেকে এগিয়ে আসাও সহজ হচ্ছিল না। নিরুপায় বিশ্বম্ভরবাবু সেইদিন একটু আপনজনই ভাবলেন বোধ করি। হালছাড়া গোছের একটা নিশ্বাস ফেলে কলম রেখে সরাসরি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদক্ষিণাটক্ষিণার দিন একেবারে গেছে নাকি হে?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বোঝার আগেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে টাকা আছে কিছু?

থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢোকালাম। টাকা কিছু ক'দিন ধরে নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু নেবার থেকেও পাত্র-বিশেষে দেবার সংকোচটা বড় হয়ে ওঠে।

—অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরো দেখি, একখানা দাও।

ইচ্ছে থাকলেও বলা গেল না, সবকটাই রাখুন, এই প্রয়োজনেই আনা। একখানা দশ টাকার নোট হাতে করে উঠে ভিতরে চলে গেলেন তিনি। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে ওষুধ পথ্য এবং আর যা-যা দরকার থাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে আসতে বলে ফিরে এসে অনেকটা নিশ্চিন্তমনে লিখতে বসলেন এবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসের মত দেখলাম যেন, লেখা শুরু করার আগে বললেন, এই ব্যাপারটাই যদি গুছিয়ে লিখতে পার, মন্দ হাসির গল্প হবে না বোধহয়।

এর দু-তিন দিন পরে কাজের ঝামেলায় দিনকতক আর দেখা করে উঠতে পারি নি। সে-দিন সকালে কাগজ খুলে মস্ত একটা সাহিত্য অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। পৌরোহিত্য করবেন বিশ্বম্ভরবাবু। দেখে আনন্দ হল, এতবড় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের আহ্বান রীতিমত মর্যাদার ব্যাপার।

অধিবেশনে বিশ্বম্ভরবাবুর বক্তৃতাটি এই দিনে ভারী জমেছিল সকলেই স্বীকার করবেন। আধুনিক কথাসাহিত্য আর্থিক পটভূমি প্রসঙ্গে বলছিলেন তিনি। বিষয়টি গুরুগম্ভীর। কিন্তু হাসির তরঙ্গে বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য খান্ খান্। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, স্বয়ং কুবেরকে সাহিত্য-রচনার কাজে ডেকে এনে বসালেও কেমন করে অর্থ-নীতির শর-শয্যায় তাঁকে কাহিনী বিছাতে হবে।

মোটা মোটা মালায় তাঁর এক বিঘত লম্বা গলা ঢেকে গিয়েছিল। আর আমি না থাকলে ওই বিশাল দুটো তোড়াও তাঁর পক্ষে বহন করা সম্ভব হত না বোধ করি। বক্তৃতা শেষে অনুষ্ঠাতারা সাদরে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন আমাদের। ট্যাক্সি ভাড়া তো অগ্রিম দেওয়াই থাকে।

আমি বক্তৃতার তারিফ করছিলাম কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবু শুনছিলেন না। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অন্যমনস্ক একটু। ভাবলাম, খানিকটা গিয়ে নেমে পড়ার কথা ভাবছেন। এ-রকম দুগোছা মালা আর এমন বিশাল দুটো তোড়া নিয়ে বদলে বদলে তিনবার ট্রামে ওঠার কথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। ঠিক করলাম, নামতে চাইলে বাধা দেব, ট্যাক্সি নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার ফিকিবে তাঁকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু আজ আগে নেমে টাকা বাঁচানোর কথা নিজেই ভুলে গেছেন বোধহয়। চুপচাপ ভাবছেন কি। মাঝে মাঝে ক'টা বাজল জিজ্ঞাসা করছেন। আমার মনে হল, আর কোথাও কিছু জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সচকিত হলেন তিনি। কিন্তু বাড়ির দিকে না গিয়ে সামনের বাজারের মুখে থামালেন গাড়িটা। আমি ভাড়া মেটাবার জন্যে এগিয়ে আসতে বাধা দিলেন। ...মিটারে ছ'টাকা উঠেছে প্রায়। টাকা বার করতে করতে বললেন, পনেরো টাকা দিযেছিল, যাবার সময় সবটাই ট্রামে গিযেছিলাম—এখনো ন'টাকা বাঁচবে।

এত বড় বড় তোড়া আর মালা নিয়ে দশ পাও হাঁটা বিড়ম্বনা বিশেষ। বললাম, কি আনতে হবে বলুন আমি নিয়ে আসছি।

জবাবে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তোড়া দুটো আমার হাতে, মালা দুটো তাঁর হাতে। মালাব ওপর এই দুটো তোড়া হাতে করে তাঁর পক্ষে দাঁড়ানোও শক্ত বটে। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ দুটো অমন চকচকে হাসি হাসি দেখাচ্ছে কেন!

বললেন, ভাবছিলাম তোমাকে ছেড়ে দেব কি না। আচ্ছা, এসো।

দুই হাতে অতিকায় দুই মালা ঝুলিযে বাজারের মধ্যে ঢুকে গেলেন। অগত্যা তোড়া নিয়ে বিব্রত-চরণে আমিও।

ফুলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এ অঞ্চলের নামকরা ফুলের দোকান। ফুল রক্ষার তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরও আছে এঁদের।

আমি হতভম্বের মত দাঁড়িযে। কি দেখছি, কি শুনছি—বুঝছি না। দর কষাকষির পর মালা আর তোড়া দোকানে গিযে ঢুকল আর বিশ্বম্ভরবাবুর হাতে কিছু নগদ টাকা এল।

বাজার থেকে শূন্য হাতে বেরিয়ে এলাম। একটিও কথা নেই কারো মুখে।

বাড়ির লাগোয়া ওষুধের দোকানে ঢুকলেন বিশ্বম্ভরবাবু। পকেট থেকে প্রেসক্রিপশান বার করে দু-তিনটে ওষুধ কিনলেন। এবারে ব্যস্ত হয়ে খবর নিলাম, ঝন্টুবাবু কেমন আছেন?

—চল, দেখি। ....অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

জবাবটা হেঁয়ালির মত লাগল।

বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ানোর আগেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলাম একটা। পা-দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বাড়ির দরজায় অনেক লোক। বেশির ভাগই প্রতিবেশী। আমাদের দেখেই ভিতরে

কান্নার রোল উঠল একটা।

বিশ্বম্ভরবাবু বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। ফ্যাল ফ্যাল চোখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকলেন। প্রতিবেশী ছেলে-ছোকরাদের খাটিয়া বাঁধাছাঁদা করতে দেখে বোঝা গেল, যা হবার অনেকক্ষণই হয়ে গেছে।

ভিতরে বিশ্বম্ভরবাবুর পাশটিতে এসে দাঁড়ালাম। নির্বাক মূর্তির মত ওষুধ হাতে দাঁড়িয়ে ভাগ্নেকে দেখেছেন তিনি। ভাগ্নে যেন ঘুমিয়ে আছে। বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রী কাঁদছেন, ছেলেমেয়েগুলো আছড়া-আছড়ি করছে।

বিশ্বম্ভরবাবু আত্মস্থ হলেন এক সময়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলেদের দেহ বার করার নির্দেশ দিয়ে এক্ষুনি আসছেন বলে তিনি চললেন কোথায়...।

এ-অবস্থায় একা ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত নয়। চুপচাপ সঙ্গ নিলাম।

ওষুধের দোকান। ওষুধ কটা ফেরত দিয়ে টাকা ফেরত নিলেন।

তারপর ফুলের দোকান। দোকানী সদয়। আট আনা বেশি দিয়ে বিশ্বম্ভরবাবু সেই তোড়া দুটো আর মালা দুটোই কিনলেন আবার।

বাড়ি। ঝণ্টুবাবুকে ছেলেরা বাইরে খাটিয়ায় এনে শুইয়েছে। বিশ্বম্ভরবাবু তাব দু পাশে তোড়া দুটো যত্ন করে বসালেন। একটা মালা ভাগ্নের গলায় পরালেন, অন্যটা বুকের ওপর পেতে দিলেন।

হরিধ্বনি দিয়ে ছেলেরা শব তুলল।

হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেল বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোটরগত দুই চোখ চকচক করছে তেমনি। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাজারে ঢোকার মুখে যেমন দেখেছিলাম। তার থেকেও বেশি। কালো জলে আলো পড়লে যেমন দেখায়। বিড়বিড় করে বললেন, ভালো রকম হাসির গল্প হবে না একটা?

আমি পালিয়েছিলাম। আর হাসির গল্পের পাঠ নিতে আসিনি।

সন্দেশ

ভদ্রমহিলা সহ পাঁচ-ছ বছরের ছেলে কাঁধে চড়িয়ে ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ঘোষ দরজা ছেড়ে নিজের জায়গায বসে সন্দেশের বাক্সটা খুলতে খুলতে দরাজ গলায় বললেন, সন্দেশ খাও হে হালদার, বিদায়-পর্বে তোমাদের মিষ্টি-মুখ করিয়ে দিই।

সকলের হাতে হাতে একটা করে সন্দেশ দিতে দিতে আবার বললেন, স্পেশাল সন্দেশ দেখছি, সাইজ দেখেছ?

যত বড় সাইজেরই হোক, সকলকে দেবার পর একটা আস্ত সন্দেশ তাঁর মুখ-গহ্বরে চলে গেল।

আমরা হাসছি।

মুখের সন্দেশ খানিকটা আয়ত্তের মধ্যে এনে আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, হাসি নয়, আমাকে হটিয়ে রেসিডেন্ট সার্জন তো হলে—সন্দেশ খেয়ে তাগত বাড়িয়ে নাও, নইলে তোমার যা নার্ভ দেখলাম, শেষে ডাক্তারী ছেড়ে কুঁজো হয়ে বসে শুধু সাহিত্যই করতে হবে।

আর সকলে সবটা না বুঝলেও তাঁর সঙ্গে হাসি জুড়ে দিলেন। তাঁকে হটিয়ে রেসিডেন্ট সার্জন হবার কথাটা টিপ্পনী ভেবেও হয়ত আনন্দ পেলেন কেউ কেউ। ডক্টর ঘোষ নিজের টাকায় বিলেত যাচ্ছেন আরো বড় সার্জন হয়ে আসতে, আমরা স্টেশনে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছি। তাঁকে হটাবার কথাটা নিছক ঠাট্টা। তবু তিনি গেলে তাঁর জায়গাটি দখল করার দিকে আমার সক্রিয় চেষ্টা ছিল, সেটা এঁরা অনেকেই জানেন। তাছাড়া আমার কিছু মুরুব্বির জোর আছে, সেই জোরে আমি যে এই ভয়াবহ ভদ্রলোকের ভয়ে বাইরে অন্তত একেবারে জুজু হয়ে থাকতাম না, সেও অনেকেই জানেন। হাসপাতালের অন্যান্য জুনিয়ার ডাক্তারদের চোখে সেটা একটা দুর্জয় সাহসের ব্যাপার। তাঁকে সরাতে পারলে আমি চেষ্টার কসুর করতাম না, কারো কারো সেই সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ, আসল প্রমোশনের সময় বাইরের মুরুব্বিয়ানা যে আমার কাজে লাগেনি, তার থেকে অনেক বেশি কাজ হয়েছে এই মেজাজী লোকটির ঢালা সুপারিশে, সেও অপ্রকাশ্য নয় কিছু। কাজেই ডক্টর ঘোষের এই মন্তব্যটা সন্দেশের মতই রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে কারো কারো।

. সন্দেশ মুখে পোরা সত্ত্বেও আমার দুর্বল নার্ভ দুর্বলতর হয়ে আসছিল। সেই দুর্বলতার নজির দু'চোখের কোণ ঠেলে না বেরিয়ে আসে সেই আশঙ্কায় তটস্থ আমি। উনি কি বললেন আর কেন বললেন আর কেউ জানবে কি করে....।

কিন্তু ভদ্রলোকের যেন আমাকে জব্দ করারই মেজাজ এখনো। একজনকে জলের ক্যান্টা এগিয়ে দিতে ইশারা করে আবারও দরাজ গলায় বলে উঠলেন, দেখলে তো, মা আর ছেলের একসঙ্গে জীবন-সংশয় হলে সর্বদা আগে মায়ের কথা ভাবা উচিত, তাহলে মা বাঁচে, ছেলে বাঁচে আর বরাতে সন্দেশ জোটে।

জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেবার আগেই হা-হা করে হেসে উঠতে গিয়ে তাঁর অট্ট-হাসি আর অট্ট-কাশি একসঙ্গে চলল।

চিকিৎসা-রীতির একটা ছক-বাঁধা নির্দেশ, শিশুর আসন্ন আবির্ভাব কালে মায়ের জীবন-সংশয় দেখা দিলে শিশুর বিনিময়েও আগে মায়ের জীবন-রক্ষার দিকটা চিন্তা করতে হবে—মাদার্স লাইফ ফার্স্ট। কিন্তু ডক্টর ঘোষের যে-মায়ের জীবন-রক্ষার কারণে এই অন্তর্তুষ্টি আর সন্দেশ লাভের আত্মপ্রসাদ, তিনি ওই মহিলা—যিনি সন্দেশের বাক্স রেখে চোখের জল চেপে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে গেলেন, যাঁর ছেলের বয়স পাঁচ ছাড়িয়েছে, আর, ছেলের জীবন সংশয়ের সময়ও যাঁর সেই নিজস্ব সংকট কোন

চিকিৎসা-শাস্ত্রের আওতায় পড়ে না।

গোড়া থেকে বলা দরকার।

অধীনস্থ জুনিয়ার ডাক্তাররা একজনও যে রেসিডেনসিয়াল সার্জন ডক্টর ঘোষকে পছন্দ করত না, তার দুটো কারণ। প্রথম এবং প্রধান, তার মেজাজ। জুনিয়র ডাক্তাররা সব যেন তাঁর খাস তালুকের প্রজা। মারুন ধরুন কাটুন কুটুন, মুখটি বুজে থাকতে হবে। নাম সুজন ঘোষ। হাসপাতালের কাজের পরিবেশে নামটা সাধারণত ডুবে যায়, আর. এস্. শব্দটাই চালু। কিন্তু সুজন ঘোষের বেলায় তা হয়নি। কোন এক জুনিয়র ডাক্তার এক সময় তাঁর নামকরণ করেছিল জি-জি, অর্থাৎ, গর্জন ঘোষ। অসাক্ষাতে এই নামটাই চলতি এখন, জি-জি বা গর্জন ঘোষ। এটা তিনিও জানেন।

সার্জন হিসেবে এমন কিছু সিনিয়র লোক নন তিনি। আমাদের থেকে ছ'সাত বছরের বড়—চল্লিশও হয়নি। কিন্তু এই মেজাজের জন্যেই একাধিকজন তাঁকে টপকে প্রমোশন পেয়ে গেছে। তাঁর সম্বন্ধে কোন ওপরঅলার ভালো রিপোর্ট একটিও আছে কিনা সন্দেহ। রাগের মাথায় কতজনের সামনে যে ছুরি-কাঁচি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রস্থান করেছেন ঠিক নেই।

অথচ অতি আপনজনের কোন সার্জিকাল কেস নিয়ে যদি কোন সার্জনের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার হয়—সবার আগে সম্ভবত ওই গর্জন ঘোষের কথাই মনে হবে। শুধু আমার নয়, বিরাগভাজন ওপরঅলাদেরও। অপারেশনের সময় ওই রগচটা মানুষটার হাতটি পাকা আর্টিস্টের হাত যেন। অস্ত্রোপচারে একটি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে কারবার, প্রাণ নিয়ে সমস্যা—সেটাও তাঁর মনে থাকে কিনা সন্দেহ। দেখলে মনে হবে, কিছু একটা শিল্প-কর্মে নিবিষ্ট তিনি। এ পর্যন্ত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বহু অপারেশন দেখেছি, দেখে চোখ ফেরাতে পারিনি। মন মেজাজ প্রসন্ন থাকলে এরই মধ্যে অপারেশনের ফাঁকে ফাঁকে উপস্থিত জুনিয়র ডাক্তারদের অস্ত্রোপচার-পদ্ধতি বুঝিয়েছেন। কি করেছেন, কেন করছেন, কতটা করবেন, কতটা রাখবেন, কতটা ফেলবেন, কি ভালো হতে পারে, কি মন্দ হতে পারে—রোগীর দেহ চিরে চিরে দেহ-তত্ত্বের রূপকথার মধ্যে নিয়ে যেতে পারেন একেবারে। কিন্তু এরই মধ্যে হয়ত কোথাও একটু এদিক-ওদিক হল, অপারেশনে অ্যাসিস্ট যাঁরা করছেন তাঁদের নিখুঁত যান্ত্রিক তৎপরতায় হয়ত খুঁত বেরুল একটু—ভদ্রলোক সেই ছুরি-কাঁচি হাতে তাকেই যেন ফালাফালা করতে উঠবেন তক্ষুনি। এমন যে, হাতের কাছাকাছি থাকাও নিরাপদ নয় তখন। রোগীর জ্ঞান থাকলে কত রোগী এই মূর্তি দেখে বা সেই গর্জন শুনে হার্টফেল করত ঠিক নেই।

জুনিয়র ডাক্তারদের অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণটা রোমান্টিক। মেয়েদের প্রতি গর্জন ঘোষের পক্ষপাতিত্ব। অবশ্য এর জন্যে এমনিতে আমরা যে খুব অখুশি তা নয়। হাসপাতালের রোগিণী আর নার্স আর গর্জন ঘোষকে নিয়ে অনেক মর্মগ্রাহী খোস-গল্প জল্পনা-কল্পনা হাসি-কৌতুকের খোরাক জোটে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। কিন্তু তা বলে রমণী-সঙ্গ-বিরহিত বলেও মনে করে না কেউ। সব সত্যি না হোক, যা রটে তার কিছুটা সত্যি বলে আমরা সানন্দে বিশ্বাস করি। বোস হলপ করে বলবে, অমুক

নেপালী নার্সের সঙ্গে অমুক ইংরেজি সিনেমা হলের দিকে যেতে দেখেছে তাঁকে, দাস বলবে, অমুকের সঙ্গে অমুক জায়গায় দেখেছে। দত্ত বলবে, অমুক রোগিণীর (সুশ্রী নিশ্চয়) কেবিনে দু'বেলা ঘড়ি ধরে আধ ঘন্টা করে গল্প করতে দেখেছে। চক্রবর্তী বলবে, কোন ভদ্রলোকের অপারেশনের পর তাঁর স্ত্রীটিকে সান্ত্বনা আর অভয় দেবার জন্য দু'বেলা হাসপাতাল থেকে তিনি উধাও হতেন—সেই গল্প। রায় বলবে, হৃদ্যতা-মন্ত্রে এক মহিলার তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনে বিনা পয়সায় ভাইয়ের বড়সড় অপারেশন করিয়ে নেওয়ার কাহিনী। রমণী-প্রীতির এ-রকম আরো অনেক নজির অনেকে দেখাতে পারেন।

কোন সুরসিক বৃদ্ধ ভিজিটিং ফিজিসিয়ান এক ঘবোয়া চায়ের আসরে একবার বেশ কড়া ঠাট্টা করেছিলেন শুনি এই নিয়ে। জবাবে সুজন ঘোষ, অন্যথায় গর্জন ঘোষ জবাব দিয়েছেন, মেয়েরা এ-দেশে হয় ভোগের বস্তু, নয় ত্যাগের বস্তু, নয়তো অর্চনার বস্তু। আসলে ওরা যে বস্তু নয় সেটাই কেউ ভাবে না।

বৃদ্ধ ডাক্তারটি ছাড়েন নি, তক্ষুনি ফোঁস করে উঠেছেন, মেয়েদের ওপর এত টান তোমার, নিজের ঘরে ওই একটিও অ-বস্তুকে জোটাতে পারলে না কেন হে এ-পর্যন্ত!

গর্জন ঘোষ গর্জন করেই হেসে উঠেছিলেন। তারপর সখেদে বলেছেন, জোটালে ওই একটিই মাত্র জোটাতে হয় যে—!

কিন্তু আমাদের ক্ষোভ সেইজন্যে নয়। উল্টে বরং ভালই লাগে। অবকাশ সময়ে আড্ডা জমে, সময় কাটে। কিন্তু রোগিণী বা নার্স ছেড়ে ওই যে বারান্দা ঝাঁট দেয় রমণীটি, সে-ও যদি কারো নামে নালিশ করে, ভদ্রলোক গোটাগুটি বিশ্বাস করবেন এবং তেতে উঠবেন। নার্সরা তো ওই একজনের ভরসায় কেয়ারই করে না কাউকে। নিজেদের জোরেব খবরটা জানা থাকলে রোগিণীরাও অনেক সময় ভ্রূকুটি করতে ছাড়েন না। এঁদের সামনেই ধমক-ধামক খেতে কে আর চায়!

সেদিন আউটডোরে একটি মহিলা এসেছেন তাঁর ছেলেকে দেখাতে। ছেলেটির ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়, আর মাঝে-মধ্যে পেটের ব্যথা বলে। পাঁচ বছর মাত্র বয়েস, কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে এক মিশনে থাকে। সেখানেই পড়াশুনা করে। মিশনের নামটা শোনা ছিল, অনেক দুষ্টু ছেলের মতিগতি ফেরানোর সুনাম আছে তাদের।

মহিলা, অর্থাৎ ছেলেটির মা, কলকাতার কাছেই চব্বিশ পরগণার কোন এক সেলাইয়ের প্রতিষ্ঠানে সামান্য চাকরি করেন। সেখানেই থাকেন। নিজের কাছে ছেলেকে রাখার অনেক অসুবিধে বলেই তাঁকে মিশনে দিয়েছেন। মনে হল ভদ্রমহিলা বিধবা, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। পরণে অবশ্য হালকা রঙিন শাড়ি। ও-বকম রঙিন শাড়ি আজকাল অনেক বিধবা পরেন। তাছাড়া সামান্য কাজ করে খেতে হয় যখন, রঙিন পরলে খরচেরও সাশ্রয়।

ছেলেটির ভারী মিষ্টি চেহারা। দারিদ্র্যের ছাপের মধ্য দিয়েও একটু একটু দুষ্টুমির

ছাপ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। রোগী পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে পাঁচদিন বাদে আবার তাকে নিয়ে আসার ধরাবাঁধা নির্দেশ দেওয়া হল।

বাকি ক'টি রোগী দেখার পর চোখ পড়ল, দরজার ওধারে মহিলাটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমার অবকাশের প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছেন বোঝা যায়।

কাছে এসে তাঁর আবেদন শুনলাম। ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া যায় কি না। অন্যথায় ওর চিকিৎসা হবার আশা কম। কাজ ফেলে বার বার নিয়ে আসার সুবিধে হবে না, মিশনে রোগীর যত্ন হওয়া সম্ভব নয়। তা-ছাড়া বাইরে থেকে চিকিৎসাটা খরচেরও ব্যাপার। নিজের যতটুকু সাধ্য তা করার পরেই ছেলে নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন।

আবেদন বটে, কিন্তু কথাবার্তায় বেশ স্পষ্ট আর মার্জিত মনে হল মহিলাটিকে। অথচ সেই সঙ্গে বেশ বিষণ্ণও। বছর সাতাশ-আটাশ বয়েস, রীতিমত সুশ্রী। মেহনতীর ছাপটা সুস্পষ্ট বলেই শ্রীটুকু চট করে চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে ক্রমশ ভালই লাগে। আউটডোরের রোগী-বিদায়ের তাড়ায় এই বিশেষ শ্রীটুকুই আগে লক্ষ্য করিনি।

বিব্রত বোধ করলাম। যে ভাবে বললেন, ফেরাতে মন সরে না। ছেলেটাকে দেখেও কেমন মায়া হয়। অথচ এমার্জেন্সি কেস নয় যে চট করে নিয়ে নেব। কেবিনের প্রশ্নও ওঠে না, তাতে খরচের সমস্যা। ফ্রী-বেডের জন্যে ওয়েটিং লিস্টে কত নাম পড়ে আছে ঠিক নেই। বেড বাড়িয়ে সাময়িক ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সেটা করতে গেলে সুযোগ-সুবিধে পেলেই কেউ না কেউ ঠেস দেবে।

জানালাম, আজই একেবারে ভর্তি করে নেওয়ার পক্ষে অসুবিধে আছে, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি শিগগীরই যাতে হয়, তাছাড়া এভাবে নিতে হলে রেসিডেনসিয়াল সার্জনের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া দরকার।

শুনে মহিলাটির মুখে নিরুপায় হতাশার ছাপটাই স্পষ্টতর হল আরো। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি না?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজাজের পালে প্রতিকূল হাওয়া লাগল যেন। সশরীরে তিনি আবেদন নিয়ে উপস্থিত হলে নিরাশ হযে নাও ফিরতে পারেন। যদিও নিরাশ না হবার মত কথা বা আচার-আচরণের বিন্যাস মহিলাটি জানেন, মনে হয় না। কিন্তু সেটা না জানাও অনেক সময় বৈচিত্র্যের অঙ্গ।

বললাম, কেন পারবেন না, চেষ্টা করে দেখুন, হলেও হতে পারে।

এই কথাগুলোই মিষ্টি করে বললে মনে করার কিছু ছিল না। কিন্তু নিজের রূঢ়তায় নিজেই কেমন লজ্জা পেয়েছি। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে জায়গায় এসে বসেছি। বসে আড়চোখে ভদ্রমহিলার শুকনো মূর্তিটি লক্ষ্য করেছি। বিমূঢ় মুখে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ছেলের হাত ধরে তিনি আস্তে আস্তে সরে গেলেন সেখান থেকে।

উঠে এসে দেখি, গেটের দিকে চলেছেন। ফিরে চলেছেন।

ভয়ানক খারাপ লাগল। এখান থেকে বাইরের গেট কম পথ নয়। ওটুকু হাঁটতেই ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে বলে মা তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

—এত দেখার ইচ্ছে যখন, ছেড়ে দিলে কেন—কল্ দেম ব্যাক অ্যাণ্ড সী এগেন!

গমগমে গলা শুনে চমকে উঠেছি। বিপরীত করিডর ধরে সামনে এসে দাঁড়ালেন আর. এস. ডক্টর ঘোষ। গর্জন ঘোষ। গম্ভীর মুখে হাসির আভাস। রাউণ্ডে বেরুলে সাধারণত এদিকেও রোজই ঘুরে যান একবার।

পলকে ভেবে নিলাম একটু। সামনের দারোযানকে ডেকে তক্ষুনি নির্দেশ দিলাম মহিলাটিকে ডেকে আনতে। সে ছুটল। ডক্টব ঘোষ ভ্রূকুটি করলেন, হোয়াট্ দ্য ডেভিল ইউ মিন?

বললাম। পরোক্ষে একটু সুপারিশ করলাম বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে ছেলে সঙ্গে করে মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরিচয় দিলাম, ইনি আর. এস. ডক্টর ঘোষ।

যুক্ত করে নমস্কার জানিযে আমাদের নির্দেশ শোনার আশায় তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডক্টর ঘোষ ছেলেটিকে দেখার আগে তার মাকেই এক নজর দেখে নিলেন। তারপব ছেলেটিকে হাতের কাছে টেনে নিলেন। তাঁব অভ্যস্ত দুই হাত শিশুটির গলা চড়াও করল, গলা টিপে দেখছেন হাতে গ্ল্যাণ্ড বা অন্য কিছু লাগে কিনা। কিন্তু দৃষ্টিটা তখনো মাযের দিকে।

আমি হাসি চেপে দাঁড়িযে আছি। মহিলাটি নির্বাক, শান্ত। ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে ডক্টব ঘোষ সংক্ষিপ্ত হুকুম জাবি কবলেন, নিযে নাও।

সুশোভন ব্যস্ততায চলে গেলেন। মহিলাটির দিকে চেযে মনে হল সত্যিকারের আশ্রয় পেযেছেন তিনি। মুখে কৃতজ্ঞতার একটি কথাও বললেন না, কিন্তু চোখ দুটি কৃতজ্ঞতায ভরা। একটা ফর্ম বার করে দিতে সেটা ফিল্-আপ করলেন। নাম সই করলেন, তৃপ্তি গাঙ্গুলী।

ছেলে রেখে তৃপ্তি গাঙ্গুলী বিদায় নিলেন আরো ঘন্টাখানেক বাদে। আরো দশজন দশ রকমের রোগীর মধ্যে ছেলেটাকে একটা বিছানায ফেলে রেখে যেতে মন চাইছিল না বোঝা যায়। শেষে, আর থাকাটা ভালো দেখায় না বুঝেই ছেলের বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। ছেলেকে বুঝিয়েছেন, ডাক্তার বাবুরা খুব ভালো, খুব আদর-যত্ন করা হবে তাকে, রোজ তিনি এসে দেখে যাবেন, আর কাল তো একটা বল তিনি নিশ্চয় কিনে আনবেন। এই সবই একান্ত ছেলেকেই বলেছেন তিনি, অন্য রোগী দেখা, চার্ট দেখার ফাঁকে ফাঁকে আমার কানে যেটুকু এসেছে।

মিশনে থাকে বলেই হয়ত ছেলেটাও এই বযসে মাকে ছেড়ে থাকতে খুব বেশি আপত্তি করল না। ওইখানেই থাকতে হবে আপাতত সেটা বুঝে প্রথম দিন-দুই একেবারে চুপ করে গিযেছিল। যতক্ষণ জেগে থাকত, চুপচাপ মাযের প্রতীক্ষা করত। কিন্তু তারপরেই বেশ চাঙ্গা হযে উঠল। দুই-একটা ছোটখাট ঘুষের জিনিস হাতে

আসতেই সে আমাকে আপনজন বলেই ধরে নিল। শুধু আমার নয়, মনে হয়, ওই ছটফটে ছেলেটাকে অন্যান্য রোগীদেরও ভালো লেগেছিল।

মহিলাটি রোজ বিকেলের দিকে আসতেন। প্রথমে আমার কাছে এসে ছেলের খোঁজখবর করতেন, তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বসতেন।

চারদিন কি পাঁচ দিনের দিন ডক্টর ঘোষের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় যোগাযোগ। বিকেলে বারান্দায় ছেলেকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসেছিলেন। ডক্টর ঘোষ যাচ্ছিলেন সেই দিক দিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সার্জিক্যাল কেস্ ভিন্ন অন্যান্য কেসের খুব বেশি খবর রাখেন না তিনি। রাউণ্ডের সময় কখনো-সখনো চোখের দেখা দেখে যান এই পর্যন্ত।

দূর থেকে দেখলাম তৃপ্তি গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়িয়েছেন, হাত তুলে নমস্কার জানিয়েছেন, আর কিছু একটা প্রশ্নের মৃদু জবাব দিচ্ছেন। ডক্টর ঘোষ ছেলেটাকে আদর করলেন একটু, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। কি অসুখ, ভিজিটিং ফিজিসিয়ান কি বলছেন, এই ক'দিন কতটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে, ইত্যাদি প্রশ্ন।

এই আন্তরিকতার একটাই অর্থ আমাদের জানা।

তার পরদিনও ডক্টর ঘোষকে বিকেলে ওই সময় ওখানেই দেখা গেল। তার পরদিনও। আদর করে সেদিন ছেলেটাকে কোলেও নিয়েছেন ডক্টর ঘোষ। বুঝলাম, ছেলেটা যে ক'দিন আছে, রোজই উনি এখন থেকে দেখাশুনো করতে আসবেন। শুধু তাই নয়, ছেলেটাকে সেইদিনই অন্য ঘরে আরো ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ছেলের মাকে আশ্বাস দিলেন শুনলাম, ভিজিটিং ফিজিসিয়ানের সঙ্গে পরদিনই ছেলের অসুখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

এ-সব কারণে আমি বা আমরা বিরূপ হয়ে উঠব খুব স্বাভাবিক কথা। চিকিৎসক হিসেবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে সেই বিবেচনাটুকু পর্যন্ত নেই ভদ্রলোকের। মহিলার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যস্ত।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হই আর যাই হই, ছেলেটার ক্ষতি চাইনি। তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে গেল। আর দু তিন দিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। দেবার কথাও। অথচ আমার মনে কি রকম খটকা লাগছে। ছেলেটা পেট ব্যথার কথা বলে প্রায়ই। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম কতগুলো বিশেষ ওষুধের প্রতিক্রিয়া। দেখা গেল তাও না। তার ওপর ছেলের মা স্মরণ করিয়ে দিলেন আগেও এ-রকম বলত। আর ব্যথার অভিযোগটা ক্রমশ বাড়ছে মনে হল।

পেটে হাত দিয়ে সেদিন ভাল করে পরীক্ষা করতে কেমন একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল। ভিজিটিং বিশেষজ্ঞকে আজ আর পাবার আশা নেই। তাড়াতাড়ি ডক্টর ঘোষকেই ডেকে নিয়ে এলাম। আর একটু বাদে, অর্থাৎ, ছেলের মায়ের আসার সময় হলে নিজেই আসতেন তিনি। এই ক'দিনেই গর্জন ঘোষ আর তৃপ্তি গাঙ্গুলীকে নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে সরস আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমি অবশ্য খুব মন খুলে

সে আলোচনায় যোগ দিতে পারিনি। কারণ, ঘোষের দিক থেকে আলোচনাটা যতই সত্যি হোক, ওই মহিলাটির দিক থেকে সেটা ততটাই মিথ্যে এবং মনগড়া। সেটা আমার থেকে বেশি কেউ জানে না। আমার কেবলই মনে হয়েছে, এই বাহ্য দুনিয়া থেকেই উনি যেন খানিকটা তফাতে সরে আছেন। একমাত্র ছেলের সামনে সকলের অগোচর নিভৃতে তাঁকে একটু অন্য রকম দেখা যায়। অন্যথায়, একলার এক নীরব গণ্ডির মধ্যেই তিনি বাস করছেন যেন। সেখানে তাঁর কোন দোসর নেই, দোসর লাভের বাসনাও নেই।

ডক্টর ঘোষ নিবিষ্ট চিত্তে ছেলেটির পেট পরীক্ষা করছেন যখন, সেই সময় নিঃশব্দে তার মা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ এভাবে পরীক্ষা করতে দেখে একটু ঘাবড়েও গেলেন হয়ত। আমি ইশারায় আশ্বস্ত করলাম তাঁকে।

পরীক্ষা শেষে ডক্টর ঘোষ তার মাকে দেখে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এ-রকম কতদিন ধরে হচ্ছে, খাবার পরেই ব্যথাটা বেশি হয় কিনা, ইত্যাদি। তারপরেই আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, সামটাইমস্ ইউ আর এ জেম, কালকের মধ্যেই পেটের এক্সরে করিয়ে নাও, আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট।

নিমেষে সমস্ত মুখ শুকনো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মহিলাটির। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

উনি ভয় পেয়েছেন বোঝা মাত্র ডক্টর ঘোষ সবাসরি একখানা হাত তাঁর কাঁধে চালান করে দিয়ে দরদী গলায় বললেন, ভয় পাবার মত সাঙ্ঘাতিক কিছু না, এদিকে আসুন——।

সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু মহিলার কাঁধে হাত দেওয়াটা তেমন পছন্দ হল না। অবশ্য অনাগত আশঙ্কায় মহিলার মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল ঠিকই।

কানে না শুনলেও ডক্টর ঘোষ কি বোঝাচ্ছেন তাঁকে, অনুমান করতে পারি। ছোট ছেলেদেরও কখনো-সখনো ক্রনিক অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়, সময়ে ধরা পড়লে তেমন ভয়ের কিছু নেই। অপারেশন করলেই সেরে যাবে। এ-ছাড়া আর কি-ই বা বলার আছে।

পরদিন ছিল শনিবার। পেটের এক্সরের ঝামেলা আছে কিছু। মাঝে রবিবার পড়ায় সোমবার সকালের আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। মনটা একটু উতলা ছিল। ওই মায়ের একমাত্র সম্বল ওইটুকু ছেলের আবার একটা অপারেশনের ধমক সইতে হতে পারে ভাবতে ভালো লাগছিল না। আমার যেটুকু করার, যত্ন করেই করেছি। কিন্তু রবিবার সকালে এক অবাক কাণ্ড।

রোগীর ভিড় নেই সেদিন। নিজের জায়গায় বসে আরাম করে এক পেয়ালা চা খাচ্ছি। কার্ড পেলাম, আই. বি. থেকে একজন কর্মচারী দেখা করতে এসেছেন। অ্যাক্সিডেন্ট কেসের নানা ব্যাপারে এমন হামেশাই এসে থাকেন, কাজেই অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু ভদ্রলোকের বক্তব্য শুনে আমি হাঁ। সহসা বোধগম্য হল না কি তাঁর অভিযোগ। অভিযোগই বটে। তাজ্জব অভিযোগ।

ভদ্রলোকের বক্তব্য, আই. বি.'র কোনো পদস্থ অফিসার তাঁকে পাঠিয়েছেন। আজ পনেরো-বিশ দিন ধরে একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেকে এখানে ভর্তি করেছি আমরা। তার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সন্দেহ করা হয়েছে, অথচ এখনো এক্সরে পর্যন্ত হয়নি—এই সব ব্যাপারেই অনুসন্ধান করতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। অনুসন্ধান করে তিনি সেই অফিসারের কাছে রিপোর্ট দেবেন। ইতিমধ্যে চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতাল যদি একটু তৎপর হন, ভালো হয়।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল একেবারে। ওই মেয়ে, অমন নিরীহ চুপচাপ দেখতে, যাকে দেখলেও অকারণ ব্যথাব মত একটা অনুভূতি জাগে—সেই তৃপ্তি গাঙ্গুলী এই কাণ্ড করেছে। পুলিশ খোঁজ-খবর করছে জানলেই আমরা একেবারে ভযে দিশেহারা হয়ে ছেলের চিকিৎসা করব তাঁর! ওই ছেলেটার জন্য এরই মধ্যে যত করেছি, যত ভেবেছি, তেমন সচরাচর করিনে আমরা। তার ফলে এই। খুব সুবিধে দেখেছেন।

অবশ্য কর্মচারীটি একবারও বলেননি কার কাছ থেকে খবর পেযে অনুসন্ধান করতে এসেছেন। কিন্তু তৃপ্তি গাঙ্গুলী ছাড়া কাব মুখ থেকে আর এ ধরনের খবর পেতে পারেন? কাবই বা আর দায পড়েছে। হযত যোগাযোগ আছে কারো সঙ্গে, একটু বেশি সুবিধের আশায় এদিক থেকেও একটা মোচড দিযে রাখলেন।

প্রথমেই সব রাগ গিয়ে পড়ল ডক্টর ঘোষের ওপর। কার জন্যে এত করেছেন বুঝুন এবার, রমণী-অনুরাগের ফল দেখুন। সেটা বোঝাবার আর দেখাবার জন্যে কর্মচারীটিকে বসিয়ে আমি তখুনি ছুটলাম ডক্টর ঘোষের কাছে।

বুঝতে সময লাগল তাঁবও। বোঝার পরে তিনিও আমারই মত হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর আত্মস্থ হয়ে নির্দেশ দিলেন, যে এসেছে ডাকো, আর কাগজ-পত্র কি আছে নিয়ে এসো।

ছেলেটির কাগজ-পত্র সহ কর্মচারীটিকে নিযে এলাম তাঁর কাছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তখনো। আর সেই রাগটা গিযে পড়ছে ডক্টর ঘোষের ওপরেই। ডক্টর ঘোষ সেই কাগজ-পত্র দেখিয়ে শান্ত মুখেই কর্মচারীটিকে বুঝিয়ে দিলেন, চিকিৎসায অনাবশ্যক দেরি কোথাও হয়নি। যে-রোগের জন্যে ছেলেটিকে ভর্তি করা হযেছিল সেটা সেরে গেছে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সন্দেহ হয় গত শুক্রবার বিকেলে, শনিবার এক্সরে করা হয়, আজ রবিবার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, কাল সকালে রিপোর্ট আসবে।

ভুল খবরের জন্যে দুই একটা মামুলি অনুশোচনার কথা বলে কর্মচারীটি গাত্রোত্থান করলেন। আর যাবার আগে বলে গেলেন কেস্‌টা যেন আমবা একটু যত্ন নিয়ে দেখি।

ডক্টর ঘোষ জবাব দিলেন, দেখব। ভুল খবরটা আপনাদের কে দিয়েছেন?

লোকটি তাঁকেও বললেন না—বা বলতে পারলেন না কে দিয়েছেন।

পরদিন সকালেই এক্সরে রিপোর্ট পাওয়া গেল। সন্দেহ মিথ্যে নয়, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই।

রিপোর্টটা ডক্টর ঘোষের টেবিলে ফেলে এলাম। একটি কথাও বললাম না, অর্থাৎ, যা করার তিনিই করুন এখন।

তার ঘণ্টা তিনেক বাদেই তৃপ্তি গাঙ্গুলী এসে হাজির সেদিন। রিপোর্ট কি হয় জানার জন্যে ছুটি নিয়েই এসেছেন বোধহয়। মুখে নীরব উদ্বেগের চিহ্ন। কিন্তু আজ আর তা দেখে একটুও অনুকম্পা হল না আমার। আউটডোর পেসেন্ট বসিয়ে তাঁকে নিয়ে এলাম ডক্টর ঘোষের ঘবে। নিজে না"এলেও চলত, এলাম কারণ নিজের কানেই শোনার ইচ্ছে ছিল কি বলেন ডক্টব ঘোষ, কোন্ ধরনের অনুযোগ করেন।

কিন্তু ডক্টর ঘোষের আজকের অভ্যর্থনাটা অন্যরকম হল। মহিলার নমস্কারের জবাবে চোখ তুলে একবার দেখলেন শুধু। হাসলেন না, বসতে পর্যন্ত বললেন না। একটা স্লিপ লিখে দরোয়ানকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর এক্সরে রিপোর্টটা মহিলার দিকে ঠেলে দিয়ে শান্ত মুখে বললেন, আপনার ছেলেব যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তাই। আমরা আর্লি অপারেশন অ্যাডভাইস করে দিলাম—আর, এই আপনার ছেলের ডিসচার্জ কার্ড, এখনই নিযে যান।

ডিসচার্জ কার্ডের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশের আব যা কাগজ-পত্র ছিল সবই ঠেলে দিলেন।

তৃপ্তি গাঙ্গুলী ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। হকচকিয়ে গেছেন, ভয়ও পেয়েছেন বিষম। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায অপারেশন হবে?

পুলিসের কাছে গিয়ে খোঁজ করুন কোথায় অপারেশন হবে। আমরা জানিনে।

কোনো মেয়ের এমন হতচকিত, বিমূঢ় বিস্ময় আর বোধহয় দেখিনি। আবারও খানিক শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তৃপ্তি গাঙ্গুলী বললেন, এখানে হবে বলেছিলেন সেদিন...

আজ বলছি এখানে হবে না, আপনার ওই পুলিসের কাছে যান, তারা ব্যবস্থা করে দেবে। পরক্ষণে আমার দিকে চেয়ে ক্ষিপ্ত গর্জন করে উঠলেন, টেক হার অ্যাওয়ে প্লীজ, আই অ্যাম বিজ্ই নাউ! মহিলার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন আবার, আপনি আপনার ছেলে নিয়ে চলে যান, আর বিরক্ত করবেন না।

নিস্পন্দ মূর্তির মতই তৃপ্তি গাঙ্গুলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এতটা শুনব বলে আমিও প্রস্তুত ছিলাম না। বাইরে এসে দেখি, একজন নার্স ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে এসেছে। নিজের অগোচরেই যেন মহিলা এগিয়ে গিযে ছেলে নিলেন তার কাছ থেকে। তারপর আমার দিকে ফিরলেন। কথা বলার শক্তিও লুপ্ত মনে হল।

ফল তো হাতে হাতেই পেয়েছেন, আর রাগ পুষে কি করব। রীতিমত করুণ লাগছে ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করলাম, একটা রিক্‌শ ডেকে দিতে বলব?

শূন্যদৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে তিনি মাথা নাড়লেন শুধু। আমি ইঙ্গিতে একজনকে বললাম একটা রিক্‌শ ডেকে দিতে। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বারান্দার মাথায় দরজার কাছে এলেন। কথা বলার মত শক্তি সংগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি এভাবে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?

—আপনি বোঝেন নি কেন?

মাথা নাড়লেন তক্ষুনি, বোঝেন নি।

ছেলের চিকিৎসার গাফিলতি হচ্ছে বলে পুলিস পাঠিয়েছিলেন কেন?

—আমি! আবারও মনে হল এত বিস্ময় দেখিনি। অস্ফুট কাতরোক্তি করলেন, আমি পুলিস পাঠিয়েছিলাম!

আপনি না পাঠান, আপনার কথা শুনে আপনার আপনজন কেউ পাঠিয়েছেন। মনে পড়ছে?

আবারও মাথা নাড়তে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন যেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। কিছু একটা মনে পড়েছে বোঝা গেল। আর তারই ধাক্কা সামলাতে না পেরে দ্বিগুণ অসহায় আরো।

কোমল করেই বললাম, ছেলেটাকে আর কোনো হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে অপারেশনটা তাড়াতাড়ি করিয়ে নেবেন।

অনেক রোগী বসে, আর দাঁড়ানো সম্ভব হল না। চলে এলাম। কিন্তু মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। গর্জন ঘোষ একেবারে তাড়িয়ে দেবেন ভাবিনি। কোনো মেয়ের ওপর অন্তত তাঁকে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে কেউ কখনো দেখেনি।

দিন পাঁচেক পরে। সন্ধ্যার দিকে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে হাজির। আমারই খোঁজে এসেছেন শুনে ডেকে বসালাম। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, তৃপ্তি গাঙ্গুলী—যাঁর ছেলে আমাদের এখানে পেসেন্ট ছিল—তাঁর আত্মীয় তিনি। তাঁর বক্তব্য, একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে আমরা ছেলেটিকে ডিসচার্জ করে দিয়েছি, ওই মেয়েটির কোনো দোষ নেই।

আমি নিরুত্তর। নিস্পৃহ।

ভদ্রলোক জানালেন, ছেলেটিকে অমুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার ছাত্ররা পেট টিপে টিপেই ছেলেটাকে মেরে ফেলার দাখিল করেছে। ওইটুকু ছেলের ক্রনিক অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, তাদের শিক্ষার ব্যাপার—তারা এসে এসে পেট টিপবেই। ছেলেটা দিন রাত কাঁদে এখন, আর আপনাদের কথা বলে—ওখানে যাব। পেটে ভয়ানক ব্যথা।

শুনে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। ফ্রী বেডের রোগী ছাত্রদের হাতে পড়লে কি হয় আমার জানা আছে। আবার রাগও হল, বললাম, তা এখানে কেন, এখন সেই পদস্থ আই. বি. অফিসারকে হুমকি দিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠাতে বলুন না।

বিরস মুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আর নয় মশাই খুব শিক্ষা হয়েছে। সেই পদস্থ আই. বি. অফিসারটি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কিছু না ভেবেই লোক পাঠিয়েছিলাম খবর করতে। মেয়েটার একমাত্র সম্বল ওই ছেলে, পনেরো দিন ধরে হাসপাতালে আছে,অথচ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস মাত্র সেইদিন সন্দেহ করা হল—আগের অসুখের কিছু জানতুম না। ...লোক পাঠানোর ফল পেয়ে পেয়ে এমনই খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে, ভাবলাম কাউকে খবর করতে পাঠালে মেয়েটার যদি একটু উপকার হয়, হোক। আরে, আমাদের লোকগুলোও হয়েছে তেমনি, ধরতে বললে বাঁধতে যায়। সব আমাদের দোষ মশাই, মেয়েটার কোন দোষ নেই—সে বরং আপনাদের দয়ার অজস্র প্রশংসা করেছিল।

চুপ করে রইলাম। এও বানানো কিনা কে জানে! ভদ্রলোক দু'হাত ধরে অনুনয় করলেন, ছেলেটাকে আবার এখানে নিযে আসার অনুমতি দিন, ওখানে অপারেশন হলে বাঁচবে না।

জানালাম সেটা আর হয় না, আর. এস. ডক্টর ঘোষ রাজী হবেন না। পেসেন্ট তিনিই ডিসচার্জ করেছেন।

ভদ্রলোকের কাতর মিনতি, আমাদের দোষে ওই ছেলেটা মারা যাবে, দিন রাত অত কাঁদলে কাউকে বাঁচানো যায়! ওই দুঃখে মেয়েটার যে ওইটুকুই একমাত্র সম্বল, যা-হোক করে আপনারা বাঁচান, আমি জোড হাত করে ক্ষমা চাচ্ছি।

সত্যি সত্যি ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করলেন।

ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। ছেলেটার অসহায় অথচ দুষ্টু-দুষ্টু মুখখানা চোখের সামনে ভাসছে। একটু ভেবে বললাম, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু তাতে বোধহয় কাজ হবে না। আপনি মিসেস গাঙ্গুলীকে একবার আর. এস.-এর কাছে নিয়ে এসে বলে দেখুন।

ভদ্রলোক এবারে হাল ছাড়লেন। বললেন, অনেক চেষ্টা করেছি নিয়ে আসতে। ...পারা গেল না। বরাবরই ওই রকম, তা না হলে আর এভাবে জীবন কাটাবে কেন। মুখ বুজে ছেলে মরতে দেখবে, তবু না ডাকলে নিজে থেকে আর আসবে না।

এর পরে কথায় কথায় ছোট্ট একটু জীবনের অধ্যায় আহরণ করে নিতে বেগ পেতে হয়নি। দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করতে ভদ্রলোক নিজে থেকেই বলেছেন।

খুব নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এ-রকম ঘটনা অনেক শোনা আছে। তবু, ওই ছেলেকে দেখেছি আর ওই শূন্যতার বেষ্টনে তার মাকে দেখেছি বলেই হয়ত ভারী বেদনা-করুণ মনে হল আমার।

ভদ্রলোক মেয়েটির নিজের মেসো কিন্তু মেসো হয়েও তাঁর কোন উপকারে লাগতে পারেন নি। বরং উপকার করতে গিয়ে অপকারই করলেন শেষ পর্যন্ত। তৃপ্তি গাঙ্গুলীর স্বামী বেঁচে এবং মোটামুটি ভালো চাকরিই করেন। নিজের মায়ের অমতে ওই মেয়েকে ঘরে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন দু'দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটাই ঠিক

হল না। শাশুড়ী বউকে গঞ্জনা দিতেন, এমন কি পরে নির্যাতনও করতেন। তাঁরই হাতে সম্পত্তি বলে তাঁর জোরও ছিল। অর্থাৎ স্বামীটি লোক খারাপ নন, কিন্তু দুর্বল চরিত্রের মানুষ। মায়ের দাপটে মানুষ হলে যেমন হয়। ভেবেছিলেন, বউয়ের তোষামোদে মা শান্ত থাকবেন, সেই তোষামোদটাই বউয়ের দ্বারা হযে উঠল না দেখে উল্টে তিনিও বউয়ের ওপর বিগড়োতে লাগলেন। আর শেষে নির্যাতনের সঙ্গী হলেন মায়ের। তারই চরম পরিণতি এই। এক বছরের ছেলে কোলে করে তৃপ্তি গাঙ্গুলী পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বউয়ের তেজ দেখে স্বামী আর শাশুডী আগেব রাত্রিতে শাসিয়েছিলেন সকাল হলেই দূর করে তাড়ানো হবে তাঁকে। আর তাঁব মুখ দেখতে চান না কেউ।

মুখ আর দেখতে হযনি তাডাতেও হযনি। ভোর না হতে তিনি নিজেই ছেলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। কোন আত্মীযের কাছে যান নি, কারো মুখাপেক্ষী হন নি। স্বামী খোঁজ করেছেন, খোঁজ পেয়েছেনও। অনেক ভয দেখিয়েছেন, অনেক শাসিয়েছেন। কিন্তু তাতে ফল কিছু হযনি। তাছাডা স্বামীও নিরুপায, তাঁব মা বউ আর ঘরে নিতে রাজী নন, শুধু নাতিটি চান তিনি।

তৃপ্তি গাঙ্গুলী নিজেও আসেন নি, ছেলেও দেন নি। বাপ ছেলেটাকে ভালবাসতেন, মাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। কিন্তু তৃপ্তি গাঙ্গুলী ছেলে নিযে হঠাৎ একদিন অনেক দূরেই চলে গেলেন। কোথায় কেউ জানত না। ছেলে মানুষ কবাব ভাবনায মাত্র ছ-মাস হয আবাব এদিকে কাজ নিযে এসেছেন। তাঁব শাশুড়ী মাবা গেছেন। মেসো অনেকদিন অনুরোধ করেছেন, মধ্যস্থতার জন্যে নিজে তাঁব স্বামীব কাছে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তৃপ্তি গাঙ্গুলী একটা খবরও দিতে দেন নি।

কতক্ষণ বসে ছিলাম চুপচাপ, বলতে পারব না। ভদ্রলোক উসখুস করে উঠতে খেযাল হল। বললাম, আমি যতক্ষণ না ঘুরে আসি, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, হযত সময লাগবে একটু।

আশ্বাস পেয়ে ভদ্রলোক আশান্বিত।

আর. এস. নিজের কোয়ার্টারেই আছেন। কি-ভাবে কথাটা তুলব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। কোন কিছুতে একবার না করে বসলে আর তাঁকে হ্যাঁ করানো শক্ত। মেয়েছেলে বলেও আর খাতির করবেন বলে মনে হয় না, হয়ত শুনতেই চাইবেন না।

গিয়ে দেখি ইজিচেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন আর কি একটা ইংরেজী জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছেন। এতবড় ঘরে এখানেও যেন একটা শূন্যতা থমকে আছে। পড়ার সামনে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে একটা, বড় আলোটা নেভানো।

পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টি। বললাম, আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা আনতে বলুন, আজ সমস্ত দিনে ভালো চা আর জুটল না।

বেয়ারা ডেকে চা আনতে বলে আবার তাকালেন। শুধু চা খেতেই এসেছি তা ভাবেননি।

ভণিতা বাদ দিয়ে বলে বসলাম, শুনলেই আপনি আবার খোঁচা দেবেন, মাঝেসাঝে গল্প লিখি বলে তো যা-তা বলেন—কিন্তু একটা ডাক্তারী সমস্যার গল্প আপনাকে শুনতেই হবে, এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

শুনে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। হয়ত ভেবেছিলেন, তাঁর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে শুনে নিজের কিছু সুপারিশের আশায় এসেছি।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। কিন্তু চায়ের কথা আমার আর মনে ছিল না। গল্পটা বললাম। গল্পে কতকটা অতিশয়োক্তি ছিল বলতে পারি না, তবে আন্তরিকতা ছিল। কারণ, আই. বি. অফিসার ভদ্রলোকটির যতটা সময় লেগেছিল বলতে, আমার তার থেকে বেশি ছাড়া কম সময় লাগেনি।

বলা শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ নেই। ইজিচেয়ারে মাথা রেখে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়লেন কি-না সেই সন্দেহও হল একবার।

অপেক্ষা করছি।

নড়ে-চড়ে বসলেন একসময়, কিন্তু আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। বললেন, যিনি এসেছেন তাঁকে বলে দাও তৃপ্তি গাঙ্গুলী ছেলে নিয়ে আসতে পারেন।

খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করতে একটা দিন কেটে গেল—ডক্টর ঘোষ বলেন, এটা করো, ওটা দেখ। ছোট ছেলের জন্যে অত সব দরকার মনে হয় নি আমার। কিন্তু সে-সবে আমার নাক গলাতে যাওয়া উচিত নয় বলেই চুপ করে আছি। শুধু মনে হয়েছে, অপারেশনটা হয়ে যাওয়া উচিত। ছেলেটার ব্যথা আগের থেকে বেশ বেড়েছে।

ডক্টর ঘোষের হাব-ভাব একটু অন্যরকম। একটু গম্ভীর, একটু চিন্তাচ্ছন্ন। তাঁর হাতে এ-সব অপারেশন কখনো বড় অপারেশন বলে ভাবিনি আমরা। সাদা কথায়, আমার সন্দেহ হল, রমণী-হৃদয় জয়ের এ আবার কোনো নতুন পরিকল্পনা কি-না। বিশেষ করে যে-রমণীর হৃদয়টি সম্পূর্ণ-ই নিজের দখলে, অন্য কোন হৃদয়ে বাঁধা নয়। নইলে তৃপ্তি গাঙ্গুলীর সামনে এমন একটা সিরিয়াস ভাব করেন! সদয় ব্যবহার করেন, অভয়ও দেন, কিন্তু মহিলা খুব অভয় পান বলে মনে হয় না।

মহিলাটি এ-ক'দিন বোধহয় ছুটি নিয়েছেন, তিন বেলাই অনেকক্ষণ করে ছেলের কাছে থাকেন।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ডক্টর ঘোষ তাঁর সামনেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অপারেশান হবে, বণ্ড সই করে নিয়েছ? তৃপ্তি গাঙ্গুলীর দিকে তাকালেন, এর বাবা কোথায়, তাকে কখনো দেখলাম না—এখানে থাকেন না?

প্রশ্ন শুনে আমি তাজ্জব। মহিলা মূর্তির মত নির্বাক। আমি জানালাম, বণ্ড ইনিই সই করেছেন।

গতকাল সেই বণ্ড সই করানোর সময় মহিলাকে বোঝাতে হয়েছে, ভয়ের কোন কারণ নেই, যে-কোন অপারেশনের আগে হাসপাতালের এটা একটা ছক-বাঁধা নিয়ম।

ডক্টর ঘোষ যেন ধরেই নিলেন, ছেলেটার বাবা কলকাতায় থাকেন না। চিন্তিত মুখে বললেন, বাট হিজ ফাদার শুড বি ইনফরম্ড্, তাঁর জানা দরকার—তুমি একটা অফিসিয়াল ইন্টিমেশান পাঠিয়ে দাও।

পরীক্ষার নামে ঘুমন্ত ছেলেটাকে একটু নাড়া-চাড়া করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমার গা জ্বলতে লাগল, সব জেনেও এমন নির্লজ্জ অভিনয়ের হেতু আর কি হতে পারে।

মহিলা নিস্পন্দের মত বসে। অনেকক্ষণ বাদে আবার আমাকে দেখে দিশা ফিরল যেন। উঠে বারান্দায় এলেন, আমাকে বলবেন কিছু।

কাছে এসে দাঁড়াতে বললেন, আপনি বলেছিলেন, ভয়ের কিছু নেই, এখন তো মনে হচ্ছে ভয়েরই....

কি বলি? একবার ইচ্ছে হল ওই লোকটার ছলা-কলা সব ফাঁস করে দিই। সেটা সম্ভব নয়। বললাম, না তেমন কিছু নয়, তবে অনেক সময় গণ্ডগোল হয়, কৈফিয়ত দিতে হয় বলেই উনি জানিয়ে রাখতে বলেছিলেন...।

একটুও আশ্বাস পেলেন বলে মনে হল না। মুখ নীচু কবে ভাবলেন একটু, তারপর বললেন, উনি মিস্টার গাঙ্গুলী এখানেই থাকেন, অসুখের খবর জানেন না....আমার জানানোর একটু অসুবিধে আছে, আপনি যদি দয়া করে একটা খবর পাঠিযে দেন...।

বললাম, দেব, ঠিকানা বলুন।

ঠিকানা বলে সেই অসহায় চোখ দুটো আবার আমার মুখের ওপর রাখলে: ....হয়ত আসবেন না...তাহলেও জানানো দরকার, কি বলেন,?

জবাব দিতে পারিনি ঠিক মত। জবাব চানওনি হযত, নিজের সঙ্গেই ফয়সলা করে নিচ্ছেন। বললাম, চিঠি আমি পাঠাচ্ছি, আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না।

চিঠি পাঠানোর আগে পরদিন ডক্টর ঘোষের কাছে এলাম একটা বোঝাপড়ার মেজাজ নিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, আজও অপারেশন হবে না?

তিনি ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠি দিয়েছ?

—চিঠি দেওযাটা কি খুব জরুরী ব্যাপার?

—ইন দিস কেস্—ইয়েস।

—ওঁর স্বামী না আসা পর্যন্ত বা মত না দেওয়া পর্যন্ত অপারেশন করবেন না আপনি?

দেখা যাক না, চিকিৎসা তো অনেক করছ, এ-রকম চিকিৎসার চান্স ক-টা পাবে—একটা চিকিৎসায় দুটো রোগ সারতে পারে।

হঠাৎ আমিই যেন বোবা একেবারে। কি মতলব বুঝেও বুঝছি না। তিনি আবার বললেন, শী ইজ অ্যান ওয়াণ্ডারফুল লেডি—সিম্‌পলি ওয়াণ্ডারফুল!

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতে গেলাম, কিন্তু শিশুটির যে ওদিকে—

তিনি বাধা দিলেন, মাদার্স লাইফ ফার্স্ট!

আবারও বলতে চেষ্টা করলাম, এত দেরি হচ্ছে, ছেলেটার—

সঙ্গে সঙ্গে এবারে গর্জন করে উঠলেন গর্জন ঘোষ। —আই নো মাই জব, নাউ গেট আউট!

পরদিন।

ঘণ্টাখানেক বাদে অপারেশন হবে। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখাশুনা করছি। ডক্টর ঘোষও একবার এলেন দেখতে। তৃপ্তি গাঙ্গুলী স্তব্ধ বিবর্ণ মুখে ছেলের শিয়রের কাছে বসে। হঠাৎ মনে হল, তিনি যেন কি দেখে নড়ে-চড়ে সজাগ হলেন একটু।

ফিরে দেখি, দোরগোড়ায় বারান্দায় শুকনো মুখে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম কে ইনি। ডক্টর ঘোষের সঙ্গে চোখোচোখি হতে ইশারা করে দেখালাম।

ডক্টর ঘোষ সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন—হু আর ইউ? এখানে কি চান?

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক আমার চিঠিখানা বার করে দেখালেন।

—ও, আপনি এর বাবা? মনে হল ধরে দু'ঘা বসিয়েই দেবেন বুঝি ভদ্রলোককে। —ছেলে মরতে বসেছে, আর আপনি সেটা ছেলেখেলা পেয়েছেন কেমন? দ্বিগুণ গর্জন—নাউ গো অ্যাণ্ড সাইন দি বণ্ড!

গট্-গট করে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক পাংশু মুখে আস্তে আস্তে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তৃপ্তি গাঙ্গুলীর মুখ নীচু। ওষুধের ঘোরে ছেলেটা বেহুঁশের মত। পায়ের দিকে তার বাবা স্থাণুর মত দাঁড়িযে।

অপারেশন হয়ে গেল। সেই নিখুঁত সুন্দর অপারেশন। যেমনটি দেখে অভ্যস্ত আমরা। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে দূরে দূরে দুটি চেয়ারে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা—বোবা আকুতিতে নিস্পন্দের মত বসে।

আমি ওঁদের দিকে এগোতে যাচ্ছি, ডক্টর ঘোষ বাধা দিলেন, এক্ষুনি গিয়ে খুব একটা আশার কথা শোনানোর দরকার নেই। নিজে তাঁদের কাছাকাছি এসে আমাকে গম্ভীর নির্দেশ দিলেন, এমারজেন্সি কেবিনে নিয়ে যাবে, জেনারেল ওয়ার্ডে রেখো না।

তাঁদের দিকে দৃকপাত না করেই তিনি চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা ব্যাকুল মুখে এগিয়ে এলেন আমার কাছে, কাঁপছেন থর-থর করে, অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, ঘাবড়াবেন না, ঠিক আছে।

ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু ভরসা করে কাছে আসতে পারেন নি।

স্থানের অভাবে একটা ঘরের মাঝে নীল পরদা ফেলে দুটো কেবিন করা হয়েছে। তারই একটিতে ছেলেটিকে আনা হয়ছে। জ্ঞান ফিরতে এখনো দেরি। দু'দিকের দুটো চেয়ারে তার মা আর বাবা বসে। নির্বাক আমি মাঝে মাঝেই এসে দেখে যাচ্ছি। নয়ত কাজের অছিলায় পরদার এপাশে এসে দাঁড়াচ্ছি। একটা কথারও বিনিময় শুনিনি।

যথাসময়ে ছেলের জ্ঞান ফিরল। তাঁরা দু'জনেই ঝুঁকে এলেন সামনে। আমি কর্তব্য-রত। আবার ঘুমের ওষুধ দিলাম। দিয়ে পরদার এধারে এসে বিশ্রামের জন্য বসলাম।

অনেকক্ষণ বাদে পরদার ওধার থেকে ভদ্রলোকের মৃদু গলা শোনা গেল, কেমন আছ?

—ভালো। আরো শান্ত, আরো অস্ফুট নারী-কণ্ঠ।

স্বল্পক্ষণের নীরবতা। —এতখানি হয়েছে, তবু আমাকে একটা খবর দিলে না!

দুপুরে একবার এসে দেখলাম, চেয়ার দুটো ছেলেটার একদিকেই, আগের মত দু'দিকে নয়। একটু দূরে অবশ্য। বিকেলের দিকে দেখা গেল, ঘরের বাইরের বারান্দায় কার্ণিশ ধরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আকাশ দেখছেন দু'জনে।

পায়ের শব্দে সচকিত হলেন। ডক্টর ঘোষ আসছেন রোগী দেখতে। হাসিমুখে ভদ্রলোকের দিকে জ্রক্ষেপ না করে তৃপ্তি গাঙ্গুলীর কাঁধ ধরে ঘরে ঢুকলেন তিনি। আমি দেখলাম, কিন্তু গোড়ার দিনের মত আমার আর চোখে কাঁটা বিঁধল না।

বোগী দেখে ডক্টর ঘোষ আরো খুশি। দু'জনের উদ্দেশ্যেই বললেন, আপনারা আজ রাতটা রোগীর কাছে থাকতে পারেন, আই থিঙ্ক ইউ শুড।

বাইরে এসে তিনি আমাকে বললেন, কি-হে, আমার চিকিৎসা তোমার পছন্দ হচ্ছে?

আমি হেসেছি। হাসতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিজের চোখের কোণ দুটো কেমন শিরশির কবছে বলেই অস্বস্তি।

রাত্রিতে ভদ্রলোককে দেখলাম না কিছুক্ষণের জন্য। পরে দেখলাম। হাতে একটা টিফিন-ক্যারিযার।

আব একদিন।

. ছেলে সহ ডক্টব ঘোমের.ঘরে বিদায নিতে এলেন তারা। আমিই নিয়ে এসেছি। ডক্টর ঘোষ সাদরে বসতে দিলেন তাঁদের। হাসিখুশি দেখলে মনে হবে এমন একটা কেস্ শিগ্গীর সারান নি র্তিনি। ছেলের খাওয়া-দাওযা যত্ন-বিধির ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করে ফেললেন। খুব সাবধানে রাখতে হবে, এই সমযটাই নাকি ভয়ের। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে হঠাৎই বলে বসলেন, তারপর, ও-কোন মিশনে থাকত শুনলাম, মিশনে দিযেছেন কেন, খুব দুষ্টু বুঝি?

ভদ্রলোকের বিব্রত মুখভাব-টুকু উপভোগ্য। মহিলার মুখেও হাসির আভাস। ডক্টর ঘোষই আবার বলে উঠলেন, ও-সব মিশনটিশন এখন চলবে না, নিজেদের কাছেই রাখুন।

ভদ্রলোক তাডাতাড়ি বললেন, না, নিজেদের কাছেই থাকবে।

—গুড! আর সপ্তাহে একবার করে এনে চেক করিয়ে নিয়ে যাবেন—চার মাস পর্যন্ত। আমার দিকে তাকালেন, চার মাসই যথেষ্ট—কি বলো?

তাঁর সকৌতুক দৃষ্টি এডিয়ে অন্য দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখেই মাথা নাড়তে চেষ্টা করেছি। চার মাস ছেড়ে চারদিনই যথেষ্ট, সে আর বলি কি করে।

ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার বিদাযী কৃতজ্ঞতার আভাস পাওয়া মাত্র ডক্টর ঘোষ আমাকে দেখিযে দিলেন—ওই ওখানে, ওঁর জন্যেই আপনারা সব ফিরে পেযেছেন—হি

টুক অ্যাক্‌টিভ ইন্টারেস্ট।

হাসতে লাগলেন। আমিও চেষ্টা করেছি হাসতে। কিন্তু কারো দিকে চোখ ফেরাতে পারি নি। আমার নার্ভ দুর্বল—চোখ দুটো বোধহয় আরো বেশি দুর্বল।

গাড়ি ছেড়ে গেল। একজন বলল, বাঁচা গেল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখছি। আর ভাবছি, এখান থেকে বম্বে বেশ দূরে। বম্বে থেকে বিলেত আরো অনেক—অনেক দূরে। তারপর দুটো বছর তো আরো কতদূরে। ...ভদ্রলোক ফিরে এলে আবার তাঁর পায়ের কাছে বসে কাজ করতে পাব কিনা কে জানে!

বট-জাঙলের বাঁক

মেজাজ দেখে আজ কেন কে জানি হঠাৎ মেজাজ চড়ল বিন্দু বউয়েরও। জিনিসগুলো দাওয়ার ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে প্রায় সমান ওজনের জবাব দিয়ে বসল, সাত সকালে উঠে ধার্মিক লোককে গালমন্দ করতে লজ্জা করে না! এই না হলে এমন অদৃষ্ট হবে কেন, নিজে না খেয়ে আধপেটা খেয়ে রোগা দেহে যে মানুষটা এত করছে, উঠতে বসতে তাকে জিভ নেড়ে গাল পাড়লে ভগমান সয়, না তার ভালো হয়।

গণেশ হাজরা ঘরের ভিতর থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। দেখল একটু। —কি বললি?

বিন্দুবউ চমকে ফিরে তাকাল। দাদা যা পাঠিয়েছে, দিন তিনেক নিশ্চিন্ত। চাল ডাল তেল বাগানের তরি-তরকারী, কাঁচা পেঁপে কলার কাঁদি—সব একধারে গুছিয়ে রাখতে রাখতে কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল তার। ঠিক সেই মুহূর্তে দাদার প্রতি টিপ্পনীটা সহ্য হয়নি। তাই বলে ফেলেছে। কিন্তু এই কণ্ঠস্বরও চেনে আবার।

যা বলেছে সেটা ফিরে আর বলার দরকার হয়নি। গণেশ হাজরাও শুনতে চায়নি। গোল গোল দুই ক্ষুদে চোখ দুটো পাথরের টুকরোর মত বিন্দুবউয়ের মুখের উপর আটকে রইল খানিক। বিড়বিড় করে শুধু বলল, উপোসে বড় ভয়, কেমন?

পরমুহূর্তে এই ভয়টাই যেন একেবারে তচনচ করে নির্মূল করে দিতে চাইল গণেশ হাজরা। আনাজ-পাতি সব ছিটকে-ছটকে উঠোনের ওপর পড়তে লাগল, এক লাথিতে অমন ভর-ভরতি চালের ডালাটা উল্টে গেল। সংহার পর্ব এখানেই শেষ হত না হয়ত। পায়ে লেগেছে।

গণেশ হাজরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাপের মূর্তি দেখেই ছেলেমেয়েগুলো ঘরের ভিতর সেঁধিয়েছিল। দাওয়ায় শুধু

গণেশ হাজরা আর বিন্দুবউ। বউয়ের দুই চোখে নির্বাক ধিক্কার উপচে উঠছে। সেটুকুও বরদাস্ত করার কথা নয় গণেশ হাজরার। কিন্তু পায়ের হাড়টা খচখচ করছে।

বিন্দু কই রে, গণেশ আছে?

যে-লোকটাকে কেন্দ্র করে সকালের এই খণ্ড-প্রলয়, তারই গলা।

বিন্দুর দাদা নিবারণ ঘোষ। রোগা ঢ্যাঙা মূর্তি, বুক-পিঠ বেষ্টন করে এক বিঘৎ চওড়া বিবর্ণ ব্যাণ্ডেজ একটা। মানুষটাকে দেখার আগে ব্যাণ্ডেজটার দিকে চোখ যায়। বুকের ওপর মস্ত অস্ত্রোপচার হয়েছে, বাঁচবে আশা ছিল না। তিনমাস শয্যাশায়ী ছিল। মাস খানেক হল লাঠি ভর করে চলাফেরা করছে। পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হলেই নিবারণ ঘোষ দুঃখ করে, বুকটাকে একেবারে ফালা ফালা করে দিয়েছে, অর্ধেক মাংস খুবলে নিয়েছে, এমন বাঁচা বেঁচে আর সুখ কি বলো।

নিবারণ ঘোষ হাঁ করে উঠোন আর দাওয়ার অবস্থান দেখল চেয়ে চেয়ে। গণেশের মুখের ওপর চোখ পড়তেই ব্যাপার বোঝা গেল। নিস্পন্দ কঠিন পাথরের মূর্তি একখানা। বিন্দু মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে কান্না চাপার চেষ্টায অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

নিবারণ ঘোষ মোটা লাঠিটা কোলে ফেলে দাওয়ার ওপর বসল। সকাল বেলাই এই সংহার-পর্ব কেন, একবাবো জিজ্ঞেস করল না। গণেশের চণ্ডাল রাগ জানে। বলল, তোর কাছেই এসেছিলাম রে গণশা, একটা খবর আছে।

এই মুহূর্তে এই একজনের মুখ থেকে অন্তত কোনো খবব শোনার আগ্রহ গণেশ হাজরার ছিল না। দাঁড়িয়েই থাকত, অথবা ঘবেব ভিতর চলে যেত। কিন্তু পায়ের হাডটা বড বেশি খচখচ করছে। আস্তে আস্তে সেও বসে পডল। রূঢ় নিস্পৃহ মুখে আর একদিকে চেয়ে রইল সে।

কান্না চাপতে না পেরে বিন্দু চলে যাবার জন্যে পা বাডিয়েছিল। কিন্তু দাদার মুখে খবর আছে শুনে শোক ভুলে সেও দাঁড়িয়ে গেল আবার।

নিবারণ ঘোষ সোৎসাহে খবরটা দিল এবার। বলল, কাল দশ বারোজন কর্মচারী এক হয়ে ছোট ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করেছে শুনলাম, মাপ টাপ চেয়েছে—ছোট ইঞ্জিনীয়ার আবার তাদের কাজে নেবে বলেছে। ...আমি বলি কি, তুইও একবার যা, গিয়ে দেখা কর, মুখে দুটো নরম কথা বলতে দোষ কি? বিপদে অমন কত বলতে হয়—

সঙ্গে সঙ্গে সাপের মত ফুঁসে উঠল গণেশ হাজরা, পারলে তাকেই ছুবলে দেয়। —আমার ভাবনা তোমায় কে ভাবতে বলেছে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।

বিরক্তিতে শীর্ণ মুখ কুঁচকে গেল নিবারণেরও। বলল, ওই মেজাজের গুমোরেই গেলি তুই, যা হবার হয়ে গেছে, সবাই এখন যে-যার ফাঁড়া কাটাবার জন্যে ছোটাছুটি করছে—আর তুই শুধু মেজাজ দেখিয়ে ঘরে বসে থাকবি? কর্তারা তোর আমার মেজাজের ধার ধারে এখন! ....যা বলি তোর ভালোর জন্যে বলি—

গণেশ হাজরা গজরে উঠল, অসুখের দোহাই দিয়ে তুমি তো নিজের ভালোটি

দিব্বি বুঝেছ, ঘরে গিয়ে এখন সেই আনন্দে নাচ গে যাও—আমার ভালোর জন্যে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

রাগ সামলে আর বসে থাকা সম্ভব হল না তার পক্ষে, উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের ভিতর চলে গেল।

নিবারণ বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করল, পায়ে কি হল আবার?

বিন্দু নিরুত্তর।

বোনের উদ্দেশে নিবারণ ঘোষ এবারে ফিস ফিস করে পরামর্শ দিল, যা হোক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠা ওকে—দেখা করে আসুক। সকলেই তাই করছে, একেবারে বরখাস্ত হয়ে গেলে তখন আর কিছু হবে না। এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা, তাদের মুখ চেয়ে একটু বুঝে-শুনে চলতে বল্ এখন।

যাবার জন্যে নিবারণ ঘোষ দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। ছড়ানো আনাজপাতির দিকে চোখ পড়তে থমকাল একটু।

—ভালো কথা, বোনের দিকে ফিরল আবার, পুকুরে জাল ফেলতে বলে এয়েছি—ভাগ্নে ভাগ্নিদের সক্কলকে পাঠিয়ে দিস, দুপুরে আমার ওখানে খাবে।

রেল-কারখানার ফীটার গণেশ হাজরা। লেখাপড়া শিখেছে কিছু, মুখ্যু নয় নিবারণ ঘোষ বা আর দশজন মেহনতী মানুষের মত—মনে মনে সেই গর্ব আছে। আর, লোকটাও একরোখা বেপরোয়া গোছের। নিজেদের ভালোমন্দ সুখসুবিধে বোঝে, নরম-গরম যুক্তি তর্কে সহকর্মীদের তা বোঝাতেও পারে। ইউনিয়ানের পাণ্ডা গোছের লোক সে, সম পর্যায়ের বা নিচের পর্যায়ের কর্মচারীরা রীতিমত সমীহ করে তাকে, মান্যিগণ্যি করে।

করে না, করত।

হঠাৎই যেন বড় রকমের ভূমিকম্প হয়ে গেছে একটা। অকল্পিত বিস্ফোরণে এতদিনের একটা নিরাপদ সংহতি খান খান হয়ে গেছে। মানুষের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত শত-সহস্র জনের একটা মিলিত ইচ্ছার বেগ ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। এমন হবে কেউ ভাবেনি। উদগ্র উদ্দীপনার আলোটা এ-ভাবে নিভবে কেউ কল্পনা করেনি।

কিন্তু যা ভাবেনি তাই হয়েছে। যা কল্পনা করেনি তাই হয়েছে।

দেশব্যাপী ধর্মঘট ভেঙে গেছে।

ধর্মঘট যারা করেছিল, আপাতত তাদের মেরুদণ্ডও ভেঙেছে।

আগে এত কদর ছিল গণেশ হাজরার, এত খাতির ছিল সকলের কাছে—এখন তার বিপরীত। সকলে এখন এড়িয়ে চলে তাকে, তার সঙ্গে চোখের চেনাটাও খুব যেন নিরাপদ নয় এখন। যে-যার প্রাণের দায়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর মত্ত হাতীর ক্ষেত চষার মত বড় কর্তারা চষে-পিষে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে এদের! ছাঁটাই বাছাই ইম্বিতম্বির ধুম পড়ে গেছে। সেই দিশেহারা ঘূর্ণীপাকে উঁচু মাথা আর একটাও নেই।

ক'দিন আগেও ওই ছোট ইঞ্জিনীয়ার সাহেবই গণেশ হাজরাকে ডেকে কত মিষ্টি

কথা বলেছিল, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছিল, উন্নতির লোভ দেখিয়েছিল। সেই ছোট ইঞ্জিনীয়ারেরই সংহার মূর্তিটা সব থেকে ভয়াবহ এখন।

শ্রমিকদের মধ্যে সাময়িক বরখাস্তের তালিকায় একেবারে গোড়ায় নাম গণেশ হাজরার। সাময়িক বরখাস্ত, কারণ, গণেশের পাকা চাকরি, বিধিবদ্ধ বিচার-বিবেচনার আগে একবারেই চাকরিটা খতম করে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিচারের ফলাফলটা কি হবে সেটা সহজেই আঁচ করতে পারে সকলে। মাস গড়িয়ে গেল, বিচারের প্রহসন শুরুই হয়নি এখনো।

নিবারণ ঘোষ শান্টিং মিস্ত্রী। গণেশের থেকে ছোট চাকরি। কিন্তু তারই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে রেষারেষি লেগেই আছে। বোনের বিয়ে দিয়ে একোবারে মাথা কিনেছে যেন। আর পাঁচজনের মত মান্যিগণ্যি করা দূরে থাক, সকলের সামনেই যখন তখন উপদেশ দেবে, তত্ত্বকথা শোনাবে। গণেশের মর্যাদায় লাগে, মনে মনে মুখ্যু বলে গাল দেয়, মুখেও ঝাঁঝালো পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়। ফলে বচসা হয়, তর্কাতর্কি হয়। গণেশ বলে, মিস্ত্রীগিরি করে আর নীতি ফলাতে এসো না এখানে, তোমার নীতি ঝুলি ধুয়ে নিজেই জল খাওগে যাও।

এই এতবড় হুলুস্থূল ব্যাপারটার মুখেই তো একহাত হয়ে গিয়েছিল গণেশের সঙ্গে। নিজের বাড়িতে আর বিশ পঁচিশজন সহকর্মীকে ডেকে এনে ধর্মঘটের নেতারা কি কি নির্দেশ দিয়েছে বোঝাচ্ছিল। মাস দেড়েক আগের কথা, নিবারণ তখন চলতেও পারে না ভালো করে, বুকের ক্ষতও একেবারে কাঁচা। বাড়িতে মিটিং বসেছে খবর পেয়ে সেই অবস্থাতেই এসে হাজির। আরও বচন শুনে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল গণেশের। বলেছিল আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে ভালো করে ভেবে দ্যাখরে গণশা, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা তোর— ভালো হল তো ভালো, মন্দ হলে যে সব্বনাশ।

রাগে অপমানে গণেশ ক্ষেপেই গিয়েছিল সেদিন। ওই রোগা পটকা শরীরটা আলতো করে তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। তা পারেনি, কিন্তু বচনের ছপ্‌টি সেও বসিয়েছে গোটাকতক। বলেছে, এখানে বললে—বললে, আর কোথাও মুখ খুলেছ কি আমার সম্বন্ধী বলে কেউ খাতির করবে না তোমাকে—বুক কাটিয়ে বেঁচে গেছ ভাবছ, তাই ভাবো গে যাও— যেখানে সেখানে উপদেশ ঝাড়তে গেলে গলাটা যাবে!

নিবারণ অবাক, যেখানে সেখানে আবার কি, আমি তো তোদের বললাম, আমি কি দলছাড়া!

দল ছাড়া নও, কেমন? হিস হিসিয়ে যেন ছোবল মারার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল গণেশ হাজরা, তাহলে লিখে দাও তুমিও দলে আছ আমাদের, ছুটিতে আছ তো আছ তাতে কি—সব্বাই মাথায় তুলে নাচবে তোমাকে।

বোকার মত হেসেছিল নিবারণ ঘোষ।—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি গেছে রে গণশা, আমি কি লিখতে জানি যে লিখে দেব! আর, মাথায় তুলে নাচলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত

ছুটবে না বুক দিয়ে? তিন-তিনটে হাড তুলেছে, একটা দুটো নয়—

ভালোয় ভালোয় যাবে তুমি এখন এখান থেকে?

হুংকার শুনে ঘরের ভিতরে বিন্দুবউও চমকে উঠেছিল।

দফায় দফায় গরম চুন-হলুদ লাগনোর ফলে গণেশের পাযেব ব্যথা কমেছে একটু। সেই সঙ্গে রাগটাও পড়েছে। বিন্দু এই প্রতীক্ষাতেই ছিল। অনেক অনুনয করল, অনেক বোঝাল। —দাদার কথা শোনো, একবারটি গিযে মনিবেব সঙ্গে দেখা করে এসো—কচিকাচাগুলোর মুখ চেযেও যাও একবার।

কিন্তু ফল কি হবে জানলে বিন্দুবউ তাকে যেতে বলতো না বোধ হয।

কচিকাচাগুলোর মুখ চেযেই গণেশ হাজরা ছোট ইঞ্জিনীযার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দেখাও করেছিল।

অফিস পর্যন্ত যেতে হয়নি। গণেশ রেললাইন ধরে চলেছিল। একটা ট্রলি আসছে দেখে দাঁড়িযে পড়ল। ট্রলির প্রধান আরোহীকে দূর থেকেই চিনেছে। তারই কাছে আবেদন পেশ করতে চলেছে সে। ছোট ইঞ্জিনীযার লাইন দেখতে বেরিযেছে। গোলযোগের পর ঘটা করে বুক ফুলিযে লাইন দেখাটা বেড়েছে।

গণেশ হাজরা জানে তার শত অনুরোধেও ওই ট্রলি এক মুহূর্তের জন্য এখানে দাঁড় করানো যাবে না, হাত জোড় করলেও না। তার মানে আজ আর দেখা হবে না ছোট ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু গণেশ হাজরা আজ দেখা করতে এসেছে, আজই দেখা করবে। যে-দুর্বলতা আজ ওকে এ পর্যন্ত ঠেলে পাঠিয়েছে, কাল আর সেটা নাও থাকতে পারে। কাল আবার খুন চাপতে পারে মাথায় , যেমন প্রত্যেকদিন চাপছে।

হাত দুই তফাতে ট্রলিটা থামল।

না থেমে উপায় নেই, কারণ গণেশ হাজরা দুই লাইনের মাঝে পাথরের মূর্তির মত পথ আটকে দাঁড়িযে আছে।

ছোট ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া দু'জন বাবু কর্মচারী আর দু'জন কুলী ছিল ট্রলিতে। তারা হতভম্ব। লোকটার আস্পর্ধা দেখে ধারালো ক্রূর হয়ে উঠেছে ছোট ইঞ্জিনীযারের দুই চোখ। অটল গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা, করাল, কি চাই?

বিচার হুজুর, আমার বিচারটা করে দ্যান, একমাস হয়ে গেল! অনেকের বিচার হযে গেছে, তারা কাজে লেগেছে—আমার হচ্ছে না কেন?

হিংস্র ক্রোধে ছোট ইঞ্জিনীযার তক্ষুনি বিচার করল। তার হাতে ছিল চামড়া মোড়া লকলকে শৌখিন ছড়ি। সেটা গণেশের পিঠে আগুন ছড়িয়ে দিল দুই প্রস্থ। লম্বা দুটো দাগ পিঠ কেটে বসে গেল। বিচার পেযে গণেশ হাজরা লাইন ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ট্রলি চলে গেল।

গণেশ বিচারের আশায় গেছে খবর পেয়ে নিবারণ ঘোষ আগে ভাগেই বোনের কাছে এসে বসেছিল। বিন্দুকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ভাবিস না, ওপরঅলা আছেন তো রে—

গণেশকে এরই মধ্যে ফিরে আসতে দেখে দু'জনেই অবাক! খবর জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে নিবারণ থমকে গেল। একটা পাথরের মূর্তিতে ধকধক করছে শুধু দুটো জ্যান্ত চোখ।

নিজের অগোচরে শুকনো গলায নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, দেখা করলি?

জবাবে গণেশ আগুনের মত চোখ দুটো তাব মুখেব ওপর রাখল খানিক, তারপর জামা তুলে পিঠটা দেখিযে দিল।

নিবারণ শিউরে উঠল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল বিন্দুবউ।

দিন চারেক পরে।

দুপরের খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে ঘন্টাখানেক ঘুমোয় নিবারণ। কিন্তু ঘুমটা ঠিক যেন হচ্ছে না। চোখ বুজলেই কি একটা অশুভ ছায়া ভাসে সামনে। ভাবল, দুর্বল শরীর, তাই মনটা খারাপ, সেই জন্যেই এমন হচেছ।

হঠাৎ হাউমাউ করে বিন্দু এসে কেঁদে পড়ল, আজই কিছু একটা সর্বনাশ হবে দাদা, শিগগীর দেখো কোথায় গেল!

নিবারণ ঘোষ বিষম চমকে উঠেছিল। বিন্দুকে টেনে বসিয়ে ঠাণ্ডা করে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করল। শুনল যা, তারও গায়ের রক্ত হিম। গণেশের অসাধ্য কর্ম কিছু নেই।

বিন্দু যা বলেছে তার সার কথা, ক'দিন ধরেই মানুষটা কিসের জন্যে যেন নিঃশব্দে প্রস্তুত করেছে নিজেকে। একটা কথা বলেনি, একটা কথারও জবাব দেয়নি। আজ শুধু সকাল থেকে হেসেছে, বিন্দুকে ঠাট্টা করেছে, অমন মামা থাকতে ছেলেপুলের জন্যে তোর ভাবনা কি? তারপর বলেছে, ছোট ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কলকাতা গেছল, আজ দুপুরের মেলে ফিরেছে—বড় জংশনে যাবে। গণেশ বলেছে, বড় জংশনে যাবে কি কোথায যাবে কে জানে—মস্ত বড় জংশনেই যাবে বোধ হয়। বলেছে আর হেসেছে। অমন অস্বাভাবিক হাসি বিন্দু আর দেখেনি। দুপুর হতে রেঞ্জ আর হাতুড়ী নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল—কিছু বলল না কোথায় গেল, আটকানও গেল না তাকে!

কি করবে না করবে, কোথায় খুঁজবে, না ভেবেই নিবারণ ঘোষ জামাটা গায়ে পরে লাঠি হাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। নিজের অজ্ঞাতে রেল লাইনের দিকেই চলেছে। বুকের ভিতরটা কাঁপছে ঠকঠক করে। ভাবতেও পারছে না কিছু সুস্থ মাথায়,

এলোমেলো চিন্তাগুলো যেন হঠাৎ হঠাৎ মগজে গিয়ে বিঁধছে। ছোট ইঞ্জিনীয়ার মেল ট্রেনএ আসছে ...বড় জংশনে যাবে ...ঘণ্টা দেড়েক বাদে মেল ট্রেন একটা আসবে বটে। কিন্তু তাতে কী? গণেশ গেল কোথায়? রেঞ্জ-হাতুড়ী কেন? কাজ তো কিছু নেই এখন, তবে রেঞ্জ-হাতুড়ী কেন?

কেন? কেন? কেন?

মাথা খুঁড়ে এই কেনর জবাব খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল নিবারণ। হঠাৎই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর।

অন্তস্তলের কে যেন তাকে বলে দিল, বট্-জাঙলের বাঁকে যাও। সেইখানে পাবে।

বট্-জাঙলের বাঁক!

মনে হতেই সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল নিবারণের। গোলযোগের সময়ে ওই বট্-জাঙলের বাঁকে কিছু একটা অঘটন-ঘটানোর চাপা সংকল্প অনেকবার কানে এসেছে তার। ধর্মঘটের সময় গায়ের জোরে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করলে ওই বট্-জাঙলের বাঁক আর পেরুতে হবে না, শলাপরামর্শের এই চাপা আস্ফালনটা চাপা ছিল না একেবারে।

নিবারণ যেখানে দাঁড়িয়ে, কম করে ছ-মাইল পথ বট্-জাঙলের বাঁক। দু'দিকে দুই সারি মস্ত বট গাছের টানেলের মত একটা, তার মাঝখান দিয়ে রেললাইন বৃত্তকারে ঘুরে গেছে। বৃত্তের এ-মাথা থেকে বটের আড়ালের ও-মাথা দেখা যায় না—এমনই বাঁক সেটা। বটের ছায়ায় আর দু'ধারের জঙ্গলের ছায়ায় দিনের বেলায়ও জায়গাটা অন্ধকার-অন্ধকার।

ছ-মাইল পথ নিবারণ কি করে এলো, কতক্ষণে এলো জানে না। নিজের হৃৎপিণ্ডের ধপধপানি নিজের কানে শুনেছে আর হেঁটেছে। শুনেছে আর দৌড়েছে।

কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছে না। কিছুই দেখতে পাচেছ না।

হঠাৎ বাঁকের ও-মাথায় ঠং করে একটা আওয়াজ কানে এল। তারপর, পর পর কয়েকটা। স্তব্ধ নির্জনতায় সেই আওয়াজ নিবারণের হৃৎপিণ্ডে এসে বাজল। নিবারণ অচেতন, বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই তীরের মত বাঁকের ও-মাথায় ছুটল সে।

পর পর লাইনের দুটো বোল্ট খুলে ফেলেছে গণেশ, আর একটায় হাত দিয়েছে। নিবারণ দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে, টেনে সরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ, গণেশ, গণশা—এ কাজ করিস নারে, গণশা, এমন সর্বনাশ করিস না।

মাত্র দুই এক মুহূর্তের জন্য থামল গণেশ হাজরা। বাধাটা অপ্রত্যাশিত। তারপরেই এক ধাক্কায় প্রায় হাত দশেক দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল নিবারণ। বুকের ক্ষতটা খচখচিয়ে উঠল, কিন্তু নিবারণের সেইদিকে হুঁশ নেই।

আঘাত সামলে উঠে আবার আগেই ঠং করে এক আসুরিক ঘায়ে রেঞ্জ ঘুরিয়ে আর একটা বোল্টও ঢিলে করে ফেলল গণেশ হাজরা। তারপর হাতুড়ী হাতে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

ত্রাসে উত্তেজনায় লাইনটা এক পলকে পরীক্ষা করে নিল নিবারণ ঘোষ। ইঞ্জিনের চাপ পড়লেই লাইন সরে যাবে। তারপর? তারপর কি হবে?

জঙ্গলের দিকে চেয়ে পাগলের মত চিৎকার করে গণেশকে ডাকতে লাগল সে। —গণেশ। ওরে গণেশ আয। মেল যে এসে পড়বে এক্ষুনি। গণেশ আয়, দু'জনে আমরা লাইন ঠিক করে রাখি, কেউ জানবে না, কাকপক্ষীও টের পাবে না—গণেশ আয়, গণেশ আয়।

কিন্তু লাইন ফিরে আসাব ঠিক করে রাখবে বলে এ-কাজ করেনি গণেশ হাজরা। ভরা নির্জনতায কান্নার মতই নিবারণের ডাকগুলো গুমরে গুমরে উঠল শুধু। গণেশের চিহ্নও নেই।

দু'হাতে পটাপট মাথার চুল টেনে ছিঁড়ল নিবারণ ঘোষ। কি করবে সে এখন? কি করবে? রেঞ্জটা ফেলে গেছে গণেশ। শুধু হাতেই সেই রেঞ্জ লাগিযে বোল্ট ঘোরানোর জন্যে ধস্তাধস্তি করল খানিক। অন্য সময আর কাউকে এমন অসম্ভব চেষ্টা করতে দেখলে সে হেসে গড়াত। বোল্ট খুলতেও আসুরিক শক্তি দরকার, গণেশের সেই শক্তি ছিল বলে, আর সঙ্গে হাতুড়ী ছিল বলে পেরেছে।

পাগলের মতই রেললাইনে কান পাতল নিবারণ। গাড়ি আসছে কিনা ঠিক বুঝছে না। না এলেও দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে তো যাবেই। তারপর? তারপর নিবারণ ঘোষ চেয়ে চেয়ে সেই অঘটন দেখবে? সেই বিভীষিকা দেখবে? চোখের সামনে শত শত মানুষের মৃতদেহ দেখবে? ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখবে? হাহাকার শুনবে?

লাল নিশান। একটা লাল নিশান পেলে হত। পাবে কোথায়?

বুকের কাছটা চটচট করছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখ গেল তার। গণেশের ধাক্কায মুখ থুবড়ে পড়ে, আরো, শুধু হাতে রেঞ্জ নিযে ঝাঁকাঝাঁকির ফলে বুকের ক্ষতর ওপর ব্যাণ্ডেজটা জবজবিয়ে উঠেছে—গাযের জামাটাও চটচট করছে।

কি মনে হতে স্থির নিস্পন্দের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িযে রইল নিবারণ ঘোষ। পরক্ষণে বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল সে। একটা ষষ্ঠ অনুভূতি যেন তাকে বলে দিল, এইবার মেল আসছে, এইবার যা হবার হবে।

এক নির্মম সংকল্পে সেই মুহূর্তে গাযের জামাটা খুলে ফেলল নিবারণ ঘোষ। রক্তে আধ-ভেজা ব্যাণ্ডেজটা টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলল। বাঁ হাতে লাঠিটা তুলে নিল, ডান হাতে রেঞ্জটা।

রেঞ্জের আঘাতটা ঠিক মতই বসেছে। গলগলিযে রক্ত ছুটেছে বুক দিয়ে। নিবারণ ঘোষ জামা চেপে ধরল তার ওপর।

বহু দূরে বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে একটা ট্রেন আসছে।

লাঠির মাথায় লাল নিশান নাড়ছে, নিবারণ ঘোষ। প্রাণপণ শক্তিতে দুই পায়ের ওপব দেহটাকে খাড়া রাখতে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না, পা টলছে, সর্বাঙ্গে থব থর কাঁপুনী, চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার।

নিবারণ ঘোষ লাইনের ওপর বসে পড়ল। দুই হাতে লাঠি আঁকড়ে বিপদের সংকেতটা উঁচিয়ে ধরে আছে। গাড়িটা এগিয়েই আসছে যে তবু, লাল নিশান দেখছে না কেন? থামছে না কেন? আর কতক্ষণ ধরে থাকতে হবে লাল নিশান, ভগবান আর কতক্ষণ! গাড়িটা কি থামবে না, লাল নিশান দেখবে না!

নিশান হাতে লাইনেব ওপর লুটিযে পড়ল সে। গাড়ি তখনো অনেকটা দূরে।

গাড়ি থেমেছে।

ড্রাইভার দু'জন নেমে এসেছে গার্ডও দৌড়ে এসেছে। লাঠির ডগায় লাল-সংকেত হাতে স্থাণুব মত দাঁড়িযে আছে একজন লোক।

গার্ড জিজ্ঞাসা কবল, কি ব্যাপাব? কে তুমি এভাবে গাড়ি থামালে কেন? চমকে উঠল পরক্ষণে, ওখানে ও-ভাবে পড়ে কে? নিশান হাতে লোকটা নিষ্পলক চোখে একবাব দেখে নিল সকলকে। তাবপর ধীর শান্ত গলায বলল, আমি গণেশ হাজবা, গাড়ি ডি-বেল কবার জন্য লাইনেব বোল্ট খুলে বেখেছি। আমাকে গ্রেপ্তার কবতে পাবেন।*

সম্ভাষণ

আরতি তরতরিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

অনুরাধা কাঠ হযে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু তাঁর দাঁড়ানো চলবে না। অতিথি-অভ্যাগতরা সব বিদায় নেযনি এখনো। তাঁদের কলহাসি কলগুঞ্জন কানে আসছে। এক্ষুনি তাঁব ডাক পড়বে, খোঁজ পড়বে। এই উৎসব-মুখর রাতটা শুধু তাঁর। শুধু তাঁরই জন্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই আজকের

*একটি বিদেশী গল্পের প্রেরণায

এই আয়োজন। অতিথিরা একে একে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বিদায় নেবেন। নতুন জীবনে পদার্পণের এটুকু অভ্যর্থনাই কাম্য ছিল একটু আগেও।

কিন্তু এই আয়োজনে আরতিও ঠিক তাঁদেরই একজনের মত এসেছে। তাঁদের একজনের মতই চলে গেল। তার বেশি কিছু নয় কিছুই নয়।

খানিক আগেও যতবার আরতির দিকে চোখ পড়েছে, স্নেহে কৃতজ্ঞতায় বুকখানা ভরে ভরে উঠছিল তাঁর। শুধু তাঁর নয়, জীবনবাবুরও। ক'দিন ধরে ওকে নিয়ে অনেক প্ল্যান করেছেন তাঁরা, অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। আর ওকে হস্টেলে থাকতে দেওয়া হবে না, এখানেই জোর করে ধরে রাখা হবে তাকে। এই বাড়িতে, নিজেদের কাছে। .

কিন্তু এই মুহূর্তে অনুরাধা একটি কথাও বলতে পারলেন না, একটা অনুরোধও করতে পারলেন না। নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। আর হাসি মুখে আরতি সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

রাস্তায় নেমে আরতি একটা ট্যাক্সি নিল। বাড়ি যাবে? না কি হস্টেলে যাবে? এত রাতে হস্টেলে গেলে কে কি ভাববে আবার। বাড়িই যাবে। কিন্তু বাড়ি গেলে তো সকলের সঙ্গেই দেখা হবে, সকলের চোখের ওপর দিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে—সকলের সঙ্গে চোখোচোখি হবে। কেউ কিছু বলবে না। ভালোমন্দ কিছুই না। কিন্তু তাও হাজার বলার বাড়া। এতদিন পরোয়া করেনি, সকলের চোখের ওপর বিদ্রোহ করে সে-ই বরং শেষ অনুষ্ঠানটুকু সম্পন্ন করিয়েছে। কিন্তু এখন আর তার থাকল কী? এমন খালি খালি লাগছে কেন বুকের ভিতরটা! বাড়ি ফিরলে কাকারা কাকীমারা ওর দিকে তাকালেই যেন টের পাবে সেটা, দেখতে পাবে।

ড্রাইভারকে হস্টেলের রাস্তার নির্দেশ দিল আরতি।

পিছনের গদিতে মাথা রেখে অন্য দিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল। ...মা এবারে সুখী হবে। তাছাড়া, মায়ের ঋণও কিছুটা শোধ করা গেল। নিজের মায়ের ঋণ শোধ হয় না নাকি। কিন্তু এ তো নিজের মা নয়। সৎ-মা। কি বিচ্ছিরি কথাটা। না, এভাবে ভাববে না আরতি, এই মা না থাকলে কোথায় ভেসে যেত, কি গতি হত ওর, কে জানে! জীবনটা নিজের কাছেই বোঝা মনে হত, দুর্বহ লাগত। নিজের মা হোক আর না হোক, আরতি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু নিজের মা যে নয়, সেটা জীবনে এই প্রথম অনুভব করছে। দু'দিন বাদে সয়ে যাবে হয়ত, কিন্তু আপাতত এটুকুই যাতনার মত। নিজের মাকে মনেও পড়ে না আরতির। বড় কাকীমার তোরঙ্গে একটা ছবি দেখেছিল। তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। ভাবছে, এবারে একদিন গিয়ে সেই ছবিটা চেয়ে নেবে। নিজের মায়ের

ছবি।

তিন বছর বয়সে এই মাকে পেয়েছিল। তারপর দীর্ঘ সতের বছরের মধ্যে মায়ের অভাব বোধ করেনি কোনদিন। মা ওর থেকে পনের বছরের বড়, ওর কুড়ি এখন, মায়ের পঁয়ত্রিশ। সুখের আসল সময় তো এই মা প্রায় পার করে দিয়েছে বলতে গেলে ওরই জন্যে। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, তার জন্যে। কম কথা নাকি। আ-হা, এখনো সুখী হোক।

শুধু মায়ের অভাব নয়, বলতে গেলে বাবার অভাবও আরতি তেমন বড় করে অনুভব করেনি এ পর্যন্ত। বাবাকে হারিয়েছে সাত বছর বয়সে। এই মা-ই বাবার মতও আগলে রেখেছিল ওকে। অবশ্য তখন থেকেই জীবনমামা মায়ের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনমামা না থাকলে মা মেয়ে দু'জনেরই কি যে হত...। জীবন দত্ত, মস্ত চাকুরে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর। কিন্তু পয়সার গুমোর নেই, টাকা দিয়ে সাহায্য করে সস্তা নাম কিনতে চায় নি, মায়ের পাশে থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সহায়তা করেছে। তার জোরটাই মায়ের মস্ত জোর ছিল। সেই জোরটা এখন বাড়ল আরো, পাকাপাকি হল। ভালই তো হল। ভদ্রলোকেরই বা মহত্ব কম নাকি! একটানা এতগুলো বছর মুখ বুজে প্রতীক্ষা করার কথা কে কবে শুনেছে?

আরতি আগে কাকা ডাকত জীবন দত্তকে। বাবার বন্ধুকে তাই তো ডাকে সকলে। দশ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আরতিও তাই ডেকেছে। জীবনকাকা। তারপর মা হঠাৎ একদিন কাকা বাতিল করে মামা বলিয়েছে। জীবনমামা। বাড়িতে অনেকগুলো কাকা, আরতির কাকা-কাকা শুনতে শুনতে মায়ের কান ঝালাপালা নাকি। আরতি চট করে কাকাকে মামা করে উঠতে পারে নি, বার কতক বকুনী খেয়ে শেষে পেরেছে। কাকা ছেড়ে মামা বলানোর হেতুটা তখনো বোঝেনি। পরে বুঝেছে। অনেক পরে মায়ের সেই দুর্বল চেষ্টার কথা ভেবে হাসিই পায় আরতির। এই করে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়, না গেল? মিছিমিছি এতগুলো বছরের অশান্তি আর যাতনা। যা হয়ে গেল, আগে হলে অনেক ভালো হত। ওর পরিণত জ্ঞানবৃদ্ধির অনেক আগে।

কাকারা তেমন বড় রোজগেরে নয় কেউ। আরতিকে এভাবে মানুষ করতে পারত না তারা, এভাবে লেখা-পড়া শেখাতে পারত না নিশ্চয়। নিজেদেরই এক একজনের অনেকগুলো করে ছেলেপুলে। বছরের পর বছর নির্বিবাদে ফেল করছে খুড়তুতো ভাই-বোনেরা! বাড়ি তো নয়, আস্ত বাজার একখানা। ওখানে লেখাপড়া হয়! আরতির কোনো কালেও হত না, য়ুনিভার্সিটির মুখ দেখতে হত না। জীবনমামার সঙ্গে ব্যবস্থা করে মা বারো বছর বয়স থেকে হস্টেলে রেখেছে তাকে। সেই থেকে এই এম-এ পর্যন্ত হস্টেলই চলছে। মা-ই এ পর্যন্ত খরচা চালিয়েছে, নিজের উপার্জনের টাকায় ওকে পড়িয়ে এসেছে। বাবার ইন্সিওরেন্সএর টাকায় বিশেষ হাত

পড়েনি। সে টাকা ওর নামেই আলাদা করা আছে। ওর বিয়ের জন্য—আবার হাসি পাচ্ছে আরতির। যাক, এই একটা বছর খরচা-পত্রের জন্যে আটকাবে না কিছু। তার পরে? পরের কথা পরে। আরতি ভাববে না।

জীবনমামা না থাকলে এ সংসারে থেকে মায়ের বি-এ পড়া হত না, বি-টি পড়াও হত না। চাকরি করা তো হতই না। মায়ের মুখেই সে দুর্দিনের গল্প শুনেছে আরতি। এ সংসারে জীবনমামার তখন মস্ত প্রতাপ। কাকাদের মধ্যে তিনজনকে জীবনমামাই তো ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকিয়েছে। তাছাড়া আপদে-বিপদে তার সাহায্য আশা করত সকলে। সাহায্য পেতও। কাজেই মনে ধরুক আর নাই ধরুক, তার ব্যবস্থার ওপর কথা বলবে কে! মায়ের লেখাপড়া, মায়ের চাকরি —সবই জীবনমামার জন্যে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একটা ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয় ক'জনে? কিন্তু মা হয়েছে। জীবনমামার কোন জায়গাতেই যেন জোর কম নয়। ...অবশ্য ইস্কুলের চাকরি মা এখন আর করবে কি না কে জানে। করা সম্ভব কী? ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, ইস্কুলের ছোট ছোট মেয়েগুলোও হাঁ করে চেয়ে থাকবে তার সিঁদুর-পরা মায়ের দিকে, ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগছে আরতির। মাকে জিজ্ঞাসা করলে হত, বারণ করে এলে হত...।

কলেজে পড়তে কেমন একটা কানাঘুষা কাকীমাদের চাপাচাপি ইশারার আভাস পাচ্ছিল আরতি। বি-এ পরীক্ষার পর দু'মাস আড়াই মাস বাড়িতে ছিল যখন, তখন সেই ইশারা আর সেই অভ্যাস আরো একটু স্পষ্ট, আরো একটু উগ্র মনে হয়েছিল তার। কাকারা কথায় কথায় আর জীবনদা বলে না, জীবন দত্ত বলে। মায়ের মুখখানাও বেশির ভাগ সময় থমথমে গম্ভীর।

তখনো কিছুই জানে না আরতি, মাকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, মা জীবনমামা আর আসে না কেন?

মা থমকে গিয়েছিল। চেয়েছিল খানিক। তারপর ভুরু কুঁচকে বলেছিল, আসে না তাতে কি হয়েছে?

না, এই দু'মাসের মধ্যে এক দিনও দেখলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মায়ের ঈষদুষ্ণ জবাবে একটু অবাকই হয়েছিল আরতি।—এ বাড়িতে কি মাথা বিক্রি করা আছে নাকি তাঁর যে আসতেই হবে? দেখার ইচ্ছে থাকলে নিজে গেলেই পারতিস!

আরতি বোকাই বটে। সেই দিন, সেই মুহূর্তেই বোঝা উচিত ছিল তার। তখনো খেয়াল হয়নি কিছু।

খেয়াল অনেক পরে হয়েছে। তখন জীবন দত্তর বাড়িতেও গিয়েছিল বইকি আরতি। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কাণ্ড করেছিল।

মাস তিনেক আগের কথা। দুই-এক দিনের ছুটিতে হস্টেলে ভালো লাগছিল

না বলে বাড়িতে এসেছিল। এসে হতভম্ভ একেবারে। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় শুয়ে মা কাঁদছে। ওকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আঁচলে চোখ মুছে কান্না সামলাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেছে।

কি হয়েছে মা?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মা মাথা নেড়েছে, কিছু না।

দু হাতে করে মায়ের মুখখানা জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল আরতি। —কি হয়েছে বলো।

তার হাত ছাড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজে মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

ছোট কাকীমা আরতির থেকে বছর দুই-এর বড় মাত্র। কলেজেও পড়েছে কিছু দিন। তার সঙ্গেই আরতির বেশি ভাব। মায়ের ঘর থেকে সোজা তার কাছে গেছে আরতি।

মা'র কি হয়েছে?

কি হযেছে শুনেছে। ছোট কাকীমা লজ্জা পেয়েছে বলতে, কিন্তু তবু বলেছে শেষ পর্যন্ত।

আরতি অবাক, স্তব্ধ। জীবনমামার বিয়ের প্রস্তাবে কাকারা নাকি অগ্নি-মূর্তি এক-একজন, কাকীমারাও বিরূপ। মা হাঁ না কিছুই বলেনি। জীবনমামা স্পষ্ট জবাব চেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। অফিসে এক কাকাকে ডেকে নিজেই সে কথা বলেছে জীবনমামা —স্পষ্ট জবাব একটা চাই। মাকে ছাড়েনি কাকারা, সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করেছে, আরতি নিজের মেয়ে হলে কি হত, আরতির সত্যিকারের মা হলে এমন প্রস্তাব বরদাস্ত করত কি না।

মা একথারও জবাব দেয় নি।

আরতি হস্টেলে চলে এসেছিল। দু'দিন ভেবেছে। দিবা-রাত্র শুধু ভেবেছে। তারপর আবার বাড়িতে এসেছে। মাকে ধমকেছে, শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লজ্জা করে না? নিজের জোর নেই তোমার? তুমি কার পরোয়া করো?

নিজের জোর না থাক, মেয়ের জোরের বহর দেখে মা হকচকিয়ে গিয়েছিল মনে আছে। কাকাদের কাছেও সটান গিয়ে বোঝাপড়া করেছে আরতি, কাকীমাদের সঙ্গে বলতে গেলে ঝগড়াই করেছে। তাদের ওপর কারো কর্তৃত্ব খাটবে না সেটা আরতি বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে সকলকে।

সরাসরি জীবনমামার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত তারপর। এমন একটা সংকোচের ব্যাপারে এই মেয়ে যে এরকম কোমর বেঁধে এগিয়ে আসতে পারে, কেউ ভাবেনি। জীবন দত্ত অবাক যেমন, খুশিও তেমনি। আরতির কথায় কোন দ্বিধা ছিল না, কোন জড়তা ছিল না। স্পষ্ট করে বলেছে, মায়ের জবাব তো আপনার জানাই ছিল, জবাব জানা না থাকলে আপনি প্রস্তাব করতেন না। বাধা শুধু বাড়ির লোক,

সেই বাধার মধ্যে ফেলে রেখে মাকে আপনি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে জীবনমামা ওর মাথায় হাত রেখে আদর করে মাথাটা নেড়ে দিয়েছিল। আরতি খুশি হয়েছিল কিনা মনে নেই, কি জানি কেন তার চোখে তখন জল আসছিল। বলেছে, বাড়ির লোকেও আর বাধা দেবে না, আপনি ব্যবস্থা করুন।

দিন তিনেক আগে সেই ব্যবস্থাটাই হয়ে গেছে। তার মা এখন মিসেস জীবন দত্ত। ভাবতেও অদ্ভুত লাগছে আরতির।

তারই আনুষঙ্গিক আনন্দোৎসব এটা।

সন্ধ্যে থেকে অতিথি অভ্যাগতদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। হাসির হাট বসেছে। এ জগতে নিরানন্দের কিছুই নেই যেন। জীবন দত্ত খুশি, অনুরাধা খুশি। আর. সব থেকে বেশি হাসিখুশি আরতি। ছোট মেয়ের মতই সে হৈ-চৈ করছে সন্ধ্যে থেকে, দাপাদাপি করছে, দেখাশুনা তদবির তদারক করেছে। অনুরাধা বার বার মেয়েকে লক্ষ্য করেছেন, আর স্নেহে মমতায় বুকখানা ভরে উঠেছে তাঁর। ...মেয়েটা দিন কে দিন কি সুন্দরই না হচ্ছে দেখতে। এম এ-টা পাস করলেই ওর বিয়ে দেবেন, ছেলের মতই একটি ছেলে যোগাড় করতে হবে ওর জন্যে, রূপে-গুণে বিদ্যেয় কিছুতে কমতি হলে চলবে না।

ঘড়িতে রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আরতি উঠে দাঁড়াল। চলি মা, অনেক রাত হল।

কাছে আর কেউ ছিল না, অনুরাধা অবাক মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। সে কি রে, তুই এখন যাবি কি!

আরতি হেসে সারা, রাত কত হল তোমার খেয়াল আছে, এখন না গেলে আর যাব কখন! বলতে বলতে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল আরতি, অনুরাধা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বলল, তুমি ওঁদের দেখোগে, আমি পালাই এখন মিঃ দত্তকে বলে দিও—

সেই মুহূর্তে অনুরাধা আড়ষ্ট পাংশু একেবারে। মিঃ দত্ত!

নতুন জীবনে কি তিনি পাবেন বা পেতে চলেছেন সেটা পরবর্তী ব্যাপার। যা হারালেন বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে এই মুহূর্তে সেইটুকুই তিনি আচমকা উপলব্ধি করলেন শুধু।

আরতি তরতরিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

অনুরাধা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সন্ধ্যার পর গা ধুয়ে এসে পরিষ্কার একপ্রস্থ শাড়ি ব্লাউজ বার করার জন্য বড় ট্রাঙ্কটা খুলেছিলেন বিমলাদেবী। কিন্তু শাড়ি-ব্লাউজের বদলে কোণের দিকে গোঁজা পেট-মোটা শৌখিন পাউডারের কৌটোটাই আগে চোখে পড়ল তাঁর। মুখভাব অপ্রসন্ন হল একটু। হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নিয়ে ঢাকনাটা খুলে ফেললেন।

পাউডার নয়, একতাড়া নোট।

ঘরে কেউ নেই। মেয়ে পাশের ঘরে তারস্বরে কোন্ এক ক্ষেপা সুলতানের নতুন টাকা বানানোর পাগলামির বিবরণ মুখস্থ করছে। কৌটো রেখে উঠে ঘরের পরদাটা ভালো করে টেনে দিয়ে এলেন বিমলাদেবী। তারপর পা ছড়িয়ে কৌটো থেকে নোটের গোছা বার করে গুনতে বসলেন।

কত আছে, জানেন। অনেকবার গোনা হয়ে গেছে। ঠিক দু'মাস আগে পুরোপুরি ছ'শো হয়েছিল। এই দু'মাসের মধ্যে আর একটাও বাড়েনি। এইজন্যেই কৌটোটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ অপ্রসন্ন। মাসে অন্তত দুটো-একটা করে নোট বাড়ার কথা। সেইরকমই প্ল্যান ছিল সুশোভনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু বাড়বে কি করে, ভালোমানুষি করেই গেল যে!

বেশ একটি একটি করে গুনছেন বিমলাদেবী। নতুন করকরে নোট সব-ক'টাই, একটার বদলে দুটো চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। সুশোভনবাবু পুরনো নোট দিলেও চেষ্টাচরিত্র করে বদলে নতুন করে রাখেন বিমলাদেবী। এই টাকার বিনিময়ে গয়না আসবে বলেই বোধহয়। নিজের নয় মেয়ের। এ-কৌটোর নোট পুরনো হলে ভেতরটা কেমন খুঁত খুঁত করে বিমলাদেবীর। গয়নার সোনার রংটাই যেন কাল্‌চে মনে হয়।

বেশ ধীরে-সুস্থে গোনেন, তাড়া কিছু নেই। গুনতে ভাল লাগে। এক-আধবার গোনা থামিয়ে নাকের কাছে ধরেন। নতুন নোটের একধরনের ম্যাটমেটে গন্ধ....মন্দ লাগে না।

কবে যে হবে শেষপর্যন্ত সাতশো টাকা কে জানে। এভাবে রাখলেই হয়েছে আর কি। দু'মাসের মধ্যে এক কপর্দকও দেবার নাম নেই। গতমাসে বলেছে সামনের মাসে পুরিয়ে দেবে। আজ বাদে কাল সেই সামনের মাসও কাবার। পুরিয়ে দেওয়া দূরে থাক, এ মাসেও শূন্য। দেবে কোত্থেকে, ভালোমানুষ যে!

ঠাণ্ডা মাথায় তবিলের হিসেবটা যদি আর একটু তলিয়ে দেখতেন তাহলে ক্ষোভের এতটা কারণ থাকত না বিমলাদেবীর। প্ল্যানটা হয়েছিল এই একবছর ছাড়িয়ে মাস তেরো আগে। মেয়ে তখন এগারো পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে, এক রতি সোনা নেই গায়ে। বিমলাদেবী সখেদে স্বামীকে বলেছিলেন, মাসে অন্তত দশ-বিশটা করে

টাকা ধরে দিলেও তো কোনদিন কিছু হয়ে উঠতে পারে—নাকি এ-ভাবেই সারাজীবন থাকবে মেয়েটা?

একটি মাত্র মেয়ে—আদরের কম নয় সুশোভনবাবুরও। কিন্তু একটিমাত্র মেয়ের কথা না ভেবে একটিমাত্র স্ত্রীর মেঘভার তরল করে আনার জন্যেই তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছেন, কই কখনো তো বলোনি! আচ্ছা, দেব'খন এবার থেকে মাসে দশ-বিশটা করে টাকা—ওর নামে তুলে রেখো।

অতঃপর খবরের কাগজে সোনার দর দেখে নিয়ে মোটামুটি একটা হিসেব কষে দিয়েছেন বিমলাদেবী। .....দুহাতের দু'গাছা পোক্ত বালা, গলার একছড়া হার আর কানের একজোড়া দুল। সাতশো টাকার ধাক্কা। কত দিনে জমতে পারে এ-টাকাটা, কষ্ট করে আর সেই হিসেবটা করলেন না। ফলে, এই দু'মাস টাকা না পেয়েই মেজাজ বিগড়েছে, আর মনে হচ্ছে, কতকাল ধরে যেন চেষ্টাই করে আসছেন তিনি—নির্ধারিত অঙ্কটিতে কিছুতেই আর পৌঁছানো যাচ্ছে না।

এই অসহিষ্ণুতার অবশ্য কারণও আছে একটু। সোনার দাম বাড়ছেই ক্রমশ। টাকার অঙ্কটা না বাড়িয়ে মনে মনে সোনার মাপটা একটু একটু কমিয়েছেন বিমলাদেবী। কিন্তু কত আর কমানো যায় তা বলে! সোনার দাম তো চড়ছেই বাজারের মাছ তরকারির মতো।

অথচ ফেলে দিলেই পারে বাকী একশোটা টাকা। যখন খুশি দিতে পারে। অন্তত সেরকমই বিশ্বাস বিমলাদেবীর। মাসিক-সাপ্তাহিকগুলোয় একমাস তিনটে গল্প বেশি লিখলে একশো টাকার বেশি আসে। কিন্তু যেচে আবার লেখা দেবে! সেইবেলায় কত মান। বরং বিনে-পয়সায় কেউ লেখা চাইতে এলে ভালোমানুষ সেজে আদর করে দিয়ে দেবে। বাড়ির ব্যাপারেই শুধু ডাইনে আনতে বাঁযে কুলোয় না। নইলে ভালোমানুষির কোন্ ব্যাপারটা আটকাচ্ছে! সেও ছোটখাটো ব্যাপার নয়, রীতিমতো এক-একটা বড়লোকি কাণ্ডকারখানার জেরও দিব্বি নির্বিকার চিত্তে নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। তখন যেন আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসে! সেজো-ভাশুরের সেই জমি-কেনার ঘা-টা এতদিনেও শুকোয়নি বিমলাদেবীর। বাড়ির কাছেই পাঁচ কাঠার মতো একটা জমি ভারী পছন্দ ছিল সেজো-ভাশুরের। একদিন বায়নাপত্র করে ফিরলেন একেবারে, তারপর টাকা সংগ্রহে মন দিলেন। বিমলাদেবীর মনে মনে বিশ্বাস, টাকা সংগ্রহের চেষ্টাটা লোকদেখানো—আসলে টাকা মজুতই ছিল, নইলে হাজার টাকা আগাম দিয়ে কেউ বায়নাপত্র করে আসে!

গোল বাঁধল জমি কেনার সময়। পাকাপাকি মাপ-জোখ করে দেখা গেল জমি পাঁচ কাঠা নয়, সাড়ে পাঁচ কাঠা। জমির মালিক মুখে বলেছিলেন, পাঁচকাঠা-খানেক হবে—বায়না করা হয়েছিল গোটা প্লটটা ধরেই। এখন আধকাঠা বেশি মানে তো

দেড়হাজার টাকা বেশি। কিন্তু এদিকে এমন অবস্থা তখন যেন দেড়টাকাও আর টানলে বাড়ে না। সেজো-ভাশুরের আহার-নিদ্রা ঘুচল, সেজো-গিন্নির মুখ অন্ধকার।

শেষে এই ভালোমানুষ দেওরেরই শরণাপন্ন হলেন তিনি। কাঁদো-কাঁদো মুখ। —কি হবে ঠাকুরপো, বায়নার হাজার টাকাই যে জলে গেল।

শুনে কতক্ষণ আর ভেবেছিল ভালোমানুষটি? এক ঘণ্টাও নয় বোধহয়। গায়ে জামা গলিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেছে। ফিরেছেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। একটা আটশো টাকার আর একটা সাতশো টাকার চেক ভাইয়ের হাতে দিয়ে তারপর ঘরে ঢুকেছে। দু'জায়গায় দু'খানা উপন্যাস লিখে দেবার বায়না নিয়ে ভাইয়েব বায়নার টাকা বাঁচিয়েছে। সেজো-গিন্নির মুখে হাসি ধরে না, অকৃপণ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, অনেক পুণ্যে এমন আপন জন মেলে।

সেই জমিতে সেজো-ভাশুরের একতলা উঠেছে কোনরকমে, এবছর সেই কোনরকমেই তার ওপর দোতলা উঠেছে আবার। শুনছে, কোনবকমে তিনতলাটা তুলে ফেলতে পারলে, একতলাটা ভাড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সব ধাব-দেনা শোধ করার দিকে মন দিতে পারেন তাঁরা। দেনায় দেনায় নাকি মাথার চুল-সুদ্ধ বিক্রি। বাড়ি গেলে অবশ্য সেজো-গিন্নি আদর-যত্ন করেন খুব, আর দেওবের প্রশংসাও করেন পঞ্চমুখে....

ক্ষোভের মাথায় নোট গুনতে ভুল হযে গেল বিমলাদেবীর। আবাব গোড়া থেকে গুনতে শুরু করলেন তিনি।

আরো আছে।

গেলবছর আদরের ছোটবোন বাড়ি এসে কান্নাকাটি করে অস্থির। তার ছেলের পিঠের না কোথাকার হাড়ে টি.বি.। মাদ্রাজের কোথাকার এক স্যানিটোরিয়ামে পাঠাতে হবে ছেলেকে—সেখানে চিকিৎসা হবে, অপারেশন হবে। অন্যথায় ছেলে বাঁচে না। মাসে একশো-দেড়শো টাকা করে খরচ পাঁচ-ছ'মাস, এ ছাড়া অপারেশন বাবদেও মোটা টাকা লাগবে। বোন কান্নাকাটি করেনি শুধু, শোকের জ্বালায় অনুযোগও করেছে। বলেছে, এমন বিয়েই দিয়েছ দাদা যে ছেলে মরতে চলেছে—একটু চিকিৎসা করারও শক্তি নেই।

ঠাকুরঝির শোকে সেদিন অবশ্য বিমলাদেবীরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল। স্বামী যথাসাধ্য সাহায্য করুক, এটা তিনিও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাবলে গোটা চিকিৎসাপর্ব একাই লোকটা টেনে গেল কি করে, বিমলাদেবীর কাছে সেটা আজও একটা বিস্ময়। শুধোলেও ভালোমানুষের মুখে একটু হাসি ছাড়া আর জবাব নেই কিছু। ছ'মাস হয়ে গেল সেই ভাগ্নে দিব্যি গোলগাল হযে ফিরেছে—এসে সেই যে একবার দেখা করে গেছে তারপর এই ছ'মাসে মামা-মামীর একটা খবর পর্যন্ত করেনি। ফলে বাৎসল্যের বদলে বিমলাদেবীর ভিতরে ভিতরে টাকার খেদটাই বড় হয়ে উঠেছে। মনে মনে এক একসময় এ-ও ভাবেন তিনি এইসব ভালোমানুষি করার জন্য নিশ্চয ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে বেশ-কিছু টাকা মজুত আছে, নইলে দরকার পড়লেই এত আসে কোত্থেকে!

গুনতে আবারও ভুল হয়ে গেল। ফের গোড়া থেকে শুরু।

ভাবতে গেলে শেষ আছে নাকি!

এসব বড় ব্যাপার বাদ দিলেও ছোটাখাটো ভালো-মানুষির উৎপাত তো নিত্য লেগে আছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত তাতেই। বিমলাদেবীরও, আর যে করে ভালমানুষি—তারও। কিন্তু বলারও জো নেই কিছু। —এমন সাহিত্যিক, অনুরাগীজনেরা আসবে না তার কাছে! তাদের অনুরাগের ঠেলায় মাসের মধ্যে ক'দিন যে লেখা বন্ধ ঠিক নেই। সময় নেই অসময় নেই, তাদের আদর-আপ্যায়ন করো, চা-জলখাবার খাওযাও। কেই-বা এ-সব সামলায় আর সেইবেলায় খরচাই বা আসে কোত্থেকে?

ফোঁস করে একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়লেন বিমলাদেবী।.... কত গুনেছেন জানি.... তিনশো কুড়ি.....তিনশো তিরিশ....

তা ছাড়া চাকরি করেনা বলে পারিবারিক আর সামাজিক সব দায়-দায়িত্বও যেন তারই। যেন তার লেখার সময়টা চাকরির বাঁধা সময়ের তুলনায় কিছুই নয। কার অসুখ হল—তোমার তো অফিসের তাড়া নেই অতএব সব ভার তুমি নাও। কে আসছে কোত্থেকে—ছোটো ইস্টিশানে। বাড়িতে সান্ধ্য-নেমন্তন্নের ঘটা, যে-যার অফিসে বেরিয়ে গেল, তোমার আবার তাড়া কিসের—তুমি সামলাও সব।

যন্ত্রণা। যন্ত্রণা। যন্ত্রণার একশেষ!

মুখ বুজে এতটা সামলায় বলেই ঘরে-বাইরে সুখ্যাতির অন্ত নেই। অমুকের মতো লোক হয না, অমুকের মতো মানুষ হয় না, অমুকের মত প্রাণ হয় না—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।

বিমলাদেবীর মনে মনে একটা ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে এখন। সকলের প্রশংসা পাওযা আর সকলের কাছে ভালোমানুষি হওয়ার প্রতি ভদ্রলোকের বিশেষ একটা মোহ আছে। সেইজন্যই এত করে, এই দুর্বলতা আছে বলেই সকলের সর্ব-কর্মে বৃহস্পতি হয়ে বসে আছে। নিজের সংসারের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে চোখে অন্ধকার দেখেন বিমলাদেবী।

....পাঁচশো আশি....পাঁচশো নব্বই....ছ'শো—

—তবিল পুরল? কত হল?

চমকে ফিরে তাকালেন বিমলাদেবী। পরদা সরিয়ে কখন ঘরে ঢুকেছেন টের পাননি। মনের এই অবস্থায় টাকা গুনতে দেখে ফেলাটা মোটেই মনঃপুত হল না। যেন এও ভদ্রলোকের আর একটা অপরাধ। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাউডারের কৌটোয় টাকা পুরে ঝাঁঝালো উত্তর দিলেন, অনেক হল, লাখটাকা লাখটাকা দু'কুড়ি দশ টাকা—

পরিষ্কার শাড়ি আর বার করা হল না। নিচের আড্ডা এরই মধ্যে শেষ হবে ভাবেন নি। সশব্দে ডালা ফেলে ট্রাঙ্ক বন্ধ করে খাটের নিচে ঠেলে দিলেন। তারপর ঘুরে বসলেন। —আমার কপালে আবার হবে কিছু! হ'তাম বাইরের লোক—হত।

মেয়েটারও যেমন বরাত—আবার জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কত হল—আমি মরলে হবে, তার আগে হবে না।

বিমলাদেবীর অল্পস্বল্প রাগ দেখতে ভালোই লাগে সুশোভনবাবুর। আদুড় গায়ে পাতলা-শাড়ি-জড়ানো রাগতপ্ত মুখখানি বেশ লাগছে। মেজাজ আর একটু চড়িয়ে দিতে পারলে স্বভাব-সুলভ হাত নেড়ে যদি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন একটু আধটু—দৃশ্যটা আরো একটু লোভনীয় হয়ে উঠতে পারে। নিরীহ গোছের একটুখানি খুনসুড়ি করার লোভ ছাড়তে পারলেন না সুশোভনবাবু।

শয্যার একধারে বসে হালকা করে বললেন, কেন, ছ'শো টাকা তো হয়েছে শুনেছি।

বিমলাদেবী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, সে তো দু'মাস আগে হয়েছে!

তবে?

কি তবে?

টাকা দিচ্ছিনা কে বলল?

গেল দু'মাসে দিয়েছ কিছু?

—না দিলেই বা। সুশোভনবাবু নিরীহ অভিব্যক্তিটুকু বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন।—আগে অনেক বেশি দিয়েছি, মাসে তুমি দশ-বিশ টাকা চেয়েছিলে—দশ টাকা করে হলে তোমার ছ'শো জমতে লাগে গিয়ে—বছরে বারো-দশকে একশো কুড়ি—পুরো পাঁচ বছর—আর কুড়ি টাকা করে হ'লে পুরো আড়াই বছর—টাকা না দিলে একবছরের আগেই তোমার ছ'শো টাকা হল কি করে?

সুশোভনবাবু যেটুকু আশা করেছিলেন, ফল তার থেকেও একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। বিমলাদেবী ভূমি-আসন ছেড়ে সরাসরি দাঁড়ালেন একেবারে।—আমার বেলায় যে একেবারে নিক্তির হিসেব, অ্যাঁ? বলি, এ হিসেব অন্যের বেলায় থাকে কোথায়? এই প্যাঁচ কষছ তুমি মনে মনে, কেমন? সেইজন্যই অমুক খরচ তমুক খরচ—

বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি সামলে নিতে চেষ্টা করলেন সুশোভনবাবু।—কি মুশকিল, আমি ঠাট্টা করছিলাম, অত চটবার কি হল, বোসো বোসো—

রাগ সামলাবার জন্যে বিমলাদেবী খাটের ওপরেই বসে পড়ে বড করে গোটাকতক দম নিলেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, নিচে কে এসেছিল?

মাসিকপত্রের আপিস থেকে।

লেখার জন্য?

কোনদিকে যাচ্ছেন সঠিক ঠাওর পেলেন না সুশোভনবাবু। জবাব দিলেন, তা ছাড়া আর কি—

বিমলাদেবী অসহিষ্ণু প্রশ্ন ছুঁড়লেন আবার, পয়সার লেখা না বিনে-পয়সার?

মনে মনে শঙ্কিত। আর ঘাঁটাতে সাহস করলেন না সুশোভনবাবু। আপসের চেষ্টায় হাসিমুখে বুক-পকেট থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বার করে দেখালেন।

বিমলাদেবী গম্ভীরমুখে হাত বাড়ালেন।

সুশোভনবাবু যথার্থ প্রমাদ গুনলেন এবারে। নোট ক'খানা তাঁর হাতে দিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, এ কি তুমি.... ওই ইয়ে ...কৌটোয় রাখবে নাকি?

জবাব না দিয়ে বিমলাদেবী একঝলক উষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শুধু। তার সাদা অর্থ, সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

নিরুপায় হয়ে সুশোভনবাবু বলে ফেললেন, এ টাকাটা থাক, সামনের দু'মাসের মধ্যেই তোমার সাতশো টাকা আমি পুরিয়ে দেব, আসছে মাসের গোড়াতেই লাইফ ইন্সিওরেন্সের তারিখ পড়ে গেছে—

রাগ ভুলে বিমলাদেবী আকাশ থেকে পডলেন একেবারে, লাইফ-ইন্সিওরেন্সের টাকা না তুমি আলাদা সরিযে রেখেছিলে?

মেজাজ এমন লঙ্কা-বাটা হযে আছে জানলে সুশোভনবাবু আদৌ লাগতে আসতেন না। অপ্রতিভ ভাব দমন করে বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা দেখলেন তিনিও। —বাঃ! ওই যে সাহিত্যিক ভদ্রলোক অসময়ে মারা গেলেন তঁাব ফাণ্ড-এ টাকাটা দিতে হল না!

দৃষ্টিবাণে ভদ্রলোককে নীরবে খানিক বিদ্ধ করে হাতের নোট ক'খানা প্রায় গায়ের ওপরে ছুঁড়ে দিলেন বিমলাদেবী।

এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁডাবার আগেই সুশোভনবাবু তাড়াতাডি হাত ধরে বসিয়ে দিলেন তাঁকে। —আ-হা, বলছি তো—আচ্ছা, দু'মাসে নয়, সামনেব মাসেই চেষ্টা করব তোমার ওই টাকাটা পুরিযে দিতে।

এ কাজটাও ভালো করলেন না সুশোভনবাবু। কারণ অতঃপর দীর্ঘ একটানা খেদোক্তি শুনে যেতে হল তাঁকে।

তুমি অবুঝ। তুমি বে-হিসেবী। তোমার মতো লোককে নিযে ঘর করা থেকে গারদের পাগল নিয়ে ঘর করা সহজ। তোমার মতো লোকের সংসারী হওয়া কেন। তুমি নিজের ভালো-মন্দ বোঝো না, সংসারের ভালো-মন্দ বোঝো না, ভবিষ্যৎ ভাবো না। তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিষয-বুদ্ধিহীন। লোকে এসে প্রশংসা করলে আর দুটো মিষ্টি কথা বললেই তুমি গলে জল হয়ে যাও—

খাওযার ডাক পডতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সুশোভনবাবু। তাড়াতাড়ি খেতে চলে গেলেন। কিন্তু এ-যে শুধু সাময়িক বিরতি জানতেন না।

তিনি ঘরে ফিরে আসার খানিকক্ষণের মধ্যেই শ্রীমতীও আহার সমাধা করে ফিরে এসে অসমপ্ত খেদ সমাপ্ত করতে বসলেন। নিরুপায় হযে শয্যায় আশ্রয় নিলেন সুশোভনবাবু। কথার মাঝে বিমলাদেবীও একসময় খাটের অন্য ধারে গা এলিয়ে সব ক্ষোভ নিঃশেষে উজাড় করে যেতে লাগলেন—

—একটা মাত্র মেয়ে, লোকের কত সাধ-আহ্লাদ থাকে, কত কি করে, কিন্তু আমার কপালে কিছুই হল না। ভগবান বক্ষা করেছেন আর দেননি, দিলে অদৃষ্টে আরো কত ছিল কে জানে! যতদিন টানাটানি ছিল, রোজগার ভালো ছিল না, ততদিন মুখ বুজে সযেছি, একটা কথাও বলিনি। কিন্তু এখন ভগবান মুখ তুলে

চেয়েছেন, এখনো এ-রকম হবে কেন। যেখানে যা ঢেলেছ, থাকলে আজ তো রাজার হালে থাকার কথা। তুমি বোকা বলেই এই অবস্থা। লোকে বোকাই ভাবে তোমাকে। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটু প্রশংসা করে আর দুটো দুঃখের কথা বলে কাজ হাসিল করে নিয়ে যায়, তারপর আড়ালে বোকা বলে। আসলে লোকের কাছে ভালো হবার লোভটাই তুমি ছাড়তে পারো না। তোমার দরকারে কেউ কানাকড়ি দিয়েছে, না দেবে? এটুকু বুঝে চলার মতোও জ্ঞানবুদ্ধি তোমার নেই—

থামার কোন লক্ষণ না দেখে সুশোভনবাবু অগত্যা ঘুমিয়ে পড়লেন।

নড়াচড়ার আভাস না পেয়ে বিমলাদেবীর খেয়াল হল একসময়। একটু কাছে সরে এসে পরখ করে দেখলেন। তারপর উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে তিনিও শয্যা নিলেন। খানিক বাদে তাঁরও নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো।

সন্তর্পণে উঠে বসলেন সুশোভনবাবু। ওদিকে দু'চোখ এক হলে আর চট করে জাগার সম্ভাবনা কম—তবু। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ টিপলেন। চারধারে শেড-দেওয়া ল্যাম্প, টেবিল ছাড়া আর কোনদিকে আলো ছড়ায় না।

লিখতে হবে। সন্ধ্যায় বসতে পারলে রাত জাগতে হত না। রাত জেগে লেখায় অনভ্যস্ত নন, কিন্তু আজ কেমন যেন মন বসছে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু হল না। স্ত্রীর কথাগুলো সব মনে নেই, সব শোনেনও নি—তবু একধরনের বিষণ্নতা ভিতরটা জুড়ে বসেছে।

আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন সুশোভনবাবু। ঘুমন্ত স্ত্রীকে খানিক দেখলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কে বলবে সন্ধ্যা থেকে খানিক আগে পর্যন্ত এই মুখেরই একটানা বাণীবর্ষণে নাজেহাল হয়েছেন তিনি। মুখখানা বড় শান্ত আর বড় সুন্দর মনে হল সুশোভনবাবুর। ফ্যানের হাওয়ায় সামনের দু'চারটে চুল মুখের উপর পড়ে আছে। আলতো করে সরিয়ে দিলেন।

সামনের ছোট ঘরে মেয়ে ঘুমুচ্ছে। পায়ে পায়ে সেই ঘরে এসে দাঁড়ালেন সুশোভনবাবু। আলোটা জ্বাললেন। তাঁর ঘরে এসে এই মেয়ে অসুখী হবে ভাবতেও ভিতবটা টনটনিয়ে উঠল। স্ত্রীব দুর্ভাবনাটা ভিতর থেকে একেবারে বাতিল করে দিতে চাইলেন তিনি। অসুখী হলেই হল—ওই মেয়ের জন্য কি-না করতে পারেন তিনি, কি-না করবেন! একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিভিয়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু লেখা আজ আর হবে না। টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে সামনের অন্ধকার বারান্দায় এসে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। নিঝুম রাস্তা। দূবে দূবে দুই-একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। গাছগুলো বিষম মৌনী। বাড়িগুলোর যেন সমাধির সাধনা। তারাভরা আকাশটার রহস্য বাড়ছে....

সুশোভনবাবু দেখছেন আর ভাবছেন। লোকে তাকে তোষামোদ করে, প্রশংসা করে, ভালো বলে। কিন্তু এ তো তিনি চান না। শুনলে বরং অস্বস্তি হয়, প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের এই তোষণ-রীতি দেখে দুঃখ হয়। তবু যথাসাধ্য করেন, তার কারণ,

কাউকে নিরাশ করতে মন সরে না। এমন কি বিরক্ত হলেও কারো প্রতি রূঢ় হতে পারেন না, কারো মনে এতটুকু আঘাত দিতে পারেন না। ...ভাবেন, এই মমতা-বোধ কি দুর্বলতা?

মোটামুটি কয়েকটা দিন ভালোই কাটল এর পর। বিমলাদেবী তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে হাসলেন। বাড়ির কোনো ব্যাপারে সুশোভনবাবুর ডাক পড়লে তিনি সাফ বলে দেন, তাঁর দ্বারা হবে না, সময় নেই। কিন্তু চুপি চুপি কাজের ব্যবস্থাটুকুও যে সম্পন্ন করে দেন, বিমলাদেবীর জানতে বাকি থাকে না। কেউ দেখা করতে এলে দু-দশ মিনিট কথা বলেই ফিরে আসেন। স্ত্রীকে শুনিয়ে নিজের মনেই বলেন, দিলাম হাঁকিয়ে—যত ঝামেলা! বিমলাদেবী নিঃসন্দেহ, ক'দিন ধরে বাড়ি ফিরতে রাত হচ্ছে তার কারণ ওই সব ঝামেলা বাইরেই সেরে আসছেন ভদ্রলোক। এমন কি ঢালা আশীর্বাদে পঞ্চমুখ ভিখারীকে পর্যন্ত উঞ্চ-ঝাঁঝে বিদায় করতে দেখা গেছে তাঁকে —কিন্তু ভিখারীর আশীর্বাদ যে প্রাপ্তির তুষ্টিতে, সেটা গোপন করার চেষ্টা হলেও গোপন থাকে না। বিমলাদেবী দেখেন সব—মুখে কিছু বলেন না, আর মনে মনে হেসে বাঁচেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে যে মহিলাটির আগমন, তাঁকে দেখেই বিমলাদেবী খুশিতে আটখানা। খুড়তুতো বোন রমাদি। ছেলেবেলার এবং প্রাক্-বিবাহ-জীবনের একান্নবর্তী পবিরারে তিন-চার বছরের বড় এই রমাদি-ই ছিলেন একদঙ্গল খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো বোনের গুরুদেবী। কে একটু বেশি খুশি করতে পারবে রমাদিকে তাই নিয়ে বোনেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। বিমলাদেবীর এখনো মনে আছে, এই রমাদির হুকুমে জেনেশুনে তাঁকে একবার পিঁপড়ের গর্তে পা দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। রমাদি বিরূপ হলে চোখে অন্ধকার দেখতেন তাঁরা। রমাদির বিয়ের পর তাঁদের সেই কান্না দেখে জামাই বেচারী হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

বিগত দিনের কথা থাক, ভদ্রমহিলার এখনো টান আছে এই বোনের প্রতি। কলকাতার আর এক প্রান্তে থাকলেও মাসে দু'মাসে এক-আধবার আসেন। আর, ছেলেবেলার সেই একাগ্র আকর্ষণটা সম্ভবত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বিমলাদেবীও। তিনি এলে প্রায় ছেলেমানুষের মতোই খুশিতে উপছে ওঠেন এখনো। খাতির করেন, আদর-যত্ন করেন। রমাদির প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ নিয়ে সুশোভনবাবুও অনেক সময় ঠাট্টা-তামাসা করেছেন।

কিন্তু তাঁর আজকের পদার্পণের হেতু এবং ফলটা জানা থাকলে হয়ত তেমন খুশি হতেন না বিমলাদেবী।

—ওমা! রমাদি যে—এসো এসো কি ভাগ্যি!

রমাদি টিপ্পনী কাটলেন, হ্যারে ভাগ্যিউলি, আমি তো তবু মাঝে-সাজে আসি—মস্ত লেখক-গিন্নি হয়ে তোর তো একবার মনেও পড়েনা।

আনন্দে মুখ রাঙিয়ে বিমলাদেবী বলেন, হ্যাঁঃ, তুমি আর আমি—তুমি দয়া করে

আসো তাই—চলো ওপরে চলো—সন্ধ্যে পার করে এলে, কতটুকুই বা বসবে!

সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে উঠতে রমাদি বললেন, না রে, আজ বসতে আসিনি—একটু বিপদে পড়ে এলাম তোর কাছে।

বিপদের কথা শুনে চিন্তিত মুখে ফিরে তাকালেন বিমলাদেবী।

সব বলছি তোকে, বসি আগে—

ছোট ঘরে মেয়ে পড়ছে, নিজের ঘরে লেখার তাগিদে কখন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হবে মানুষটা ঠিক নেই—তখন লেখা পণ্ড। কাজেই সামনের ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতলেন বিমলাদেবী।

রমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, সুশোভন বাড়ি নেই?

না। বোসো—

কখন ফিরবে?

কে জানে—এক্ষুনি ফিরতে পারে আবার রাত এগারোটাও হতে পারে, তার কিছু ঠিক আছে নাকি।

বসতে আসেননি, তবু সবিস্তারে বিপদের সমাচার শেষ করে উঠতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল রমাদির। সার মর্ম, তাঁর তৃতীয় মেয়ের বিয়ে—কম করে ছ'টি হাজার টাকা খরচ, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পাঁচহাজার টাকা সংগ্রহ হয়েছে, কর্তার আপিসে আর একপয়সাও ধার পাবার সম্ভাবনা নেই—দু'মাস আগে দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে সেখান থেকে টাকা নিতে হয়েছিল। এখন হাজার টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ হয় সেই ভাবনায় পড়েছেন রমাদি—অবশ্য, ছ'মাস পরে কর্তার একটা ইন্সিওরেন্সের মেয়াদ ফুরোচ্ছে, তখন এ-টাকা অনায়াসেই শোধ করা যাবে।

শোনামাত্র বিমলাদেবীর মুখ শুকালো। হাজার টাকা!

রমাদি বললেন, যতটা পারিস দ্যাখ্—আমি আর কার কাছে যাব।

সেই ছেলেবেলায় কিছু দরকার হলে রমাদি বলতেন, যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়—নয়তো এই শেষ! এখন সেরকম করে না বললেও মনে মনে যেন ঠিক সেইরকমই একটা তাগিদ উপলব্ধি করতে লাগলেন বিমলাদেবী। ধাক্কাটা সামলে নিতে নিতে মনে হতে লাগল, বিপদ তো সত্যি কম নয়, আর সেই বিপদে রমাদি ছুটে এসেছেন তাঁরই কাছে। ....কতজনের কত বিপদে ঘাড় পেতেছে ঘরের মানুষটা... এই বিপদে একেবারে কিছু করতে পারবেনাই বা কেন? ইচ্ছে করলে যে পারে সে-বিশ্বাস বিমলাদেবীর আছে।

শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কবে দরকার?

দিন পনেরোর মধ্যে পেলেই হয়।

বিমলাদেবী একটু ভেবে বললেন, ওঁর হাতে কি আছে না আছে আমি কিছুই জানিনে রমাদি... তুমি নিজেই একবার ওঁকে বলে দেখো....

বিমলাদেবীর মনে হল, রমাদি ঠিকমতো বলতে পারলে কিছুটা ব্যবস্থা হবেই। তাই সলজ্জ হেসে আবারও বললেন, আগে একটু প্রশংসা-টশংসা করে নিয়ো

রমাদি—একটু ভালো-মানুষ টালো-মানুষ বোলো—তুমি তো জানই সব—

জানেন ঠিকই। বিমলাদেবীর খেদ রমাদি অনেকদিনই শুনেছেন।

একটা সমস্যার সমাধান হয়েই গেল, এমনি খুশিমুখে ভাবী-জামাইয়ের প্রসঙ্গে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন বিমলাদেবী। এদিকে রাত হচ্ছে দেখে রমাদি উশখুশ করছেন। বিমলাদেবীর মেয়ে ঘরে ঢুকতে রমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে তোর বাবা ফিরবে কখন?

মেয়ে জবাব দিল, বাবা খানিক আগেই ফিরেছেন, এতক্ষণে লিখতে বসে গেছেন।

দুজনেই অবাক। —ওমা, কখন এলো!

কাল-বিলম্ব না করে উঠে পাশের ঘরে এলেন তাঁরা। সত্যিই গভীর মনোযোগে লিখছেন সুশোভনবাবু। রমাদি বললেন, এসে লিখতে বসে গেছ টেরও পাইনি—

সুশোভনবাবু মুখ তুললেন। হাসলেন একটু। বসুন। কি খবর?

—আর ভাই আমাদের আবার খবর—খবর তো চারদিকে শুধু তোমারই।

সুশোভনবাবু হালকা করে বললেন, চারদিকের কথায় কান দেবেন না।

রমাদি হাসলেন। বিমলাদেবীও। রমাদি বললেন, তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে বলো। ...তোমার কাছেই এসেছিলাম ভাই... একটু মুশকিলে পড়ে গেছি... তুমি তো সর্বত্র মুশকিল-আসান... আমাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন সুশোভনবাবু।

এবারে সংক্ষেপেই বক্তব্য পেশ করলেন রমাদি। ক'রে বললেন, এখন তোমার ওপরেই ভরসা আমার, ও-টাকাটা আমাকে না দিলে হবে না।

সুশোভনবাবু ভাবলেন একটু, বললেন, অত টাকা কি হবে...

যেন হবে কি না দেখার জন্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি। বিছানার নিচে থেকে চাবির গোছা নিয়ে খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে বার করলেন। ট্রাঙ্ক খুললেন। পাউডারের কৌটা থেকে নোটের তাড়া হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

—ধরুন, এখানে ছ'শো টাকা আছে, আপাতত এই নিয়ে যান, তারপর দেখি...

টাকা রমাদির হাতে দিয়ে সুশোভনবাবু লেখার টেবিলে গিয়ে বসলেন। আনন্দে খানিক নির্বাক রমাদি, নইলে বিমলাদেবীর দিকে একবার তাকালে বোধহয় ঘাবড়েই যেতেন তিনি। নিষ্প্রাণ একখানি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন বিমলাদেবী।

হঠাৎ যেন ভাষা খুঁজে পেলেন রমাদি। —বেঁচে থাকো ভাই—অদৈন্য হোক, এমন আত্মীয় পাওয়াও ভাগ্যের কথা—আমি আগেই জানতুম তোমার কাছে এসে পড়তে পারলেই আমার ভাবনা শেষ—

সুশোভনবাবু লেখার চেষ্টা দেখছেন দেখে আর বাড়ালেন না। —আচ্ছা লেখো তুমি, আর বিরক্ত করব না, আমারও রাত হয়ে গেল। আয়রে বিমলা—

বিমলাদেবী চিত্রার্পিতের মতো অনুসরণ করলেন তাঁকে। নিচে থেকে বিদায়-মুহূর্তেও রমাদি বলে গেলেন, সত্যি ভাই, যাই বলিস এমন মানুষ হয় না—তোর বরাত ভালো।

ভালো বরাত নিয়ে জীবনের মতোই একটা বোঝা-পড়া করে নিতে ওপরে উঠে এলেন বিমলাদেবী। লেখা ফেলে সুশোভনবাবু চেয়ারের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে পড়ে আছেন। সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে ফিরে তাকালেন তাঁর দিকে।

দুই চোখে সাদা আগুন ছড়িয়ে তুমুল বর্ষণের মুখে হঠাৎ যেন বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে থমকে গেলেন বিমলাদেবী। চোখে চোখ পডতেই কেমন করে যেন বুঝে নিলেন, স্বামীকে তুষ্ট করার বিষয়ে পাশের ঘরে রমাদিকে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা শুধু রমাদি একাই শোনেননি।

সুশোভনবাবু চেয়েই আছেন তাঁর দিকে। ব্যথাভরা ছলছল দুই চোখের গভীরে অব্যক্ত অনুযোগ।

খাটের বাজু ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিমলাদেবী।

একটি প্রাচীর চিত্র

মসৃণ দেয়ালের গায়ে খড়ি আর পেন্সিলেব ছক-কাটা ঘরগুলো রঙে রঙে ভরাট হতে থাকে। গণেশের মনে হয়, রঙে-রসে ভরাট হতে থাকে, রঙে-ঢঙে ভরাট হতে থাকে। কাঁধ-উঁচু বিবর্ণ একটা টুলে বসে তুলি চালায নিরঞ্জন। গণেশচন্দ্র মাথায ছাতা ধরে, রঙের মালশা বদলে দেয়, তুলি ধুযে দেয়। আর সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায় ওস্তাদেব তুলি চালনা দেখে।

মোটা তুলির ঘায়ে নারী দেহের আভাস স্পষ্ট আর উগ্র হতে থাকে। তুলি থামিয়ে মাঝে মাঝে দেখে নিরঞ্জন। হাতের ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মেলায়। একটা চোখ বুজে যায প্রায়ই, দুই চোখে যেন খুঁটিয়ে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। হ্যাংলার মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার লোক। দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে লাস্যময়ী নারীদেহ-রচনার স্থূল কারিগরি দেখে। তবে নিরঞ্জনের ভ্রুকুটি অথবা গণেশের গোল চোখের নীরব তর্জনেন বেশি কাছে এসে কাজের ব্যাঘাৎ ঘটায় না তারা।

নিরঞ্জন হাতের ছবি দেখে আর তুলি চালায়, ছবি অনুযায়ীই আঁকতে হয় দেয়ালের প্রচার চিত্র। সব পাটিরই সেই নির্দেশ। ছবির মত করেই আঁকে নিরঞ্জন। কিন্তু তার মধ্যেই আরো বাড়তি কিছু মেশাতে পারে, আরো জীবন্ত কিছু। নারী দেহের অংশবিশেষে বেপরোয়া তুলি চালায়, মুখের আদলে এক ধরনের স্থূল আমন্ত্রণ মেশায়, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে রমণী-মাধুর্যের বিলোল রেখাগুলো যৌবন-তটের সীমানা উপছে উঠতে চায়।

নারীমূর্তি মনের রেখা-বন্দিনী হল কি না সেটা আঁকার দিকে নয, মানুষটার মুখের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে গণেশচন্দ্র। শেষের দিকে তুলি

আর ততো দ্রুত চলে না নিরঞ্জনের। একটা দুটো করে আঁচড় ফেলে আর দেখে। একটা চোখ বুজে যায় ঘন ঘন। অন্য চোখ জোরালো হয়ে ওঠে। তুলির বাঁট কোলের ওপর রেখে নিজের অগোচরে হাফ-শার্টের পকেট হাতড়ায়। বিড়ি আর দেশলাই উঠে আসে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা মুখে এক ধরনের হাসির আভাস দেখা দেয়। গণেশচন্দ্রের মনে হয় শুধু চোখ দুটো হাসে আর তার ছটায় গোটা মুখটা ওরকম দেখায়। নিরঞ্জন বিড়ি টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। শিকারকে আওতার মধ্যে ফেলে শ্রান্ত তুষ্টিতে দুচোখ ভরে লেহন করে। তারপর বিড়ি ফেলে তুলি ধরে আবার। আর সবশেষে সমস্ত নারী-প্রাচুর্য কেমন করে যেন এক ধরনের কমনীয়তার আবরণে আটকে ফেলে সে।

এইখানেই সব থেকে বড বাহাদুরী আর বড় কারিগরি নিরঞ্জনের। নইলে হয়ত অশ্লীলতার দায়ে মোটা জরিমানা হয়ে যেত তার অনেক পার্টির, আর নিজের পসারেও ভাঁটা পড়ত। তার বদলে হোমরাচোমরা চিত্রনির্মাতাদের ঝকঝকে গাড়িগুলোকে যখন তখন এসে থামতে দেখা যায় নিরঞ্জন বাগচীর নোনাধরা বসত-ঘরের সামনের ঘুপচি গলির মুখে। তাঁরা জানেন, লোকটার মেজাজ চড়িয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। অতি বড় মুখচোরা পথচারীও প্রেক্ষাঘরের প্রাচীর চিত্রের দিকে এক নজর থমকে না তাকিয়ে পারে না। পথ-চলতি অনেক রূপসী মেয়েরও গোপন নিঃশ্বাস পড়ে।

নিজের কদর জানে নিরঞ্জন। তাই তার মেজাজ কড়া, দাম চড়া। অন্যান্য প্রাচীর-চিত্রকরের প্রায় ঈর্ষার পাত্র সে। এ-হেন ওস্তাদের সাগবেদ গণেশচন্দ্র, সতীর্থদের কাছে তারও মর্যাদা কম নয়।

কিন্তু ওস্তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে এই গণেশচন্দ্রই আজ কেমন যেন হকচকিয়ে যাচ্ছে। নিরঞ্জনের হাতের ফোটোখানা অবশ্য এখনো দেখার সুযোগ হয়নি তার। কিন্তু দেয়ালের গায়ে ক্রমশ যে রূপের প্রতিফলন ঘটছে, ফোটোতে তাই আছে বলে তো মনে হয় না। ফোটো না দেখুক, বাবুদের মুখের কথা শুনেছে। তাছাড়া লাইনের খবর-বার্তাও রাখে। কাল সেই নতুন ছবির শুভারম্ভ, যে ছবির প্রচার-সমারোহ শুরু হয়েছে প্রায় দুমাস আগে থেকেই। এক নবাগতা শিল্পীকে নিয়ে বেশ একটু ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে ভাবী দর্শক-চিত্তে। নব-নায়িকাটির সম্বন্ধে শুধু কানে শুনেই ক্ষান্ত হয়নি গণেশচন্দ্র। চিত্র প্রস্তুতির সময় স্টুডিওতে গিয়ে স্বচক্ষে একদিন দেখেও এসেছে তাকে। যতটা রটেছে ততটা না হোক, কিছু তো বটেই!

বাবুরা ডেকে পাঠাননি নিরঞ্জনকে, মস্ত গাড়ি চেপে নিজেরাই এসেছিলেন চার-পাঁচ দিন আগে। সন্ধ্যার পরেই। এঁদো গলি পেরিয়ে টিমটিমে আলোর খুপরি ঘরে নড়-বড়ে চৌকিটার ওপরেই বসেছেন পরমানন্দে। কথা পাড়ার আগেই একটা খাঁটি বিলিতি বোতল উপহার দিয়েছেন নিরঞ্জনকে। তারপর ফোটো বার করেছেন গোটাকতক। আর যা বলছেন তার সারমর্ম, ফোটোতে আসলের কিছুই ওঠেনি—ক্যামেরা তো আর যাদু জানে না নিরঞ্জনের মত, ইত্যাদি—।

সব পার্টির মুখেই এ ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত নিরঞ্জন। কিছু না বলে ফোটো

হাতে নিয়েছে। প্রথমেই নাচের ফোটো একটা। কোনো জম-জমাট দৃশ্যে প্রগলভ সমর্পণের ভঙ্গিতে নৃত্যরতা এক নারী। এটিই প্রধান প্রচার-চিত্র হবে।

গণেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছে ফোটোখানা হাতে নেবার পরেই মুখভাব কেমন যেন বদলে গেছে নিরঞ্জনের। চোখে-মুখে বোবা বিস্ময়। ভদ্রলোকেরা হাসি চেপে এবং আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করেছেন।

কিন্তু নিরঞ্জনের যেন হুঁস নেই তেমন। আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় ফোটোগুলো দেখছে। দেখছেই।

তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে নিরঞ্জন উঠল এক সময। ঘরের কোণের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা খুলল। তলা থেকে আর একখানা ফোটো টেনে বার করল। মলিন আবরণ দেখেই বোঝা যায় অনেক দিন আগের ফোটো সেটা। চৌকিতে ফিরে এসে সেই ফোটোর সঙ্গে সদ্যপ্রাপ্ত ফোটোগুলো একে একে মেলাতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে গণেশচন্দ্র। কাছে এসে কৌতূহল মেটাবে সে সাহস নেই।

সবগুলো ফোটোই চৌকির ওপর রাখল সে। বাখল না, আছড়ে ফেলল। তারপর উঠে পার্টির দেওয়া বোতলটা খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল খানিকটা। গণেশচন্দ্র ঘর ছেড়ে পালালো।

তোরঙ্গের ছবিখানা আবারও কোলের ওপর রেখে নিবঞ্জন কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল ঠিক নেই। এও নৃত্যরতা এক কিশোরী মেয়ের ছবি। দশ বছর আগের এক বেণী দোলানো মেযের ছবি। টাটকা জুঁই ফুলেব মত। দশটা বছর যোগ করলে কি হয়? অন্য খোলা ছবি-গুলোর দিকে বিরস চিত্তে একবার তাকালো সে, দেখল কি হয।

জঠরের তরল পদার্থের ক্রিয়া শুরু হয়েছে একটু একটু। ইচ্ছে হল, পার্টির দেওয়া ছবিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে বড়সড় কিছু একটা যেন চুরি হয়ে গেছে। সেই চুরিটা মেনে নিতে গিযে বুকেব ভিতরটা টনটনিয়ে উঠছে কেমন। নিরঞ্জনের হাসিই পেল। জঠরেব ক্ষুধা আর প্রবৃত্তি-ক্ষুধাব তাড়নায় জঞ্জালেব বোঝা তো কম চাপায়নি, তবু স্মৃতি এমন উদ্ভট হয় কি করে?

নিরঞ্জন হাসছে আর ভাবছে। ভাবতে নেশার মত লাগছে। বোতলের নেশার সঙ্গে এর মিল নেই। স্মৃতির পটে আর একখানা মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

এখন কোথায় আছে প্রবীর? ছেলেটা বোকা ভাবত ওকে, ভাবত এমন ভক্ত আর নেই। বড়লোকের ছেলে। মফঃস্বল সহরের এস-ডি-ওর ছেলে মানেই বড়লোকের ছেলে।

বাপ মুহুরি বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, ছেলেবেলায় ওদের বাড়িতে বড় আসত না নিরঞ্জন। দেখা হত স্নানের ঘাটে, খেলার মাঠে, ফুল বাগানে। তা ছাড়া ইস্কুল তো আছেই। প্রবীর কলেজে ঢোকার 'পর দেখা-শুনাটা কমে আসতে লাগল। তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করার পরে নিরঞ্জনের পড়াশুনার পাট খতম হয়েছিল।

তখন নিরঞ্জন মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি আসত। আরো অনেকে আসত, বাইরের ঘরে বসত। কিন্তু নিরঞ্জন আসত কোনো এক ফাঁকে সেই বাড়ির একটি মেয়েকে দেখার জন্য। অন্য ঘরে তার টুকরো টুকরো কথা, খিল-খিল হাসি, অথবা দাদার উদ্দেশে অসহিষ্ণু দু'চারটে হাঁক-ডাক শোনার জন্যে।

প্রবীরের বোন অনীতা।

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী।

একগাদা বই বুকে করে লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত। দু'বেলা ঠিক সময় ধরে সাইকেল নিয়ে বেরুতো নিরঞ্জন। সকলের চোখ এড়িয়ে যতক্ষণ সম্ভব দূর থেকে অনুসরণ করত, তারপর পাশ কাটিয়ে যেত। কোনদিন বা সামনের দিক থেকে আসত। সে যেন এক নেশার মত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেউ সন্দেহ করতে পারেনি কখনো। ওই মেয়েও না। অবশ্য সন্দেহ করার মত তেমন পাকাপোক্ত বয়সও নয় সেটা অনীতার। তাছাড়া দাদার আড্ডার নিরঞ্জনকে যদি দেখেও থাকে, খেয়াল করেনি। সেখানে নিরঞ্জন এমনিতেই নিষ্প্রভপ্রায়।

এক ছুটির দিনে প্রবীর প্রস্তাব করল, চল অনীতাদের স্কুলের থিয়েটার দেখে আসি—নেমন্তন্ন করেছে, ওরই আবার মেন-রোল কিনা—।

নিরঞ্জনের নিস্পৃহ মুখভাবে মনে হবে অনীতা বলে কোনো মেয়ের অস্তিত্বও জানা নেই তার। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা দাপাদাপি শুরু হয়েছিল মনে আছে।

থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা। নৃত্য-নাট্য সেই প্রথম দেখল নিরঞ্জন। পরের জীবনে আরো অনেক দেখছে। কিন্তু সেদিন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনীতাকে নয়, নাচে-গানে সত্যিই যেন সুষমাভারে আনত এক চণ্ডালিনীর নিঃশেষিত সমর্পণ দেখেছে মন্ত্রমুগ্ধ বিস্ময়ে। এমন বিহ্বল হয়েছিল সারাক্ষণ যে হঠাৎ একটা আলো ঝলসে উঠতে বিষম চমকে উঠেছিল নিরঞ্জন। পরে বুঝেছে ফ্ল্যাশ লাইটে নৃত্যরতা চণ্ডালিনীর ছবি নেওয়া হলো।

সেই এক রাতের বিবশ আচ্ছন্নতা কাটতে কম করে তিন চারদিন লেগেছিল নিরঞ্জনের। ঘুমের মধ্যেও সেই সমর্পণের নূপুর-ধ্বনি শুনেছে।

লম্বা বেণী দুলিয়ে আবার স্কুলে যেতে দেখেছে অনীতাকে। চলার ঠমকে তেমনি বেণী দুলেছে ডাইনে-বাঁয়ে। কিন্তু এ দেখার সঙ্গে আগের দেখার যেন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। ও যেন আর অনীতা নয়—চণ্ডালিনী প্রকৃতি। সেই সাজ নেই, পায়ে নুপুর নেই—তবু নিরঞ্জনের চোখে অনীতা আর প্রকৃতি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এরপর একদিন হঠাৎ এক ফোটো তোলার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সে। নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। শো-কেসএ অনীতার ছবি। অনীতার ছবি নয়, নৃত্যরতা চণ্ডালিনীর ছবি। নিরঞ্জনের মনে পড়ে ছবি তোলা হয়েছিল বটে। প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করে জানল, ওই দোকানের ফোটোগ্রাফারকেই ফোটো তোলার জন্য ডাকা হয়েছিল। ছবিখানা খুব ভালো হওয়ায় তার বাবার কাছ

থেকে একটা কপি শো-কেসএ রাখার পারমিশান আদায় করে ছেড়েছে দোকানের মালিক।

দিন-কতক এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই ফোটো দেখেছে নিরঞ্জন। ইচ্ছে হয়েছে, শো-কেশ ভেঙে ফোটোটা নিয়ে চলে যায়। দোকানের মালিকের সঙ্গেই আলাপ করেছে শেষ পর্যন্ত। আর তারপর যে-মূল্যে সেই ফোটো সংগ্রহ করেছে সেটা তার অনেক দিনের সঞ্চয়।

একটা সিনেমা হল্এর প্রাচীর-নক্সা শেষ হল। আরো দুটোর বাকি। দ্বিতীয় সিনেমা হল্এর কাজ ধরবে একটু রাত হলে, তৃতীযটির কাজ শেষ কববে পরদিন খুব ভোরে। তুলি ফেলে নিরঞ্জন উঠে দাড়াল। গণেশচন্দ্রকে যথাবিধি নির্দেশ দিযে প্রস্থান কবল সে। ভালো করে তার মুখের দিকে তাকালে বুঝত, এবারের কারিগরি তেমন পছন্দ হয়নি গণেশচন্দ্রেব। মনে মনে বেশ অবাক হয়েছে সে, বাবুরা অত খাতির করলেন, অত করে বলে গেলেন—তার বদলে এই! আব ওস্তাদের এই আঁকার ধরনটাও অস্বাভাবিক ঠেকল তার চেখে। তেমন করে বযে-সয়ে এক চোখ বুজে দেখল না, মাঝে বিড়ি ধরিযে শিকাবী চোখে তাকালো না—একধাব থেকে শুধু এঁকেই গেল। এ রকম ব্যতিক্রম গণেশচন্দ্র আর দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

সরঞ্জাম গুছিযে যাবার জন্য প্রস্তুত হল সে। কিন্তু তার আগেই ফুটপাথ ঘেঁষে ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়াল একটা। এক নজব তাকিযেই চিনল গণেশচন্দ্র। বাবুবা হল্এর সাজসজ্জা দেখতে বেরিয়েছেন বোধহয়। ধারের মহিলাটির মাথায খানিকটা ঘোমটার আড়াল থাকলেও গণেশচন্দ্রের চিনতে দেরি হল না ইনিই সেই নবাবতীর্ণা নাযিকা। সকলেই গাড়িব জানালা দিয়ে দেযালের সদ্য-সমাপ্ত ছবি দেখছেন। কারো চোখে মুখেই তেমন খুশির আভাস পেলনা গণেশচন্দ্র।

দরজা খুলে নেমে এলেন স্বয়ং প্রযোজক। রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এই—এটা কে এঁকেছে?

নি-নিরঞ্জনদা...

কোথায সে?

বাড়ি গেল—বলে গেছে রাতে দক্ষিণের ছবিঘরে কাজ হবে।

মাথা হবে...

গটগট করে গাড়িতে উঠলেন আবার। গাড়ি ছুটল। ঘণ্টাখানেক বাদে নিরঞ্জনের বাড়ির গলির মুখে এসে থামল সেই গাড়ি। গাড়িতে প্রযোজকের দুই প্রধান সহকর্মী।

চিৎপাত হযে চৌকিতে শুয়ে ছিল নিরঞ্জন। একটু আগে গণেশচন্দ্র ফিরেছে। বাবুদের খবরটা জানাবে ভাবছে, কিন্তু ঠিক যেন সাহস পাচ্ছে না। সহকর্মীরা ঘরে ঢুকে বিনা ভণিতায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়। —এ কি হয়েছে নিরঞ্জনবাবু? কি করেছেন? আমরা দেখে এলাম—

নিরঞ্জন ধীরেসুস্থে উঠে বসেছে। তাদের বসতে না বলে পালটা প্রশ্ন করল,

কেন কি হয়েছে?

কিছুই হয়নি, কিচ্ছু না, একদম রাবিশ!

হাতের কাছেই পার্টির দেওয়া সেই নমুনাটা ছিল। সেটা টেনে নিয়ে একবার দেখল নিরঞ্জন। তারপর তাদের দিকে ওটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মিলিয়ে দেখে আসুন, এতে যা আছে ওতেও তাই আছে।

সহকর্মীদের একজন বিরক্ত মুখে বললেন, তাতো আছে, কিন্তু আসল এফেক্ট কিছুই নেই—মনে হচ্ছে যেন পুজোর নাচ নাচছে—তাছাড়া মেয়েটির কি ওই বয়েস নাকি! যা এঁকেছেন মনে হয় ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। একবার যদি দেখতেন তাহলে আর—

অন্যজন বললেন, যাকগে যা হয়েছে হয়েছে—শিগগীর ওটা তুলে ফেলে আবার আঁকুন—কর্তা ভয়ানক রেগে গেছেন। এক্ষুনি যান!

নিস্পৃহ মুখে নিরঞ্জন জবাব দিল, আমার দ্বারা আর অন্য রকম হবে না, আপনারা অন্য লোক দেখুন।

গরজ বড় বালাই। হাবভাব দেখে সহকর্মীদের বিরক্তি উবে গেল। একজন বললেন, সে কি কথা, আপনি আর্টিস্ট কম নাকি! মেজাজ আসেনি বলেই ওরকম হয়ে গেছে বোধহয়—

বিড়ি ধরিয়ে নিরাসক্ত মুখে সেই একই জবাব দিল নিরঞ্জন, তার দ্বারা অন্যরকম আর কিছু হবে না।

হবে না মানে? আবারও তেতে ওঠেন ভদ্রলোকেরা, দায়িত্ব নিয়েছেন এখন হবে না বললেই হবে?

সোজা হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে নিরঞ্জন সাফ জবাব দিল, তাহলে থানা পুলিস করুন গে যান।

বাড়তি পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়েও ফল হল না। তাঁরা উঠে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে আবারও গলির মুখে এসে থামল সেই গাড়িটা।

এবারে স্বয়ং প্রযোজক।

সন্ধ্যা পার হওয়া সত্ত্বেও ঘরের আলো জ্বালা হয়নি। চৌকির ওপর নিরঞ্জন তেমনি চুপচাপ বসেছিল। আগন্তুকের সাড়া পেয়ে গণেশচন্দ্র আলো জ্বেলে দিল। নিরঞ্জন বিরক্ত মুখে ফিরে তাকালো।

মৃদু হেসে ভদ্রলোক মুখের সিগারেটটা হাতে নিয়ে বললেন, ওদের পাঠানোই ভুল হয়েছে, জ্ঞানগম্যি থাকলে তো! চলুন—

নিরঞ্জনের দু'চোখ নীরব জিজ্ঞাসু।

চলুন না মশাই, এই ভরসন্ধ্যায় ঘরে বসে আছেন কি! উঠুন, আপনার সঙ্গে আলোচনা আছে।

অগত্যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হল। গাড়িতেও উঠতে হল। ড্রাইভার গাড়ি ছোটালো। নিরঞ্জন ফিরে তাকালো। দৃষ্টিতে এক ধরনের রুক্ষতা। অর্থাৎ, কি

বলার আছে বলুন এবার-

কিন্তু ভদ্রলোক বললেন না কিছুই। পকেট থেকে দামী সিগারেটের টিনটা বার করে তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রায় বিশ পাঁচিশ মিনিট বাদে একটা অপরিচিত বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো। ভদ্রলোক নেমে আহ্বান করলেন, আসুন-

নিরঞ্জন অনুসরণ করল তাঁকে। সামনের বসার ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকে নিরঞ্জন হকচকিয়ে গেল আরো। বিলেতি আসবাবপত্র, মেঝেতে পা-ডোবানো কার্পেট, সামনে দেয়াল-জোড়া সোনালী পাতে বাঁধানো মস্ত শৌখিন আয়না। তাতে নিজের আধ-ময়লা জামা-কাপড় আর খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মূর্তিটি দেখে নিরঞ্জনের মনে হল সে যেন রাহুর অনুচব।

সোফায় বসে আছেন সেই দুজন সহকর্মী। তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। প্রযোজক মশাই মৃদু তর্জন করলেন, তোমরাই এঁর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছ...ম্যাডাম কোথায়?

আসছেন।

বসুন নিরঞ্জনবাবু, বসুন।

প্রযোজকের আপ্যায়নে বসতে গিয়েও বসা হল না। তাব আগেই অন্দর থেকে যে মহিলার আবির্ভাব, তার দিকে সপ্রশংস নেত্রে দুই এক মুহূর্ত চেযে থেকে প্রযোজক সানন্দে বলে উঠলেন, আসুন, একেবারে খোদ আসামী ধরে এনেছি।

নিরঞ্জন বিমূঢ় মুখে একটু হাসতে চেষ্টা করল শুধু। প্রবীরের বোন অনীতাই বটে, কিন্তু সেই অনীতা নয়। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ধপধপে শাদা সিল্কের ব্লাউজের ওপর সর্বাঙ্গ হাল্কা কলাপাতা রঙের দামী শিফনের সবুজাভায় ঘরের এমন রূপও যেন বদলে গেল। চোখে মুখে অধরে সূক্ষ্ম প্রসাধন-মাধুর্য। স্মিতহাস্যে দু'হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকালো। প্রযোজক পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্যোগ করতেই অনীতা বাধা দিয়ে বলল, থাক, এ লাইনে এলে ওঁকে না চিনে উপায় আছে নাকি?—বসুন, দাঁড়িয়ে কেন!

নিজের অগোচরেই নিরঞ্জন বসে পড়ল। হাতখানেক তফাতে সেই কৌচেই নির্দ্বিধায় বসল অনীতাও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আবার, দাঁড়ান চা বলে আসি—কি খাবেন, চা না কফি?

সামান্য একটা জবাব দেবার চেষ্টায় খাবি খেতে লাগল নিরঞ্জন। প্রযোজক বললেন, চা-ই হোক চট করে একটু—

অনীতা ভিতরে চলে গেল। সেই যাওয়াটুকুর ভঙ্গিতেও শিফনের শাসন উপছানো তনু-তরঙ্গ।

প্রযোজক সঙ্গীদের কাছ থেকে আসন্ন চিত্র মুক্তির কি খোঁজখবর নিচ্ছেন কানে এলো না নিরঞ্জনের। তার চোখে ভাসছে মফঃস্বল সহরের সেই রাস্তাটা আর সেই মেয়েটি। বই বুকে করে যে ইস্কুলে যেত, যার লম্বা বেণী দুলত ডাইনে বাঁয়ে। ফুলসাজে চণ্ডালিনী প্রকৃতি সেজেছিল যে মেয়ে.আর যে সমর্পণ দেখে পর পর

ক'রাত্রি ঘুম ছিল না নিরঞ্জনের চোখে।

অনীতা ফিরে এলো একটু বাদেই। পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। নিরঞ্জনেব মোহভঙ্গ হল। অনীতা সেই কৌচেই বসল আবার। হাতে হাতে চা পরিবেশন করে নিজের পেয়ালাটা নিয়ে ঘুরে বসে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। তারপর সরাসবি কাজের কথা পাড়ল একেবারে।—আজ যেটা এঁকেছেন দেখলাম নিবঞ্জনবাবু—

চায়ের পেয়ালা হাতে নিরঞ্জন আড়ষ্ট হয়ে বসে।

তেমনি হাল্কা সুরে অনীতা বলল, আপনার এত নাম-ডাক, কতজন উতবে গেল আপনার হাতে—আপনি আমার বেলায় এমন অকরুণ কেন?

বাকি তিনজন হেসে উঠলেন। নিরঞ্জনও হাসতে চেষ্টা করল। না পেবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

অনীতা ঘুরে বসেছে আবো একটু। গোটা পরিবেশ যেন তারই করায়ত্ত। আব্দার মেশানো অনুযোগের সুবে বলল আবাব, এড়িযে গেলে চলবে না, মুখ তুলুন, যা এঁকেছেন ঠিক হযেছে?

পেয়ালাটা রেখে নিবঞ্জন সত্যিই স্থির নেত্রে তার মুখেব দিকে চেযে বইল খানিক। তারপর ঘাড় নাড়ল, হযনি। উঠে দাঁড়িযে অস্ফুটস্বরে বলল, ঠিক কবে দিচ্ছি।

প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে ড্রাইভারকে বললেন তাকে পৌঁছে দিতে। তারপব অনুচ্চ কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন, ঠিক মত কাজটা কবে দিন নিবঞ্জনবাবু, আপনার পরিশ্রম আমি পুষিয়ে দেব।

বাড়ি ফিরেই নিরঞ্জন গণেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিল, দেযালের আঁকা ছবিটা তুলে ফেলতে এবং সব সরঞ্জাম রেডি কবে রাখতে।

সে চলে যেতে দশ বছর আগের সেই ছবিখানা বাব করল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে। খরচোখে বিস্মৃতির আভাস। কযেক নিমেষ। তাবপরেই খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলল ফোটোখানা। টুকরোগুলো জানালা দিযে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। কতক বাইরে পড়ল, কতক ঘরের মধ্যেই।

রাত মন্দ হযনি।

ঠায় দাঁড়িযে থেকে পাযে ব্যথা ধরে যাবার কথা গণেশচন্দ্রের। কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছে না। উৎফুল্ল বিস্ময়ে ওস্তাদের আঁকা দেখছে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে। আনন্দে দুই একবার স্ফূর্তিসূচক শব্দ বার করে ফেলার মুখে জিভ কামড়ে সামলে নিয়েছে। দেখছে আর কিসের যেন একটা উষ্ণ স্রোত উপলব্ধি করছে সেও। লোকটা যেন নারীর সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন না করে ছাড়বে না। আড়ে আড়ে বাববাব দেখছে মানুষটাকে। শেষের মাথায় ঠিক তেমনি একটা দুটো করে আঁচড় ফেলছে আর দেখছে এক চোখ বুজে। অন্য চোখটা জোরালো হয়ে উঠছে তেমনি। তেমনি নয়, যেমন হয় তার থেকেও অনেক বেশি। তুলি কোলের ওপর ফেলে রেখে পকেট হাতড়াচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে দেখছে চেয়ে চেয়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখের সেই পরিচিত ছটা

রাতের আলোয় চকচকে দেখাচ্ছে আরো। শিকারকে আওতার মধ্যে পেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শিকারীর দৃষ্টি। বিড়ি ফেলে তুলি ধরেছে আবার।

শেষ হল।

স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দেখছিল গণেশচন্দ্র। হুঁস ফিরল। উঁচু টুল থেকে নেমে দাঁড়াল মানুষটা। বিড়ির খোঁজে আবার পকেট হাতড়াচ্ছে। মনের মত আঁকা হলে ওস্তাদের দিকে চেয়ে নীরবে শুধু একমুখ হাসে গণেশচন্দ্র। তারিফ করার আর কোনো ভাষা জানে না, অথবা জানলেও সাহসে কুলোয় না। আজকের হাসিটা একটু বেশিরকমই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল গণেশচন্দ্রের মুখে।

কিন্তু চোখোচোখি হতেই হকচকিয়ে গেল কেমন। হাসি তলিয়ে গেল। শিকারীর দুই চোখে চকচকে ছুরির ফলার মত ওই শানিত দৃষ্টি দেখে অভ্যস্ত সে।

কিন্তু ছুরির ফলাটা যেন জলে ভেজা।

বউ ধার

রামজীবনবাবু এক কালের নামকরা গল্প লিখিয়ে ছিলেন। উপন্যাসের না হোক, ছোট গল্পে বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটা স্থায়ী আসন থাকবে। আর উষারঞ্জনবাবু তাঁরই সমসাময়িক তীক্ষ্ণ সমালোচক। একটা সময় ছিল যখন কোনো সাহিত্য-পত্রে অথবা সাহিত্য সংকলনে রামজীবনবাবুর গল্প না থাকলে বহু পাঠক ঠোঁট উল্টে সেই সাহিত্যপত্র বা সংকলন একদিকে সরিয়ে রাখতেন। অন্যদিকে, সমালোচনা সাহিত্য আজকের দিনেই কে আর কতটুকু পড়ে—সেদিন তো আরও কম পড়ত। তবু সেদিনও উষারঞ্জনবাবুর কিছু বক্তব্য বা মন্তব্য চোখে পড়লে পাঠকের আগ্রহ একটু অন্যরকম হত। তাঁর টীকাটিপ্পনী আর চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে অনেক রসের খোরাক থাকত।

রামজীবনবাবু এখন আর গল্প লেখেন না। বয়েস সত্তরের দিকে গড়িয়েছে, দু'বারে দুই চোখের ছানি কাটিয়ে লেখা ছেড়েছেন। বাড়িতে এখন দু'মাস ধরনা দিয়ে পড়ে থাকলেও একটা ছোট লেখা মেলে না। আর উষারঞ্জনবাবু কলম ধরা ছেড়েছেন তাঁরও আগে। তাঁর অঢেল টাকা এবং পৈতৃক সম্পত্তি। জীবিকা অর্জনের জন্যে কোনোদিন লিখতে হয়নি তাঁকে। বরং এককালে নিজের টাকায় কাগজ করে অনেক লেখকের উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিলেন তিনি। শুভার্থী চিকিৎসকরা ব্লাড-প্রেসার রোগটা পাকাপোক্তভাবে তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তিনিও লেখা ছেড়েছেন।

দু'জনেই এক বাড়িতে থাকেন। বাড়িটা উষারঞ্জনবাবুর। ওপর তলায় নিজে থাকেন, নিচের তলায় বিনা ভাড়ায় রামজীবনবাবু। সকালে বিকালে দুজনে একসঙ্গে বেড়ান,

চেঞ্জের সময় একই জায়গায় চেঞ্জে যান, আর পাড়ার সাহিত্য বৈঠকে যেদিন আসেন—একসঙ্গেই আসেন।

বৈঠকে সেদিন ভারী উল্লাস। তাঁরা এলেই তিন চারজন তিন চার দিকে ছোটে অনুপস্থিত সভ্যদের খবর দিয়ে ধরে নিয়ে আসতে। ফলে বৈঠক ঘরে সেদিন ঠাসাঠাসি ভিড়। রামজীবনবাবু গল্প আর লেখেন না বটে, কিন্তু গল্প করেন। ভারী মজার মজার গল্প। নিজের জানা গল্প, শোনা গল্প, বা বানানো গল্প। যে গল্পই বলুন, জমজমাট। এদিকে ঊষারঞ্জনবাবুরও সমালোচনার স্বভাবটি একেবারে যায়নি। গল্পের শুরুতে হোক, মাঝে হোক, বা শেষে হোক, বারকতক হুল ফোটাবেন, আর, কিছু না কিছু মন্তব্যও করবেন।

আমার বিশ্বাস, এই সান্ধ্য বৈঠকে এ পর্যন্ত রামজীবনবাবু যত গল্প বলেছেন, শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই অনায়াসে কেউ মোটামুটি সাহিত্য-খ্যাতি কুড়োতে পারে। আর ঊষারঞ্জনবাবুর বিদ্রূপ ব্যঞ্জনা টীকা-টিপ্পনীর ধারা মক্স করে মোটামুটি সমালোচক হয়ে বসাও সম্ভব।

গরমে হাওয়া বদলে আসার পর বৈঠকে সেইদিন প্রথম পদার্পণ তাঁদের। আমরা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে বসে আছি। রামজীবনবাবু গুড়গুড় করে তামাক টানছেন আর আমাদের প্রত্যাশা দেখে মিটিমিটি হাসছেন। একটু তফাতে ঊষারঞ্জনবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দামী সিগারেট টানছেন। তিনি শৌখিন মানুষ, গম্ভীরও। রামজীবনবাবু মুখ না খুললে তাঁর মুখ আদৌ খুলতে না পারে।

কিন্তু রামজীবনবাবু মুখ খুলবেন, কারণ, ঘরের একদিক থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের কথা কিছু বলবার জন্যে বায়না হয়েছে। তাই শুনেই মিটিমিটি হাসছেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক্ষায় রেখে গড়গড়ার নলটা একপাশে সরিয়ে সকলের উদ্দেশেই হঠাই তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, সাহিত্যিক হবার জন্য তোমরা কেউ বউ ধার করেছ কখনো?

প্রথম বড়ে এগিয়েই গল্পের আসর মাত। আমরা সাগ্রহে নড়ে-চড়ে বসলাম। অন্যদিকে মুখ বাঁকিয়ে ক্রিটিক ঊষারঞ্জনবাবু মন্তব্য করলেন, সূচনা অশ্লীল।

শুনব! শুনব! চারদিকে থেকে উৎফুল্ল তাগিদ।

রামজীবনবাবু বললেন, সাহিত্যিক হবার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল, বউ ধারটাই তার মধ্যে বড় ব্যাপার।

ঊষারঞ্জনবাবু এবারে সরাসরি ভুরু কুঁচকে তাকালেন তাঁর দিকে। —ধারের অভ্যাস সহজে যায় না শুনেছি, তোমার গেছে তো?

রামজীবনবাবু বক্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গড়গড়ার নলটা মুখে ঠেকালেন। —নিজের পরিবারকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো গেছে কি না...।

আবার দমকা হাসি। ঊষারঞ্জনবাবু আর বাধা সৃষ্টি না করে সিগারেট টানতে লাগলেন। গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখলেন যেন। গল্প আজ

ভালোরকম জমবে সেই আশায় উন্মুখ সকলেই।

রামজীবনবাবুর গল্প তাঁর নিজস্ব জবানীতে বলাই ভালো। এর মধ্যে লেখকের কারিগরি ফলাতে গেলে গল্পের রস ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। গড়গড়ার নল রেখে উষারঞ্জনবাবুর মুখের ওপর আর একটা তির্যক নিরীহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি আসরে অবতীর্ণ হলেন। এক নজরে সকলের প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশাটুকু দেখে নিয়ে প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস ঠোঁটের ফাঁকে আটকে রাখলেন।

—আমাদের সময় ভাই লেখক হওয়াটা আজকের মত এত সহজ ছিল না। সেদিক থেকে তোমরা ভাগ্যবান। লেখার বুলি ফুটতে না ফুটতে লেখকের কাছে তখন সম্পাদক বা প্রকাশক ছুটত না। সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির লেখককেই তাঁদের দ্বারস্থ হতে হত। নামজাদা উকীলের সামনে খুদে মক্কেল যেমন মুখ করে বসে থাকে, বা রায় দেবার সময় আসামী যেমন করে বিচারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে—আমাদেরও সম্পাদকের কাছে সেইভাবে গিয়ে ধরনা দিতে হত। লেখা সচল কি অচল সেই রায়ের অনিশ্চয়তায় তেমনি করেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত। সোনার মত নিক্তির ওজনে গল্প বিচার করা হত তখন। একটা শব্দের এদিক ওদিক হলে সম্পাদকের বিবেচনার নিক্তিতে কম করে দশ রত্তির তফাত।

প্রবীণ সমালোচক উষারঞ্জনবাবু সিগারেটের টুকরো অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে মন্তব্য করলেন, বোরিং।

রামজীবনবাবু কর্ণপাত করলেন না। বলে গেলেন,—এই ওজনটা তখন সব থেকে বেশি হত কথাঞ্জলি কাগজে। কথাঞ্জলির নাম তোমরা সকলেই শুনেছ নিশ্চয়। কথাঞ্জলিতে অঞ্জলি না উতরালে লেখকের লেখক হওয়া প্রায় দুরাশা ছিল। ফলে ছোট বড় সব লেখকই তখন কথাঞ্জলির চারধারে গুনগুনিয়ে ঘুর ঘুর করতেন।

—আমার সময় সেই কথাঞ্জলিতে এক নবীন সম্পাদক জাঁকিয়ে বসেছেন। তার নাম ধাম আর প্রতাপ আরো বেশি ছড়িয়েছিল, কারণ লেখকের লেখা ছাপা হলে তিনি টাকা দিতে শুরু করেছিলেন। এক একটা লেখা-প্রতি দশ টাকা পর্যন্ত! ভাবো একবার, অন্য কাগজের সম্পাদকরা নামী লেখকদের কাছ থেকে তখন দু টাকায় বড় গল্প পেতেন। ছোট লেখকদের টাকা পাওয়া দূরে থাক, বাড়ির কলাটা মুলোটা চুরি করে নিজেদের গাছের জিনিস বলে সম্পাদকদের দিয়ে আসতে হত।

—এই কথাঞ্জলিতেই লেখা ছাপানোর চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম আমি। সম্পাদক নবীন হলে কি হবে, প্রবীণদের ভিড়ের ঠেলায় তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায়। আর সুযোগ সুবিধে মত কাছে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলেও কথা তিনি বড় কইতেন না। বহু আয়াসের এক একটা লেখা বহু লেখার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, দেখব। কখনো বা লেখা সমেত লেখক ফিরিয়ে দিতেন।—গল্প দরকার নেই এখন।

শেষের দিকে এক মস্ত লেখকের—নাম করব না—চিঠির ফলে সম্পাদক আমার লেখাগুলো একটু আধটু উল্টে পাল্টে দেখতেন। তারপর লেখাগুলো ফেরত আসত।

কখনো বা সহৃদয় নির্দেশ থাকত, লেখার মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে, আরো অনেক লিখে হাত মক্স করুন, আরো ভালো লেখা পাঠান, ইত্যাদি।

ওইটুকুতেই গলে যেতাম একেবারে। আশায় আনন্দে তিনগুণ উৎসাহ নিয়ে লেখা মক্স করতাম। ক্রমাগত নতুন লেখা দিয়ে পুরনো লেখা ফেরত নিয়ে আসতাম।

কিন্তু কথাগুলিতে কক্ষে পাওয়ার মত লেখা কিছুতে আর লিখে উঠতে পারিনে। ভাগ্যক্রমে একদিন পত্রদাতা সেই অগ্রজ লেখককে উপস্থিত দেখলাম সেখানে। আরো অনেকে ছিলেন। আমাকে দেখিয়ে তিনি সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কাগজে তো এ আজকাল বেশ লিখছে টিখছে—আপনি কেমন বুঝছেন?

সম্পাদক জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। সামান্য একটু মাথা নেড়েছেন শুধু। অর্থাৎ, আশা আছে।

আমার পত্রদাতা বৃদ্ধ লেখকটি রসিক মানুষ। এবারে আমার দিকে চেয়েই ঠাট্টা করলেন, তোমার বউ অমন সুন্দরী দেখতে, তোমার তো ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প লেখা উচিত। একবার করে বউ নিয়ে রাস্তায় বেরুবে, চারদিকে চোখ রাখবে, আর বাড়ি ফিরে একটা করে গল্প লিখবে।

সকলেই হেসে উঠেছিলেন। লজ্জায় অধোবদন হলেও আড়-চোখে চেয়ে দেখি কর্মব্যস্ত সম্পাদকও হাসছেন মৃদু মৃদু।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে সস্ত্রীক একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রণাম করেছিলাম। তারই জের।

এবারে ভায়ারা একটা গোপন কথা ফাঁস করছি তোমাদের কাছে।

নিজের স্ত্রীটিকে আমি তেমন সুন্দরী দেখতাম না। কারণ আমি আরো একটি সুন্দরী দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখতাম। তিনি আমার স্ত্রীর সহোদরা। সুন্দরী বলে সুন্দরী, একেবারে মিষ্টি সুন্দরী। চলন বলন, রাগ বিরাগ, ঠাট ঠমক—সব মিষ্টি। তার ওপর সেই দিনে বি-এ পড়েন, ভাবো একবার—নাম করলেই তোমরা চিনে ফেলবে, নাম করব না। আমি একটা নাম দিয়েছিলাম। পদ্মা, পদ্মা দেবী। পদ্মা দেখেছ তোমরা? এমনিতে খুশির ঢেউ, ভ্রূকুটিও রোমাঞ্চকর—কিন্তু ঝড় উঠলে থর থর কাঁপুনি।

মোট কথা ওই শ্যালিকাটির রূপের জোয়ারে গোপনে গোপনে আমি দিশেহারা হতাম প্রায়ই। মনে মনে আফশোস হত, তাড়াতাড়ি বিয়েটা না করে বসালে হয়ত এই পরেরটিকেই ধরা যেত। গোপন খেদটা পদ্মা দেবীর কাছে একদিন প্রকাশ্যে প্রকাশও করে ফেলেছিলাম। তার ফল ভয়াবহ হয়েছিল।

আর একটা কথাও এই ফাঁকে বলে নেওয়া দরকার। সেটা আমার ভাগ্যের কথা। বিয়ের পরে ভাগ্য ফেরে এ ধরনের কথা শোনা ছিল। কিন্তু বোন বিয়ে দেবার পর শালার ভাগ্য ফেরে, এ রকম কথা কখনো শুনিনি। আমার বরাতে তাই ঘটল। বোন বিয়ে দেবার পরেই শালার ব্যবসায়-ভাগ্যে বৃহস্পতির উদয়। দু'বছরের মধ্যে তাদের একটা নিজস্ব গাড়ি পর্যন্ত (যদিও সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড) হয়ে গেল। সেই গাড়ি

চড়ে পদ্মা দেবী কলেজে যাতাযাত কবতেন।

যাক, এবাবে আসল গল্প। স্মৃতিব আমেজে বামজীবনবাবুব দু'চোখ আধবোজা।

—দিনটা এই এত বছবেও চোখেব ওপব ভাসছে। বেলা তখন তিনটে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশেব অবস্থা মুখ ভাব কবা কালো মেঘেব মত। আমি পাযে হেঁটে চলেছি কথাঞ্জলিব দপ্তবে। পুবনো গল্প ফেবত নিযে যথাবীতি নতুন গল্প দিযে আসব। মুখটা আপাতত শুকনো, সম্পাদকেব দপ্তবে পৌঁছুনোব আগে হাসি-হাসি কবে নেব।

অন্তবাত্মা কাঁপিযে দিযে ঘ্যাচ কবে একেবাবে গা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়াল একটা। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যথার্থ ক্রুদ্ধ হযে ওঠাব অবকাশ পেল না। চেযে দেখি পিছনেব সীটে সমাসীনা পদ্মা দেবী। দবজা খুলে দিযে ডাকলেন, উঠে আসুন।

বিনা বাক্যে উঠে বসতে আবাব গাড়ি চলল। তাবপব শ্যালিকাব স্বভাব সুলভ গঞ্জনা, এভাবে হাঁ কবে চলেছেন কোথায, একদিন গাড়ি চাপা পড়বেন দেখি।

বললাম, পড়লে জ্বালা জুড়তো।

বুক মোচড়ানো ভ্রূকুটি সৌন্দর্যে খানিক ডুবে থাকাব পব আসল কাজটা মনে পড়ল। বললাম, আমাব তো ভাই একটা কাজ সেবে যেতে হবে। ড্রাইভাবকে গন্তব্য পথেব নির্দেশও দেওযা হল।

কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতেই অন্তস্তলেব কি এক অদৃশ্য মন্ত্রণায বাব বাব বোমাঞ্চিত হযে উঠতে লাগলাম। যত ভাবছি ততো মুখ শুকিযে যাচ্ছে, আব জলতেষ্টা পাচ্ছে। আশা মবীচিকা, কিছুতে আব সেই আশাব হাতছানি এড়ানো গেল না।

হঠাৎ ঘোষণা কবলাম, ভযানক জ্বব আসছে, এত জ্বব আসছে যে শবীবটা আব খাড়া বাখতে পাবছি না।

মুখ চোখেব অবস্থা দেখে পদ্মা দেবীবও ভালো লাগল না। প্রথমে হাত পবে কপাল পবীক্ষা কবলেন। —কই, গা তো ঠাণ্ডা পাথব।

বললাম, বেজায শীত কবছে, তাই ঠাণ্ডা বোধহয... জ্ববটা খুব তেড়ে আসছে, মাথা তুলতে পাবছি না।

তিনি প্রস্তাব কবলেন, আব কোথাও গিযে কাজ নেই তাহলে, বাড়ি চলুন।

না, আজকেই লেখাটা দেবাব কথা, দিযেই যাই...সম্পাদক আবাব কথা না বাখলে বেজায চটেন।

নামকবা এই সম্পাদকটিব নাম উনিও জানতেন। আব বাধা দিলেন না। এদিকে অদৃষ্টও প্রসন্ন, জল চেপে এলো।

গাড়িটা সম্পাদকেব দপ্তবেব সামনে এসে দাঁড়াতে ঘোষণা কবলাম, জ্ববও চেপে আসি আসি কবছে, সর্বাঙ্গে কাঁপুনি, আব বসতেও পাবছি না।

এ অবস্থায কি আব কবতে পাবি? যা পাবি তাই কবলাম। পদ্মা দেবীব কাছে আবেদন কবলাম, এই জলে ভিজলে মবেই যাব, তুমি এক কাজ কববে ভাই—লেখাটা

সম্পাদকের হাতে দিয়ে আসবে দয়া করে? আমি গাড়িতে বসে আছি বোলো না যেন, এ পর্যন্ত এসেও দেখা করলাম না...অসুখ বিশ্বাসই করবে না—সম্পাদক কি না, ভয়ানক রাশভারী, তোমার কিছু ভয় নেই, শুধু অসুস্থ জানিয়ে লেখাটি দিয়ে আসবে।

ভয়টা আবার কিসের, দিন দিয়ে আসছি—

আমার দুরবস্থা দেখেই মনে মনে রাশভারী সম্পাদকের ওপর চটেছেন উনি, তার ওপরে ভয়ের কথা বলতে আরো একটু মেজাজ চড়েছিল।

লেখা হাতে করে তিনি বীরাঙ্গনার মতই গাড়ি থেকে নামলেন। কিন্তু বৃষ্টি যে! শাড়ির আঁচলাটা মাথায় জড়িয়ে এক ছুট—

আমি ঘাড় বাড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে একটা ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে তাড়াতাড়ি সরে এসে একেবারে গাড়ির কোণে মিশে থাকতে চেষ্টা করলাম। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং সম্পাদক। লোক না থাকায় আলসেয় দাঁড়িয়ে জল দেখছিলেন বোধহয়। বৃষ্টি-বিড়ম্বিতা ত্বরিতচরণা রমণী মূর্তিটি ছাড়া আর কিছু তাঁর চোখে পড়েনি, পড়ার কথাও নয় জেনেও ভিতরটা আমার ধুকপুক করতে লাগল।

মিনিট আট-দশ বাদে তিনি ফিরে এলেন। আবারও মাথায কাপড়টি তুলে দিয়ে এক দৌড়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। এক গাল হাসিভরা জলে-ভেজা মুখখানি দেখে আমি যে বেজায় অসুস্থ সেটা নিজেই ভুলে বসার দাখিল। গাড়িটা খানিক এগোতে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম। —কি হল?

—দিয়ে এলাম, ভদ্রলোক তো খারাপ নয়, আপনি ওরকম বললেন কেন? মাঝখান থেকে আমিই বিচ্ছিরি ঠাট্টা করে এলাম।

সর্বনাশ। কি বলে এলে?

বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি। —আপনি আচ্ছা ভীতু তো! ভয় নেই, আপনার আগের লেখাটা মনোনীত হয়েছে বললেন, আর এ লেখাটাও রেখে দিলেন।

জয় গণেশ! জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ! আমার সেই আবেগের মুখ আগলাতে কি ধকল গেল সে তোমরা বুঝতে পারবে না ভায়ারা। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি বললেন?

—উনি বললেন, অসুখ যখন কি দরকার ছিল আপনার কষ্ট করে লেখা নিয়ে আসার, পরে পাঠালেই হত।

তুমি কি বললে?

আমি বললাম, আপনি সম্পাদক, আপনাদের বিরাগভাজন হবার কথা মনে হলেই লেখকদের হার্টফেল করার দাখিল, অসুখ থাক আর যাই থাক সময়মত লেখা পৌঁছে দিতে হবে—তারপর সে লেখা আপনারা ছাপুন বা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটেই ফেলুন।

আমি হাওয়ায় ভাসছি। —তারপর? তারপর?

তারপর আর কি, আমি তো আর লেখিকা নই যে ভয় করব। হেসে হজম

করলেন, বললেন, জল থামলে যেতে, বললেন এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে—আপনি গাড়িতে বসে ধুঁকছেন সে তো আর জানেন না! আমি গাড়িতে যাব জানিয়েই আবার ছুট।

একটু বাদে গবেষণা করে বললাম, তুমি মাথায় কাপড় দিয়ে দৌড়েছিলে, তোমাকে বিবাহিতা ভেবেছেন বোধ হয়।

আপনার যেমন বুদ্ধি, ওখানেও আমি—

থমকে গেলেন। ভ্রূকুটি। —খুব যে! বিবাহিতা ভাবুন আর যাই ভাবুন তাতে আপনার কী?

—না আমার আর কি। বেফাঁস বলে ফেলে ঢোক গিলেছি।

বারান্দার আলসেতে দাঁড়িয়ে সম্পাদক যে তাঁকে ঘোমটা টেনে দৌড়তে দেখেছেন সেটা আর কোন্ সাহসে বলি?

তারপর যথাসময়ে কথাঞ্জলিতে পরপর দুটো লেখাই ছাপা হয়েছে। যেটা মনোনীত হযেছে জানা গেল সেটাও, আর যেটা পদ্মা দেবী সমর্পণ করে এলেন সেটাও।

এরপর দু'দুবার লেখা পাঠানোর আগে—তা প্রায় আট দশ দিন আগে থাকতেই আমার অসুখ হতে লাগল। আর সেই অসুখের খবরটা যাতে ভালো করে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছয় সেদিকটাও ম্যানেজ করতে হল। হার্ট দুর্বল, চলতে ফিরতে মাথা ঘোরে, হাঁটা চলা ডাক্তারের নিষেধ, ইত্যাদি—।

ফলে শালী ছেড়ে ফল আর সন্দেশ নিয়ে দু'বারই শাশুড়ী আর শালাও জামাইকে দেখে গেছেন। শেষের বার বড় ডাক্তার দেখাতেও পরামর্শ দিয়ে গেছেন তাঁরা। আর এদিকে স্ত্রীও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে খাওয়াদাওয়ার একটু সুব্যবস্থাই করছেন। লেখা পাঠানোর দিন এলে শ্রীমতীকে ডেকে সেই একই আবেদন, দিয়ে এসো ভাই, নইলে এই শরীরে নিজেকেই যেতে হয়—কখন মাথা ঘুরে পড়ি ঠিক নেই।

পদ্মা দেবী আপত্তি করেন নি। বরং ঠাট্টাই করেছেন, তাঁর লেখা দিয়ে আসার দৌলতেই আমার লেখা ছাপা হচ্ছে—

পাপ লাঘবের সুযোগ পেয়েই একবাক্যে স্বীকার করেছি, তা বটে, তাই বটে—।

উনি লেখা দিয়ে এসেছেন। দিয়ে এসে অত অল্পবয়সী নামকরা সম্পাদকের বিনয় ব্যবহারের সুখ্যাতিই করেছেন। ভদ্রলোক নাকি যেমন বিনয়ী, তেমনি ভদ্র।

বিনয়ী ভদ্রলোককে আমি শুধু পত্রের দ্বারা অসুস্থতার কথা জানিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছি। যদিও জানি তার দরকার ছিল না। তিনি অসুস্থতার দরুন উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রের জবাব দিয়েছেন।

তৃতীয় বারে ফেঁসে গেলাম।

লেখা পৌঁছে দিয়ে শ্রীমতী একেবারে চণ্ডী মূর্তিতে সবাসরি আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তাঁর তপ্ত প্রশ্ন, আপনার কি অসুখ, কে দেখছে?

আমি হতভম্ব, কেন? কি হয়েছে?

অসহিষ্ণু অগ্নি উদ্‌গিরণ আবার, কি অসুখ? কে দেখছে?

ইয়ে—হার্টের অসুখ, এক বন্ধু ডাক্তার—

ওষুধ কই? প্রেসকৃপশন কই?

বোনের মূর্তি দেখে স্ত্রীর মুখে এতক্ষণ কথা সরেনি। এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, হল কি রে তোর?

কর্ণপাতও করলেন না। আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করলেন আবার, জবাব দিচ্ছেন না কেন, কি ওষুধ খাচ্ছেন? ডাক্তারের প্রেসকৃপশন কই?

আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা আমার। —ওষুধ দেননি, মানে একটু ভালো খেতে টেতে বলেছেন—

ভালো খেতে টেতে বলেছেন? দুইচোখে আগুনের কণা। আপনি মিথ্যেবাদী! আপনি জোচ্চোর, আপনি অভদ্র, আপনি ইতর, আপনি ছোটলোক—

আত্মপরিচয় লাভ করে নির্বাক আমি। কিন্তু অতটা তাঁর ভগ্নীরই বরদাস্ত হল না বোধহয়। তিনি প্রতিবাদ করলেন, তোর মাথা খারাপ হল না কি! কি হয়েছে?

কি হয়েছে? তোমার ওই লোকটাকে তোমার চিনতে ঢের দেরি এখনো—আমাকে ওই সেই সম্পাদক তুমি বলে জানে—

স্ত্রীর দুর্বোধ্য বিস্ময়। —তোকে আমি বলে জানে! কি বকছিস আবোল তাবোল?

এবারে ভগ্নীর ওপরেই ক্রুদ্ধ সহোদরা। ওই তো বুদ্ধি তোমার, সব জেনে শুনে ফি-বার আমাকে দিয়ে লেখা পাঠায়—লেখা যাতে ছাপা হয়, অসুখ না ঘোড়ার ডিম!

অনুনয় বিনয় করে, হাত ধরে, টেনে হিঁচড়ে তাকে বসাতে চেষ্টা করলাম। এদিকে যা হয়েছে হয়েছে, ওদিকে কতটা সর্বনাশ করে এলো কে জানে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর জেরায় প্রকাশ, কে না কে এক ভদ্রলোক ছিলেন কথাঞ্জলির দপ্তরে, তাঁর কাছে সম্পাদক শ্রীমতীর পরিচয় দিয়েছেন অমুকের স্ত্রী বলে। তাই শুনেই জ্বলতে জ্বলতে তাঁর এখানে পুনরাগমন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু স্ত্রীর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোকে দেখেও উনি ওরকম ভাবতে গেলেন কেন?

জবাবে আমিই তাড়াতাড়ি নিজের দোষস্খালনের পথ করতে ব্যস্ত। বললাম, প্রথম দিন দোতলার আলসে থেকে উনি ওকে মাথায় কাপড় দিয়ে দৌড়ে ঢুকতে দেখেছিলেন—

এবার ঝলসে উঠে পদ্মা দেবী চার আঙুল জিভ বার করে আমায় যথার্থ চণ্ডিকা মূর্তি দেখিয়ে এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। নিজের অপরাধ যথাসম্ভব লঘু করে স্ত্রীকে ব্যাপারটা বোঝানোর একটু সুবিধে হল। শুনে তিনিও অবশ্য রাগতেই চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমার বরাতক্রমে রাগটা ওঠার আগেই তাঁর মুখে হাসি এসে গেল।

কিন্তু সত্যিকারের বিপদ সেই বিকেলে। দোতলার বারান্দা থেকে দেখি ঝকঝকে একটা গাড়ি থামল বাড়ির দরজায় আর সেই গাড়ি থেকে নামলেন কথাঞ্জলির তরুণ সম্পাদক! আমি দিশেহারা। ঘরে সরে এসে বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আছি। চাকর এসে খবর দিল, আমার অসুখ শুনে কাগজ-আপিস থেকে এক বাবু দেখতে এসেছেন।

প্রথমেই স্ত্রীর শরণাপন্ন। ভালো করে চা জলখাবার সাজাতে অনুরোধ করে সটান শয্যায় আশ্রয় নিলাম। তারপর চাকরের প্রতি ভদ্রলোককে নিয়ে আসার নির্দেশ।

সেই সাক্ষাতের প্রথম দৃশ্যটা তোমরা কল্পনা করে নাও ভায়ারা। আমি বিস্ময়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত। আর, সম্পাদকের কর্তব্যের বিনয়, অসুখ ও চিকিৎসার প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ। শেষে আমার ইদানীংকালের লেখার উন্নতি প্রসঙ্গে দুচার কথা। সেই সঙ্গে কাকে যেন দেখবেন আশা করছেন অথচ দেখছেন না...। তারপর আমার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশংসা—আপনার লেখার প্রতি আপনার স্ত্রীর ভারী দরদ, নিজে কষ্ট করে লেখা দিয়ে আসেন, খুব ভালো—

এই সুযোগ হেলায় হারালে ভরাডুবি। রাজ্যের বিস্ময় আমার গলায়, আমার স্ত্রী!...ও আপনি আমার শালীর কথা বলছেন, তাই তখন এসে হেসে গড়িয়ে তার দিদির কাছে কি সব বলছিল... তার তো বিয়েই হয়নি এখনো, বি-এ পড়ছে। —যাতায়াতের পথে পড়ে বলে ওই নিয়ে যায়...তবে আমার লেখার ওপর ওর সত্যিই খুব দরদ।

সম্পাদকের মুখের সেই কারুকার্য আমি জীবনে ভুলব না। স্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন চা জলখাবার নিয়ে। তখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। পরিচয় আর সৌজন্য বিনিময়। কিন্তু যতক্ষণ ছিলেন ভদ্রলোক, আর একমুহূর্তও স্বচ্ছন্দবোধ করেন নি।

কই হে, গল্প শেষ করেই যেন রামজীবনবাবু হাই তুললেন একটা, এবারে আর একটু তামাক-টামাকের ব্যবস্থা করো—

তামাকের বদলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পাঁচ সাতজন। —কিন্তু আপনার লেখা কি হল, কথাঞ্জলি কাগজে আপনার লেখা বন্ধ হয়ে গেল?

পাগল নাকি! উল্টে রামজীবনবাবুই বিস্মিত যেন। —লেখা বাড়ল আরো, কিছুদিন বাদে সম্পাদক নিজে উপন্যাস চেয়ে নিয়ে ছেপেছেন।

আর একজন খুঁত খুঁত করে উঠল, কিন্তু গল্পটা যেন শেষ হল না, আপনার শালীর কি হল?

জবাব না দিয়ে রামজীবনবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

আমরা উসখুস করছি। ওদিকে ক্রিটিক ঊষারঞ্জনবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে এতক্ষণ যেন ঘুমুচ্ছিলেন। আড়ামোড়া দিয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করলেন তিনি। মন্তব্যের আশায় সকলেই এবারে তাঁর দিকে চেয়ে। কিন্তু তাঁকেও নীরব দেখে একজন তাগিদ দিল, আপনি বলুন না—গল্পটার শেষ কি-রকম যেন হল—সম্পাদক উপন্যাস চেয়ে ছাপলেন, অথচ—

উষারঞ্জনবাবু গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, বাজে গল্পের শেষ ওই রকমই হয়। আর বউ-ধার-করা লেখক সম্বন্ধেও আমার কোনো বক্তব্য নেই—সে সম্বন্ধে ওঁর শালীই ওঁকে যা বলবার বলেছেন—মিথ্যেবাদী বলেছেন, জোচ্চোর বলেছেন, অভদ্র বলেছেন, ইতর বলেছেন, ছোটলোক বলেছেন—ভদ্রমহিলার সেই সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে আমি একমত।

রামজীবনবাবু বললেন, ভদ্র মহিলার সুচিন্তিত মতামত পরে আরো একটু প্রসারিত হয়েছিল। কাপড় কাচা পেশা যাদের তারা যে ভারবাহী জীব পোষে, সেই তরুণ সম্পাদকের সঙ্গে তারই একটা বিশেষ সাদৃশ্য দেখেছিলেন পদ্মা দেবী।

কক্‌খনো না! উষারঞ্জনবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন, এ তোমার বানানো কথা, আমি আজই ওকে—

থমকে গেলেন। অপ্রতিভ।

রামজীবনবাবু তার মুখোমুখি ঘুরে বসে হাঁ করে চেয়ে রইলেন খানিক। নিরীহ বিস্ময়। —এ গল্পে তুমি আবার কে হে!

রামজীবনবাবুর গল্পের শেষ মিলতে সকলের ঘর ফাটানো হাসি।

রিষ্টি

ভরা শীতেব রাতেও পাতলা জামার ওপর শুধু একটা সুতির চাদর জড়িয়ে রামকিঙ্করবাবু ছাদে উঠেছেন। কার্নিস ধরে চুপচাপ সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তারাভরা আকাশ দেখছেন। তন্ময় হয়ে আকাশ-লিপি পাঠ করছেন যেন।

আসলে কিছুই করছেন না। শুধু চেয়ে আছেন। ছোট ছেলেকে দুর্বোধ্য কোনো ধাধাঁর সামনে এনে দাঁড় করালে সে যেমন বিমূঢ় চোখে দেখে, তেমনি দেখছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের তলায় দুর্বহ অস্বস্তির বোঝা একটা। সেই ধাঁধাঁর জট ছাড়ানোর তাড়নায় চোখের সামনে সব লেপে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আকাশ-রহস্য নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ডক্টর রামকিঙ্কর গোস্বামী। শ্রবণ-মুগ্ধ ছাত্রদের কাছে অনেক বক্তৃতা করেছেন, অনেক সমাচার শুনিয়েছেন যুগ্মতারা অগস্ত্য বলয়গ্রাস খণ্ডগ্রাস ক্রান্তিবৃত্ত চান্দ্রমাস লুব্ধক অভিজিৎ শুক্র কালপুরুষের। অনেক মনীষীর চলিত ব্যাখ্যার ছিদ্র খুঁজেছেন, অনেক নতুন সংযোজনের ইশারা হাতড়ে বেড়িয়েছেন। অনেক ছক কেটেছেন, অনেক অঙ্ক কষেছেন, অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধ-শিক্ষিত এক মানুষের সেই অঙ্ক আর সেই সিদ্ধান্তটাই থেকে থেকে চোখের সামনে সঙ্কট-পূর্ব লাল নিশানার মত দপদপিয়ে উঠতে লাগল।

ওটা ভুল প্রমাণ করার জন্য গোটা জ্যোতিষ-শাস্ত্রটাই কি লণ্ডভণ্ড করে আঁতিপাতি করে খোঁজেননি তিনি? ভুল এবং যুক্তিহীন প্রমাণ করে বহুবারই নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করেন নি আজ পর্যন্ত? সবই করেছেন। করে করে হাল ছেড়েছেন। শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

তারা-ভরা আকাশটা যেন মূক কৌতুকে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

বাবা—

রামকিঙ্করবাবু চমকে ফিরে তাকালেন। কিছুই ভাবছেন না, তবু অন্তস্তলের কি একটা একাগ্র তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। আবছা অন্ধকারেও আরতি সেটুকু লক্ষ্য করল। অনুযোগের সুরে বলল, নিচে কোথাও না দেখেই ঠিক বুঝেছি এই ঠাণ্ডায় তুমি ছাদে উঠে এসেছ, চলো নিচে চলো—

ঠাণ্ডা কই রে, রামকিঙ্করবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন, তুই আবার উঠে এলি কেন, আমি তো এক্ষুনি যাচ্ছিলাম।

মেয়ের আগেই সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এলেন তিনি। দোতলার সামনের ঘরে আনন্দমুখর জটলার আভাস। ছোট ভাই, ভাইয়ের বউ, ছেলে-মেয়েরা আসন্ন উৎসবের আলোচনায় মগ্ন। বংশে এই প্রথম বিবাহ উৎসব, আনন্দ হবারই কথা।

বারান্দা ধরে নিজের ঘরের কাছে এসে রামকিঙ্করবাবু ফিরে তাকালেন। মেয়েও পিছন পিছন আসছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, জিতুও ও-ঘরে নাকি? ডাক একবার—

ঘরে ঢুকে আরাম করে বিছানায় বসলেন। কিন্তু আরতির কাউকে ডাকার আগ্রহ দেখা গেল না। সেও ভিতরে ঢুকে বাবার মুখের দিকে চেয়েই রইল। এই শীতেও বাবার কপালে ঘামের আভাস। জিজ্ঞাসা করল, দাদাকে কেন?

শুনি একটু কি ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করল, খুব তো খুশি দেখি সকলেই, কাজ কতদূর?

বাপের কথায় মেয়ে তেমন ভুলল না। তেমনি চেয়ে আছে।

বাবা—

রামকিঙ্করবাবু তাকালেন।

তুমি খুশি হওনি?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে রামকিঙ্করবাবু সচকিত হয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন একটু, তারপর হাল্কা বিস্ময়ে বলে উঠলেন, খুশি হব না কেন রে!

না হলে বলো, আমি বারণ করে দিই।

মেয়ের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে রামকিঙ্করবাবু মনে মনে বিচলিত। হেসে আরো সহজ হতে চেষ্টা করলেন,আয় এদিকে, বোস—

আরতি কাছে এসে বসল।

তোর এসব পাগলামি মাথায় এলো কেন, আমিই তো খুশি হয়ে মত দিলুম!

কেন এরকম মনে হল,আরতি সেটা মুখ ফুটে বলতে পারে না। তবু তেমন করে মনে হয়েছে বলেই না বলতে পারেনি। এতদিনে মায়ের অভাবটা নতুন করে অনুভব করেছে আবার। মা থাকলে যা বলার মা-ই বলত, মা-ই বুঝত। ওকে

এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হত না।

রামকিঙ্করবাবু বলে গেলেন, আমি কি কিছু বুঝি, না কোনো কাজ নিজের হাতে করতে পারি—তোর কাকাবাবু বরং এসবে এক্সপার্ট, আমি নিজে কিছু দেখছি না বলেই তোর মন খারাপ? তাছাড়া তোর দাদারা, কাকীমা, কত ফুর্তিতে সব দেখছে-শুনছে—আমাকে দেখলেই তো সবাই পালায়!

প্রসন্নমুখেই হাসতে লাগলেন তিনি। বাবার ছেলেমানুষি কথা শুনে আরতিরও হাসিই পায়। সব ভার ওঁদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন বলেই যেন আরতির মাথাব্যথা। বাড়ির যে-কোনো ব্যাপারে কাকা-কাকীমাই তো সব করে থাকেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মনের মত কর্তামো করতে পেয়ে দাদারাও খুশি। দাদারা বলতে নিজের দাদা আর খুড়তুতো দাদা।

হঠাৎ কি মনে পড়তে রামকিঙ্করবাবু উতলা একটু।—সমরেশের সর্দি জ্বরের মত শুনেছিলাম, কেমন আছে এখন? ফোন করেছিলি?

স্বাভাবিক সঙ্কোচে আরতি জবাব দিতে পারল না, মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ ভালই আছে।

কিন্তু রামকিঙ্করবাবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তবু। বললেন, ওর স্বাস্থ্য আর একটু ভালো হওয়া উচিত, নইলে যখন তখন অমন ঠাণ্ডা লাগবেই বা কেন—খোলা জীপে ছোটাছুটি করতে হয় বলেই আরো ঠাণ্ডা লাগে। ভাবলেন একটু। —তাকে না হয় আমি গাড়িই কিনে দিই একটা, কাল পরশু একবার ডেকে পাঠা, কি গাড়ি পছন্দ জিজ্ঞাসা করে দেখি—

আচ্ছা সে পরে হবেখন, এখন তোমাকে গাড়ির ভাবনা ভাবতে হবে না—

কথাবার্তা এখন গাড়ি আর ভাবী জামাইয়ের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে জেনেই আরতি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে বাঁচল। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে আবার বাবার কথাই ভাবতে লাগল। যতই সহজ হতে চেষ্টা করুন, মুখের দিকে তাকালেই এক ধরনের অসহায় চঞ্চলতা চোখে পড়ে। শুধু আজ নয়, ওর বিয়ে স্থির হওয়ার দিন থেকেই সেটা লক্ষ্য করে আসছে আরতি। সংগোপনে কি একটা মর্মান্তিক দুর্ভাবনা পুষে আসছেন। এই বিয়েতে আপত্তি করেননি বটে, কিন্তু পারলে করতেন হয়ত। ওর মনোভাব বুঝে মত দিয়েছেন, কাকা আর দাদার জোরজুলুমে হাল ছেড়েই দিয়েছেন। তাও অনেক কাণ্ড-কারখানার পর।

আরতি আগেও অবাক হয়েছে, আর, ভেবে কূলকিনারা পায় না এখনো। ওর বিয়ের নামে বরাবর বাবাকে এমনি বিচলিত হতে দেখে আসছে। আরো দশবছর আগে থেকেই। তখন বছর চোদ্দ হবে ওর বয়েস। মা দাদু দিদু সবাই বেঁচে। আরতি ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে তখন। নিজের চেহারা সম্বন্ধে আরতির প্রথম সচেতন পুলক জাগে বোধহয় দাদুর হাসি-ঠাট্টায়। দাদু চাঁদমুখি বলে ডাকতেন ওকে, বলতেন হাতে ধরে তোকে আর কোনো ব্যাটার হাতে দিতে মন উঠবে না আমার, তোকে নিয়ে আমিই থাকব। ইস্কুলের পথে মোড়ে মোড়ে অনেক ছেলেকে নিয়মিত দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখত, সেই নতুন বয়সের মনের তলায় অনেক ইশারা উঁকিঝুঁকি দিত। কারণে অকারণে হাসি-কৌতুক রাগ-বিরাগের অনুভূতি জাগত। চাপা মেয়ে কখনো প্রকাশ করত না কিছু, কিন্তু উপলব্ধি করত, চেষ্টা করত উপলব্ধি করতে।

তারপর উদ্ভিন্ন যৌবনের প্রথম বিস্ময় সেই ইস্কুলে পড়তেই। সবে তখন স্কুল-ফাইনাল ক্লাসে পা দিয়েছে। ওদের সঙ্গে পড়ত সুলতা, রোজ নিজেদের গাড়িতে আসত। কি কারণে একদিন ড্রাইভারের বদলে সুলতার দাদা এলো বোনকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে। পথে আরতির সঙ্গে দেখা। আরতি হেঁটে যায়। সুলতাই বোধহয় দাদাকে বলেছিল গাড়ি থামিয়ে ওকে তুলে নিতে। আরতি খুশি হয়েই গাড়িতে উঠেছিল। আগেও আরো অনেকদিন উঠেছে। এমন কি, আরতি মনে মনে আশাও করত, সুলতাদের গাড়িটা দেখতে পেলে হাঁটাটা বাঁচে।

পর পর দিনকতক সত্যিই হাঁটার দায় বাঁচল আরতির। ওর বাড়ি থেকে বেরুতে একটু-আধটু দেরি হলেও দেখত সুলতাদের গাড়িটা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর ড্রাইভারের বদলে চালকের আসনে সুলতার সেই দাদা বসে। সুলতার হাব-ভাবও তখন কেমন কেমন। দাদার গল্প করত, প্রগল্ভ ইঙ্গিত করত একটু আধটু।

ফলে আরতির গাড়ি চড়ার লোভ গেল। বাড়ি থেকে অনেক আগে বেরুতে লাগল সে। তবু ভয় ভয় করত, এই বুঝি দেখবে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সুলতা একদিন মুখ মচকে ঠাট্টাও করল, এখন ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, তুই আর বাড়ি থেকে অত আগে বেরোস না। কিন্তু শিগগীরই ড্রাইভার ছাড়াও গাড়িতে সুলতার মাকে দেখা গেল দিন দুই, সুলতার বাবাকেও দেখল একদিন। আরতি রোজই শুনত, মেয়েকে ইস্কুলে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অন্য কাজে যাবেন। কিন্তু চাপা হাসি দেখে আরতির সে-রকম মনে হত না। আর সুলতার বাবা মায়েরও যেন ওর বাড়ির সব খবর জানার আগ্রহ। বাবার নাম কি, বাবা কি করেন, ক'টি ভাই বোন, আর কে কে থাকেন বাড়িতে, কাকা কি করেন, দাদু কি করতেন—এ-রকম অনেক কথা।

তারপর সুলতার বাবাকে একদিন ওদের বাড়ি এসে বাবার সঙ্গে আর দাদুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখে আরতি হতভম্ব। আরো হতভম্ব, ভদ্রলোক চলে যেতে ক'দিন ধরে বাবা আর দাদুর মধ্যে একটা মন-কষাকষি চলতে দেখে। দাদুর চাঁচাছোলা ঠাট্টা থেকেই ব্যাপারটা কি আরতি বুঝে নিয়েছিল। দুই চোখ একেবারে কপালে তুলে দাদু ওকে বলেছেন, ওরে ছুঁড়ি এই কাণ্ড তোর? ইস্কুলের নামে বেরিয়ে ছেলে ধরে বেড়ানো!

আর বাবার কাছে ঘুর ঘুর করে বলতে গেলে অনুনয়ই করেছেন তিনি, বিয়েটা দিয়ে দেবার জন্য। শুধু দাদু নয়, দিদুও অনেক সাধ্যসাধনা করেছেন।—অমন বংশ, অমন অবস্থা, ছেলেও এম-এ পড়ছে—বিয়েটা দিয়ে দে—আমাদের বিয়েটা দেখে যেতে দিবি নে? ক'দিন আর বাঁচব...

দাদু-দিদুর হয়ে সুপারিশ করতে এসে মাকেও একেবারে নাজেহাল হতে দেখেছে আরতি। আর অমন শান্ত বাবাকে একেবারে ফেটে পড়তে দেখেছে। বাবা স্তম্ভিত

হয়ে শুধু বলেছেন, তোমাদের সকলের মাথা খারাপ হল? সবারই?

নাছোড়বান্দা দাদুর আকুতিতে শেষে থমথমে মুখ করে বাবা বলেছেন, পণ্ডিতমশাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি মত দিলে আপত্তি নেই।

সেই পণ্ডিতমশাই ছিলেন বাড়ির কুলগুরুর মত। আহ্লাদে আটখানা হয়ে দাদু আর দিদু সাত-তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর মত পেতে একটুও দেরি হবে ভাবেননি তাঁরা। কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের মতামত শুনে মুখ আমসি সকলের। পণ্ডিত মশাই ঠিকুজি মেলাননি, পাঁজি দেখেননি বা কিছুই করেননি। গম্ভীর মুখে শুধু বলে গেছেন, বিয়ে দিলে খুব খারাপ হবে, এখন বিয়ের কথা ভেবে কাজ নেই।

আরতির অবশ্য ধারণা, দাদু-দিদুর মুখ বন্ধ করার জন্য আগে থাকতেই বাবা পণ্ডিতমশাইকে শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিলেন। এর পর বাবা আর ওই ইস্কুলেই রাখেননি ওকে, অন্য স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন, যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

একে একে দাদু গেছেন, দিদু গেছেন, মা-ও গেছেন। সেইসঙ্গে অনেকগুলো বছর গেছে। আরতি আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে, এম-এ পাস করেছে। ইতিমধ্যে কাকা কাকীমা দুই-একবার ওর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বাবা কানেই তোলেননি, একবার খোঁজও করেননি কোথাকার ছেলে, কি ছেলে। বাবার মুখের দিকে চেয়েই তাঁদের আগ্রহ আর উৎসাহ জল হয়ে গেছে। কাকীমার অনুযোগও শুনেছে। এমন ভালো ভালো সম্বন্ধ যেচে এসে ফিরে যাচ্ছে, উনি একবার ফিরেও দেখছেন না—সেটা তাঁর বিস্ময়ের কারণও বটে, দুশ্চিন্তার কারণও বটে।

বাবার নিস্পৃহতার দরুন আরতির কোনো খেদ ছিল না, কিন্তু মনে মনে অবাক সেও একটু হত। মা মারা যাবার পর বাবাকে বড় কাছে পেয়েছে একমাত্র সে-ই। অন্যের কাছে বাবা যেমন, ওর কাছে তেমন নয় একটুও। প্রথম প্রথম আরতির মনে হত, ওর বিয়ের ফলে সম্ভাব্য বিচ্ছেদটাই বাবার আপত্তির কারণ। কিন্তু আরো একটু বয়েস হতে মনে হয়েছে, ঠিক তা যেন নয়। বাবা তো এই গেল বছরও আরো পড়াশুনার জন্য ওকে বিলেত পর্যন্ত পাঠাতে চেয়েছিলেন। মেয়েরা আজকাল কত দিকে কত বড় হয়ে উঠছে, সেই গল্প যে বাবার মুখে কত শুনেছে, ঠিক নেই। বাবার ধীর শান্ত মুখে উদ্দীপনার আভাস লক্ষ্য করেছে আরতি। কিন্তু সেই মুখই ওর বিয়ের নামে অদ্ভুত রকম বদলে যেতে দেখেছে। শিশুর মত চঞ্চলতা দেখেছে আর চকিত ত্রাসের ছায়া দেখেছে।

তাই দেখে আরতি কখনো নিজের মনে হেসেছে, কখনো অবাক হয়েছে। গভীর মমতায় দুচোখ ছলছলিয়ে উঠেছে অনেক সময়।

এম-এ পাস করার পর একটা বছর শুয়ে বসে কাটিয়ে আর ভালো লাগছিল না। ও বাইরে যেতে রাজি নয় দেখে বাবা আবার কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশুনার তাগিদ দিচ্ছিলেন। ওদিক থেকে দাদা ক্রমাগত ইন্ধন যোগাচ্ছে, বাবাকে বল্ না তোতে আমাতে দুজনেই বিলেত যাই।

আরতি ভাবছিল, হয় আর কোনো বিষয় নিয়ে আবার এম-এ পড়বে, নয়তো

মেয়ে-কলেজে চাকরির চেষ্টা করবে।

ইতিমধ্যে নতুন যোগাযোগ একটা।

ওর ছ'বছরের কলেজ জীবনে কম করে ছত্রিশজনের নীরব আবেদন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস উপলব্ধি করেছে। সহপাঠী, অগ্রপাঠী, অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের আত্মীয় পরিজন, এমন কি দুই একজন তরুণ অধ্যাপকেরও হৃদয়বেদনার আভাস পেয়েছে। এর মধ্যে যে-কোনো একজন সরাসরি কাছে এসে হাত বাড়ালে আরতি কি বলত, কি ভাবে ফেরাতো, ফেরাতে পারত কি না—নিজেও জানে না। কিন্তু কাউকে নিয়েই ওর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি কখনো। ওর প্রচ্ছন্ন আর পরিচ্ছন্ন গাম্ভীর্যের ওধারেই বিচরণ করেছে সকলে।

শেষ পর্যন্ত ভাবনার কারণ ঘটালো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের একজন।

সমরেশ। সমরেশ চক্রবর্তী। কাকীমার দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে। বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ার, সেচ বিভাগে বড় চাকরি করে। কাজ পরিদর্শনের নামে সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারদিন বাইরে বাইরে জীপ ছুটিয়ে বেড়ায়। ওদেরও নিয়ে গেছে দুই একবার। ওকে আর দাদাদের। খোলা রাস্তায় মানুষটার বেপরোয়া জীপ হাঁকানো দেখে আনন্দের বদলে আরতি শঙ্কাই অনুভব করেছে। দাদারাও খুব স্বস্তি বোধ করেনি বোধহয়। গেল বার বেরুনোর আমন্ত্রণ আসতে দাদা বলেই বসেছিল, তোমার সঙ্গে জীপে বেরুতে ভয় করে সমরেশদা, প্রাণটা একেবারে হাতের মুঠোয় ছেড়ে বসে থাকতে হয়।

...জবাবে খুব হেসেছিল। সেই হাসি ভালো লেগেছিল আরতির। জবাবটাও। বলেছিল, আমার হাতের মুঠোটা খুব কম নয়, চলো চলো—।

সকলকে নিয়ে বেরুনোর আগ্রহের উৎসটা কোথায়, মুখে না বললেও আরতি বুঝত।

সেই একজন কাছে এসেছে। কাছে এসে হাত বাড়িয়েছে।

প্রস্তাবের বহরে আরতি হকচকিয়েই গিছিল। কলকাতায় থাকলে দিনের মধ্যে রোজই একবার অন্তত মাসির খোঁজে আসে। সেদিনও এসেছিল। মাসি বাড়ি নেই শুনে খুশি হয়েছিল। তারপর দাদাদের খোঁজ করেছিল। তারাও বাড়ি নেই শুনে ঘটা করে নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কি তাহলে চলে যাব?

আরতি হেসে ফেলেছিল।—যাবেন কেন, বসুন, আমি চা করে আনি।

সমরেশ বলেছে, চা দরকার নেই, বোসো, এমন সুযোগ আর ক'টা দিন পাব! আমার কিছু বক্তব্য আছে, শোনো। মাসিকে বললাম, মাসি বলল হবে না। মেসোকে বলেছি, তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা বললেন তার অর্থও হবে না। তাই ক'দিন ধরে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করার ফাঁক খুঁজছিলাম। ... হবে না?

এমনই হালকা করে বলেছে যে আরতি চট করে বুঝেও ওঠেনি।—কি হবে না?

আবারও একটা নিঃশ্বাস ফেলেছে।—কি হবে না তাই জানো না! ...তাহলে

হবেই না বোধহয়। তারপর চট করে উঠে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে আরতি চকিতে খোলা দরজার দিকেই তাকিয়েছে প্রথম।

—হবে না?

নিরুপায় আরতি হেসেই ফেলেছিল।

ওর সম্মতি জানার পর কাকা কাকীমাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। দাদারাও খুশি। কিন্তু আরতি লক্ষ্য করেছে—প্রস্তাবটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বিষম চমকে উঠেছিলেন। হঠাৎই যেন একটা ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে কাটিয়েছেন। আরতি জানে, বাবা বাধা দিতেন। মেয়ে নিজে মত দিয়েছে জেনেই কিছু বলেন নি। কাকা কাকীমা আর দাদারাও সেই জন্যে বাবার মতামতের অপেক্ষা রাখেননি। ক'টা দিন আরতি দূরে দূরে থেকেছে, দূর থেকে লক্ষ্য করেছে বাবাকে। কেমন অপরাধী মনে হয়েছে নিজেকে।

তারপর কি একটা জড়তা যেন সবলে ঝেড়ে ফেলে বাবা সহজ হতে চেষ্টা করেছেন। সমরেশকে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছেন, তার স্বাস্থ্য নিয়ে খুঁত খুঁত করেছেন, এমন কি নিজের এক বন্ধু ডাক্তারকে দিয়ে প্রকারান্তরে স্বাস্থ্যই পরীক্ষা করে নিয়েছেন। সমরেশের রেগে ওঠার কথা। মোটা নয়, কিন্তু রীতিমত ভালো স্বাস্থ্য তার। বিয়ে করার তাগিদে নিরুপায় হয়েই ভাবী শ্বশুরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। শুধু তাই নয়, সে জোরে জীপ হাঁকায় শুনে বাবা প্রায় শর্তই করে নিয়েছেন, ভবিষ্যতে পারত পক্ষে নিজে গাড়ি চালাবে না, চালালেও ধীরে সুস্থে চালাবে।

বাবা যা বলেন এক বাক্যে স্বীকার। কিন্তু আড়ালে আরতির কাছে এসে ঠাট্টা করেছে, বিয়ের পরেও শ্বশুর মেয়ে দেবে তো শেষ পর্যন্ত?

কিন্তু দিন যত এগিয়ে আসছে, লক্ষ্য করেছে, বাবা আবারও কি এক নিঃশব্দ যাতনায় ছটফট করেছেন যেন। একা একা থাকেন, সারাক্ষণই অন্যমনস্ক, দিন রাত ভাবেন কি, মুখে হাসি নেই। অনেকদিন পরে আজ আরতি মায়ের জন্য খুব কেঁদেছে, তারপর ছাদে গিয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে এসেছে—তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে।

কিন্তু এ বিয়েতে মত দেবার আগে কাকার সঙ্গে বাবার যে একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে গেছে, সেটা আরতি জানে না। মত রামকিঙ্করবাবু স্বেচ্ছায় দেননি, যুক্তি তর্কে আর আবেদনে কালীকিঙ্করবাবু তাঁর মুখ বন্ধ করে মতটা আদায় করে নিয়েছেন। একমাত্র তিনিই জানেন মেয়ের বিয়ে দিতে দাদার আপত্তি কেন। এই বিয়ে বলে নয়, বরাবরই সেই একই কারণে তিনি আপত্তি করেছেন, আর আপত্তি করবেন।

বাড়ির সেই পণ্ডিতমশাই মস্ত এক বিভীষিকা চাপিয়ে রেখে গেছেন দাদার বুকের ওপর। সেই বিভীষিকা নিদারুণ এক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্ডিতমশাই আজ আর বেঁচে নেই, থাকলে কালীকিঙ্করবাবু রোগ নিরসনের যা-হোক একটা কিছু উপায় করতে পারতেন। অন্য একাধিক পণ্ডিতের বিপরীত মত তিনি এনে দিয়েছেন দাদাকে, কিন্তু তবু ওই বিভীষিকা ছায়ার মতই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। ঘুরছে।

পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, মেয়ের বিষ্টিদোষ আছে—বিয়ের অনতিকালের মধ্যে স্বামী অথবা নিকটতম কারো বিয়োগের সম্ভাবনা—বুঝে সুজে যেন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। কালীকিঙ্করবাবু জানেন, এই নিয়ে দাদাই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছেন, তর্ক আর বিশ্লেষণের জালে আটকে তাঁকে কোণ ঠাসাও করেছেন। দাদাও এসব ব্যাপারে কম পণ্ডিত নন, আর সেই পাণ্ডিত্যের ওপরেই কালীকিঙ্করবাবুর অনেক বেশি আস্থা। কিন্তু তর্কের জবাব দিতে না পেরেও পণ্ডিতমশাই মত বদলাননি, সেই এক গোঁড়ামি ধরেই বসেছিলেন, ঠিকুজিতে মেয়ের প্রবল বিষ্টি যোগ, ফলে অকালবৈধব্য অথবা নিকটতম আত্মীয়বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী, বুঝে শুনে মেয়ের বিয়ে দিও তোমরা, আত্মীয় বিয়োগের ওপর দিয়ে যদি যায়, তাহলে কমের ওপর দিয়েই গেল জানবে।

অর্থাৎ অকাল বৈধব্যেরই সম্ভাবনা বেশি।

এবারে আর রামকিঙ্করবাবুর মত নিতে আসেননি কালীকিঙ্করবাবু। বিয়ে এখানেই হবে তাই জানাতে এসে ছিলেন। জোর না করলে মেয়েটার আর বিয়েই হবে না হয়ত, তাছাড়া এমন ছেলেও হাজারে একটা মেলে। ভাইঝিটিকে বাপের থেকে কম ভালবাসেন না কালীকিঙ্করবাবু, রামকিঙ্করবাবু তা ভালো করে জানেন বলেই আরো বেশী দোটানায় পড়েছিলেন। আর, মেয়ে নিজেই যখন মত দিয়েছে, তিনি বলবেনই বা কি।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে শেষে বলেছেন, সব জেনেও বিয়ে দিতে বলছ?

কালীকিঙ্করবাবু জবাব দিয়েছেন, যা জানি সেটা সত্যি হবে ভাবলে আমি এগোতাম মনে করো? ও কি আমাদের কেউ নয়? তাছাড়া এ বিয়ে বন্ধ করলে আর কোনদিন মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে তুমি? এরপর তুমি আমি যখন থাকব না, তখনো কি ওই মেয়ে আমাদের আপনজন ভাবতে পারবে? কোষ্ঠীর মাথামুণ্ডু বুঝি না, কিন্তু এর জীবনটা যে আমরাই পঙ্গু করতে বসেছি!

রামকিঙ্করবাবু মত দিয়েছেন, আর ভাইয়ের ওপরেই সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু বিড়ম্বিত সত্তার কাছে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণ অচল। একটা করে দিন যায়, আর যাতনা বাড়ে। অকারণে চমকে ওঠেন রামকিঙ্করবাবু ছায়া-ভয়-চকিত বিমূঢ় তিনি। একের পর এক দুর্ভাবনা ভিড় করে আসতে থাকে। ছেলেটার নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই, যদি ঘটেই কিছু, তাহলে...। রামকিঙ্করবাবু শিউরে ওঠেন, এই বয়সে অমন সর্দিকাশিতে ভোগে কেন, অমন বেপরোয়া গাড়িই বা চালায় কেন! ভবিতব্যের ইঙ্গিত কিছু?

রামকিঙ্করবাবু বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু তবু, তবু একটা দুঃস্বপ্ন পাথরের মত বুকে চেপে বসে আছে। তাঁর মত শিক্ষিত মানুষের ওই পণ্ডিতের উক্তি তো হেসে উড়িয়ে দেবার কথা। কিন্তু তবু যে উড়িয়ে দিতে পারছেন না তার কারণ আছে। শুধু কন্যার নয়, পণ্ডিতমশাই তাঁর বিয়োগের আভাসও দিয়েছিলেন। বলতে গেলে পণ্ডিতের সেই হিসেব প্রায় মাস ধরে মিলেছে। বুকের পাঁজর কখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী চলে গেছেন। সেই ব্যথা নিঃশব্দে বহন করে আসছেন রামকিঙ্করবাবু।

ওই এক দুর্বিষহ যোগাযোগ তাঁর সমস্ত আত্মবিশ্বাসের মূলসুদ্ধ উপড়ে দিয়ে গেছে।

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ত্রাসের ছাপই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মুখে, আচার আচরণে। আর দুটি দিন মাত্র বাকি বিয়ের। কিন্তু একজনের দিকে চেয়ে সকলেই আচ্ছন্ন কেমন।

সকালে সেদিনও রোজকার মত আরতি বাবার দুধ নিয়ে এসেছে। অন্যমনস্কের মত হাত বাড়িয়ে ওর দিকে চোখ পড়তেই বিষম চমকে উঠলেন রামকিঙ্করবাবু। অস্ফুট একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।...মেয়ের পরনে কালো সরু পাড় শাদা জমিনের শাড়ি একটা। অদ্ভুত দৃষ্টি-বিভ্রম! কালো সরু পাড়টা প্রথমে চোখেই পড়েনি রামকিঙ্করবাবুর—যে ভয়াবহ শাদাটে মূর্তি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে অনেকবার, আর যা তিনি প্রাণপণে অস্বীকার করেছেন—হঠাৎ সেই মূর্তিই যেন সামনে দেখলেন তিনি। অবশ্য কালো-পাড় চোখে পড়েছে তার পরেই, কিন্তু সেই এক ঝাঁকুনিতেই সমস্ত স্থৈর্য তছনছ হয়ে গেল। প্রায় চিৎকার করেই মেয়েকে ধমকে উঠলেন তিনি, এই শাড়ি পরেছ কেন? কেন এই শাড়ি পরেছ? রঙিন শাড়ি নেই তোমার? যাও বদলে এসো এক্ষুনি!

জ্ঞান-অবধি বাবার এমন কণ্ঠস্বর শোনেনি আরতি। ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল সে।

আবারও চিৎকার করে উঠলেন রামকিঙ্করবাবু, আমার কথা কানে যাচ্ছে? শিগ্‌গীর শাড়িটা বদলে এসো!

ওদিক থেকে কাকা আর দাদা দৌড়ে এলেন। দুধ রেখে আরতি দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রামকিঙ্করবাবু হঠাৎ ছেলেকেই ধমকে উঠলেন, ওর শাড়ি আছে কি নেই সে খবর রাখো? দেখেছ কখনো জিজ্ঞাসা করে কি আছে, কি লাগবে?

অসহিষ্ণু হাতে ট্রাঙ্ক খুলে দু'তিনখানা একশ টাকার নোট তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন, এক্ষুনি দোকানে যাও, যতগুলো পারো রঙিন শাড়ি এনে দাও ওকে—যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না!

কাকার ইশারায় হতভম্ব ছেলে নোট কটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। রামকিঙ্করবাবু শয্যায় বসে সুস্থ হতে চেষ্টা করলেন।

কালীকিঙ্করবাবু কাছে এসে বললেন, ওর জন্য দু' বাক্স রঙিন শাড়ি কেনা হয়েছে।

তাহলে ও ওই শাড়ি পরেছে কেন?

কালীকিঙ্করবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। —তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রামকিঙ্করবাবু মাথা নাড়লেন শুধু। ভালই আছেন।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই একেবারে অন্য রকম দেখা গেল তাঁকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। কালীকিঙ্করবাবু দেখলেন, দাদার মুখের দুঃস্বপ্নের ঘোর

একেবাবে কেটে গেছে। আগেব মতই সুস্থ স্বাভাবিক এবং প্রসন্ন তিনি। কোনো দুর্ভাবনাব লেশ মাত্র নেই।

সকালেই ভাইকে ডেকে চাবিব গোছা হাতে দিলেন, ট্রাঙ্কে টাকা আছে, যখন যা লাগে তুমিই বাব কবে নিও—আমি অত ঘণ্টায ঘণ্টায ট্রাঙ্ক খুলতে পাবিনে। চাবি তাঁব হাতে দিলেন বটে, কিন্তু খবচা কবালেন প্রায ডবল। মনেব আনন্দে ছেলেদেব বাব বাব ছোটাছুটি কবালেন বামকিঙ্কববাবু। হাসিমুখে সব দেখে বেড়াতে লাগলেন। দুপুবে সকলেব সঙ্গে খেতে বসে দুই একটা প্রত্যক্ষ দেখা বিযেব আজগুবী কাণ্ডকাবখানাব গল্প বলে সকলকে হাসালেন।

সন্ধ্যা লগ্নে বিযে হযে গেল।

মেযে জামাই প্রণাম কবতে এলে দুজনকে দুহাতে বুকে জড়িযে চোখ বুজে দাঁড়িযে বইলেন অনেকক্ষণ। প্রাণভবে ইষ্ট-কামনা কবলেন তাদেব।

আদব-আপ্যাযন খাওযা-দাওযাব ব্যাপাবে বাড়ি সবগবম। কালীকিঙ্কববাবু কি প্রযোজনে দুই একবাব দাদাব খোজে এসে তাব দেখা পেলেন না। কখনো ভাবলেন ওপবে আছেন, কখনো ভাবলেন নিচে।

তাব অনুপস্থিতি স্পষ্ট হল আবো ঘণ্টা দুই বাদে। উৎসব-বাড়িতে ব্যাপাবটা শুধু তিনি জানলেন, ছেলে আব ভাইপো জানল। নিঃশব্দেই খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল।

বাত প্রায বাবোটাব সময বাড়িতে বাইবে—সর্বত্র খোঁজাখুঁজিব পব থানায খবব দেওযা হল, হাসপাতালে হাসপাতালে টেলিফোন কবা হল।

বাত আড়াইটেব সময নিচেব দবজাব কড়া নড়ে উঠল হঠাৎ। নিচে নিস্পন্দেব মত বসেছিলেন কালীকিঙ্কববাবু, ছেলে, আব ভাইপো। তিনজনেবই চমক ভাঙল।

দবজা খুলে দেখা গেল দু'জন পুলিস অফিসাব এবং দু'জন কনেস্টবল দাঁড়িযে।

একজন পুলিস অফিসাব জিজ্ঞাসা কবলেন, কালীকিঙ্কব গোস্বামী কাব নাম?

কালীকিঙ্কববাবু মূর্তিব মত এক-পা এগিযে এলেন শুধু।

সুজিত গোস্বামী?

সুজিত সামনে এলো।

একবাব আসুন আপনাবা—।

নৈশ স্তব্ধতা বিদীর্ণ কবে ট্রাক ছুটেছে। কালীকিঙ্কববাবু নিষ্প্রাণ, কাঠ। পাশে সুজিত—সেও চিত্রার্পিত। কোথায যাচ্ছে, কি দেখতে যাচ্ছে কিছুই জানে না। জিজ্ঞাসা কবাব শক্তিটুকুও গেছে।

ট্রাক ছুটেছে। ডালহৌসী স্কোযাব ছাড়িয়ে, স্ট্র্যাণ্ড বোড ধবে।

হাওড়া ব্রীজ পেরুলো।

স্টেশান।

স্টেশান-ইযার্ড ধবে খানিকটা গিযে ট্রাক থামল। পুলিসেব লোকেবা নামলেন, তাঁদেবও নামতে ইশাবা কবলেন।

কালীকিঙ্কববাবু নিজেব অগোচবে কখন সুজিতেব হাত ধবেছেন। পাযে পাযে

রেল-লাইন ধরে এগিয়ে চলেছেন তাঁদের সঙ্গে। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত।

বেশ খানিকটা দূরে ওয়ে-সাইডে দাঁড়িয়ে এঞ্জিন-বিহীন গুডস্ ট্রেন। একটা বোগির সামনে জনাকতক লোক।

কালীকিঙ্করবাবু আর সুজিতকে গাড়িতে তোলা হল। তারপর একটি মৃতদেহের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেহ সনাক্ত করতে বলা হল।

কালীকিঙ্করবাবু ঘুমিয়ে আছেন। প্রসন্ন, শান্ত ঘুম।

সুজিত আর্ত-চিৎকারে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। পুলিসের লোকের বাধা পে[illegible] ডুকরে কেঁদে উঠল, কাকা এ কি হল!

কালীকিঙ্করবাবু জানেন কি হল। জানেন, কেন হল।

বোবা [illegible]।

এ [illegible] পুলিস [illegible] তাঁর হাতে [illegible]। চিঠি দিলেন একটা। জানালেন, জামার পকেটে দু[illegible] চিঠি ছিল। একটা [illegible], দ্বিতীয়টি পুলিসের।

তাই ও কালীকিঙ্করবাবু [illegible] পড়ে উঠতে পারেন নি। পরে বাড়ি এসে পড়েছেন।

দাদা [illegible] তাঁর [illegible] জামাই [illegible] দীর্ঘায়ু হবে সুখী হবে, সে-সম্বন্ধে [illegible] তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। [illegible] নিশ্চিন্ত।

[illegible] নায়িকা

ছবির জন্য চিত্র প্রযোজকরা গল্প যাচাই করতে এসে অনেকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, গল্পটি নায়িকা-প্রধান, না নায়ক-প্রধান-না কি নায়ক নায়িকা দুইয়েরই সমান প্রাধান্য। তাঁদের বেশি খুশি এবং আশান্বিত হতে দেখা যায় যদি শোনেন, গল্প অবিমিশ্র নায়িকা-প্রধান।

তারপরেই তাঁদের প্রশ্ন, গল্পের 'থিম' বা বিষয়বস্তু কী?

গল্প পড়ার ব্যাপারেও সম্প্রতি অনেক পাঠকেরই এই ধরনের ঔৎসুক্য দেখা যায়। লেখক গল্প লিখেছেন শুনলে অনেক পরিচিতজন আগে থাকতেই জিজ্ঞাসা করে নেন, কি নিয়ে লেখা হচ্ছে এবং কে প্রধান। তাই, পাঠকের বিরাগভাজন হবার ভয়ে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এ-গল্পের কোনো 'থিম' নেই, আর গল্পটি নিঃসংশয়ে নায়িকা-প্রধান হলেও সেই নায়িকা কোনো অঢেল বিত্তাধিকারীর একমাত্র কন্যা নয়—তিনি খুদে লেখক ভবতোষবাবুর একমাত্র কন্যা, এবং তার বয়স মাত্র পাঁচ।

আশাভঙ্গের এই প্রথ[illegible] ধাক্কার পর অবশ্য বলা যেতে পারে, নায়িকার বয়েস মাত্র পাঁচ বছর হলেও নায়িকা-সুলভ অনেক গুণ কন্যার এই বয়েসেই বর্তমান। তাছাড়া রাগ বিরাগ বা অনুরাগের ব্যাপারগুলো সে যে রেট-এ বাপের ওপর দিয়ে

টপাটপ রপ্ত কবে নিচ্ছে তাতে অদূব ভবিষ্যতে তাব নির্ভেজাল পাকাপোক্ত একটি নাযিকা হযে ওঠা ছাডা আব গতি নেই ভেবে ভবতোষবাবু এখন থেকেই মনে মনে বিলক্ষণ শঙ্কিত। বাবা সমযমত ঘুম থেকে ওঠে না, সমযমত লিখতে বসে না, সময মত খায না বা বাত্রিতে সময মত বাডি ফেবে না—এত সব অনিযম-জনিত অনুশাসন পুবনো হযে গেছে। বাবা কেন লেখে, কি নিযে লেখে, গল্পেব মধ্যে দুই একটা বাঘ সিংহ, একটা ডাইনি বুডি, আব একটা ছোট মেযে নেই কেন—ইত্যাদি প্রশ্নও এখন আব কবে না। কাবণ সে বুঝে নিযেছে বাবাব জ্ঞানগম্যি কম, আজে বাজে লেখে, সেটা বাব বাব বলে কষ্ট দিযে লাভ কি। তাব থেকে যতক্ষণ শান্ত হযে কাগজ কলম নিযে বসে থাকে থাক্। নিজেও নিযমিত বাবাব সঙ্গেই পড়তে বসে যায। মাযেব সাডা পেলে একটু আধটু চেঁচামেচি কবে পড়ে, নইলে মাযেব অনুযোগটাই সমর্থন কবে, বাবা আমাকে কিছু পডাচ্ছে না মা—

মাযেব অনুপস্থিতিতে দু-লাইন পড়েই এক একবাব বাবাব কার্যকলাপ দেখে, কখনো তাব সিংহ ছেলেটা আব হাতী মেযেটা কি বিষম মাবামাবি কবেছে সেই সমাচাব শোনায। কখনো বা তাদেব পডাশুনায অবহেলা দেখে শাস্ত্র-প্রসঙ্গ [illegible] মুখে বাবাব সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবে। সম্প্রতি তাব চোখ আব মন অনেক একটু পাবদর্শিতা লাভ কবেছে। বাবা দু'দিন দাড়ি না কামালেই ঠিক চোখে পড়ে এবং তখন দাড়ি কামাতে না বসে উপায নেই। বেরুবাব আগে আকাশে মেঘ বা [illegible] নিজে হাতে তাডাতাডি ছাতাটি ধরিযে দেবে - সেটাও না নিযে উপায নেই। অন্যদিকে, নিজেব বুলবুল নামটিব ওপব যেমন ভালবাসা, তেমনি দবদ। বুলবুল নামটা ভালো না পাশেব বাডিব সমবযসী ছেলেটাব সোনা নামটা ভালো—তাই নিযে একএকবাব বেশ একটা বকমেব ঝগড়াও হযে গেছে সোনাব সঙ্গে। দোতলায দুইবাড়িব দু-ফালি গৃহ-সংলগ্ন বাবান্দা প্রায লাগালাগি। সেখানে দু'জনে মুখোমুখি দাঁডালেই তাদেব নিযমিত সব আলাপ বা সব ঝগড়াঝাঁটি সম্পন্ন কবে। যাক সে-কথা, কন্যাব এমন প্রিয নামটি ধবে বাবাব কিন্তু ডাকা চলবে না। বাবা ডাকবে ছোট মেযে অথবা ছোট-মা। ও নিজে বডদেব নাম ধবে ডাকলে যেমন খাবাপ শোনায, বাবা ওব নাম ধবে ডাকলেও নাকি প্রায সেই বকমই বিচ্ছিবি লাগে শুনতে।

এ-হেন নাযিকা বুলবুল বাডিসুদ্ধ সকলেবই একটু আনন্দ মিশ্রিত উত্তেজনা এবং হাবভাব লক্ষ্য কবে আব তাদেব প্রায-দুর্বোধ্য কথা-বার্তা আলাপ-আলোচনা শুনে হঠাৎ যেন একটু হকচকিযে গেল। সবকিছুই যে তাব বাবাকে অথবা বাবাব কিছুকে কেন্দ্র কবে সেটা অনুমান কবতে পাবছে। কিন্তু কি যে ব্যাপাব সেটাই বুঝে উঠছে না। ওদিকে বাবাকে ধবে যে বুঝে নেবে সে সুযোগও পাচ্ছে না। বাবাকে এত ব্যস্ত সে বোধহয জন্ম-বযসে দেখেনি। বাতে যখন শুতে আসে তখন সে ঘুমিযে, আব সকালে যখন বাবাব ঘুম ভাঙে তখন নিচে দলবল সহ বাখালবাবু এসে বসে আছেন। বাখালবাবু চিত্র প্রযোজক। অন্যসমযও এমন ব্যস্ততায বাবা কি সব লিখতে আব আঁকিবুকি কবতে বসে যায যে পাঁচটা প্রশ্নেব একটা জবাব পর্যন্ত মেলে না।

এমন কি বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিরক্ত পর্যন্ত হতে দেখা যায়, যা বাবা সচরাচর হয় না। একটা পুরোদিন কথা না বলে অভিমান করেও দেখেছে—বাবার হুঁশ পর্যন্ত নেই। মায়ের সঙ্গে মেয়ের তেমন বনিবনা নেই কোনোদিনই, তবু শেষ পর্যন্ত মায়েরই শরণাপন্ন হতে হল তাকে। কিন্তু মাকেও সুবিধেমত পাওয়া দায়, কাকা আর কাকিমাদের কথা-বার্তা মা'কেও হাঁ করে বসে গিলতে দেখে সে।

যাক্ বাবার অভাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইল কন্যা। মায়ের কাছে সরাসরি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল, তোমরা সকলে কি সব বলাবলি করছ দিন রাত আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

কিসের কি বলাবলি করছি?

ওই যে ছবি-ছবি ছবি-ছবি বলে কাকারা আর কাকিমারা, আর তুমি খালি হাঁ করে শোনো—

মা বুঝলেন, বুঝে জবাব দিলেন, হ্যাঁ বাবার একটা ছবি আসছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে।

বাবার ছবি! ওই যে দেযালে আমার তোমার আর বাবার ছবি আছে সেই রকম ছবি?

না, তোর বাবার লেখা একটা গল্প ছবি হয়ে সিনেমা হল-এ আসছে—লোকেদের সেটা দেখানো হবে।

পাঁচ বছরের কন্যাটির ভাবনা আরো বাড়ল বই কমল না। সিনেমা কথাটা তার শোনা আছে এবং দেয়ালে বড় বড় ছবি আঁকা আলো ঝলমলে বাড়িটাও তার দেখা আছে। কিন্তু গল্প কি করে ছবি হয়ে আসবে সেটাই বুঝে উঠছে না। এই প্রশ্নের জবাবে মায়ের জবাব শুনল, ছবি তৈরি করা হয়েছে, বড় হলে দেখবি।

কে তৈরি করেছে, রাখালবাবু? বাবার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রতিজনের নামধাম মেয়ের জানা।

হ্যাঁ।

কিন্তু ছবি আবার আসবে কি করে, ছবি নড়তে চড়তে পারে?

মায়ের বিরক্তি। —আর বকবক করতে হবে না, এবারে ঘুমো চুপ করে।

এই জন্যেই মায়ের বিদ্যেবুদ্ধির ওপর তেমন আস্থা নেই মেয়ের। কিন্তু আপস করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তরও নেই। তাই ঠিকমত জবাব না পেলেও খানিক চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করে, বাবা এত কি কাজ করে এখন? আর এত কি গল্প করে ভদ্রলোকদের সঙ্গে?

ভবতোষবাবু সম্প্রতি প্যামফ্লেটের জন্য গল্পটা ছোট করে লিখে দিচ্ছেন। তাছাড়া বিজ্ঞাপনও তাঁকেই লিখে দিতে হচ্ছে। কিন্তু মেয়ে অতশত বুঝবে না বলেই প্রথম প্রশ্ন এড়িয়ে শেষটার জবাব দিলেন, ছবিটা কেমন হবে না হবে সেই গল্প করে।

আর কাকারা?

কাকারাও।

ছবি কেমন হবে?

তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা করিস, আমি জানি না, এখন ঘুমুবি তো ঘুমো।

পরদিন সকালে ঘর-সংলগ্ন সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির সোনাকে ডেকে ছবির সমাচারটা জানিয়ে দিল সে। বাবার সুন্দর ছবি আসছে সিনেমা হল্-এ আর সেই জন্য ও খুব ব্যস্ত এখন, তাই সোনার সঙ্গে বেশি গল্প-টল্প করার সময় সে আর পেয়ে উঠবে না এখন। ঘুম ভাঙা আলস্যে বিছানায় গড়াচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, আলাপ কানে আসতে হাসি গোপন করার জন্যে পাশ ফিরে শুলেন।

এর দিন কয়েক বাদে মেয়ে বুঝল, বাবার ছবিটা এসেই গেছে। কারণ, বাড়িতে আলোচনা এবং উত্তেজনা দুই-ই বেড়ে গেছে। আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য রাতে মাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবাব ছবিটা এসেছে।

হ্যাঁ।

কাকারা দেখেছে?

দেখেছে।

ভালো বলেছে?

ভালই তো বলছে।

তুমি দেখেছ?

না দেখব।

আমি দেখব?

তুই দেখে কি বুঝবি?

—আমাকে না দেখালে আমি পচা বলব, ছবি পচা বলব, তোমাকে পচা বলব, বাবাকে পচা বলব—সব পচা বলব। রাগ করে এক ঝটকায় বাবার শূন্য শয্যার দিকটায সরে গিয়ে মাযের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করল।

এর দুদিন পবেব এক সকালে দেখা গেল বাডির সবগবম আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন এক ধরনের বিপরীত ক্ষোভে এবং অসহিষ্ণুতায ভরে গেল। সকলেই যেন অনির্দিষ্ট কারো ওপর রুষ্ট। এমন কি বাবাও রীতিমত বিমর্ষ। পাঁচ বছরের বুলবুল সঠিক বুঝে উঠছে না। শুধু এইটুকু বুঝেছে, সেদিনের খবরের কাগজে কিছু একটা ব্যাপার আছে, তার সঙ্গে তার বাবার ছবিটার যোগ আছে। কারণ, কাকারা সব হুমড়ি খেয়ে কাগজ পড়ছিল আর কাকে বা কাদের যেন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলছিল।

দুপুরে বাবাকেই একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল সে। বাহুতে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে। মেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় উঠে এলো। সবই জানতে পারবে এবার, মায়ের মত দু'কথার পর তিন কথাতেই চুপ করার জন্য ধমকে উঠবে না বা বিরক্ত হবে না। এ ক'দিন বাবার ব্যবহারে অনেক অভিমান জমে আছে, তবু আজ সকালের

মধ্যে কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বুঝেই বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব দোষই ক্ষমা করে ফেলল সে। বাবার গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা করল, বাবা তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?

ভবতোষবাবু চোখ থেকে হাত নামালেন। —কেন, কে বলল?

কেউ বলেনি, আমি দেখতে পাচ্ছি।

ভবতোষবাবু সত্য গোপন করতে পারলেন না। জবাব দিলেন, হ্যাঁ, একটু দুঃখ হয়েছে।

কেন দুঃখ হয়েছে?

খবরের কাগজে আমার ছবিটা তেমন ভালো লেখেনি তাই।

কে ভালো লেখেনি?

খবরের কাগজে যারা লেখে তারা।

কেন ভালো লেখে নি?

তাদের ভালো লাগেনি বলে।

কেন ভালো লাগেনি?

তাদের খুব পছন্দ হয়নি, তাই।

মেয়ে গুম হয়ে ভাবল একটু। পরের দফা প্রশ্ন নিয়ে প্রস্তুত হতে সময় লাগল না। —ভালো না লিখলে কি হয়?

লোকে পড়ে খারাপ বলে, ছবি দেখতে আসে না।

না দেখতে এলে কি হবে?

তোমার বাবার গল্প আর ছবি করবে না কেউ, ভাববে খারাপ গল্প।

আবারও ভাবনা। কিন্তু ভেবে পথ বার করতে দেরি হল না এবারও। বলল, এক কাজ করো, খবরের কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দাও।

এতটা সময় ধরেই একটু ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন ভবতোষবাবু, কন্যার সঙ্গে কথা বলে হালকা লাগছে এখন। তাই আলাপ চালু রাখতে চাইলেন তিনি। বললেন, একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেললে আর কি হবে ছোটমা—হাজার খানেক কাগজে তো একরকমই লেখা আছে।

সব কাগজে খারাপ লিখেছে?

তাই তো...।

সোনাদের কাগজেও?

বোধহয়...।

আর কত সহ্য হয়? মেয়ে যেন ফেটে চৌচির হয়ে পড়ল এরপর। —পচা! পচা! পচা! ভদ্রলোকেরা পচা! খবরের কাগজ পচা! বিশ্ব-সংসারের সব পচা আর সবাই পচা। সেই ক্রন্দনোন্মুখ অগ্নি উদ্‌গিরণে ভবতোষবাবু ঘাবড়েই গেলেন প্রায়। আর পাঁচ কথায় ভোলাতে চেষ্টা করলেন তাকে। কিন্তু খুব ভুলল বলে মনে হল না।

সেটা বোঝা গেল রাত্রিতে আর পরদিন সকালে। রাতে মেয়ের সাড়াশব্দ না পেয়ে মা ঘরে ঢুকে দেখেন, মেয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে, বাপের অনুকরণে একখানা ছোট্ট বাহু চোখের ওপরে। মা হাঁকলেন, কি রে শুয়ে আছিস যে, ভাত খাবি না?

চোখ থেকে হাত না সরিয়েই সে জবাব দিল, আজ আর খাব না কিছু, মনটা খারাপ।

মাকে যথোচিত গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল, মনটা খারাপ কেন?

খবরের কাগজে বাবার ছবিটা খারাপ লিখেছে, তাই—

মা বললেন, কিন্তু একেবারে খাবি না যে, পেটের ঠাকুর যদি মাঝ রাতে উঠে কান্নাকাটি শুরু করে?

সেটা ভাবনার কথা। মেয়ে জানে শরীরের সর্বত্র একজন করে ঠাকুর থাকে। পেটের ঠাকুরের সম্ভাব্য অবুঝপনায় বেশ বিরক্ত হয়েই উঠে বসল। বলল, ওই মিট্‌-সেফএ যে দু'টো রসগোল্লা আছে দেখেছি সেই দুটো দাও তাহলে, আর দুধ এনে দাও—আর কিছু খাব না।

হাসি চেপে মা সেই ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন সকাল।

ঘুম ভাঙতে ভবধামবাবু দেখেন মেয়ে সেই সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির সোনার সঙ্গে প্রাত্যহিক ভোরের আলাপে মগ্ন। কিন্তু আলাপের বিষয়বস্তু কানে আসতেই বালিশ উঁচু করে চোখ বুজে থাকতে হল এবং কান খাড়া করতে হল।

মেয়ে বলছে, কালকের খবরের কাগজে বাবার ছবিটা খু-উ-ব ভালো লিখেছে, না?

সমবয়সী সোনা কিছু বুঝুক না বুঝুক, প্রতিবাদ করা দরকার মনে করেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, না ভালো লেখেনি।

মেয়ের কণ্ঠস্বর চড়ল, ভালো লেখেনি? তুমি পড়ে দেখেছ?

ওদিক থেকে সোনা সদর্পে মাথা ঝাঁকাল, অর্থাৎ, নিশ্চয় পড়ে দেখেছে।

ব্যাস্। ওইখানেই হয়ে গেল। পারলে মেয়ে তখুনি তার চুলের ঝুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে আসে। সেটা পারা যাচ্ছে না বলেই গলা এবং মুখভঙ্গীর দ্বারা যতটা সম্ভব হল, করল। হাত মুখ নেড়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, অ্যাঁ! তুমি পড়ে দেখেছ! মিথ্যেবাদী কোথাকার, পড়তে জানে না কিছু না, আবার বলে পড়েছে! দাঁড়াও সক্কলকে বলে দেব তুমি মিছে কথা বলো-তোমার সঙ্গেই জন্মের মত আড়ি আমার যাও।

জন্মের মত আড়ি করে দিয়ে মেয়ে বারান্দা থেকে ছিটকে এসে ঘরে ঢুকল, তারপর দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকেও বেরিয়ে গেল।

ভবতোষবাবু চোখ বুজলেন আবার। কি একটা পাওয়ার গভীর তৃপ্তিতে যেন ভরপুর তিনি। রাজ্যশুদ্ধ লোকের মতামতও তুচ্ছ এর কাছে। আর, রাখালবাবু আবার নতুন ছবির গল্প বায়না করবেন কিনা সেই চিন্তা দূরে থাক, এই ছবির গল্পের টাকাও যদি ফেরত চান তাও বোধহয় নির্দ্বিধায় ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলতে পারেন ভবতোষবাবু।

খণ্ডিতা

সাত বছরে সাতশ খবর জানার ছিল, কিন্তু সত্যব্রত একটা খবরের জন্যেই উসখুস করছিল সেই থেকে। এসে পর্যন্ত পাশের বাড়ির ওই ঘরটার জানালা দুটো বন্ধ দেখছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। সকাল থেকে গান-বাজনার রেশ কানে আসা দূরে থাক, কেউ যে বাস করছে ও-ঘরে তারও আভাস নেই। বন্ধ জানালা দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে সত্যব্রতর মনে হচ্ছিল ওই ঘরটার মধ্যে একটা শূন্যতা থমকে আছে।

নানা কথা-বার্তা অনুযোগ-অভিযোগের ডালপালা ঘুরে পিসিমা শেষে পাশের বাড়ির ওই জানালার প্রসঙ্গে এসে পৌঁছুলেন। বললেন, বছর দেড়েক হল বসুধার বিয়ে হয়ে গেছে।

অবাক খবর। সত্যব্রত হাঁ করে চেয়ে ছিল খানিক, বসুধা সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে শুনলেও এত অবাক হবার কিছু ছিল না বোধহয়।

—ওই মেয়ের যে আবার বিয়ে-থা' হবে কেউ ভাবিনি, ভালো ভালো সম্বন্ধ তো আর কম ফেরায়নি, পিসিমার মন্তব্য, তিরিশ পার করে দিয়ে সেই বিয়েই হল শেষে, যার সঙ্গে যার নির্বন্ধ।

পিসিমার মনে একটু ক্ষোভ থাকা অসম্ভব নয়, সরাসরি কখনো প্রস্তাব না করলেও নিজেকে বাতিলের দলেই ফেলেছেন। ভাইপোর মতিগতি লক্ষ্য করে মনে মনে একটা যোগাযোগ আশা করেছিলেন তিনি। পিসিমার মুখে বয়সের হিসেব শুনে সত্যব্রত নিজের বয়েসটার দিকে তাকালো একবার। আটত্রিশ চলছে...বসুধা তাহলে তিরিশ ছাড়িয়ে তেত্রিশ ছুঁয়েছে এখন। সত্যব্রতর মজা লাগছে ভাবতে, বছর এত তাড়াতাড়িও গড়ায়, অথচ আগে একটা মাস পার হতেই যেন এক বছর লাগত।

পিসিমার মতে বসুধার ভালো বিয়েই হয়েছে। ওই বয়সের মেয়ে, দেখতে-শুনতে কি-ই বা এমন—গুণ বলতে শুধু গান। ছেলের ওদিকে মস্ত চাকরি আর মস্ত অবস্থা, দেখতে-শুনতেও ভালো—তবু অনেক সাধাসাধির ফলেই নাকি বিয়েটা হয়েছে, ছেলের নিজেরই গান-বাজনার ঝোঁক খুব।

সত্যব্রত নিস্পৃহ প্রশ্ন করেছিল, উনিও গায়ক নাকি?

পিসিমা সে-খবর রাখেন না, শুধু সখের কথাই শুনেছেন।

আরো বিস্তারিত শোনা গেল বিকেলে পিসতুতো বোন সুমিতা আসতে। সত্যব্রত খুব যে উদগ্রীব হয়ে বসেছিল শোনার জন্যে তা নয়, সুমিতারই শোনানোর আগ্রহ বেশি। কারণ, বসুধা শুধু ওর নয়, এ-পাড়ার সমবয়সী সব মেয়েরই অবিমিশ্র ভক্তিশ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে প্রায় দেড় যুগ ধরে। তার বিয়েটা ওদের বিয়ের মত এমন ডাল-ভাত ব্যাপার নয়।

কিন্তু সুমিতার লঘু বিস্তারে বসুধার থেকেও তার স্বামী লোকটির প্রতি কৌতুকোচ্ছ্বাস বেশি দেখা গেছে। যথা, ভদ্রলোক যেমন ভালোমানুষ তেমনি গান-পাগল। এমন অদ্ভুত লোক সুমিতারা আর দেখেনি নাকি। একটানা তিন বছর লেগে থেকে বিয়েটা করে তবে ছাড়ল। বিয়ের পরেও সদা-সন্ত্রস্ত ভদ্রলোক, এই বুঝি বউয়ের গলা একটু খারাপ হল, এই বুঝি গলায় একটু ঠাণ্ডা লাগল, এই বুঝি গলার কিছু হল। গলার সব রকম ওষুধ সব সময় বাড়িতে মজুত। আর, বড় বড় এক-একটা গানের আসরে তার যা মুখের অবস্থা, দেখলে দম ফেটে হাসি আসে সুমিতাদের। যতক্ষণ না বসুধাব গান শেষ হচ্ছে ততক্ষণ ত্রাস ভদ্রলোকেব। আর প্রশংসা শুনলে(বসুধার গানের প্রশংসা তো সকলেই করে) গলে জল একেবারে। শেষে প্রচ্ছন্ন খোঁচার মত সুমিতার উপসংহার একটু, যাই বলো দাদা, বসুধার গানের জন্যে এত কেউ করতে পারত না।

সত্যব্রত সকলের কথা জানে না, ও যে করতে পারত না সেটা ঠিক। হালকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। সব ফুল সর্বত্র ফোটে না। যেখানে ফোটা সম্ভব, ভবিতব্য বসুধাকে সেখানেই টেনেছে। একদিন দুদিন নয়, বলতে গেলে একটানা পনের বছর এই গানের সঙ্গে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য একটুখানি রেষারেষিই ছিল সত্যব্রতর। শেষের দিকে অবশ্য গান কান পেতে সে-ও শুনত। কিন্তু গোপনে।

ভালোও লাগত। সেটা আরো গোপন। সেই ভাল লাগার সবটুকুই শুধু গান ভালো লাগা নয়।

পনের বছর বয়সে পিসিমা একদিন ওকে ধরে আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিলেন, পরীক্ষা এসে গেল তখনো সমস্ত দিন খেলা আর সন্ধ্যে না হতে ঘুম! সেই থেকে পড়াশুনার চাড় হয়েছিল সত্যব্রতর। বইপত্র ঝেড়েমুছে গোছগাছ করে নিয়ে পড়ার মধ্যে প্রাণটা একেবারে দিয়ে ফেলবে স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু ওদিকে দশ বছরের ফ্রক-পরা মেয়েটার কণ্ঠে তখন সুর-সরস্বতী ভর করবেন বলে তোড়জোড় করছেন। খুব সকালে সত্যব্রত যখন পড়তে বসে, বসুধা তখন গলা সাধতে বসে। লাগালাগি বাড়ি, দুদিকের জানালা থেকে দুজনে হাত বাড়ালে হাতে হাত ঠেকে প্রায়। কিন্তু সে-বয়সটা হাত ঠেকানোর নয়, হাতাহাতিব। বসুধা যখন অবিরাম কান্না কান্না সুরে সা থেকে সা-তে পৌঁছয় আর ফিরে আসে, সত্যব্রতব মাথায় তখন আগুন জ্বলে। তারস্বরে সে-ও ইতিহাস বা জ্যামিতি লণ্ডভণ্ড করে ওর গলার ওপর গলা চড়াতে

চেষ্টা করে। কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়। চোয়ালে ব্যথা ধরে যায়, গলা ফ্যাসর্ফেসিয়ে ওঠে। আর ওদিকে যেন কলে-টেপা গলা, চলছে তো চলছেই।

এই মেয়ে, ওরকম গাধার মত চেঁচাস কেন, পড়ছি দেখছিস না?

গাধার মত আমি চেঁচাই না তুমি, আমি গলা সাধব না?

দাঁড়া, গলা সাধা বার করছি, ফের গলা দিয়ে শব্দ বার করবি তো গলা টিপে শেষ করে দেব বলে দিলাম।

বসুধাও ওষুধ জানে। দাঁড়াও পিসিমাকে বলে তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

মজা দেখাচ্ছি! রাগে সত্যব্রতর গোটা জিভটা বেরিয়ে আসার দাখিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে গলা সাধতে পারিস না?

সমান ওজনের উত্তর, তুমি বন্ধ করলেই পারো, আমাদের ঘরে পাখা আছে তোমাদের মত?

দিনের বেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি ঘরে আলো জ্বেলে পড়ব?

আমি গরমে সেদ্ধ হয়ে গলা সাধব?

বহুদিন এইভাবে গেছে। সত্যব্রত অনেকদিন ঠাস ঠাস করে নিজের ঘবের জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আর খুলেছে। বিরক্ত হয়ে বসুধাও অনেকদিন জানালা বন্ধ করেছে ও খুলেছে। সত্যব্রত কাগজ মুড়ে ঢেলা বানিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে, গলা নকল করে ভেঙিয়েছে। বসুধা চেঁচামেচি কবে পিসিমার কাছে ওকে বকুনি খাইয়েছে। সত্যব্রতর নালিশ টেকেনি। অসুবিধের কথা শোনামাত্র পিসিমা ওকে অন্য ঘরে চলে যেতে বলেছেন। এ-বাড়িতে ঘরের অভাব নেই। ও-বাড়ির দোতলায় তিনখানি মাত্র ঘর।

বয়সেব ধর্মে একদিন যে ঝগড়ার শুরু, বয়সের ধর্মেই আব একদিন তার অবসান। অসুবিধে মাঝে-মধ্যে হলেও সত্যব্রতর সহিষ্ণুতায ভব্যতা এসেছে। ওদিকে নাকের ডগায় পড়াশুনায় ব্যস্ত মানুষটার অসুবিধের কথা বসুধাও আপনা থেকেই ভাবতে শিখেছে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই ওই ঘরের জানালা দুটো বন্ধ থাকে। অবশ্য বন্ধ থাকলেও ও-ঘরের সঙ্গীত-চর্চা এ-ঘরে কানে আসে। তাছাড়া সঙ্গীত-চর্চার নিষ্ঠা আর উপকরণ দুই-ই অনেক বেড়েছে। এর ওপর সকালে গানের মাস্টার আসে বিকেলে তবলচি। আত্মীয়-পরিজনেরা এলেও দুই-একখানা গান না শুনে যায় না।

জানালা অবশ্য মাঝে মাঝে বসুধা ওর খোঁজেই খুলত। বিশেষ করে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা এসে যেতে। আরো দু'বছর আগেই পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, গান সামলে উনিশের আগে সেটা হয়ে ওঠেনি। —ও সতুদা, কি পড়ব বলে দাও না, এই বুড়ো বয়সে ঠিক ফেল করে বসব।

সত্যব্রত টিপ্পনী কেটেছে, আর একটু গান করো, তাহলেই পাস করবে।

বেশ করব গান করব, তুমি পড়াশুনা করে কেমন দিগ্‌গজ হচ্ছ দেখতে পাচ্ছি। গান নিয়ে কোনো শ্লেষ তখনো বরদাস্ত হয় না বসুধার, বিশেষ করে সত্যব্রত কিছু বললে।

জানালায় দাঁড়িয়েই যতটা সম্ভব সত্যব্রত সাহায্য করেছে ওকে। বাড়ি গিয়েও

দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে এসেছে মাঝে মাঝে। নিয়মিত গিয়ে পড়িয়ে আসতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু পরীক্ষার সময়েও সকাল-সন্ধ্যা যার গানই প্রাণ, তাকে আর সাহায্য করবে কেমন করে?

তবু বসুধা ফেল করেনি, পাস করেছে। পাস করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু কলেজের খাতায় শুধু নামই ছিল কিছুকাল, পড়াশুনায় গোটাগুটি ছেদ পড়ে গিয়েছিল। এতকালের পরিবর্তনটা সত্যব্রত শুধু বাইরের চোখদুটো দিয়েই দেখে আসছিল, ক্রমশ মনের নিভৃতে সেটা উপলব্ধির বস্তু হয়ে উঠতে লাগল। ও-ঘরের জানালা দুটো আবার বন্ধ সারাক্ষণ। সত্যব্রত আগের মতই মাঝে মাঝে ও-বাড়ি যায়, কিন্তু কেমন এক ধরনের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসে। তবলচি আসে, গানের মাস্টার আসে, দু'চারজন নামকরা গায়ক বা গায়িকা এসেও এটা-সেটা শিখিয়ে যায়। সত্যব্রতর মনে হয়েছে, সে গিয়ে পড়লে গানের সেই জম-জমাট পরিবেশ কেমন ঢিলে-ঢিলে হয়ে যায়, বসুধার একাগ্র তন্ময়তায় ছেদ পড়ে। ও যেন মূর্তিমান ছন্দপতন, গানের আসরে তার পদার্পণ ঘটলে বসুধার স্বস্তি।

অথচ গান শুনতে সত্যব্রতর ভালই লাগত তখন। সেদিনের সেই গলা এই হয়েছে ভাবতেও অবাক লাগে। স্বচ্ছ ঝরনাধারার মত সুরের কোমল-কঠিন উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে অবলীলাক্রমে একেবারে যেন অন্তস্তলের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারে মেয়েটা। পাড়ায় অনেকদিনই নাম হয়েছিল, সেই নামের পরিধি দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

পরের পাঁচ বছরে বসুধা ভিন্ন মেয়ে।

বড় বড় আসরে ডাক পড়ে, রেডিওর নামী শিল্পী, বাজারে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। ছবির গানে তার প্লেব্যাক একটা বড় আকর্ষণ। সত্যব্রতর ও-বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে এলো। সর্বদা গুণী গায়ক-গায়িকার আনাগোনা সেখানে, ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণীর অবরোধ, সমঝদার অনুরাগীদের প্রত্যাশার ভীড়-তানপুরা-তবলা-হারমোনিয়মের নিষেধ। সেই ভীড় আর সেই নিষেধ ছাড়িয়ে সত্যব্রত একেবারেই যে বসুধার নাগাল পেতে চেষ্টা করেনি এমন নয়। চেষ্টাটা উঠতি মৌসুমের গোড়ার দিকেই করেছিল। বসুধা খুব সাদাসিধেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে, তার পথ আর ওর পথ এক নয়, এক করতে গেলেই সেটা দুঃখের কারণ হবে।

এক করতে আর যায়ও নি। সত্যব্রতর চাকরির রোজগার তখন মাসে দু'শ টাকা মাত্র। বসুধার গানের রোজগার তার কয়েকগুণ হবে। এই ব্যবধানই বড় বাধা। অবশ্য, বসুধার সচ্ছলতার আড়ম্বর কখনো চোখে পড়েনি তা বলে। বরং আতিশয্য বলতে যা-কিছু সব একে একে ছেঁটে ফেলে সাধনার অন্তঃপুরের পথেই পা বাড়াতে দেখেছে তাকে।

শেষ রাতে সত্যব্রতর প্রায়ই ঘুম ভেঙে যেত প্রভাতী নির্জনতায় বন্ধ জানালার ওধার থেকে সুরের আলাপ কানে আসত। গভীর রাতেও শুনতে পেত এক-একদিন। সত্যব্রতর মনে হত, অব্যক্ত আকুতি[illegible] যেন কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে,

সুরের জাল বুনে বুনে সেই খোঁজার বস্তুটি অসীমের অতল থেকে ছেঁকে তোলার চেষ্টায় আর বেদনায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সত্যব্রতর এক-একদিন ইচ্ছে হত, ডেকে বলে, আর কিছু না দাও, শুধু ওই জানালা দুটো খুলে রেখে তোমার ওই ব্যথার ভাগই না হয় আমাকে দিলে একটু। কিন্তু সকাল হলে আর বলা হত না কিছু। দিনের আলোয় বলাটা হাস্যকর মনে হত নিজের কাছেই।

এরপর দূতাবাসের চাকরি নিয়ে সত্যব্রত একরকম স্বেচ্ছায়ই বাইরে চলে গেছে। দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে কখনো-সখনো পিসিমাকে এক-আধখানা চিঠে দিয়েছে। শেষের দিকে তাও দেয়নি। এমন কি ওর ফেরার খবরও পিসিমা আগে থাকতে পাননি। তাঁর অভিযোগগুলি স্বাভাবিক।

দিন তিনেক বাদে সুমিতা আবার এসে জানালো, এসে পর্যন্ত ও একটিবার দেখা করতে গেল না বলে বসুধা ভয়ানক রাগ করেছে, আর অবশ্য অবশ্য যেতে বলেছে। বসুধার টেলিফোন নম্বর দিয়ে সুমিতা বলে গেল, কাল যদি না যাও তো কোথাও থেকে একটা টেলিফোন অন্তত কোরো বাপু, নইলে আবারে ভাববে আমি হয়ত তোমাকে বলিই নি।

শুনে সত্যব্রত অবাকই হল। সাত বছর আগের সেই যাবার দিনটির কথা মনে পড়ছে। সত্যব্রত দেখা করতে গিয়েছিল। বসুধা তখন লক্ষ্ণৌয়ের কোন্ এক বড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গীততত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন। ওর যাবার খবর বসুধা আগেই শুনেছিল, শুনে নিস্পৃহমুখে বলেছিল, খুব বেড়াবে তাহলে। সেদিনও নির্লিপ্ত, বলেছে, পিসিমার কাছে তো চিঠি-পত্র দেবেই, খবর পাব। আর কিছু না। সে চলে আসার পর তক্ষুনি হয়ত সঙ্গীততত্ত্বে ফিরে গেছে আবার। ও যায়নি বলে সেই বসুধা রাগ করবে আর যাবার জন্যে তাগিদ দেবে, ভাবা শক্ত।

টেলিফোনই করেছিল পরদিন। তাতেও কম ঝামেলা নয়, কে টেলিফোন করছে, কোথা থেকে করছে, কেন করছে ইত্যাদি না জেনে কর্ত্রীটিকে খবর দেওয়ার রীতি নয় বোধহয়। অবশ্য সংবাদ পেয়েই বসুধা এসে ফোন ধরেছে। তার অনুযোগ আর আগ্রহ দুই-ই আন্তরিক, সত্যব্রত সেদিনই বিকেলে গিয়ে দেখা করবে কথা দিয়ে তবে ফোন ছাড়তে পেরেছে। তারপর হৃষ্টচিত্তে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। কানায় কানায় ভরে ওঠা জীবনে কোনদিন এতটুকু ছায়া ফেলেনি বলেই এই অন্তরঙ্গ প্রীতিটুকু শুধু ভালো লাগেনি, প্রাপ্যও মনে হয়েছে।

যথাসময়ে ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে একজন পরিচারক পরম সমাদরে সোজা দোতলায় এনে তুলল তাকে। মনে হল লোকটা তারই প্রতীক্ষায় ছিল। ছিমছাম বাড়িটাতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত প্রাচুর্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা উপলব্ধি করেছিল।

বসুধাকেও খবর দিতে হল না, হাসিমুখে নিজেই দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনায় ভিতরে নিয়ে এলো তাকে। —বোসো, আমি ভাবছিলাম আজ আর এলেই না বুঝি।

প্রথম দর্শনেই সত্যব্রত অবাক হয়েছিল একটু। কেন সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। ছিমছাম সাজানো-গোছানো ঘর, শৌখিন আসবাবপত্র। গান-বাজনার সরঞ্জাম চোখে পড়ল না, সে-সব অন্য ঘরে হবে। বললাম, আসব বলেছি, আসব না কেন?

বসুধা সামনের কৌচে বসে হালকা অনুযোগের সুরে বলল, তাগিদে এসেছ, আসার চাড় থাকলে টেলিফোন না করে সোজা চলে আসতে।

এ-রকম কথা বসুধা আগে কখনো বলেছে কি না সত্যব্রত মনে করে উঠতে পারল না। তেমনি লঘু জবাব দিল, টেলিফোনেই যা জেরা তোমার লোকজনের, সোজা চলে এলে আর বাড়িতে ঢুকতে হত না।

বসুধা হেসে উঠল, খুব জেরা করেছে বুঝি! ওরা আর জানবে কি করে, দিনের মধ্যে একশবার আজেবাজে লোকের জ্বালাতন।

অর্থাৎ গানের কদরে টেলিফোনের জ্বালাতন। সত্যব্রত বলল, জ্বালাতন কেন, আনন্দের কথা তো।

হ্যাঁ আনন্দে অস্থির একেবারে। ভ্রূ কুঁচকে বসুধা এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে দিল, তোমাব খবর বলো শুনি, খুব তো দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে—লোকে কত কি হয়ে আসে, তুমি বুঝি সেই কেরানী হয়েই ফিরলে?

বসুধা ইচ্ছে করেই যেন খোঁচা দিল একটা। সত্যব্রত বলল, যেমন বরাত।

বসুধা হাসছে। নিজে কোনো কাজেব নও তাই বলো, বরাতের দোষ দাও কেন? বাড়িতে চিঠি-পত্রও দিতে না, সেখানে মনে-টনে ধরেছিল নাকি কাউকে? নাকি তাও বরাতে জোটেনি?

বসুধার তেত্রিশের কথাবার্তা হাসি-খুশিতে তেইশের প্রাচুর্য দেখছে সত্যব্রত। কিন্তু স্বাভাবিক লাগছে না খুব, তেইশে এব ঠিক বিপরীত দেখেছিল বলেই বোধহয়। পরিবর্তনটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিলেত যাবার আগে শেষের ক'টা বছর ওকে রঙিন শাড়ি পরতে দেখেনি। এখন পরে দেখছে। ছাই-রঙা শিফনের নিচে পলাশ-বুটি ভেলভেটের ব্লাউজটা ধোঁয়ার নিচে একচাপ আগুনের মত দেখাচ্ছে। গয়না তখন ছিলই না, থাকলেও পরত কিনা সন্দেহ। এখন আছেও পরেছেও। নজর করে দেখলে বয়সের রেখার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন প্রসাধন-মাধুর্যও চোখে পড়ে। অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হয়েছে, এটুকু স্বাভাবিকই বটে। তবু সত্যব্রতর স্মৃতির পটে কি একটা ঘষামোছা চলেছে। তেইশ বছরের সাধনা আর তেত্রিশের পূর্ণতায় কোথায় যেন অনেক ফাঁক। এই নাম-যশ-খ্যাতির হিড়িকে ওকে আগের থেকেও শান্ত আর নিস্পৃহ দেখবে ভেবেছিল। এখানকার গুরুগম্ভীর সঙ্গীতচর্চার পরিবেশটাই কল্পনা করেছিল, ড্রইং-রুমের কথা ভাবেনি। সত্যব্রতর খুশি হবার কথা, অথচ খুশিও তেমন হতে পারছে না।

ভদ্রলোকটি কোথায়, বাড়ি নেই?

বসুধা হাসিমুখে মাথা নাড়ল, কানের দুলজোড়া গালের দুপাশে দুলতে লাগল। —না, অফিস থেকে এসেই গানের আসরে ছুটেছেন বড় আসরের নেমন্তন্ন।

তুমি গেলে না?

বসুধা সকৌতুকে চেয়ে রইল একটু। তুমি আসছ, যাই কি করে?

সত্যব্রত মনে মনে অবাক হল আবারও, এ কি সেই বসুধা! গান নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হত যখন তখন অবশ্য অনেকটা এই সুরেই কথাবার্তা বলত। কিন্তু সেই বসুধা তো কবেই হারিয়ে গিয়েছিল। হেসে বলল, টেলিফোনে নেমন্তন্নের কথাটা জানালেই পারতে, আমি না হয় কাল আসতুম।

বাইরের পড়ন্ত দিনের আলোর মতই বসুধার মুখের খুশির ভাবটা যেন কমে আসতে লাগল। চোখেও বিদ্রূপের আভাস একটু, টিপ্পনীর সুরে বলল, গানের ওপর তোমার আবার এত টান কবে থেকে?

আজও সকালে রেকর্ড বাজিয়ে বসুধার অনেকগুলো গান শুনেছে সত্যব্রত। কিন্তু সেটা আর বলে উঠতে পারল না। বলল, আমার টান না থাক, তোমার ভদ্রলোকটিব টানেব গল্প শুনেছি, তিনি হয়ত অসন্তুষ্ট হলেন—

শেষেব কথায় কান না দিয়ে বসুধা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তার টানেব গল্প কার কাছে শুনলে?...ও সুমিতা বলেছে বুঝি? ছোট নিঃশ্বাস ফেলল একটা, ঠোঁট উলটে নিরুত্তাপ মন্তব্য করল, তাহলে তো খুব শুনেছ।

সত্যব্রত বেশ অবাক, টান নেই?

নেই আবার! বসুধা জোর করেই হেসে উঠল, তারপর বলল, এত টান যে এখন চিকিৎসা দরকার ভাবছি...। সত্যব্রতকে হকচকিয়ে যেতে দেখে তাব হাসি বাড়লো আরো।

বাইরে দিনের আলো আরো কমে আসছিল। ঘরের মধ্যে কালচে ছাযা পড়ছিল। সত্যব্রত ভাবছিল উঠে নিজেই আলোটা জ্বেলে দেবে কি না। হাসি সত্ত্বেও বসুধাকে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল।

ওকে উসখুস করতে দেখে দিশা ফিরল। —ও মা উঠছ কি, একটু চা-ও তো দিলাম না, বোসো বোসো—।

সত্যব্রত সত্যিই উঠছিল না। কিন্তু এই ফাঁকে মনের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করার সুযোগ হল। আশা করেই এসেছিল। বসুধার অনেক নাম, অনেক খ্যাতি...তবু বললে অবহেলা করবে না হযত। শুনে অবাক হবে, আবারও হাসবে বোধহয়, কিন্তু খুশিও হবে। বলল, চা চাইনে, একটা গান শোনাও তো বসি—।

যা ভেবেছিল তাই বসুধা বিষম অবাক। শুধু অবাক নয়, হঠাৎ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। —গান! গান তো আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি...ছ'মাস হয়ে গেল। তারপর হাসি। বেদম হাসি। —হাঁ করে চেয়ে আছ কি! তোমার তো খুশি হবার কথা, এই গান ছাড়াবার জন্যে কি কাণ্ডই না করতে এককালে!

বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে সত্যব্রত চেয়েই আছে তবু। বসুধার হাসি শ্রীহীনা মেয়ের উগ্র প্রসাধনের মত উগ্র লাগছে এখন। নিজের অগোচরে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস

করল, ছাড়লে কেন?

মনে হল, ওই হাসির ওপর কঠিন বেখাও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল গোটাকতক। বিদ্রূপ-ভরা চোখদুটো ওর মুখের ওপর এসে আটকালো। তারপর একটা লঘু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েই যেন সাদামাটা জবাবটা দিল। বলল, তুমি চাওনি বলেই বোধহয়...।

এক ঝলক ব্যঙ্গ ছড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, বোসো, পালিও না।

চকিতে ওই ঘরের ভিতর দিযেই অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

গান কেন ছেড়েছে বোকার মত সেটা আর জিজ্ঞাসা না করলেও পারত সত্যব্রত। জবাবটা ওর মুখে লেখাই ছিল।... গান ছেড়েছে, গান ওকে গ্রাস কবেছে বলে। এখানে ওর জন্যে গান নয়, গানের জন্যেই ও...। গান সতীন। এ যুগে সতীন সয় না।

সত্যব্রত হতভম্ব মূর্তির মত বসে।

জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ঘরের শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে।

ভাগ্যফল

ছোটবউ কমলা চা খেতে খেতে দমকা হাসির তোড়ে হঠাৎ বিষম খেযে উঠল। হাতের পেয়ালা-প্লেট মাটিতে রেখে সে-দুটো বাঁচালো কোন রকমে। বড়বউ উমাদেবীর বলার ঝোঁকে ছেদ পড়ল। মেজবউ সেজবউ রসালো কিছু শোনার আশায় আগে থেকেই মৃদুমন্দ হাসতে লাগল।

উমাদেবী থমকে গিয়ে ছোটবউযের হাসির কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন আগে। বুঝতে না পেরে নিজেও হেসে ফেললেন, আ-মর, হেসেই মরলি যে! এক্ষুনি যা-তা বলবি তো কিছু?

আবার একপ্রস্থ হাসি। শোনার আগ্রহ সকলেরই। ছোট-বউয়ের মুখ জানে। মেজবউ রাগ দেখিয়ে বলল, বলবি তো বল্ নইলে এই চায়ের পেয়ালা তোর মাথায় ঢালব এক্ষুনি!

হাসি সামলে একটু দম নিয়ে ছোটবউ বলল, ভাবছিলাম...বড়দির সঙ্গে বড় নন্দাইয়ের ইয়ে হলে কি হত...!

হেসে কুটিপাটি তার পরেই। একা ছোটবউ নয়, নিরাপদে হাসার জন্যে মেজবউ সেজবউও হাতের পেয়ালা মেজেতে নামালো।

বড়দি অর্থাৎ বড় বউ, আর ইয়ে হলে অর্থাৎ বিয়ে হলে।

উমাদেবী হাসবেন কি আচ্ছা করে বকবেন ছোটবউকে ভেবে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়। —বড়দির

সঙ্গে ইয়ে হতে যাবে কেন, ইয়েটা বড় নন্দাইয়ের তোর সঙ্গে হলেই ঠিক হত, তোর ওই মুখের ওপর আর হাসির ওপর ট্যাক্স বসানো যেত —ভাল ভেবে পরামর্শ করতে গেলাম একটা, তা ভাল লাগবে কেন, ওখানে এই চার দেয়ালের মধ্যেই পচে মর, আর কষ্টি-নষ্টি কর্—তোদের কারো গিয়ে কাজ নেই, আসছে গরমে আমি একাই বেরুবো।

চার ভাইয়ের সংসার। বিভিন্ন মার্চেন্ট অফিসে চাকরি সকলেরই। মাইনেও উনিশ-বিশ একই রকম। তবে বড় ভাই অনেক বড় বলে আগে চাকরিতে ঢোকার দরুন কিছুটা এগিয়ে আছেন। সংসারের কর্তা কেউ নয়, কর্ত্রী একজন। উমাদেবী। অন্য বউয়েরা নিজেদের স্বার্থেই তাঁর মরমী দোসর। কারণ, এই ভাবনা-সম্বল দুর্দিনে উমাদেবীর সংসার চালনার কূটনীতিটা আর যাই হোক কুটিল নয়। বরং এই থেকে একটা নিরাপত্তা-বোধ এসেছে সকলেরই।

কিন্তু এমন কিছু দুর্বোধ্য বা জটিলও নয় সেই নীতি। কথায় আছে চাবেব আঁটি একের বোঝা। সংসারের এই বোঝাটাকেই উমাদেবী সর্বক্ষেত্রে একেবাবে আঁটি আঁটি করে ভাগ করে ফেলেন। ভাগের মা নাকি গঙ্গা পান না, কিন্তু এই ভাগ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সংসার-তরণীটি উমাদেবী তরতরিযে চালিযে নিয়ে যাচ্ছেন।

সংসার বলতে কি শুধু খাওয়া-পরা-ঘুমনো? সুখ-সুবিধে সাধ-আহ্লাদ বলতে কিছু নেই? চাঁদা তুলে সংসার চালনায় উমাদেবীর যত না বাহাদুরি তার থেকে অনেক বেশি বাহাদুরি একই উপায়ে এই ছোটখাট ব্যাপারগুলোর সুরাহা করায়। যেমন, বাড়িতে লোক আসে দু'পাঁচ জন—সভ্যভব্য একটু কিছু বসার ব্যবস্থা থাকা দরকার। মোটামুটি ধরনের সোফা-সেটি করতে কত লাগে আজকাল?...একশ টাকা! গালে হাত দিয়ে খানিক বসে ভাবেন উমাদেবী। ভাগ করলে এক একজনের কত করে পড়ছে? কারো চব্বিশ টাকা কারো ছাব্বিশ টাকা। মাসে চার টাকা সাড়ে চার টাকা করে তুললে ছ'মাস বাদে সোফা-সেটি আসতে পারে। এতদিন গেছে, ছ'মাস আব কি!

মাসে চার টাকা সাড়ে চার টাকা বাড়তি সরিয়ে রাখতে প্রথম মাসে খুঁতখুঁত করলেও দ্বিতীয় তৃতীয় মাসেই গা-সওযা হয়ে যায। আর ছ'মাস বাদে সত্যিই যখন ওই দিয়ে সোফা-সেটি আসে, মনে মনে সকলেই খুশি।

পাড়ায় দিনরাত রেডিওর ঘ্যানর-ঘ্যানরে বাড়িতে টেকা যায় না। কিন্তু আজকাল এ-জিনিস একটা বাড়িতে না থাকাও কেমন যেন। প্রথমে চোখ কপালে তুলেছিল তিন দেওরই—একটু ভাল সেট্ আনতে হলে যে তিনশ-সাড়ে তিনশ টাকার ব্যাপার! কিন্তু সেই রেডিও এলো পরিকল্পনার ঠিক দেড় বছর বাদে। এত অল্প আয়াসে এলো যে কেউ টেরও পেল না। আর এলো যখন, ওই ঘ্যানর-ঘ্যানর করা জিনিসটাই গভীর মমতার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল সকলের।

সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই একই রাস্তা ধরে চলেন উমাদেবী। চায়ের পেয়ালা-প্লেট ভেঙে শেষ হয়ে এসেছে— কেউ বারো আনা কেউ চোদ্দ আনা করে বেশি দেবে সামনের মাসে। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিশ-ছাড়া বা হাতল-ভাঙা

পেয়ালার বদলে নতুন পেয়ালায় চা-খাওয়ার তৃপ্তিটুকুও অনুভব করেন সকলে। এই করে বউদের জন্যে ড্রেসিং-টেবিল এসেছে, ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল আর বাবুদের অফিসের সুবিধের জন্য বড় দেয়াল-ঘড়ি এসেছে, মেয়েদের গান শেখার হারমনিয়ামও এসেছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির অসুখ-বিসুখের ব্যাপারেও এই সমবায় রীতি চালু করে এনেছেন উমাদেবী। অবশ্য ভোগেন একটু আধটু বেশি বড় কর্তা, অর্থাৎ, উমাদেবীর স্বামীই। কিন্তু স্বামীর অসুখে কখনো কিছু বলেননি উমাদেবী। বলেছেন, গেল-বারে ছোট দেওরের টাইফয়েড আর মেজ দেওরের মেয়ের ডিপথিরিয়ার সময়। —বাড়ির অসুখে আমরা সকলেই যদি কিছু কিছু বেশি না দিই তাহলে চলে কি করে?

এরপর থেকে কারো একটু বেশি অসুখ হলে অন্য ভাইয়েরা নিজে থেকেই বাড়তি কিছু কিছু দেয়, আর উমাদেবীও নির্বিবাদে তা গ্রহণ করে অসুখের খরচা বাবদ সে টাকা বরাদ্দ কবেন।

বাড়িতে হাসিঠাট্টার ব্যাপারও মন্দ হয় না এসব নিয়ে। দেওরেরা প্রতিবারই উমাদেবীর হাতে মাস-খরচা দিতে এসে ছদ্ম-শঙ্কায় জিজ্ঞাসা করেন, নতুন প্ল্যান-প্ল্যান এ মাসে নেই তো কিছু?

ছোট-বউ চায়ের পেয়ালা ভেঙে এসে হাত উল্টে বলে, বড়দি ছ'পয়সা করে বাডতি চাঁদা তুলতে হবে এ মাসে—একটা পেযালা ভেঙেছি।

বউদেব মধ্যে ছোটবউই কাগজ পড়ে, বলে, বড়দিকে না অর্থ-দপ্তর থেকে ধবে নিযে যায় কোন্‌দিন। উমাদেবী হাসেন। কখনো বলেন, তোর ছেলে হোক, শিখিয়ে পডিযে তাকেই অর্থ-দপ্তরে পাঠাবো।

উমাদেবীর নিজেব দুটি মেয়ে, কমলারও তাই। মাঝের দুই দেওরের দুটি করে ছেলে, একটি করে মেযে। সে-জন্যেই হোক বা যে-জন্যেই হোক, নিরপেক্ষ উমাদেবীর কমলার ওপরেই টান একটু বেশি।

কমলা হেসে গডিযে তক্ষুনি বলে বসে, থাক্ বাবা, যা খরচ—অমনি চাঁদা বাড়িয়ে বসবে তুমি।

মেজাজে থাকলে উমাদেবীও কম যান না। হেসে ফেলে জবাব দেন, তোব ছেলে হলে চাঁদা বরং কমাবো আমি, দেখ্ চেষ্টা চরিত্তির করে।

সংসার পরিচালনার এই তত্ত্বটা কিন্তু উমাদেবীর নিজস্ব নয়। বলতে গেলে উমাদেবীকে অনুপ্রাণিত করেছেন বড় নন্দাই শশীবাবু। নিজে ভদ্রলোক ভালো চাকরিই করেন, তাঁর ভাইয়েরাও তাই। এই বাডির সমস্ত নিচ-তলাটা জুড়ে তাঁরা থাকেন। নিজেদের যৌথ-সংসারেও ওই একই ব্যবস্থা চালু করেছেন বটে—কিন্তু ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন শশীবাবু, তেমনিটি হযনি। যার যার নিজের মত চলার সঙ্গতি আছে বলেই সেখানে যেন এই সমবায় ব্যবস্থাব প্রতি সকলেরই একটু আস্থা এবং আন্তরিকতার অভাব। শশীবাবুর সে খেদ মেটে ওপরের সংসারে এলে। উমাদেবী প্রিয় শিষ্যা তাঁর। সন্ধ্যার অবকাশে রোজই ওপরে ওঠেন একবার, গল্পগুজব করেন, যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারে শলা-পরামর্শ দেন। উমাদেবী পরম নিষ্ঠায় শোনেন সব কথা। দেওরেরা মনে মনে

শ্রদ্ধাই করেন অভিভাবক-তুল্য ভগ্নিপতিকে। কিন্তু তিনি নিচে নেমে গেলে মাঝে মাঝে হাল্‌কা শঙ্কাও প্রকাশ করেন, আবার কিছু একটা মাথায় ঠেসে দিয়ে গেল না তো?

কিন্তু ঠাট্টায় কান দেবার মানুষ নন উমাদেবী। নিজের বাপের বাড়িতে পর্যন্ত বড় নন্দাইয়ের সংসার-পরিচালনার তত্ত্বটি কাজে লাগিয়ে এসেছেন। পারলে পাড়াপড়শীর বাড়ি বাড়ি গিয়েও একটু আধটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে আসেন।

সেদিন রান্নাঘরে বৈকালিক চায়ের পর্বে উমাদেবী জায়েদের কাছে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সেটা হল, আসছে গরমে মাসখানেকের জন্য সকলে মিলে কোথাও চেঞ্জে যাওয়া যায় কিনা...। কর্তাদের তো বছরের পর বছর ছুটি নষ্ট হচ্ছে, বড় কর্তার শরীর ভালো যাচ্ছে না, ছেলেপুলেগুলিও ভোগে প্রায়ই—আর নিজেদেরও এই চার খুপরির মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠার দাখিল।

জায়েদের কাছ থেকে সাড়া বা উৎসাহ না পেয়ে উমাদেবী আবার বলেন, হাঁ হয়ে গেলি যে সব, গোটা সংসারটা তুলে নিয়ে গেলে খরচ আর এমন কি বেশি। তাছাড়া যেখানেই যাই, বড় নন্দাই বলেছেন বাড়ি ঠিক করে দেবেন।

কমলা বলে, ক'দিন ধরে বড় নন্দাইয়ের সঙ্গে বসে বসে এই পরামর্শই করছ বুঝি?

উমাদেবী বলেন, করছিই তো, নয়ত পরামর্শটা কি তোর সঙ্গে করব?

জবাবে কমলার সেই হাসি আর সেই টিপ্পনি।

প্রস্তাব শুনে তিন দেওরই আঁতকে উঠলেন প্রথম। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁদেরও সুপ্ত ক্লান্তিটা বড় হয়ে উঠতে লাগল। শেষে এই একঘেয়ে দিন যাপনের মধ্যে ওই বৈচিত্র্যটুকু ভাবতে যেন ভালই লাগল। গরম আসতে তিন চার মাস বাকি, তবু সংসারটিতে তখন থেকেই রোমাঞ্চকর ব্যস্ততা দেখা দিল একটু।

কিন্তু ওপরওয়ালা অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন। এই তিন চার মাসের অনেক আগেই বিষম একটা ওলট্-পালট হয়ে গেল। চেঞ্জে মাত্র একজন গেলেন। এমন জায়গায় গেলেন যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না কোনদিন। উমাদেবীর স্বামী। বলা নেই কওয়া নেই, অফিস থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল একদিন। তারপর তিন দিনে সব শেষ।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই। ভাইয়েরা, ভাইয়ের বউয়েরা সব আছড়া আছড়ি করতে লাগল তাঁকে ঘিরে। উমাদেবী মাথা খুঁড়তে লাগলেন।

কিন্তু কর্তব্য তো আছে। সে কর্তব্যের দায়িত্ব নিলেন বড় নন্দাই শশীবাবু। ঘণ্টা তিনেক লাগল ভাইদের সে-ঘর থেকে টেনে বার করতে।

ঘরে আছেন শুধু বড় ননদ আর উমাদেবী। ননদ কাঁদতে কাঁদতে ঠেলে দিলেন উমাদেবীকে, দাদার সেই সখের গায়ের চাদরটা এনে দাও বৌদি, দাদার শীত করছে—আর কার জন্যে রাখবে।

উমাদেবী কান্না থামিয়ে উঠে এলেন। কিন্তু পাশের ঘরে ঢোকার আগেই বড় নন্দাইয়ের গলা শুনে বাইরের অন্ধকারে পা থেমে গেল তাঁর। ঘরের মধ্যে তিন

দেওর ম্রিয়মাণ, জায়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বড় নন্দাই বলছেন, অত ভেঙে পড়লে চলবে কেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন ওঠো সব—কাজ তো শেষ করতে হবে। একটু থেমে আবার বললেন, টাকা ষাটেক লাগবে দেখছি আপাতত... তোমরা টাকা কুড়ি করেই না হয় দাও এক একজনে।

উমাদেবী হতচেতনের মত দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। গায়ের চাদর নেওয়া হল না। সেই ঘরেই ফিরে এলেন আবার। স্বামীর মৃত্যুর আঘাতে চিৎকার করে কেঁদেছিলেন। এবারের কান্নায় আর গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না।

শাড়ি

সেই নতুন বয়সের সময় বিভূতিবাবু প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু এই ষোল বছরেও তার ধকলটা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অবশ্য বয়স হিসেব করতে গেলে আজও সেটা এমন কিছু পুরনোর দিকে গড়ায় নি। ছত্রিশে তো কতজন শুরু করে! কিন্তু বস্তুতন্ত্রীয় টানা-পড়েনে এই বয়সেই ভদ্রলোক বেশ ঝিমিয়ে পড়েছেন। বাস্তব দুনিয়ায় নিজের দু পায়ে দাঁড়াবার দিকেই মন দিয়েছেন বটে কিন্তু সেই মনের ওপর এখনো মাঝে-মাঝে সোয়া-যুগ-গত সেই অনুরাগ-কলের হ্যাঁচকা টান পড়ে। আর তখনই বঁড়শি-গেলা মাছের মত একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যান ভদ্রলোক। একটা ভীরু দুর্বলতা যেন কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারেন না তখন। পারেন না বলে অনুরাগের বদলে এক-এক সময়ে বেশ রাগই হয় নিজের ওপর। প্রায় মেরুদণ্ডহীন মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু গোড়ার কথাটুকুই আগে শেষ হোক। বিভূতিবাবু প্রেমে পড়েছিলেন বাইশ বছরের শুরুতে। আর তাতে যবনিকা পড়েছিল চব্বিশ বছরের শেষে। পুরোপুরি তিন বছরও নয়। তা ছাড়া এমন কিছু হৃদয়বিদারক ব্যাপারও ঘটে নি তখনো। নিজেদের এ-বয়েসটা চিন্তা করলে অমন ছোটখাটো প্রীতির জালে জড়িয়ে পড়েন নি এ আর ক'জনে হলপ করে বলতে পারেন? তার ওপর লিখতে বসে গোড়ায় গলদ—বিভূতিবাবু স্বেচ্ছায় এবং নিজের সাহসে ভর করে প্রেমে পড়েন নি। তাঁকে প্রেমে পড়ানো হয়েছিল।

তেইশের বেশবাস এবং প্রসাধন সত্ত্বেও সুলতা দেবীর বয়স এখন তেত্রিশ। তখন ছিল সতেরো। বয়সের ভার আর কোনো পথ না পেয়ে এখন কিছুটা অবয়ব-পুষ্টির দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু তখন ছিলেন তন্বী, ছিমছাম। সুলতা দেবী আই.এ. পড়েন তখন, আর বিভূতিবাবু সবে বি.এ.পাস করে সাহিত্যের আগুনে হাত পোড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, বিভূতিবাবু নিজের কাছেই তখন বড়সড় না হোক, ছোটখাটো একজন সাহিত্যিক

হয়ে পড়েছেন। মাসিক সাপ্তাহিক বা দৈনিকে তখন পর্যন্ত তাঁর একটা লেখাও ছাপা হয় নি বটে, তবু। এ ব্যাপারে সুলতা দেবীই তাঁকে সম্পাদকের দোরে দোরে পাঠিয়েছেন। বিভূতিবাবুর তখন মনে হত পকেট থেকে কিছু খরচাপত্র করেও যদি কোন রকমে একটা-আধটা লেখা ছাপানো যেত...। তাও যায় নি। অবশ্য বিভূতিবাবু ভরসা করে তেমন প্রস্তাবও করেন নি কখনো। লেখা পড়ে অথবা না পড়েই সম্পাদকরা মুখের ওপর বিদায় দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও সুলতা দেবীর কাছে তাঁর মানহানি হয় নি। উল্টে সম্পাদকদেব একচোখোমি আর 'কোটারি' নিয়ে আলোচনা করেছেন দু জনে। যে-লেখা ছাপেন তাঁরা, তাই নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন।

এখন আপনারা ভাবছেন, বাইশ বছরের ছেলে আর সতেরো বছরের মেয়ের এমন অন্তরঙ্গ অবকাশ জোটে কি করে। কিন্তু সেদিক থেকেও বিভূতিবাবু জটিলতা-উত্তীর্ণ। সুযোগ এবং অবকাশ আপনি জুটেছিল। এই যোগাযোগের মাঝখানে আত্মীযতার যোগ ছিল, অথচ মিষ্টি কিছু গড়ে উঠতে পারে না তেমন কড়া গোছের আত্মীয়তা নয় সেটা। এ ছাড়া কাছাকাছি বাড়ি হওয়ার ফলেই দুই পরিবারের মধ্যে একটা সহজ ঘনিষ্ঠতাও আপনিই গড়ে উঠেছিল।

যাই লোক, বিভূতিবাবু যখন দিবারাত্র সাহিত্য নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত, সেই অবকাশে সুলতা দেবী টুক টুক করে আই.এ.পাস করলেন, বি.এ. পাস করলেন। সেই তিন বছরের মধ্যে প্রেমের জট আরো অনেকটা পাকিয়েছে বলেই হয়তো বিশ্বাস আপনাদের। কিন্তু ইতিমধ্যে তিন বারের বেশি চার বার হয়তো এক সঙ্গে সিনেমা দেখেন নি তাঁরা। দু বারের বেশি তিন বার ভিক্টোরিরা মেমোরিয়াল বা লেকএ বেড়াতে যান নি। তারপর হাতে হাত রাখা বা আর কিছু? না মশাই না—একটু-আধটু প্রলোভন বা প্রগল্‌ভ সান্নিধ্য সত্ত্বেও খোলার মধ্যে শামুকের মতই বিভূতিবাবু নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে রেখেছেন তখন।

যাক, সাহিত্যের বাতিক মাথায় চড়ে বসার ফলে বিভূতিবাবুর অভিভাবকরা যখন তাঁর ভবিষ্যৎ ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন, সুলতা দেবীর অভিভাবকরা তখন তাঁকে পাত্রস্থ করার জন্য সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর তার পর হঠাৎ এক দিন একটা ছাপা লেখা হাতে করে ভবিষ্যতের অমস্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করে বাতাস সাঁতরে বিভূতিবাবু যে-দিন সুলতা-সন্নিধানে এলেন, সেই দিনই আর একটা সুখবর দিলেন তাঁকে সুলতা দেবীর মা। লেখা ছাপার সুখবরে সুলতা দেবী খুশি হয়েছিলেন, তাঁর মায়ের সুখবরে বিভূতিবাবু খুশি হতে চেষ্টা করেছিলেন।... দিন-চার দিন হল সুলতা দেবীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। মস্ত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার —এই বয়সেই নাকি পসার জমিয়ে বসেছে।

এর পরেরটুকু শুনলেও আপনারা নিরাশ হবেন। বিভূতিবাবু এক বারও আত্মহত্যা করার কথা ভাবলেন না, বিবাগী হবার কথাও চিন্তা করলেন না। একদিন শুধু একা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে বসেছিলেন, আর একদিন লেকএ। তারপর বিয়ের দিনে কাপড়-কষে খাটাখাটি করে গলদঘর্ম হয়েছেন, ফাঁকে ফাঁকে বড়লোক ব্যারিস্টার

জামাই দেখেছেন সম্ভ্রমভরা চোখে। কাজ-কর্ম শেষ হতে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী না খেয়েও ফেরেন নি বিয়েবাড়ি থেকে। মাংস আর রসগোল্লা-সন্দেশের পরিমাণ সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে বরং একটু বেশিই জঠরস্থ হয়েছিল। বাড়ির কাছের পানের দোকানে একটা সোডা খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে অতঃপর শয্যা নিয়েছিলেন বিভূতিবাবু। ঘুমটা অবশ্য সে-রাতে খুব চট্ করে আসে নি। মনটা একটু বিষণ্ণ ছিল বৈকি—লেখার প্রথম উপার্জনের টাকায় রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা কিনে বিয়েতে সুলতাকে উপহার দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উপহারের টেবিলে এক ফাঁকে চোখ বুলিয়ে দেখেন সঞ্চয়িতা আরো তিনখানি জমেছে সেখানে।

এতদিনে বিভূতিবাবু মোটামুটি গোছের সাহিত্যিক হয়েছেন। ঘষে-মেজে নামও একটু যে হয় নি তা নয়। কিন্তু নাম হওয়া আর সাহিত্য-রচনার উপার্জনে অনটন ঠেকিয়ে রাখা—দুয়েতে অনেক ফাঁক। বিশেষ করে এই দুর্মূল্যের দিনে। হাঁড়িতে জল ফোটে, দোকানে চাল। একান্নবর্তী পরিবার বলেই যা-হোক করে চলে যায়। দাদারা ভাল চাকরি করেন। তাঁরা বিভূতিবাবুর সাহিত্য-সাধনা এবং দারিদ্র্য-ভূষণ দুই-ই একরকম মেনে নিয়েছেন।

আর মেনে নিয়েছে স্ত্রী বরুণাও। অবশ্য তার মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক দুই কারণে। এক, তার সদা-আনন্দপুষ্ট চারিত্রিক গুণ। দুই, যেখানে ছিল এবং যেখানে এসেছে তার মধ্যেও অনেক তফাৎ। অভাব-অনটনে জর্জর উদ্বাস্তু কলোনী-জীবন থেকে লেখক-বধূ হয়ে শহরের পাকা দালানে উঠে আসাই নয় শুধু। সেখানকার বে-আব্রু গণজীবনের আর পাঁচটা আনুষঙ্গিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে তার সহজাত হাসি-খুশির উৎসটিতে শুকনো টান ধরতে বসেছিল। শেষে এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ঘর থেকে মাটির উঠোনে নামা দায়। আশেপাশে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেই কেউ না কেউ। ওই এক মেয়ে নিয়ে পিতৃগৃহের আপনজনেরা ভাবনা-চিন্তায় আধখানা হতে বসেছিল। আর লজ্জায় সংকোচে বরুণা তখন মরতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু কপালগুণে না মরেই বাঁচল সে। বেঁচে নিজেকে আবার ফিরে পেল। বিভূতিবাবুর সঙ্গে বয়সের তফাৎ বেশ। কিন্তু বরুণার ছেলেমানুষি অন্তর-তুষ্টির জোয়ারে সেই তফাৎ ভেসে গেছে। বকলে হাসে, রাগ করলে হাসে, আর কান্না পেলেও আগে হাসি দিয়ে সেটা চাপতে চেষ্টা করে। বড় ভয়ে ভয়ে বিয়ে করেছিলেন বিভূতিবাবু, দায়িত্বের ভাবনায় ক'রাত ঘুম হয় নি তাঁর। কিন্তু এখন আবার বড় বেশী নিশ্চিন্ত তিনি। এখন অর্থাৎ, দু বছর ধরে। দু বছর হল তিনি সংসারী হয়েছেন।

সুলতা দেবীর কথা কি বিভূতিবাবু গোপন করেছেন বরুণার কাছে? আদৌ না। বরং একটু-আধটু বাড়িয়ে বলেছেন। ব্যঞ্জনায় বরং একটু-আধটু আতিশয্যই হয়েছিল। আর নৈশ শয্যায় বরুণা বুকের কাছে ঘেঁষে এসে বিস্ফারিত বিস্ময়ে দুই চোখ বড় বড় করে সেই কাহিনী শুনেছে।... ওই বি. এ. পাস সুলতা দেবী—যাঁর রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি, যাঁর তিনখানা গাড়ি, যিনি নিজে এসে গাড়ি করে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছেন, উপহার দিয়েছেন, তার পরে আবার গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে

দিয়েছেন! বরুণা যেন রূপকথা শুনেছিল। আনন্দে আর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার প্রায় কান্না পাচ্ছিল। তার বদলে সুলতা দেবী এই বাড়িতে বউ হয়ে এলে তাঁর যে ওই বাড়ি গাড়ি কিছুই থাকত না, সে-কথা এক বারও মনে হয় নি। শুধু ভেবেছে, কে আসত পারত আর কে এসেছে। ভেবেছে, তার এই বক্ষ-লগ্ন মানুষটির কত বড় হৃদয় হলে অত বড় না-পাওয়ার পরেও তাঁর মত একটা মুখ্যু মেয়েকে এমন সহজ উদারতায় ঘরে আনতে পেরেছে আর নতুন করে ভেবেছে, সুলতা দেবী পর্যন্ত এত খাতির করেন যাঁকে, তিনি কতবড় সাহিত্যিক না জানি। না হোক টাকা, সাহিত্যিকরা গরীবই হয়।

খাতির অবশ্য সুলতা দেবী বিভূতিবাবুকে বরাবরই করতেন এবং এখনো করেন। গত প্রায় বারো বছর ধরে এই খাতিরের ধকলটাই যা হোক করে সামলে আসছেন বিভূতিবাবু। বড় লোকের বাড়িতে ফাংশান বা পার্টি বা একটা কিছু লেগেই আছে। আর প্রতি ব্যাপারে ডাক পড়বেই বিভূতিবাবুর। সমাদরও কম হয় না সেখানে। ব্যারিস্টার স্বামীর বান্ধবী, বন্ধু এবং বন্ধুর স্ত্রীদের কাছে এক জন হোমরা-চোমরা সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচয় দেওয়া হয় তাঁর। তাঁরা তাঁর নাম শুনে থাকুন বা না থাকুন, আলাপের সৌভাগ্য জ্ঞাপনে ত্রুটি করেন না। বিভূতিবাবুর কেমন একটা ধারণা, আধুনিকতার ব্যাপারে প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে সুলতা দেবীও যে একেবারে গ্রাম্য ধরনের নিরামিষ ছিলেন না, স্বামীর কাছে এবং তাঁর বান্ধবী এবং বন্ধু-পত্নীদের কাছে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই প্রতি ব্যাপারে তাঁকে অমন সাদর অভ্যর্থনায় ডেকে নেওয়া হয়। আর ডাকারও অসুবিধে কিছুই নেই, বাড়িতে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির চাকুরে দাদার একটা টেলিফোন আছে। বৌদিরা টিপ্পনী কাটেন, ডাক এসেছে গো যাও! বরুণাকে বিয়ে করে নিয়ে আসার পর প্রথম প্রথম বলেছেন, এবারে টেলিফোনের তলবটা একটু কমাতে বলে দিও, নইলে এদিকে আবার কি গণ্ডগোল বাধে ঠিক কি!

টেলিফোনও কমে নি, গণ্ডগোলও বাধে নি।

কিন্তু বিভূতিবাবু একদা যে পরিবেশে সুলতা দেবীকে পেয়েছিলেন, সেটা আজ নিছক স্মৃতির সঞ্চয়। এখন ডাক আসে এবং যেতে হয় বলেই অস্বস্তি। সেখানকার চোখ-ধাঁধানো প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে ভয়ানক বেমানান মনে হয় বিভূতিবাবুর। যতই ফিটফাট হয়ে যান, যত বড় ফুলের তোড়াই উপহার দিন অথবা সাধ্যের বাইরে যত দামী উপহার নিয়েই হাজির হোন—ভিতরে ভিতরে সাবাক্ষণ যেন মিইয়ে থাকেন তিনি। মুখের সহজ হাসিটুকু ধরে রাখার চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যে-কোন ছোটখাটো উৎসবে বা পার্টিতে প্রতি মিনিটে যে-টাকা খরচ হয় সেখানে, বিভূতিবাবু গোটা মাসে সে-টাকা রোজগার করেন কিনা সন্দেহ। শুধু তিনি ছাড়া আর যাঁরাই আসেন সেখানে, সবাই প্রায় এক দলের লোক। ওই রকম পরিবেশে বিভূতিবাবু খাপ খাবেন কি করে?

অনেকবার মনে মনে স্থির করেছেন তিনি, এই শেষ, আর নয়। যা-হোক একটা কিছু অজুহাত দেখিয়ে কাটান দেবেন। এমন কি ডাক আসতে মনে মনে প্রস্তুত

হয়েই গিয়ে টেলিফোন ধরেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন নি। ইচ্ছে সত্ত্বেও পারেন নি। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ভেবেছেন, না গেলেই হবে, পরে যা-হোক কিছু বলে দিলেই হবে। বার কতক না গেলেই শেষে আর ডাক আসবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটি এলেই শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারেন না। ইচ্ছে থাক বা না থাক যেতেই হয়। বিভূতিবাবু নিজেই অবাক হয়ে ভাবেন, কেন এমন হয়।

বরুণা আসার এই দু বছরের মধ্যে এ পর্যন্ত চার বার নেমন্তন্ন হয়েছে তাঁর। এক বার নববধূ বরুণার অভ্যর্থনায়। বাকি তিন বার শুধু বিভূতিবাবুর—আগে যেমন হত। শেষের দু বার বিভূতিবাবু যথার্থই যাবেন না স্থির করেছিলেন। কিন্তু শুনে বরুণাই উল্টে দু চোখ কপালে তুলেছে। —সুলতাদি নেমন্তন্ন করেছেন, যাবে না কি গো!

এমন মর্যাদা অবহেলা করার কথা বরুণা ভাবতেও পারে না। নিজেই সাগ্রহে জামা-কাপড় কেচে কলপ লাগিয়ে ইস্তিরি করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উপহারের খরচটাও প্রায় তিন ভাগ বাঁচিয়েছে বরুণা। চমৎকার সেলাই করতে পারে। কলোনী-জীবনে তার সেলাই আর এমব্রয়ডারির ডিপ্লোমা কোনো কাজে লাগে নি। কিন্তু এই ব্যাপারে লেগেছে। একবার রুমাল করে দিয়েছে চারটে, দ্বিতীয় বারে টেবিল-ক্লথ। সেই টেবিল-ক্লথ দর্শনীয় সামগ্রী হয়ে উঠেছিল আর দশ রকমের দামী উপহারের মধ্যেও।

একটা বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেল ঠিক বারো বছরের মাথায়।

আর তার মূলে একখানা শাড়ি।

এই শাড়ি-প্রসঙ্গে আবার দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। মোটামুটি ভালো শাড়ি বরুণার একেবারে নেই এমন নয়। দু-তিনখানাই আছে, সে ক'টা বিভূতিবাবুর টাকায় না হোক, বিয়ের দৌলতেই হয়েছে। কিন্তু বড় পরিবারের আর সব জায়েদের বিয়ে পৈতে পালা-পার্বণে নেমন্তন্ন তো লেগেই আছে—জায়েদের মতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই এক শাড়ি পরে ক'বার ক'জায়গায় যাওয়া যায়! তা ছাড়া নিজেরা মনের সাধে সেজেগুজে যাবেন, আর এক জনের অন্যরকম হবে, তাই বা কেমন করে হয়। জায়েদের মধ্যে বরুণাই ছোট সকলের। অতএব তেমন কোথাও যেতে হলে জায়েরা প্রায় কাড়াকাড়ি করেই বরুণাকে ধরে এনে গোটা বাক্সটাই খুলে দেন তার সামনে—আগে সে পছন্দ করে শাড়ি নেবে, তারপর নিজেদের সাজসজ্জা। ব্যাপারটা এমনই সহজ হয়ে গেছে যে যিনি শাড়ি বাছাইয়ের জন্যে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন, তাঁর কর্তাটি অর্থাৎ বরুণার সেই ভাসুর হয়তো সে-সময় ঘরেই আছেন। বরুণাকে যেতে হয়, কিন্তু শাড়ি বাছাই আর তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খালি হাসে, আর যেটাই দেখানো হয় সেটাই পছন্দ হয়েছে বলে ঘাড় নাড়ে। শেষ পর্যন্ত যাঁর শাড়ি তাঁকেই নিজের পছন্দমত বেছে দিতে হয় একটা। কখনো বা জায়েরাই আবার ঠাট্টা করেন, তোর জন্যে আবার এত বাছাবাছির দরকার কি, তুই যে-টা পরবি সেটাই মানাবে।

সত্যি কথা, সে যা পরে তাই মানায় বলেই হয়তো নিজের ভাল শাড়িখানা

তাকে পরিয়ে মানানোর একটুখানি আগ্রহ সব জায়েরই।

আর ভাসুরের সামনে. শাড়ি বাছাইয়ের কাণ্ডর কথা ভেবে ঘরে এসে বরুণা সেই বাছাই-করা শাড়ি হাতেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। একের পর এক শাড়ি তার গায়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে পরখ করা হয় কতটা মানাবে! বিভূতিবাবু টিপ্পনী কাটেন, তোমার আর ভাবনা কি, তিন বৌদির তিন বাক্স শাড়িই তো তোমার!

কিন্তু কিছুকাল আগে কি একটা উৎসব উপলক্ষে মেজবৌদির দেওয়া একখানা শাড়ি-পরা বরুণাকে দেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ ফেরাতে পারেন নি বিভূতিবাবু নিজেই। চাঁপা-রঙে কালো বুটির দামী সিল্কের শাড়ি একখানা। বরুণা লজ্জা পেয়ে বলেছে, অমন হাঁ করে দেখছ কি?

সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা না করেই বিভূতিবাবু বলে বসেছিলেন, তোমাকে অমনি একখানা শাড়ি কিনে দেবই দেব।

বরুণার সবেতেই আনন্দ, কিন্তু অত আনন্দ বোধ হয় শিগ্গীর হয় নি।

চার-পাঁচ মাস কেটে গেছে তারপর। সেই শাড়ি বিভূতিবাবু আজও কিনে উঠতে পারেন নি। ভুলে গেছেন, তাও নয়। চুপচাপ চার-পাঁচটা দোকান ঘুরেছেন তিনি। কিন্তু শাড়ির দাম শুনে চক্ষু স্থির। পঞ্চাশ-বাহান্ন টাকা লাগে। অবশ্য যে-শাড়ি বরুণা পরেছিল তার থেকেও পছন্দসই এগুলো—আরো গাঢ় চাঁপা রঙ আর নিবিড়-কৃষ্ণ বুটি। কিন্তু ওই দামে শাড়ি কেনা বিভূতিবাবুর সাধ্যের বাইরে। তাই শুধু হাতে এবং শুকনো মুখেই ফিরে এসেছেন তিনি।

ক'টা মাস বাদে আবার এক বিয়ের নেমন্তন্ন এসে হাজির। সেজ-জায়ের বোনের বিয়ে, বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন। কিছু না ভেবেই বরুণা বলে বসল, আবার গিয়ে শাড়ি বাছতে হবে ভাবলেই আর ভাল লাগে না বাপু।

এ ধরনের কথা হয়তো বরুণা আগেও বলেছে। কিন্তু এবারের কথাটার ভিন্ন অর্থ দাঁড়াল। ক'টা মাস আগের প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল বিভূতিবাবুর। নিরুপায় চোখে চুপচাপ চেয়ে রইলেন তার দিকে।

মনে পড়ে গেল বরুণারও। বিব্রত মুখে তাড়াতাড়ি সামলে নিতে চেষ্টা করল সে। বলল, কেন যে টানাটানি করে, আমার যে-গুলো আছে সেগুলো কি খারাপ নাকি!

উল্টে বিভূতিবাবুর আরো বেশিই লাগল যেন। তবু হেসেই বললেন, আমাকে আবার সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে বুঝি... আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি তোমাকে [illegible] করতে পারি কি না।

মনে মনে খুশি হলেও বরুণা বলল, টানাটানির সময় এখন আর জব্দ করে কাজ নেই, চট করে নিজের বরং গোটা দুই জামা করে নাও, তোমার জামা একদম নেই।

বরুণা চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত গুম হয়ে ভাবলেন বিভূতিবাবু। ভাবলেন না, নিজেকে প্রায় উত্তেজিত করলেন। গোটা তিরিশেক টাকা হাতেই আছে, আরো

গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা আগাম নিয়ে এলেন এক মাসিকের সম্পাদকের কাছ থেকে। কিন্তু বরুণার কাছে ভাঙলেন না কিছু, ওকে জব্দই করবেন তিনি।... নেমন্তন্ন চার দিন বাদে, হাতে সময় আছে যথেষ্ট।

পরদিন একটা সুযোগ এসে গেল। সেজ-জা বরুণা আর মেজ-জা-কে নিয়ে গেলেন গয়নার দোকানে বোনের জন্য গয়না পছন্দ করতে। বিয়েতে একটা কিছু ভাল গয়না দেবেন তিনি। বড়-জা তাঁর রোগা ছেলেকে নিয়ে গেছেন ডাক্তারের কাছে, তাঁরও ফিরতে কম করে দু ঘন্টা। গৃহ রমণীশূন্য।

জামাটা টেনে নিয়ে বিভূতিবাবু বেরিয়ে পড়লেন। শাড়ি কিনলেন। সটান বাড়ি ফিরে নিজের সুটকেসের একবারে নিচে লুকোলেন সেটা। তার পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। অন্তর-তুষ্টিতে ভরপূর। ছত্রিশ বছরের একঘেযে জীবনে প্রায় ছাব্বিশের আনন্দ। বিভূতিবাবু শুয়ে শুয়ে ঘরের কড়িকাঠ দেখছেন আর হাসছেন মৃদু মৃদু।

কিন্তু ও-দিকে আর কে হাসছেন তিনি জানতেন না।

টেলিফোন বাজছে বড়দার ঘরে। বাজছেই—। কেউ ধরছে না। বিরক্ত হয়ে উঠে বসলেন বিভূতিবাবু, তার পর খেয়াল হল—ছেলেরা সব নিচে, বউয়েরা কেউ বাড়ি নেই, টেলিফোন ধরবে কে?

সাড়া দিয়েই যেন মস্ত একটা ধাক্কা খেলেন বিভূতিবাবু।.... টেলিফোন তাঁরই। এবং যিনি করে থাকেন তিনিই করেছেন।

এমন একটা যোগাযোগ বোধ হয় শুধু বিধাতা চক্রান্ত করলে হতে পারে।

সুলতা দেবীর বক্তব্য, তাঁদের বিয়ের ঠিক এক যুগ পূর্ণ হতে চলল। অতএব বন্ধু আর শুভার্থীজনের বায়না, বিয়ের এই দ্বাদশ বার্ষিকীটি অন্যান্য বারের মত হলে চলবে না, বড-সড় ব্যাপার কিছু করতে হবে। আচ্ছা কি অন্যায় আব্দার বলুন তো, বড ব্যাপার আবার কি করব?

মিহি অনুযোগের জবাবে এধার থেকে বিভূতিবাবু চেষ্টা করলেন একটুখানি হাসতে। ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছেন প্রায়। বললেন, তুমি যা করো সে তো বড় ব্যাপারই হয।

—হ্যাঁঃ, ওই ও-রকম হলেই হয়েছে। আবার বলে কি জানেন, ওই দিনটা নাকি একটা বিয়ের দিন, নতুন করে আবার নাকি ওরা আমাদের—

হাসির উচ্ছ্বাসে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না সুলতা দেবী। এদিক থেকে হাসছেন, অর্থাৎ গলা দিয়ে হাসি-সূচক শব্দ বার করেছেন বিভূতিবাবুও। দিনটা বিয়ের দিন শুনে একটু যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। অতঃপর সুলতা দেবী এই উপলক্ষে বরুণা এবং তাঁকে—দু জনকেই নেমন্তন্ন করলেন।

—কবে বলো তো? শনিবার...মানে পরশুর পর দিন? বরাতই মন্দ এবার, সে-দিন যে আমাদের আবার এক বিয়ের নেমন্তন্ন!

ওদিকের কণ্ঠস্বর যেন থমকে গেল একটু। —কার বিয়ে?

সেজ বৌদির বোনের।

সুলতা দেবী যেন নিশ্চিন্ত হলেন। মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, সেজ বৌদির বোনের বিয়েতে আপনার না গেলেও চলবে, বরুণাকে না হয় ওখানে পাঠান—তা ছাড়া বাড়ির আর সবাই তো যাচ্ছেনই, আপনি এখানে আসবেন—

কথা দেওয়া হয়ে গেছে জানিয়ে তবু একটু-আধটু ইতস্তত করেছেন বিভূতিবাবু। কিন্তু নিষ্ফল। সুলতা দেবীর এক কথা, আসতে হবে, আসতেই হবে—নইলে ভয়ানক রাগ করব কিন্তু!

ঘরে ফিরে এসে এবার সত্যি সত্যি শয্যা নিলেন বিভূতিবাবু। প্রথমেই স্থির করলেন, যাবেন না—কিছুতেই যাবেন না। সেজ বৌদির বোনের বিয়েতে এমনিতেও তিনি যেতেন কিনা সন্দেহ। সেখানেই যাবেন স্থির করলেন। কিন্তু তাতে স্থৈর্য এলো না। ক্রমশ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। সেই একই দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে লাগলেন গুটি গুটি।... বারো বছর পূর্ণ হল, ঘটা বোধ হয় এবারে বেশিই হবে। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই হবে।

সব বার গিয়ে এবারে এই বিশেষ উৎসবটিতে তাঁর না যাওয়ার অর্থ কি দাঁড়ায়? না গেলে সুলতা দেবী প্রথমে অবাক হবেন, তারপর তাঁর আর্থিক অসংগতির কথাই হয়তো ভাববেন। ভাববেন, দু জায়গায় দুটো খরচ যুগিয়ে ওঠা গেল না বলেই আসা হল না। বিবাহবার্ষিকীর যুগোৎসবে ফুলের তোড়া বা রুমাল টেবিল-ক্লথ নিয়ে সেখানে হাজির হতে পারেন না বিভূতিবাবু। কত লোক কত কি নিয়ে যাবে ঠিক নেই। তা ছাড়া এই না-যাওয়ার ফলে অভিজাত পরিবেশে নিজেকে সহজভাবে মানিয়ে নিতে না পারার দুর্বলতাটাই হয়তো সুলতা দেবীর কাছে ধরা পড়ে যাবে। কারণ সুলতা দেবী জানিয়ে রেখেছেন, এবারের ব্যাপারটা বড়সড় ব্যাপার।

অস্বস্তি বাড়তেই লাগল বিভূতিবাবুর। দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলার জন্যও নিজের সঙ্গে যুঝলেন তিনি। কিন্তু এই বারো বছরের ধাক্কায় এসে সুলতা দেবী ও-রকম কিছু ভাবতে পারেন ভাবতেও পুরুষকারে ঘা লাগে।

একটাই মাত্র উপায় আছে।...তাঁর সুটকেসএ। কিন্তু সে-উপায়টার কথা চিন্তা করতেও বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠছে বিভূতিবাবুর। প্রথমে ভাবলেন অসম্ভব। তার পর সেই ভাবনাটাই আবার সম্ভবের রাস্তা ধরে মগজের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। যাতনা সত্ত্বেও আর কোনো পথ দেখতে পেলেন না তিনি। অগত্যা সুটকেসের বস্তুটিকে কেন্দ্র করেই মন স্থির করতে লাগলেন।...বরাতে নেই বরুণার, তিনি কি করবেন। তিনি নিরুপায়।

কিন্তু মনটা বেদনাভারাক্রান্ত হয়েই রইল। শুধু তাই নয়, গোপনতার দরুন একটা অস্বস্তির গ্লানি। বরুণার দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সঙ্কোচ। লেখার ব্যস্ততায় পর পর দুটো দিন নিজেকে আড়াল করলেন বিভূতিবাবু। অস্বস্তি আরো বেড়েছে বই কমেনি। নিজের দুর্বলতার দরুন অসহিষ্ণু ক্ষোভে মেজাজও রুক্ষ হয়ে উঠেছে একটু।

তিনতলার একটা চিলে-কোঠায় মাদুরের ওপর জলচৌকি পেতে নিরিবিলিতে বসে লেখেন তিনি। বরুণা রাত্রিতে বিয়ের নেমন্তন্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এলে

সাফ জবাব দিলেন, তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়, রাত্রিতে অন্য একটা ফাংশানে যেতে হবে তাঁকে।

বরুণা অবাক। —বা রে, বল নি তো কিছু?

লেখায় নিবিষ্টচিত্ত বিভূতিবাবু।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার ভাবনা ভাব গে যাও—এখন বিরক্ত করো না।

তাঁর গোমড়া মুখখানার দিকে চেয়ে বরুণার হঠাৎ হাসি পেয়ে যেতেই দৌড়ে পালালো সেখান থেকে। অপরাহ্নে সেজ বৌদি এসে জানালেন, তাঁরা সব বিকেলেই যাবেন। দেওর যেতে পারছেন না বলে একটু দুঃখও করে গেলেন তিনি।

কাগজের ওপর আঁকিবুকিও করেছেন বিভূতিবাবু। বরুণা বিকেলে যাচ্ছে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে বিষণ্ণতায় ভিতরটা যেন আবারও নতুন করে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। ...যাবার আগে বরুণা আবারও একবার আসবে নিশ্চয়। একাগ্র তন্ময়তায় তাড়াতাড়ি লেখার দিকে ঝুঁকলেন বিভূতিবাবু। মাথা তখন জলচৌকিতে এসে ঠেকেছে প্রায়। কোনদিকে তাকাবার অবকাশ নেই তাঁর।

কিন্তু তাকাতে হল।

উচ্ছ্বসিত হাসির দমকে বেশ হকচকিয়ে গিয়েই মুখ তুলে তাকাতে হল তাঁকে।

নির্বাক,বিমূঢ় পরক্ষণে।

হাসি সামলাতে না পেরে সাজ-পোশাকসুদ্ধ বরুণা বিভূতিবাবুর গা ঘেঁষে সেই মাদুরের ওপরেই বসে পড়ল একেবারে। তারপর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল আবারও।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখছেন বিভূতিবাবু। বরুণার পরনে দু দিন আগের কেনা সেই চাঁপা-রঙা কালো বুটির সিল্কের শাড়ি!

হাসির দমকে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে বরুণার সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে বলল, এই জব্দ করার জন্য দু দিন এভাবে কাটালে বুঝি তুমি? ধুতি-পাঞ্জাবি ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে সুটকেস খুলে আমি হাঁ—

বিভূতিবাবু তখনো প্রায় হাঁ করেই দেখছেন তাঁকে। এমন সুন্দর আর এমন লোভনীয় আর কখনো যেন দেখেন নি। এ দু দিনের এত গ্লানি এত অস্বস্তি আর বারো বছরের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো ব্যাধির মত এক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্বলতা যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

খুশিতে আনন্দে ভরপুর বরুণা তর্জন করে উঠল, দেখছ কি অমন করে? তুমি তো জানতেও না বিকেলে যাচ্ছি—কিছু যে বল নি, দিদিদের দেওয়া একটা শাড়ি পরেই যদি চলে যেতাম!

এমন নিটোল, এমন উদ্‌বেগশূন্য আনন্দ বিভূতিবাবু জীবনে আর কি কখনো উপলব্ধি করেছেন?

দু চোখ ফেরাতে পারছেন না তখনো। জগতে কে কি ভাববে না ভাববে আর

যেন কিছু যায় আসে না। এই ভরা ছত্রিশেও লঘ-পক্ষ বিহঙ্গের মতই ভিতরটা হালকা হয়ে গেছে একেবারে। বড রকমের একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন, চলে গেলে ডবল জব্দ হতাম—কিন্তু এখুনি যাওয়া হচ্ছে না তোমার, সেজ বৌদিকে বলে দাও তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যাখ্যান

ইজি-চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন উমানাথবাবু। বসে ভাবছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন। মাঝে মাঝে দেয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ পড়ছিল। আটটার টং টং আওযাজ শেষ হবার আগেই সিঁড়িতে পরিচিত পায়ের শব্দ কানে এলো। অভ্যস্ত ব্যস্ত-সমস্ত পায়ের শব্দ নয়। কিছুটা ধীর স্থির। তবু এ পদক্ষেপ চেনেন উমানাথবাবু।

ঘরে কেউ এসেছে অনুমান করেই যেন ঘাড় ফেবালেন। তারপর ঈষৎ বিস্মযে বাইরের দিকে তাকালেন। টিপ টিপ বৃষ্টি পডছে খেযাল কবেননি এতক্ষণ। প্রিযনাথেব দামী কোট আর পুরু চশমার কাচে জলের ছিটা দেখে খেযাল হল।

ভিজলি নাকি?

বড় টেবিলের সামনে নিজের চেয়ারটিতে বসে রুমালে করে চশমাব কাচ মুছতে মুছতে প্রিয়নাথ ছোট জবাব দিল, না...।

অন্য দিন হলে এটুকুর জন্যেই উমানাথবাবু বলতেন, কোটটা খুলে ফেল্, কাঁধেব কাছটা ভিজেছে—। কিন্তু কিছুই বললেন না। ভাইপোর মুখ দেখেই বুঝেছেন, আজ একটা বোঝাপডা হয়ে যাবে সেটা সে জেনেই এসেছে। অবশ্য উমানাথবাবু টেলিফোনে নিজেই একটু তাড়াতাডি আসতে বলেছেন ওকে। বলেছেন, কাজেব পবে দরকারী কথা আছে।...মুখ দেখে মনে হয, শুধু শুনতেই আসেনি, জবাবও দেবে।

উমানাথবাবুর দুচোখ শুকনো খরখরে হয়ে এলো আবার। হাতের অ্যানুয়াল রিপোর্টে দৃষ্টি আড়াল করলেন। টেবিলের মোটা মোটা বাঁধানো খাতাদুটো টেনে নেওযার শব্দ কানে এলো। অসহিষ্ণু পাতা ওলটানোর শব্দও। প্রায দু'ঘণ্টার কাজ সপ্তাহের এই দিনটাতে। দু'ঘণ্টাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন উমানাথবাবু।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছেন দু'মিনিট না যেতেই। আড়চোখে দেখলেন, ভাইপো খাতাপত্র দেখছে আর মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ আসার প্রতীক্ষা।...কিন্তু মেয়েটা আসছে না-ই বা কেন এখনো?

অবশ্য যে আসবে সে কাজের তাগিদেই আসবে। আর এই ব্যবস্থাটাও উমানাথবাবুরই। ছোট্ট এই আরোগ্য ভবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপার অপর্ণার নখদর্পণে। এই দিনটিতে

সমস্ত সপ্তাহের সমাচার নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় তাকে। প্রিয়নাথ এটাসেটা জিজ্ঞাসা করে, অপর্ণা জবাব দেয়। কোন্ প্রত্যাশিত জায়গা থেকে চাঁদা এলো না, সারা সপ্তাহে কি লাগবে না লাগবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সোজা হয়ে বসলেন উমানাথবাবু। বাইরে হালকা পায়ের শব্দ।...আসছে। অ্যানুয়াল রিপোর্ট কোলের ওপর রেখে ফিরে তাকালেন। চৌকাঠের কাছে ঈষৎ থমকে দাঁড়াল অপর্ণা। তারপর পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এলো। বসার কথা। কিন্তু বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। কিছু বলবে বোধ হয়।

প্রিয়নাথ মুখ তুলতে টেবিলের একটা ফাইলের নিচে থেকে কতগুলো লেখা কাগজ এগিয়ে দিল অপর্ণা। বলল, এ সপ্তাহের সমস্ত রিপোর্ট এতে লেখা আছে, আমি নিচে একটু ব্যস্ত আছি...দরকার হলে ডাকবেন।

দুই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। এতেও মনে মনে বিরূপ হলেন উমানাথবাবু। প্রচ্ছন্ন মেজাজের আভাস পেলেন। এ দিনের এই সময়টায় ব্যস্ত থাকার কথা নয়। ইচ্ছে হল, ডেকে এখানেই বসিয়ে রাখেন। বসিয়ে রেখে জব্দ করেন। বলেন, এখানে বসে থাকাটাই এ সময়ের কাজ। কিন্তু ডাকতে পারলেন না, কিছু বলতেও পারলেন না। কোথায় যেন ভারী সবল আর সহজ একটা জোর আছে মেয়েটার। সেটুকু খর্ব করতে উমানাথবাবুর নিজেরই সঙ্কোচ।

সাত বছর আগের সে-দিনটার কথা ভোলেননি। একটুখানি সংস্থানের জন্যে অপর্ণা সেই প্রথম এসেছিল এই হাসপাতালে। এই ঘরে। বছর বাইশ-তেইশ হবে তখন বয়স। প্রিযনাথের ওই চেয়ারটাতেই বসেছিলেন উমানাথবাবু। কাগজপত্র দেখতে দেখতেই তার আরজি শুনছিলেন। পিতৃহীন সংসারের দুরবস্থার কথা, বিধবা মা আর পোষ্য ভাইবোনদের কথা, লেখাপড়ার তেমন সুযোগ না হওয়ায় পছন্দমত একটু চাকরি না পাওয়ার কথা। আবেদনে কুণ্ঠা হয়ত ছিল কিন্তু কোন রকম জড়তা ছিল না অপর্ণার। বলেছিল, চাকরি একেবারে পায়নি এমন নয়, দুই-একটা বড় দোকানে চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু সেও ঠিক সুবিধের হয়নি...।

মুখ না তুলেই উমানাথবাবু জবাব দিয়েছিলেন, এখানেও সুবিধা হবে না।

তবু তাকে নেবার জন্যে একরকম অনুনয়ই করেছিল অপর্ণা। বলেছিল, আরো গুটিকতক মেয়েকে এখানে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হয়েছে জেনেই অনেক আশা নিয়ে এসেছে সে—

নেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনাকে নেওয়া হবে না।

মুখ না তুলেও উমানাথবাবু অনুভব করেছিলেন, মেয়েটা থমকে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তারপর খুব শান্ত প্রশ্ন করেছে, কেন নেওয়া হবে না?

অনেকক্ষণ ধরেই ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন উমানাথবাবু। যে-কটি মেয়ে এ পর্যন্ত কর্মপ্রার্থী হয়ে এসেছে এখানে, শুধু বেশভূষা নয়, তাদের মুখের দিকে চেয়ে ভিতরের উপবাসী কঙ্কালটিকে পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন উমানাথবাবু। দাতব্য হাসপাতালের অভাব অনটনের মধ্যে দারিদ্র্যের সেই নীরস বিষণ্ণ বেদনার্ত নিষ্প্রাণতা

দেখেই অভ্যস্ত তিনি। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতেন এই মেয়েটিরও বেশবাসে আতিশয্য নেই কোথাও। বিধাতার দেওয়া নিটোল কিছুকেই আতিশয্য মনে করেছেন তিনি। সেইটুকুর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে আছে যে রুচিবোধটুকু তা-ই তিক্ত রকমের বেমানান লেগেছে এই পরিবেশে। ফলে আবেদন ঠুনকো মনে হয়েছে প্রথম থেকেই। প্রশ্ন শুনে উমানাথবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন রুক্ষ দৃষ্টিতে। বলেছেন, হবে না তার কারণ এ কাজ আপনাদের নয়, আপনাদের জন্য অনেক দিক খোলা আছে, অন্য চেষ্টা দেখুন—

জবাবে মেয়েটা নিষ্পলক চেয়ে ছিল অনেকক্ষণ। হতাশা আর ক্ষোভে প্রায় ব্যঙ্গভরা সেই চাউনি। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে। অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, অনেক দিক যে খোলা আছে সেটা আপনার থেকে আমার কম জানা নেই। ...যা দেখে আপনি এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছেন সেইটুকু রক্ষা করার তাগিদেই আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু রক্ষা করতে আপনারাও যে চান না সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম...।

উমানাথবাবু হতভম্ব।

অপর্ণাকে ফিরে যেতে হয়নি। হাসপাতালের অঙ্গন পেরুবার আগেই আবার তাকে ডেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু যাচাই করে নিতে ছাড়েননি উমানাথবাবু। হাসপাতালের নিকৃষ্টতম কাজের মধ্যেই কাজ শুরু হয়েছিল অপর্ণার। উদয়াস্ত খাটুনির মধ্যেও নার্সিং পাস করে নিয়েছে। উমানাথবাবু লক্ষ্য করেছেন, রোগীরা তাকেই বেশি চায়, তাকে দেখলে খুশি হয়। আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের অনেক দায়িত্বও অপর্ণাকে নিতে হয়েছে ক্রমশ। সরাসরি কেউ তাকে দেয়নি সেই দায়িত্ব। কোথাও কিছুর ত্রুটি হলে কথা তাকেই শুনতে হত, অতএব দায়িত্ব তারই এটা সে বুঝে নিয়েছিল।

তবু আজ ভাবছেন উমানাথবাবু। সাত বছর আগে সেই যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রথম, সেটাই ভালো ছিল। না ফেরানই ভালো ছিল মেয়েটাকে। আজ পর্যন্ত যেমন চেয়েছেন উমানাথবাবু ঠিক তেমনটিই হয়ে আসছে। মায়ের নিঃসম্বল মৃত্যুশয্যায় সঙ্কল্প করেছিলেন হাসপাতাল করবেন। হাসপাতাল হয়েছে। এক ঘরের আরোগ্য ভবনের আস্ত একটা দালান হয়েছে। সরকারী সাহায্য নেই এতে, যা-কিছু সবই ভিক্ষালব্ধ। এক একজন ভবকাণ্ডারী সাধু মোহান্ত মহারাজের কাছ থেকে লাখ দু'লাখ করেও টাকা সংগ্রহ করেছেন তিনি। আর বিপত্নীক দাদার মৃত্যুতে সঙ্কল্প করেছিলেন, মানুষ করবেন ভাইপোকে। তাও করেছেন। ডাক্তারি পাস করে বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞের ছাপ নিয়ে এসেছে প্রিয়নাথ। গত বছর ফিরেছে সে।

সবই সঙ্কল্পমত হয়েছে। কিন্তু এবারে যা হতে চলেছে সেটা তিনি চান না। নিজে সংসারী হবার ফুরসত না পেলেও বিয়ের ব্যাপারে জাত-বর্ণ মানেন। জাত-বর্ণের কথা বাদ দিলেও হাসপাতালের মধ্যে এ-রকম একটা লঘু দৃষ্টান্ত কিছুতে বরদাস্ত করবেন না তিনি । লোক হাসবে, হাসপাতাল নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। আরো জনাকতক ছোকরা ডাক্তারের আনাগোনা আছে এখানে। অল্পবয়সী নার্সও

আছে কয়েকটি...। পাঁচজনের শুভেচ্ছা যে হাসপাতালের মূলধন সেখানে এ-সবেব প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, প্রয়োজন হলে নির্মম হতে পারেন উমানাথবাবু। তাই হয়েছেন । বছর চারেক আগে কোনো বড় হাসপাতালে অনেক বেশি মাইনের কাজ পাবার সুযোগ হয়েছিল অপর্ণার। খবরটা শুনে উমানাথবাবু তখন ভারী অবাক হয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি যাবে নাকি?

অপর্ণা কিছু বলেনি এবং সেই থেকে চেষ্টাও করেনি আর। সেই উমানাথবাবু চার দিন আগে তাকে ঘরে ডেকে খুব শান্ত মুখে বলেছেন, আমি ভেবে দেখলাম বছরের পর বছর তোমাকে এভাবে এখানে আটকে রাখা ঠিক নয়—নার্সিং পাস করেছ, এখানে কি-ই বা আশা। ভালো যদি কোথাও ব্যবস্থা হয, চেষ্টা করতে পারো—আমি আপত্তি করব না।

অপর্ণা মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে শুনেছে। শুনেও চেয়েই ছিল খানিকক্ষণ। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে গেছে। মাঝখানে একটা দিন গেছে মাত্র। তার পরদিনই সে এসে জানিয়েছে, তার চাকরি যোগাড় হয়েছে।

এরই মধ্যে চাকরি সংগ্রহ হয়েছে শুনে সত্যিই অবাক হয়েছিলেন উমানাথবাবু। ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তিটুকু চাপতে পারেননি একেবারে। শুধু পাস আর অভিজ্ঞতা নয়, আরো কিছু জোর আছে...পাবে বইকি চাকবি। যাক—। গম্ভীব মুখে জিজ্ঞাসা করেছেন, কবে যেতে চাও।

যে দিন ছেড়ে দেন।

উমানাথবাবু ভাবলেন একটু, সপ্তাহ খানেক দেরি হলে অসুবিধে হবে?

না।

অপর্ণা দাঁড়াযনি আর। বুকের ভিতরটা টনটনিযে উঠেছিল উমানাথবাবুর। ...সত্যিই যাবে ভাবেননি, সচেতন হবে এটুকুই ভেবেছিলেন। কিন্তু গেলে তিনি আর কি করতে পারেন। তিনি নিরুপায।

ভেবেছিলেন সব মিটে গেল। কিন্তু উমানাথবাবুর গতকালের ক্ষোভ প্রায় দুঃসহ। ওদের নির্লজ্জতায় সমস্ত দিন মনে মনে জ্বলেছেন তিনি। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন, চোখের সামনে দিয়ে বেবিয়ে গেল প্রিযনাথের ছোট গাড়িটা। পাশে অপর্ণা। জনাকীর্ণ রাস্তায় যে স্পীডে উধাও হল গাড়িটা তাও আপত্তিকর। সেদিনই হাসপাতালে দেখা হয়েছে অপর্ণার সঙ্গে। কিন্তু বিতৃষ্ণায একবার ফিরেও তাকাননি তিনি।

উমানাথবাবু মুখ তুলে দেখেন, ভাইপো হাত গুটিয়ে বসে আছে চুপচাপ। অপেক্ষা করছে।

হয়ে গেল?

হ্যাঁ, তুমি কি বলবে বলেছিলে?

নড়েচড়ে বসলেন উমানাথবাবু। —বলব।...ভিড়ের মধ্যে অত জোরে গাড়ি চালাস কেন, কাল দেখলাম...!

চকিতে ফিরে তাকালো প্রিয়নাথ। জবাব দিল না।

বেশ ধীরে সুস্থেই আবারও বললেন উমানাথবাবু, আমাদের ওই নার্সটিকেও দেখলাম তোর সঙ্গে কাল।...বাইরের কেস ছিল কিছু?

চেয়ারসুদ্ধু একটু ঘুরে বসল প্রিয়নাথ। প্রায় মুখোমুখি। কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে নিরুত্তাপ জবাব দিল, না—একটা প্রস্তাব ছিল। বিয়ের...।

ও। মুখে কঠিন গাম্ভীর্য উমানাথবাবুর। তা এ ব্যাপারে আমার মত নেওয়াটা দরকার মনে করিসনি বোধহয়?

দরকার হলে নিতুম। দরকার হয়নি।

উমানাথবাবুর থমথমে মুখে আত্মসংবরণের শেষ চেষ্টা। আর এক মুহূর্ত, তার পরেই মর্মান্তিক কিছু বলে ফেলতেন হয়ত। মর্মান্তিক কিছু ঘটে যেত। কিন্তু তার আগেই আরো ঠাণ্ডা গলায় কথাটা শেষ করল প্রিয়নাথ। বলল, তিনি রাজি হননি, প্রস্তাব বাতিল করেছেন।

একটু হেসেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। উমানাথবাবু হঠাৎ যেন হকচকিযে গেছেন একেবারে। বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন। এই প্রথম মনে হল. হাসি সত্ত্বেও বেশ শুকনো দেখাচ্ছে ভাইপোর মুখখানা।

প্রিয়নাথ বলল, চলি, কাজ আছে একটু। দরজার দিকে পা বাড়িয়েও থামল আবার। ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম উনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে...ঠিক নাকি?

উমানাথবাবু জবাব দিতে পারলেন না। সামান্য মাথা নাড়লেন। চোখে চোখ রেখে আবারও একটু হাসল প্রিয়নাথ, তারপর চলে গেল।

কতক্ষণ বসেছিলেন উমানাথবাবু ঠিক নেই। কি ভাবছিলেন তাও খেযাল নেই। সচকিত হলেন একসময। চাযের পেয়ালা নিয়ে অপর্ণা ঘবে ঢুকেছে। ব্যস্তভাবে ঘডিব দিকে তাকালেন তিনি। ঠিক এই সমযেই এক পেযালা চা খান বটে। অপর্ণাই দিযে যায়। আজও ব্যতিক্রম হয় নি।

হাত বাড়িযে চা নিলেন। অপর্ণা অভ্যস্ত হাতে টেবিলের ফাইলপত্র গোছাতে লাগল। উমানাথবাবু কিছু বলবেন ভাবছেন। বলবেন, সত্যিই হাসপাতাল থেকে ওকে ছাড়াতে চাননি তিনি। বড় হাসপাতালে যে মাইনে পাবে তাও তিনি দিতে রাজি আছেন জানাবেন...।

টেবিল গুছিয়ে অপর্ণা সামনে এলো। শূন্য পেয়ালাটা নেবে। মনে মনে প্রস্তুত হয়েছেন উমানাথবাবু। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বলা হল না। বলতে পারলেন না। পেয়ালাটা ফেরত দিলেন শুধু।

অপর্ণা চলে গেল। উমানাথবাবু স্থাণুর মত বসে। ভাইপোর শুকনো মুখ আর শুকনো হাসিটুকু কোথায় যেন নাড়া দিচ্ছে। অপর্ণাকে থাকতে বলার ইচ্ছেটাও ফিরে যেন তাঁকেই বিদ্রূপ করছে। বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেষ্টা করলেন উমানাথবাবু—সব ভয়-ভাবনার অবসান। তবু স্বস্তি বোধ করতে পারছেন না উমানাথবাবু।

তিনি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু উল্টে একটা প্রত্যাখ্যানের যাতনা যেন খচখচ করে বিঁধছে কোথায়।

চোখকান বুজে রমেন শেষ পর্যন্ত মঞ্জুকে বিয়েই করে ফেলল।

রমেন বসু বিয়ে করল মঞ্জু চক্রবর্তীকে।

অনেক দ্বিধা করেছে, অনেক ভেবেছে কল্পনার ওপর দূরবীন বসিয়ে অনেক দূরের ভবিষ্যৎও দেখতে চেষ্টা করেছে। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে, ভাবনা ঝেড়ে ফেলে আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ে করেছে। দক্ষ মনোবিজ্ঞানীর মত ওর ভাবনা-চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মনটাকে এই নির্দিষ্ট পরিণতির পথে পরিচালিত করেছে মঞ্জুশ্রী নিজেই। রমেন ভীতু মানুষ আর ভালোমানুষ। মোটামুটি মন্দ চাকরি করে না, মাস গেলে শ'তিনেক টাকা পায়। মধ্যবিত্ত পাঁচ ভাইয়ের সংসারের সর্বকনিষ্ঠ। যুগের হাওযায় অসবর্ণ বিয়েটা জলভাত ব্যাপার হলেও ওদের পরিবারে এটা ছোটখাট উত্তেজনার কারণ। কিন্তু নিজের সংসারের ঝামেলা নিয়ে রমেন মাথা ঘামায নি। মাথা ঘামিয়েছে মঞ্জুদের বাড়ির কথা ভেবেই।

সেখানকার উত্তেজনাটা খুব ছোট রকমের নয়। তাদের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য প্রতিকূলতায় সে বিলক্ষণ ঘাবড়েছিল আর মুষড়েও পড়েছিল। কিন্তু মঞ্জুশ্রী শেষপর্যন্ত এক ঝলক আলোর মতই ওর একরাশ ভাবনা-চিন্তার অন্ধকার দূর করে দিযেছে।

ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলা দরকার।

পাশাপাশি লাগালাগি দুটো বাড়ি—তাদের আর মঞ্জুদের। ঘরের জানালায বা আলসেয় দাঁড়িয়ে এ-বাড়ির মেয়েরা ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, গল্পগুজব করেন। সকালে দুই বাড়ির পুরুষেরা হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ বদলাবদলি করে পড়েন। কান পাতলে এ-বাড়ির কথা ও-বাড়িতে শোনা যায, ও-বাড়ির কথা এ-বাড়িতে আসে।

ওই বাড়ির সংসারটিও ছোট নয়। মঞ্জুরা চার বোন তিন ভাই। তার ওপর ঠাকুরদা আর দু'জন কাকা। কাজেই মঞ্জুশ্রীর বাবা মোটামুটি ভালো চাকরি করলেও অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়। মঞ্জুশ্রী মেজ, বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। বাকি তিনটির বিয়ের ভাবনায় তার ঠাকুরদা ঠাকুমা এখন থেকেই চিন্তিত।

মঞ্জুশ্রী মাত্র আই-এ পড়ে তখন। আর ছোটরা অনেক ছোট। মঞ্জুকেও ছেলেমানুষটি ভাবতেন তার বাবা-মা। এই তো সেদিন মাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। কিন্তু সেখানেই তাঁদের মস্ত ভুল। উদ্ভিন্ন বয়েসকালের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের ভিতরে ভিতরে যে রীতিমত বড়রকমের একটা পরিবর্তন এসেছে, সেটা জানলে ওই বুড়ো-বুড়ীর মত উদ্বিগ্ন এবং উতলা হতেন তাঁরাও।

স্কুল ফাইন্যাল উতরে কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর গোপন অভিজ্ঞতার ঝুলিটা

ভারী দ্রুততালে ভরাট হতে থাকল। মুখ-শুকনো প্রতীক্ষার্থী ছেলেগুলোকে নিয়ে সহপাঠিনীদের প্রগল্‌ভ আলোচনায় তারও মনে কৌতুক এবং কৌতূহল সঞ্চার করল। দেখতে-শুনতে সেও একেবারে খারাপ নয়। দাদু তো সুন্দরীই বলে। অতএব কলেজে-পড়া কটা ছেলের চোখ ওর দিকে সেটা ও লক্ষ্য করতে লাগল। ওদিকে দিদি-জামাইবাবুর নতুন বিয়ের দিনগুলিও ওর চোখের ওপর দিয়েই পার হয়ে যাচ্ছে। তারপর কলেজে পড়া শুরু করে প্রকাশ্যে এবং গোপনে মাসে পাঁচটা, বছরে প্রায় ষাটটা সিনেমা দেখে ফেলেছে। গণ্ডাদশেক প্রেমের গান প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে। প্রেমের উপন্যাসই পড়েছে সপ্তাহে কম করে দুটো, মাসে আটটা, বছরে শ'খানেক।

এত-সবের পর একেবারে হাতের কাছে যে-লোকটা রয়েছে, মঞ্জুশ্রীর যদি চোখ পড়েই তার দিকে, সেটা এমন কিছু অভিনব বা অস্বাভাবিক নয়। বর্ণের বিভেদটা সে ভাবত বা ভাবতে পারত যদি সিনেমায় অথবা উপন্যাসে সে-রকম সমস্যার জোরালো অন্তরায় চোখে পড়ত। বরং অসবর্ণ বিয়ের নজিরই সে অনেক বেশি দেখেছে।

মঞ্জুশ্রী প্রথমে এক তরফাই লক্ষ্য করেছে রমেনকে। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, সাত আট বছরের বড় ওর থেকে, কাজেই প্রথম প্রথম বেশ একটু সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু একটা বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ কমে আসতে লাগল। মনে মনে দিদি আর জামাইবাবুর বয়েসের তফাতটা হিসেব করল। শেষে বাবা-মা আর দাদু-দিদুর বয়েসের তফাতটা মনে হতে একেবারে নিশ্চিন্ত। হলই বা বাবুর বয়েস সাত আট বছর বেশি, ও নিজেই কি ছেলেমানুষ নাকি!

মনে মনে সম্ভাব্য মনের মানুষটিকে সমপর্যায়ে নিযে আসার পর আগের থেকে একটু ভালোও লাগছে তাকে। বেশ কচি কচি নরম নরম ভীতু ভীতু ভাব। মাথাব একরাশ কোঁকড়া চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দেবার জন্যে অনেক সময়েই মঞ্জুর হাতদুটো নিশপিশ করে।

প্রথম মাসের চেষ্টায় সাধারণ কথাবার্তা আর দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ বাড়ল। দ্বিতীয় মাসে রমেনের অফিসে যাবার পথে আর মঞ্জু সকালের কলেজ শেষ করে ফেরার পথে যোগাযোগ চলতে লাগল। তৃতীয় মাসে গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্ট—পার্ক আর লেকএ সাক্ষাৎকার। চতুর্থ মাসে লেক আর সিনেমা। পঞ্চম মাসে মঞ্জুরও তুমি ডাকা, হাত ধরা, সুযোগ-সুবিধেমত কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হওয়া। ষষ্ঠ মাসে বিবাহের প্রস্তাব এবং ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা।

মঞ্জুশ্রী প্রস্তাবটা মায়ের কাছে পেশ করল দিদির মারফত। মা বজ্রাহতা গালে হাত দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে রইলেন। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মঞ্জুর ডানা ধরে হিড়হিড় করে একটা ঘরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। চোখ রাঙালেন, ভয় দেখালেন, শাসালেন, রাগের মাথায় বেশ বড় ঝাঁকুনিও দিলেন গোটাকতক। মঞ্জু শুধু একবার মাত্র মুখ খুলেছে। বলেছে, মন-প্রাণ সে সমর্পণ করে বসে আছে, হয় বিয়ে করবে নয়তো আত্মহত্যা করবে।

মা তাকে আত্মহত্যা করতে পরামর্শ দিয়ে স্বামীর কাছে এসে কেঁদে পড়লেন।

ফলে বাবা দাদু দিদু এবং কাকাদের সমবেত বাধার যে ধকলটা গেল ওর ওপর দিয়ে, সেটা যে অত বড়ই হবে তা অবশ্য আগে ভাবে নি। বাবা তো মারতেই এলেন প্রায়, দাদু-দিদু যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করলেন, কাকারা উপদেশ দিলেন, আর মা সারাক্ষণ নজরবন্দী করে রাখতে চেষ্টা করলেন ওকে।

এমন একটা নাড়াচাড়া দিতে পেরে মঞ্জুশ্রীর নিজের ওপরেই শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ফলে তার সঙ্কল্পটি আরো অনমনীয় হল। পাহারার যতই কড়াকড়ি হোক, মঞ্জুশ্রী হাসে মনে মনে। পরীক্ষার বছর, কলেজ তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কাজেই গোপন দেখা-সাক্ষাতে ছেদ পড়ারও দুর্ভাবনা নেই।

ওদিকে নিজের বাড়িতে রমেনের প্রস্তাব শুনে বউদিরাও হাঁ। আর তাঁদের মুখে খবর শুনে দাদারা গম্ভীর। শেষে বউদিরা বোঝাতে বসলেন, বামুনের মেয়ে এনে পাপ হবে, অকল্যাণ হবে। তাছাড়া পাশাপাশি বাড়ি, তাঁরা তো আর খুশি হয়ে মেয়ে দেবেন না, আপত্তি করবেনই—মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ হবে তখন। সকলেই উপদেশ দিলেন, এ-রকম বিয়ে কখনো সুখের বা শান্তির হতে পারে না। অনেক পরিবারের অনেক নজির দেখালেন তাঁরা।

রমেনের দুর্ভাবনা নিজের বাড়ির জন্যে নয়। রোজগেরে ছেলে, কে আর বেশি বাধা দেবে? কিন্তু দুর্ভাবনা মঞ্জুর জন্যেই। বিয়ে করলে মঞ্জুর বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনেরা তো মেয়ের মুখও দেখবেন না আর। কাজেই মঞ্জু কি করবে, সে বাজি হবে কি করে? এরই মধ্যে তো দু'বাড়ির মেয়েদের জানালায় দাঁড়িয়ে আলাপ আর পুরুষদের খবরের কাগজ বদলাবদলি করে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সেদিন মঞ্জু ক্লাস কামাই করে আর রমেন অফিস কামাই করে বেলা বারোটা পর্যন্ত পার্কে বসে এই আলোচনাই করল।

রমেন জিজ্ঞাসা করল, মঞ্জু, তোমার বাবা মা আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে তুমি থাকবে কি করে?

মঞ্জু জবাব দিল, তাঁরা কেউ আমার আপন নয়, আপন হলে এ-রকম করে! আমি তো ভেবেছি তোমাকে বাইরে চাকরি নিতে বলব, কলকাতার বাইরে—পাবলে ভারতবর্ষেরও বাইরে, কোনোদিন আমাদের যাতে দেখতে পর্যন্ত না পায় কেউ। —এটা তুমি একটা সমস্যা বলে ভাবতে পারলে? তোমারই বুঝি মন খারাপ?

রমেন খুশিতে আটখানা। —পাগল! দাদা বউদিরা বলছিলেন, এ-রকম বিয়ে নাকি সুখের হয় না—যেন এ-রকম বিয়ে কতই দেখেছেন তাঁরা! পাশাপাশি বাড়ি বলেই তাঁদের ভাবনা, মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হবে তো।

মঞ্জু ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছে, পাশাপাশি বাড়িতে থাকছে কে, এদের কারো ত্রি-সীমানায়ও আমরা থাকব না। তুমি এখন থেকেই দূরে কোথাও দু'খানা ঘর দেখো।

কিন্তু রমেনের দুর্ভাবনা আসল ব্যাপারটা নিয়ে। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে। আইনের চোখে মঞ্জু নাবালিকা। ওর আঠার বছর পুরতে তখনো মাস সাতেক দেবি। এখন বিয়ে করে বসলে নাবালিকা ভোলানোর দায়ে জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। শুনে নিজের বাবা-মায়ের ওপর মঞ্জুশ্রী মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ, যেন রমেনকে তাঁরা জেলে ঠেলেই

দিয়েছেন। এঁরাই নাকি আপনজন, বিয়েটা একবার হয়ে গেলে জীবনে আর মুখ দেখবে কারো!

যাই হোক, আলোচনায় স্থির হল, এই গোলযোগের সম্ভাবনা এড়ানোই ভালো। মঞ্জুশ্রী আপাতত মুখ বুজে আই-এ পরীক্ষা দেবে, আর রমেন মুখ বুজে চাকরি করবে। ততদিনে মঞ্জুশ্রী সাবালিকা, তখন আর তাদের আটকাবে কে? নিজেদের পাকাপোক্ত পরিকল্পনায় তারা দুজনেই নিশ্চিন্ত এবং পরিতুষ্ট।

আর কোনো ঝামেলার লক্ষণ না দেখে দুই বাড়ির পরিজনেরাও নিশ্চিন্ত কিছুটা।

যথাসময়ে মঞ্জুশ্রীর আই-এ পরীক্ষা শেষ হল একদিন এবং ফল বেরুলো আর একদিন। বাড়ির লোকে অবাক, দিন-রাত বইএ মুখ গুঁজে থেকেও মেয়ে ফেল করল! পাহারার কড়াকড়ি আর তেমন না থাকায় বিকেলে রমেনের সঙ্গে পার্কে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটল না। মঞ্জুশ্রী রমেনের ওপরেই রাগ করে কাঁদল খানিকক্ষণ, তার জন্যেই তো—বই নিযে বসে সারাক্ষণ বিয়ের কথা ভাবলে পড়া হয়, না পাস করা যায়!

রমেন সে-কথা স্বীকার করে নিয়েই তাকে সান্ত্বনা দিল, ওর কথা ভেবে পরীক্ষায ফেল করে মঞ্জুশ্রী কিছুটা আত্মত্যাগই করেছে। রমেন সেজন্য কৃতজ্ঞ।

আঠার পেরিয়ে দু'মাস যায়, তিন মাস যায়। বিয়েটা হয়ে উঠছে না দেখে মঞ্জুশ্রীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে। বাবু দু'খানা ঘরই ঠিক করে উঠতে পারলেন না আজ পর্যন্ত। এদিকে সাবালিকাটির হাবভাবে ব্যতিক্রম দেখে বাবা-মা আবার চোখে চোখে রাখতে শুরু করেছেন ওকে। মঞ্জু মনে মনে বাবা-মাকেই সব থেকে বড় শত্রু ভাবছে এখন। আব বাড়িটাকে ভাবছে জেলখানা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিযেটা হযে গেল ওদের। বিয়ের পর আর বাড়িমুখো হল না কেউ, কলকাতার আর-এক প্রান্তে নতুন বাড়িতে ঘর-সংসার পেতে বসল। বাড়িতেও ওরা সঙ্কটের মধ্যে রাখে নি কাউকে, চিঠির মারফত সবকিছু ঘোষণা করেই বেরিয়েছে।

একটা একতলা বাড়ির দেড়খানা ঘরে ওদের নতুন সংসার। ওদিকের আড়াইখানা ঘরে সপরিবারে থাকেন সুখেন ঘোষাল। বছর চল্লিশ বয়েস ভদ্রলোকের। ওঁদেরও ছোট সংসার। দুটি ছেলেমেয়ে আর ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীটি নিজেই এগিয়ে এসে ওদের সংসার গুছিয়ে দিয়েছেন। এখনো দেখাশোনা করেন, প্রয়োজনে পাঁচটা পরামর্শ দেন। মঞ্জুশ্রীও দিনে দু'চারবার ঘোষালদির শরণাপন্ন হয়।

মোটামুটি সুখেই কাটছিল। এত সুখে কাটবে রমেন ভাবে নি। মঞ্জুশ্রী যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারই। কোন্ অভিশাপে ভিন্ন বর্ণের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাদের, কে জানে। কিন্তু বলতে গেলে মঞ্জুশ্রীই সমস্ত বাধা তছনছ করে এই মিলন ঘটিয়েছে। ভাবতেও বুকখানা ভরে ওঠে রমেনের। ...দাদা-বউদিরা বলেছিলেন, এ রকম বিয়ে সুখের হয় না। সুখের যাতে হয় সেই চেষ্টার ত্রুটি নেই রমেনের। সে দেখিয়ে দেবে, এ-রকম বিয়েই একমাত্র সুখের হতে পারে। চেষ্টা-চরিত্র করে রমেন সকালের

দিকে এক বড় উকিলের বাড়ি পার্ট-টাইম একটা কাজও নিয়েছে। মঞ্জুশ্রীর সুখের দিকটা দেখতে গিয়ে মাইনের টাকায় টান পড়ে যাচ্ছিল।

মঞ্জু চোখ রাঙিয়েছে, অত পরিশ্রম সইবে কেন?

রমেন হেসে জবাব দিয়েছে, তোমার জন্যে সব সইবে।

কিন্তু সর্বরকমের সুখের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেও সুখের মোটামুটি একটা স্ট্যাণ্ডার্ড বা মাপ ঠিক করে উঠতে পারছিল না রমেন। ফলে ঘোষাল পরিবারের সঙ্গেই তার অলক্ষ্য একটা রেষারেষি চলছিল। ওই পরিবারটিকেই মোটামুটি সুখী পরিবার ধরে নিয়েছিল, অতএব তাঁদের থেকে একটু বেশি সুখী হওয়ার প্রতিই আপাতত সজাগ দৃষ্টি তার। ঘোষালদির একখানা ভালো শাড়ি হয়েছে শুনলে মঞ্জুকে আরো ভালো পর্যায়ের দু'খানা শাড়ি এনে দেয়। ঘোষালদির পুরনো দুল ভেঙে গড়ানো হয়েছে, ফলে মঞ্জুশ্রীর আর এক জোড়া নতুন দুল হয়েছে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে দু'মাসে একটা সিনেমা দেখেন, এরা পনের দিনে একটা। সুখেন ঘোষাল বউ ছেলেপুলে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই মাসের প্রত্যেকটা ছুটির দিনে মঞ্জুকে নিয়ে রমেন বেলুড় দক্ষিণেশ্বর ডায়মণ্ডহারবার চষে বেড়িয়েছে। দুই বাড়ির রান্নাঘরে কোন্ বিশেষ দ্রব্যটি রান্না হচ্ছে বাতাসেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু টেরটা প্রতি রবিবারে ওবাড়ির ওঁরাই বেশি পান।

এইভাবে প্রত্যক্ষগোচর সমস্ত ব্যাপারেই বাড়তি ব্যবস্থা করতে পেরে নিজেদের বাড়তি সুখ সম্বন্ধে রমেন মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু প্রায় ছ'মাসের মাথায় হঠাৎ যেন বাজ পড়ল একটা।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল একটু। উঠেই পার্ট-টাইম ডিউটিতে ছোটার তাড়া। এরই মধ্যে লক্ষ্য করল, মঞ্জুর মুখখানা বেশ গম্ভীর আর থমথমে। হাতে সময় নেই, তবু দুই-একবার জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

মঞ্জু শুধু মাথা নাড়ল, কিছু হয় নি। কিন্তু ওর দিকে তাকালও না ভালো করে। রমেন ভাবল, ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করবে। বেরুতে গিযে চোখে পড়ল, বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তাদের যখন নয়, তখন ঘোষালই ডেকেছেন নিশ্চয়। এই সাত-সকালে ট্যাক্সি কেন রমেনের বোধগম্য হল না। সে দ্রুত ট্রাম ধরতে ছুটল, এসেই তো আবার অফিসের তাড়া।

কিন্তু পার্ট-টাইম ডিউটিতে মন বসল না সেদিন। থেকে থেকে মঞ্জুর বিমর্ষ মুখখানা চোখে ভাসতে লাগল। ভিতরটা খচখচিয়ে উঠতে লাগল বারবার। মঞ্জুকে অমন শুকনো আর অত গম্ভীর কখনো দেখেনি।

অসুস্থতার অজুহাতে আগেই উঠে পড়ল। মন টিকছে না। বাড়ি এসে হতভম্ব।

মঞ্জু শয্যায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ও অসময়ে এসে পড়ায় একটু বিব্রত হলেও কান্না আরো বেড়ে গেল।

অনেক সাধ্য-সাধনা অনুনয়-বিনয়ে মুখখানা যদিও একটু এদিকে ফেরানো গেল, কথা আর বেরোয় না। ফলে রমেনেরও কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

শেষে প্রায় পায়ে ধরার উপক্রম করতে মঞ্জু কোনপ্রকারে শুধু বলল, ঘোষালদি—

আর বলতে পারল না, মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিল।

ঘোষালদি! চকিতে মনে পড়ল রমেনের সকালে বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়ানো দেখেছিল। —কি হয়েছে ঘোষালদির? হাসপাতালে যাচ্ছেন? কারো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?

আবার একদফা আকুতি-মিনতির পর অতি কষ্টে যে-টুকু জানা গেল তার- সার-মর্ম, অ্যাক্সিডেন্ট নয় হাসপাতালও নয়, ঘোষালদি বাপের বাড়ি গেলেন—তাঁর বাবা নিজে এসে নাতি-নাতনিসহ মেয়েকে নিয়ে গেলেন।

রমেন চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে।

জানালার ধারে

শুনেই ভাবছেন কোন বাতায়নবর্তিনীর মরমের কথা বা মর্মকথা অনাবৃত করার মতলব আঁটছি। না এটা সে জানালা নয়, তার থেকে অনেক গদ্যাকারের ব্যাপাব এটা। এমন গদ্যাকারের যে রোজই দেখছি, সুযোগ-সুবেধেমত সচেষ্ট অথবা নিশ্চেষ্ট অংশ গ্রহণ করছি, আর তার পরেই বেমালুম ভুলেও যাচ্ছি।

আমি বলছি রোজকার ট্রাম-বাসের জানালার ধারের কথা। ওই একটুখানি জাযগা নিয়ে প্রতিনিয়ত একই রকমের বা একই ধরনের যে সবাক অথবা নির্বাক প্রহসন ঘটে, লক্ষ্য করলে বা ভাবতে বসলে অনেক সময় মনানুশীলনের বিষয়বস্তু বলে মনে হবে সেগুলো। প্রহসনের মূল কেন্দ্র আরও একটু সংক্ষেপ করে আনা যেতে পারে। আড়াআড়ি তিন জনের আসন কটি নিয়ে গোল বাধে না। বাধলেও সেটা জানালার ধারের আকর্ষণে নয়। কারণ, ওই আসনে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসতে হয়। সেখানে ঘুরে বসে জানালা-রস আহরণ করতে গেলে পাশের লোক অথবা দণ্ডায়মান-যাত্রী সচেতন করে দেবে, ঠিক হয়ে বসুন মশাই।

অতএব, এই বিবৃতির পটভূমি শুধু ডাইনে বাঁয়ের দ্বিত্বাসন-গুলোর জানালার ধারটি। চোখ-কান সক্রিয় রাখলে ওই জায়গাটুকু উপলক্ষ করে অনেক নীরব এবং সরব কাণ্ডকারখানা দেখতে পাবেন। কোনও যাত্রী উঠে যদি দেখেন ও-রকম গোটা কোনও একটা আসন খালি পড়ে আছে (খুব কমই থাকে) —তাঁর মুখের দিকে চেয়েই অন্তর্তুষ্টিটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন। ট্রেনের তিন দিনের যাত্রী অপ্রত্যাশিত শোবার জায়গা পেলে যেমন হয়, প্রায় তেমনি। তাড়াতাড়ি জানালার পাশটি দখল করে বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবেন তিনি।...

দুজন পাশাপাশি বসে আছেন বরাত জোরে আপনিই হয়তো জানালার ধারে।

আপনার নামার জায়গা এলো, উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু নামার তাড়ায় আপনি নিজেই যদি ব্যস্ত না হয়ে রয়ে সয়ে পার্শ্বোপবিষ্ট সহযাত্রীর দিকে লক্ষ্য করে তাকান, দেখবেন সে-মুখে একধরনের গম্ভীর অথচ চাপা আনন্দ। আপনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালার ধার নেবেন। হয়তো দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁরও নামার পালা।

এ তো গেল খুব ভদ্রগোছের ব্যাপার। ওই জায়গাটির আকর্ষণে একসঙ্গে একাধিক ভদ্রযাত্রীকে রেষারেষি ছুটোপুটি করতে দেখেছি। তড়াক করে স্ব-স্ব আসন ছেড়ে এক সঙ্গে দু-দিন জনকে উঠে সে-দিকে ছুটতে দেখছি। ঠোকাঠুকি লাগতে দেখেছি, হাতাহাতি হতে দেখেছি, মারামারি হতে দেখেছি। তাদের বয়স? ষোল থেকে ছাপ্পান্নও হতে পারে। পড়ে মেয়েরা হাসছেন বোধ হয়...। কিন্তু না হাসাই ভাল। কারণ, মাত্র সেদিন এই চোখেই ওই একটি বিশেষ জায়গার দখল নিয়ে দুটি মহিলাকে দেখেছি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে পরস্পরকে ভস্ম করতে। আসন দখলের চেষ্টায় তাঁরা যখন মৃদু রেষারেষির পর থমকে গিয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়েছেন, ঠিক সেই সময় পিছন থেকে আর এক জন স্থূলাঙ্গী মহিলা শশব্যস্তে দু জনকে দু দিকে ঠেলে দিয়ে স-কন্যা গোটা সীটটাই দখল করেছেন।

এতক্ষণে হয়তো এ-হেন আকর্ষণের কারণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনারা। অনেকে অনেক যুক্তি দেখাবেন। কিন্তু একটু ভাবলেই নিজেই আবার সব কটা যুক্তি খণ্ডন করতে পারবেন। যাক, আমি এই ব্যাপারের কার্যকারণ বিস্তার করতে বসি নি। চলতে ফিরতে অনেক সময় যা চোখে পড়ে ভূমিকার আকারে সেটুকুই ব্যক্ত করে নিলাম শুধু। এই চলতে ফিরতেই এক দিন ভারী অন্য রকম কিছু একটু চোখে পড়েছিল।

দক্ষিণ কলিকাতার এক মাথা থেকে উত্তর কলিকাতার অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিয়মিত ডবল-ডেকারের যাত্রী আমি। এর মধ্যে ছুটি-ছাটার বালাই নেই। তবে একটা সুবিধে, ভিড় ঠেলতে হয় না, জায়গা নিয়ে মারামারি করতে হয় না। দ্বি-প্রহরিক যাত্রা এবং নৈশ প্রত্যাবর্তন। ফেরার সময় ডিপো থেকে একটা বাস ছেড়ে পিছনেরটায় উঠে বসলেই হল, আর যাবার সময়ও অঘটন না ঘটলে বসার জায়গা মেলে। শুধু তাই নয়, বরাতে অনেক সময়ই জানালার ধারটাও জোটে।

যাবার পথে সে দিনও জুটেছিল।

জগুবাজারের মোড়ে যে ভদ্রলোকটি উঠলেন, হৃদ্যতা না থাকলেও বহু কাল ধরে তাঁকে চিনি এবং জানি। এক পাড়ায় কাছাকাছি বাড়িতে এক নাগাড়ে দশ-বারো বছর কাটিয়েছি। নাম একটা আছে নিশ্চয়ই কিন্তু পাড়ায় ভদ্রলোক চক্রবর্তী মশাই বলেই পরিচিত। সেখানে চক্রবর্তীর সংখ্যা হয়তো কম নয়, কিন্তু চক্রবর্তী মশাই বলতে শুধু উনিই। বয়স পঞ্চান্নর ওধারে। কোনো মার্চেন্ট অফিসে মোটামুটি ভাল চাকরি করেন। ভবানীপুরে পৈতৃক বাড়ি। ওপরের তলায় নিজেরা থাকেন, নিচের তলাটা ভাড়া। বনেদী জমিদারী মেজাজ—মাসের মধ্যে দু-তিন বার ভাড়াটে তাড়ান অর্থাৎ তাড়াবেন বলে শাসান। কিন্তু কপালগুণে তাঁর এক যুগের ভাড়াটে ভদ্রলোকটি উকিল। বেশি হম্বিতম্বি শুনলে তিনি অমায়িক হেসে বলেন, কোর্টের দরজাটা তো

আর ছোট নয়, সকলেই ঢুকতে পারে—চলে আসুন না—বাড়িতে অশান্তি করে লাভ কি!

কিন্তু পাড়ায় চক্রবর্তী মশাই পরিচিত এবং পরিত্যক্ত তাঁর নিজস্ব মেজাজের কারণে নয়, তাঁর নিজস্ব একটি সন্তানের কারণে। পাঁচ মেয়ের পর ভদ্রলোকের একটি ছেলে। যথারীতি ছেলেটা অমানুষ এবং পাড়া-জ্বালানে। তিন-চার বছর আই-এ ফেল করার পর রক-ক্লাবের মাতব্বর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পায়জামা, হাত-গোটানো ঢোলা পাঞ্জাবি আর হলদে-সবুজ স্পঞ্জ-চপ্পলের কদর বুঝেছে। তার চাল-চলনে পাড়ার আর পাঁচ জন ভদ্রলোকের আপত্তি। তাঁদের ছেলেরা বিগড়োয় আর মেয়েরা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। অনেকেই চক্রবর্তী মশাইযের কাছে সেই আপত্তি পেশ করতে এসে উল্টে তাড়া খেয়ে ফিরে গেছেন। পাড়া ছেড়ে আসার আগে ছেলেটির দিনে দিনে উন্নতি দেখে এসেছি। নালিশ করা দূরে থাক ছেলের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলে তখন সেই ভদ্রলোকেরাই তাকে বাবা ডেকে কৃতার্থ হন।

আমার সঙ্গে চক্রবর্তী মশাইযের না হোক, তাঁর বাড়ির সঙ্গে যোগ একটু ভিন্ন কারণে। নিচের তলার ভাড়াটে ভদ্রলোক, অর্থাৎ পাড়ার যিনি দত্ত-উকিল—তাঁর একটি ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে হাজিরা দিতে হত। ভদ্রলোকের তিনটি মেয়ে শুধু। বড় মেয়েটি ইস্কুলে পড়ত—আমি তাকে পড়াতে যেতুম। ফলে মনে মনে চক্রবর্তী মশাই আমাকেও আধা-শত্রুপক্ষীয় বলে মনে করতেন। কালে আধা নয়, পুরোপুরি শত্রুতাই আমাকে করতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছেলেব সঙ্গে। অথচ আশ্চর্য, ছেলের বাবা অমন ব্যাপারের পরেও ঠিক শত্রু বলে ভাবেন নি আমাকে।

সে-প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। ডবল-ডেকারে আরোহণ করেই চক্রবর্তী মশাই একবার ভিতরের অবস্থাটা দেখে নিলেন বেশ করে। ছুটির দিনের দুপুর, অনেক জায়গাই খালি। তবু মনঃপূত হল না যেন। মুখে বিরক্তির ছায়া। আমার দিকে চোখ পড়তে সে-ভাব কাটল। এগিযে এলেন। দুজনের আসনের পাশের জায়গাটুকু খালি। তবু না বসেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ বসুন—

একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, আপনি এদিকটায় সরে আসুন না, আমি ও-ধারটায় বসি।

ও-ধারটায় অর্থাৎ জানালার ধারটায়। সত্যি কথা বলতে কি, অবাকও হলাম, বিরক্তও হলাম। অবাক হলাম কারণ, এমন অনুরোধ কখনও শুনি নি। বিরক্ত হলাম কারণ, যাব শ্যামবাজার পর্যন্ত—এই দখলটুকু ছাড়তে মন সরে না। বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের অমন বিরস মুখভাবের কারণ বোঝা গেল—জায়গা যতই থাক, জানালার ধার একটিও খালি নেই বটে।

কিন্তু কিছু বলতে বা আপত্তি করতে সঙ্কোচ হল। এদিকে সরে আসতে ভদ্রলোক ভারী খুশি হয়ে ভিতরে ঢুকে ঝপ করে বসে পড়লেন। তাঁর বসার আনন্দে আমাকে আরও আধখানা সরে আসতে হল। বসেই জানালার দিকে দৃষ্টি চালিয়ে নিলেন

একবার। তার পর মুখ না ফিরিয়েই হৃদ্যতা জ্ঞাপন করলেন, ছুটির দিনে চলেছেন কোথায়?

বললাম, আমাদের আর ছুটি কোথায়, সকালে উঠেই তো কাগজ পড়তে চাইবেন।

তা বটে...আপনারা হলেন গুণী লোক।

যে-ভাবে বললেন তার সাদা অর্থ, গুণী লোকের ছুটি-ছাটার দরকার নেই। যা-হোক কিছু বলার জন্যেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, ছুটির দিনে আপনি কোথায়?

শ্যামবাজার, একটু বিশেষ দরকার পড়ে গেল—।

জানালার ধারের আশা ছেড়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললাম। অন্যমনস্ক উদাসীনতায় রাজপথ দেখছেন ভদ্রলোক। এক সময় বললেন, আর তো আসেন-টাসেনও না এদিকে—

সময় হয় না—। আরও একটু ভালমানুষি করলাম, আপনার বাড়ির খবর সব ভাল তো? ছেলে ভাল আছে?

ছেলে আর সকলের যত চক্ষুশূলই হোক, তার কুশল-জিজ্ঞাসায় কোন্ বাপ না খুশি হয়? চক্রবর্তী মশাইয়ের তো আরও খুশি হবার কথা। কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল।

একেবারে গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোক এই প্রথম জানালা থেকে সম্পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। নিরীক্ষণ করে দেখলেন একটু। অস্বস্তিকর দেখা। তারপর আবার জানালার দিকে ফিরে গম্ভীর মুখে ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, ছেলে নেই—।

আমি হকচকিয়ে গেলাম একেবারে। বিমূঢ় খানিকক্ষণ। যেন সুস্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছি না। তার পরেই নিজের হাতের পাঁচটা আঙুলে হঠাৎ বৃশ্চিক দংশন অনুভব করলাম যেন। একটা স্পর্শ যেন হাতের কব্জি থেকে আঙুল পর্যন্ত ঝলসে দিতে লাগল।

যা শুনলাম সে-তো অতি বড় শত্রুও চায় না, এমন হবে জানলে দু বছর আগের সেই কাণ্ডটা ঘটত না...।

ব্যাপারটা ঘটেছিল দত্ত-উকিলের ইস্কুলে-পড়া বড় মেয়েটিকে কেন্দ্র করে—যাকে আমি পড়াতুম। ওপরের ক্লাসে পড়ত, বয়স পনেরো পেরোয় নি তখনও। ঝকমকে শাড়ি পরে বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যেত। নিচের দিকে বিশ-পঁচিশ আর ওপরের দিকের পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের বেশি নম্বর পেত না কোন দিন। ওই নিচের দিকে নম্বরগুলো ওপরের গুলোর কাছাকাছি ঠেলে তোলার চেষ্টায় গলদঘর্ম হতে হত আমাকে। সেই মেয়েরই একদিন পাঠ্য বইয়ের বাইরের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখা গেল। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মাস্টার মশাই, অসবর্ণ মানে কী?

জ্যামিতির সঙ্গে অসবর্ণের কি যোগ না বুঝেই জবাব দিলাম, অসবর্ণ মানে অসমান বর্ণ—

অসমান অর্থ কী?

অসমান অর্থ...এই যেমন ধর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ।

ও...। জ্যামিতির দিকে চোখ রেখেই ছাত্রী ভাবল একটু, তার পরে ঈষৎ অসহিষ্ণু

সুরে বলে উঠল, কিন্তু ব্রাহ্মণের থেকে কায়স্থ ছোট কিসে?

ছোট কে বললে, বর্ণে পৃথক এই পর্যন্ত।

ছাত্রী জ্যামিতির বইএ মন দিল। আমি মনে মনে বিস্মিত এবং নিজের অগোচরে একটু চিন্তিতও।

খানিক বাদে ছাত্রী আবার বলল, আচ্ছা মাস্টার মশাই, গান্ধীজী এই জাতের গোলমালটা তুলে দেবার জন্য এত চেষ্টা করল তবু কিছু হল না, তাই না?

পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে, ইস্কুলে ওই নিয়ে রচনা-টচনা কিছু লিখতে দিয়েছে?

থতমত খেয়ে গিয়ে সে জবাব দিল, না...এমনিই জানতে চাইছিলাম। বলেই পড়ার বইএ মনোযোগ।

ছাত্রীর বর্ণ নিয়ে মাথা ঘামানোর হেতুটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই। রবিবার এক বন্ধুর সঙ্গে লেকে বেড়াচ্ছিলাম। সন্ধ্যার ঘোলাটে আলোয় এক নিরিবিলি কোণে যে দুজন বসে আছে দেখলাম, তাদের এক জন আমার ছাত্রী, দ্বিতীয় জন চক্রবর্তী মশায়ের ছেলে। তাদের অলক্ষ্যে পালিয়ে আসতে হল। ছাত্রীর বাবা অথাৎ দত্ত-উকিলকে জানানো উচিত কি না ভাবতে ভাবতে কটা দিন কেটে গেল।

...আবারও এক দিন বরাত মন্দ তাদের। দুপুর তিনটে নাগাদ কোনো একটা সিনেমা হলএর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ওরা সিনেমায় ঢুকেছে। মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতেই ছাত্রী কাঠ একেবারে। সেটা ছুটির দিন নয়, তার এ-সময়ে ইস্কুলে থাকার কথা। সঙ্গিনীর হঠাৎ দুরবস্থা দেখে ছেলেটিও থমকে তাকালো। আমি ততক্ষণে পাশ কাটিয়ে গেছি।

সেই দিনই দত্ত-উকিলকে জানালাম সব। ভদ্রলোক বাস্তববাদী মানুষ। মেয়েকে কি শাসন বা অনুশাসন করলেন খবর রাখি নে। তবে মেয়ে পড়তে এলো মুখ গোঁজ করে, এবং পড়তে বসে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর তার পরের কটা দিনও মুখ গোঁজ করেই পড়াশুনা সম্পন্ন করল।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ হল না। ঠিক এক সপ্তাহ বাদে দিনের আলোয় আমার পথ আগলে দাঁড়াল দুজন সঙ্গী সহ চক্রবর্তী মশাইয়ের ছেলে।

দাঁড়ান!

থমকে দাঁড়িয়ে গেছি। ছেলে যত বখাটেই হোক, সেই হাফ-প্যান্ট পরা থেকে দেখে আসছি, এ ধরনের সম্ভাষণ ঠিক কল্পনা করি নি। করলে ভাবনার কারণ হত, আর পরে ভাবনার যে কারণ হয় নি তাও বলতে পারি নে।

আপনি জয়ার বাবাকে কি বলেছেন?

তার বন্ধু দুটি গুরুগম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। আর জবাব যে চাইছে সে জবাব নেবে বলে বদ্ধপরিকর হয়েই চাইছে। কিন্তু যে জবাবটা এসে গেল তার জন্য শুধু ওরা কেন, আমিও প্রস্তুত ছিলাম না।

ছেলেটা প্রায় তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে রাস্তার ওপরেই

বসে পড়ল। আমার হাতের পাঁচটা আঙুলই বোধ হয় ওর গালে বসে গেছে। আর এর পরেও মাতব্বরকে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকতে দেখেই হয়ত তার সঙ্গীরাও হতভম্ব।

গন্তব্য পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে আসার পর শুভাশুভ খেয়াল হতে মুষড়ে পড়তে হল। সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে বেশ ঘাবড়েই গেলাম। যা ছেলে আর যা তার দলবল, রাত-বিরেতে মাথা দু ফাঁক করে দেওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু কোন অঘটনই আর ঘটল না। কখনও সামনাসামনি পড়ে গেলে ওই ছেলে মাথা নিচু করে অন্য দিকে সরে গেছে। আরও তাজ্জব ব্যাপার, এর মাত্র দু-তিন দিন পরেই ওই ছেলের বাবা, অর্থাৎ, আমার পাশের এই চক্রবর্তী মশাই আড়ালে ডেকে রীতিমত তোয়াজ করেছেন আমাকে। বলেছেন, ছেলে আপনার ওপর খুব হম্বি-তম্বি করেছিল, আপনি নাকি তাকে অপমান করেছেন—কিন্তু আসলে আপনাকে বিলক্ষণ ভয় করে, বুঝলেন? খুব টিট হয়েছে—আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছেন বুঝি? দেবেন বই কি, যে আপন ভাবে সে-ই শাসন করে—বেশ করেছেন। ...তবে কি জানেন, কোনো কিছুই তো আর এক-তরফা হয় না, ওই দত্ত-উকিলকেও একটু কড়া করে সমঝে দেবেন, সে যেন তার মেয়েকে একটু সামলে রাখে—।

এর পর মাস পাঁচ-ছয় ছিলাম ওই পাড়ায়। কাজেই আর কিছুই খবর রাখি নে।

বাস তখন মধ্য কলকাতা ছাড়িয়ে উত্তর কলকাতার পথ ধরেছে। চক্রবর্তী মশাই সেই একভাবেই বাইরের দিকে ঘাড় গোঁজ করে বসে আছেন। অনেকক্ষণ বাদে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছিল?

কিসের কি হবে?

আপনার ছেলের... ?

কি আবার হবে! তাড়িয়ে দিয়েছি বাড়ি থেকে, স্রেফ জুতিয়ে তাডিয়েছি, বুঝলেন? আমি নাকি শাসন করতে জানি নে!

চক্রবর্তী মশাইয়ের রোষারক্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও একেবারে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। যাক, তবু রক্ষা। হাতের জ্বলুনি যেন কমল এতক্ষণে। কিন্তু চক্রবর্তী মশাই থামলেন না। চাপা গলায় বিড়বিড় করে বলে গেলেন, অমন অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে থাকার থেকে না থাকা ভাল...বিয়ে করেছে, বুঝলেন মশাই, ওই দত্ত-কায়েতের মেয়েটাকে বিয়ে করেছে—রেজেস্ট্রি ম্যারেজ! দিয়েছি দূর দূর করে তাড়িয়ে! এখন ঠেলা সামলা দেখি, মুরোদ কত—বউকে তার কোন্ মাসীর বাড়ি না কোথায় রেখেছে, আর নিজে রাস্তায় রাস্তার ঘুরছে ফ্যা ফ্যা করে। আর সে চেকনাই নেই, বুঝলেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি নিজের চোখে দু-দু'দিন দেখেছি ছেঁড়া জামা জুতো পরে মুখ কালি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে —আরও অনেকে পায়ে হেঁটে তাকে কলকাতার এ-মাথা ও-মাথা চষতে দেখেছে, বুঝলেন?

রাগের মাথায় এবারে জানালার দিকে মুখ করে একেবারে ঘুরে বসলেন চক্রবর্তী মশাই। আর একবারও ফিরে তাকালেন না আমার দিকে। যেন আমিই ওই ছেলের

জন্য সুপারিশ করব, তাই আমার মুখও দেখতে চান না আর।

কিন্তু আমার ধাক্কা খাওয়ার আর একটু বাকী ছিল।

শ্যামবাজার ডিপোয় বাস থামল। এক সঙ্গেই নামলাম দুজনে—আমি আগে তিনি পিছনে। নীরবে বিদায় নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ড ঘেঁষা ফুটপাথ সংলগ্ন পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ওখানে পান খাওয়া নৈমিত্তিক অভ্যাস। পান দিতে বলে ঘুরে তাকিয়ে দেখি দাঁড়ানো-বাসগুলো ঘেঁষে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে চলেছেন চক্রবর্তী মশাই। দুখানা দোতলা বাস ছাড়িয়ে সামনের প্রতীক্ষারত দক্ষিণ কলকাতাগামী ফিরতি বাসখানায় উঠে ব্যস্তসমস্তভাবে একটা জানলার ধার নিয়ে বসলেন তিনি।

আসার সময় রাস্তার যে-ধারটায় বসেছিলেন, এবার তার উল্টোদিকে।

আহ্বান

রীতি জানা না থাকলে ও-ধরনের আহ্বান শুনে হঠাৎ রেগে ওঠাও বিচিত্র নয়।

বন্ধু জানালেন, শুধু অহিংস ভাবে রেগে ওঠা নয়—এই নিয়ে রীতিমত বচসা এমন কি, অনেক সময় ছোটখাট হাতাহাতিও হয়ে যায়। নজির তিনি নিজে। এখানে আসার পরদিনই হোটেলের সামনে একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের কণ্ঠনিঃসৃত ওই ধরনের ইঙ্গিতসূচক ডাক শুনে প্রথমে নাকি ভেবেছিলেন, ভদ্রলোক তাঁর অবাধ্য কুকুরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কুকুর দেখতে না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন কুকুর নয়, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। ব্যস, মাথায় রক্ত চড়তে দেরি হয়নি একটুও—ধরে নিলেন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বাঙালী বলেই এই অবজ্ঞা। অতএব বাঙালীর ঝাঁঝ একটু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই হাত গুটিয়ে এবং চোখ লাল করে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোক হতভম্ব। সময়ে আর দুই-একজনের উপস্থিতির ফলে সে যাত্রা রক্ষা। নয়ত হাতাহাতিই হয়ে যেত আর মুখ লুকোবার জন্য বোম্বাই ছেড়ে পালাতে হত।

উনি বাড়ি খুঁজছেন শুনে ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে বাড়ির হদিস দেবার জন্যে ডেকেছিলেন। বচসা অথবা ততোধিক কিছুর সূচনায় মধ্যস্থতা করার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ও-ভাবে ডাকাটা সর্বজনীন রীতি এখানকার, অপমানসূচক তো নয়ই, বরং কিছুটা হৃদ্যতাসূচক বলা যেতে পারে।

স্-স্! সস্। চ্ চ-চ্ চ! চ্য-চ্য!

জিভ এবং তালুর বিভিন্ন সংযোগে নানা রকমের হিস্‌হিস্ অথবা চুক চুক শব্দ এবং সেই সঙ্গে মৃদু করতালির দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা। চেনা হোক আর

অচেনা হোক, নাম জানা থাক আর না-ই থাক—নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই ভাবেই এখানে একে অপরকে আহ্বান করে থাকেন। এ-ধরনের ডাকে অবজ্ঞা অথবা অবহেলার কোনো ব্যাপার নেই।

বন্ধুর স্ত্রীটি সুরসিকা। এখানকার কলেজ এবং য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী। এই আহ্বান বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটু গবেষণা আছে। হাসতে হাসতে সেটুকু ব্যক্ত করলেন তিনি।—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, এখানকার মেয়েরা সাংঘাতিক প্রেম করতে জানে—

গোড়াতেই বাধা দিতে হল। —সাংঘাতিক প্রেম কি রকম...মারধর নাকি?

বন্ধু নিরীহমুখে টিপ্পনী কাটলেন, প্রায়—। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

মহিলা ভ্রূকুটি করলেন একটু, তারপর হেসে ফেলে বললেন, সাংঘাতিক প্রেম মানে আপনাকে যদি মনে ধরে কারো তাহলে আর সহজে রেহাই নেই আপনার, কারণ তাদেরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই—

দীর্ঘনিঃশ্বাস। —আ-হা! তারপর?

—তারপর এমন আন্তর্জাতিক প্রেমের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানে ক'জন আর ক'জনের নাম ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারে! তাছাডা নাম জানে না অথচ মনে ধরেছে এমনও কম নাকি—কাজেই কুকুর বেড়াল ডাকা গোছের ওইভাবে ডাকাটা এখানকার মেয়েরাই প্রথম বার করেছিল, তাতেই দিব্বি কাজ চলে যেত কিনা—।

আমরা পুরুষোচিত গম্ভীর। মহিলা তাঁব গবেষণার শেষাংশ শেষ করলেন। —তারপর ইস্কুলে-কলেজে পথে-ঘাটে সী-বীচে তাই শুনতে শুনতে এখন ছেলেরাও এই মেয়েলী ডাকটা রপ্ত করে ফেলেছে। ওটা এখানে এখন অফিসিয়াল ডাক-এ দাঁড়িয়ে গেছে।

বন্ধু নিস্পৃহ মুখে স্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। —জ্যু-গার্ডেনের নিরিবিলিতে আধ-বুড়ো প্রোফেসারের ওই অফিসিয়াল ডাক শুনে তোমাকে কেমন দৌড়ে পালাতে হয়েছিল সেই গল্পটাও ওকে বলো।

যাই হোক, এখানকার এই ডাকের রীতিটা বোঝা গেল। মাসখানেকের জন্য আমি বোম্বাই বেড়াতে এসেছি এঁদের অতিথি হয়ে। প্রথম তিন-চারদিনের মধ্যেই এই আহ্বানের রীতিটা আমার চোখে পড়েছে। এমন কি বন্ধুর স্ত্রীকেও এইভাবে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখেছি। আবার বন্ধুকেও দেখেছি তাঁদের ঠিকা ঝিকে এই ভাবে ডাকতে। রাস্তার স্বজন অথবা মুটে-মজুর ডাকার ব্যাপারেও তাই। এই নিয়েই ঘরোয়া আলোচনা এবং বন্ধু-পত্নীর ওই সরস ব্যাখ্যা। নইলে এই ক'দিন এখানকার মেয়েদের সাংঘাতিক প্রেম করার নমুনা চোখে পড়েনি, আর ওই ডাকের গোলযোগেও এ-পর্যন্ত পড়িনি।

যেখানে আছি, সেই জায়গাটার নাম খার। খার ফোর্‌টিন রোড। শহর নয়, শহরতলী বলা যেতে পারে। শহর থেকে ন'মাইল দূরে। কিন্তু কলকাতার শহরতলীর সঙ্গে তুলনা করলে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে। চমৎকার বড় বড় রাস্তা, ঝকঝকে তকতকে বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতে কম্পাউণ্ড, ছোট বড় বাগান।

আমি এখানে এসেছিলাম অসময়ে। অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। আকাশ তখন প্রায় সারাক্ষণই কালো। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি লেগেই আছে। কলকাতার দ্বিগুণ বর্ষা তখন। কিন্তু এরই মধ্যে নেহাৎ মুষলধারে জল না নামলে সকালে বেরুনো বন্ধ হত না আমার। ...সবটাই স্বাস্থ্যের কারণে নয়। আর যে কারণ সেটা টের পেলে বন্ধু এবং বন্ধুর স্ত্রী হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপে বোম্বাই ছাড়া করবেন —সেই ভয়ে আমি সদা শঙ্কিত।

এখানকার মেয়েদের দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সাংঘাতিক প্রেমের নজির চোখে না পড়লেও সাময়িকভাবে আমি নিজেই নিরীহ গোছের একটু প্রেমে পড়েছিলাম। তবে সে প্রেম এক-তরফা এবং কিছুটা নৈসর্গিক।

কিন্তু তার আগে এখানে সকালে বেড়ানোর প্রসঙ্গে একটু বলে নেওয়া দরকার। সকাল মানে কলকাতার সকাল নয়। গ্রীষ্মকালের ছটা সাড়ে ছটায়ও রীতিমত অন্ধকার থাকে। কাজেই সকালে হাওয়া খাওয়াটা খুব চালু নয় এখানে। সকালের ঘুম ভাঙ্গা মেজাজ ঠিক হতে না হতেই ইস্কুল কলেজ বা অফিস-কাছারির তাড়া। বেড়ানোর আড়ম্বর দেখা যায় বিকেলে। পুরুষের বেশবাসে বৈচিত্র্য নেই তেমন, বেশির ভাগই ধোপদুরস্ত ট্রাউজার আর বুশ-শার্ট। মেয়েদের সাজ-পোষাক সদা-শৌখিন। তা সে শাড়ি-ব্লাউজ হোক বা সালোয়ার কামিজ হোক। রঙের সঙ্গে রঙ মেলাবার কৌশল এঁরা ভালই জানেন। কেশে ফুলের বাহার, পায়ে শান্তিনিকেতনী প্যাটার্নের চটি। শান্তিনিকেতনের আর কোনো হাওয়া বোম্বাই পর্যন্ত এসেছে কিনা জানা নেই, কিন্তু চটির হাওয়া যে ভালোমতই এসেছে সেটা এখানকার যে-কোনো ভদ্র পরিবারের মেয়েদের পায়ের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আর কিছু না হোক, তাঁদের এই চপ্পলানুরাগ চোখে পড়বেই।

যাক, সকালে বেড়ানো নিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করেছিলাম। প্রথম দু'তিন দিন বন্ধুকে টেনেটুনে বার করতে হল বীচ-এর পথটা চেনাবার জন্য। মাত্র দেড় মাইল পথ জুহু বীচ। এই জুহু বীচই সম্ভবত এদিকের সব থেকে বড় আকর্ষণ। বন্ধু ঘুম চোখে প্রথম দু'দিন জুহু বীচের শর্টকাট চেনালেন আমাকে। মাঠ আর ধানের ক্ষেত পেরিয়ে নালা টপকে জেলেদের গ্রাম ছাড়িয়ে নারকেল বনের ওধারে অশান্ত সমুদ্রলগ্ন জুহু বীচ। এই শর্ট-কাট করার পর লং কাটের পথ চেনার প্রতি আমার আর কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ এই গ্রাম্য পথের মায়া শহুরে বাঁধানো রাস্তার থেকে অনেক বেশি। আর মারাঠি জেলেদের গ্রাম পেরোবার সময় তো চোখের পাতা পড়ে না। তাদের পরনে বড় বড় রং বেরঙের শৌখিন রুমাল শুধু, অথচ ঊর্ধ্বাঙ্গের বসবাস স্বাভাবিক আধা ভদ্রলোকের মতই। এমন অদ্ভুত বেশ-বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তৃতীয় দিনে বন্ধু পাকা বাঁধানো রাস্তা ধরে বীচ-এ নিয়ে চললেন। খানিক-আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ক্ষেত নালার পথে এগানো অসুবিধা বলেই। খার থেকে বেরিয়ে লিংকিং রোড। এই পথ ধরে সোজা যেতে হবে। আশে-পাশের সব বাড়িগুলোই

সুন্দর। কিন্তু তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি বলে বাড়ি দেখার দিকে মন নেই। তবু একটা বাড়ির দিকে আপনি চোখ গেল। একতলা বাড়ি। চারদিকে কম্পাউণ্ড, সামনে গেট। গেটের গায়ে একটা মস্ত ক্যাকটাস গাছ—চোখে পড়ার মতই। বন্ধুর ইঙ্গিতে সেটা দেখতে গিয়ে দু'চোখ আর একদিকে ছুটল। ঘরে আলো জ্বেলে পড়ছে একটি মেয়ে। জানালার পাশে চেয়ার টেনে এবং রাস্তার দিকে মুখ করে বসে।

বন্ধু বললেন, এত বড় ক্যাকটাস এদিকটায় আর নেই, ফেরার সময় দিনের আলোয় ভালো করে দেখো।

ক্যাকটাসের মর্ম বুঝিনে। সুন্দর দেখলে সুন্দর মনে হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু অত ভোরে পাঠ-নিবিষ্ট মেয়েটিকে একনজর দেখেই বেশ মিষ্টি লাগল। ফেরার পথে ক্যাকটাস গাছটা ভালো করে দেখার কথা। সত্যি সুন্দর এবং সমাদরে রক্ষিত। কিন্তু এবারে বন্ধুর দ্রষ্টব্যও শুধু ক্যাকটাস গাছই নয়। গেটের কাছেই কম্পাউণ্ডের মধ্যে পেতলের রঙের ওপর একটা পোক্ত দোলনা টাঙানো। এখানকার অনেক বাড়িতেই এ-রকম দোলনা দেখেছি। দিনের আলোয় সেই মেয়েটি বই হাতে দোলনায় বসে পড়ছে এখন। শান্তিনিকেতনী প্যাটার্নের বাহারী চপ্পল-পরা পায়ের মৃদু সঞ্চালনে দোলনা দুলছে অল্প-অল্প, রাস্তার দিকে মুখ করে বসা এবারও। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই এক নজর রাস্তা দেখার কাজটাও চলতে পারে বলেই বোধহয়। সুন্দর, সুঠাম চেহারা। পরনে শৌখিন শাড়ি ব্লাউজ। বাঙালী মেয়ের মতই শাড়িটা কুঁচিয়ে পরা। এক হাতে কতকগুলো লাল গালার চুড়ি, অন্য হাতে ঘড়ি। মাথায় তেল বোধ হয় দেয়ই না—শুকনো চুল মাথার উপর খেলা করছে। পরিচ্ছন্ন ফিটফাট, যেন পড়া শেষ হলেই কোথাও বেরুবে।

এবারে আর আমার দেখাটা গোপন করতে হল না। ক্যাকটাসের বদলে দুজনেই হাঁ করে তাকেই দেখেছি। পাও খুব সচল মনে হয় না। সেই নীরব দর্শনের বারতা মেয়েটির কাছে কি করে পৌঁছল জানি না। বই নামিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। সকৌতুক দেখল দু-চার পলক। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল আর পায়ের তাড়নায় দোলনাটা একটু জোরেই দুলিয়ে দিল। সচকিত হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বন্ধু সহাস্যবদনে ভ্রূকুটি করলেন, কি মুশকিল, অমন হাঁ করে দেখে!

কেমন বা কতটা হাঁ করে দেখছিলাম বন্ধুই জানেন। প্রতিবাদ না করে সন্তর্পণে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বই কোলের ওপর রেখে মেয়েটি তখনো এদিকেই চেয়ে চেয়ে দুলছে তেমনি। মুখের কৌতুকাভাস একেবারে মিলায়নি তখনো।

বন্ধু মন্তব্য করলেন, মেয়েটা জ্বালিয়ে মারলে—

কেন?

কেন আবার কি? দেখলে না! আমাদেরই কেমন কেমন করে, ছেলে-ছোকরার দোষ কি! এক সঙ্গে দশটা ছেলেকে ঘোল খাওয়াচ্ছে ওই মেয়ে।

সুদর্শনার সব খবরই রাখেন বন্ধু। নাম, বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ চিনুভাই। তার পরেও কি একটা পদবী বলেছিলেন, সেটা আর স্মরণ নেই। গুজরাটী মেয়ে, মোটামুটি

অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর মেয়ে। শুনলাম, মেয়েটি আর সব দিকে যেমনই হোক, বেশ ভালো ছাত্রী এবং বিজ্ঞানের ছাত্রী। পরে সান্তাক্রুজ স্টেশনে (আধমাইল দূরে) বই-পত্র হাতে তাকে ট্রেন ধরতেও দেখছি।

কিন্তু পরের কথা থাক।

জুহুর পথ চেনানো শেষ করে বন্ধু একাই আমাকে প্রাতর্ভ্রমণে ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু জেলে পাড়ার শর্ট-কাটের রাস্তাটা আমার আর তেমন মনে ধরল না। এক-আধ দিন বিবেকের বিদ্রূপে সেই পথে না গেছি এমন নয়। কিন্তু দিনে দিনে লিংকিং রোডের আকর্ষণটাই বড় হয়ে উঠতে লাগল।

দৃশ্যের তারতম্য নেই। বাইরে যখন আবছা অন্ধকার মেয়েটি তখন ঘরে আলো জ্বেলে জানালার ধারে বসে পড়ে। আর বাইরে আলো হলে দোলনায় বসে। অত ভোরেও প্রায়ই শাড়ি ব্লাউজের নতুন পারিপাট্য দেখা যায়। পায়ের চপ্পলজোড়াও বাহারের। এ-পর্যন্ত সরাসরি দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বহুবার। ফেরার সময় তো বটেই—আলো জ্বালা ঘরের জানালা দিয়েও। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে সরস কৌতুক ছাড়া আর কিছু দেখেছি বলে মনে হয় না। আমি যে নতুন বেড়াতে এসেছি এখানে সেটাও বুঝছে বোধহয়। অন্তত সেই রকমই মনে হয়েছে আমার।

যাবার সময় অত ভোরে রাস্তায় লোক চলাচল দেখি না বড়। মাঝে মাঝে যার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় সে একটি মুচি। অত ভোরে লটবহর নিয়ে বেরোয় কোন্ প্রত্যাশায় সে-ই জানে। আর দেখা হয় দুই একজন ধাঙড় কুলির সঙ্গে। এদেরও ঈষৎ বিস্ময়ে আমাকে লক্ষ্য করতে দেখেছি। অথচ, এত ভোরে বেড়ানো ছাড়া আমাতে আর লক্ষণীয় কি থাকতে পারে, ভেবে পাইনে। এখানে ভোরে ওঠার তাগিদ বোধহয় শুধু মেহনতী মানুষেরই।

আর ওই বিদ্যুৎ চিনুভাইয়ের। যে ভালো ছাত্রী, বিজ্ঞান পড়ে—আবার গুটি দশেক ছেলেকে একসঙ্গে ঘোল খাওয়ায়। শেষের কাজটি দখলে রাখতে হলে সময়ের অভাব হবারই কথা। সেইজন্যেই সম্ভবত সকালে উঠে পড়াশুনার তাড়া। বিদ্যুৎ চিনুভাইকে নিয়ে বন্ধুগৃহে আরো এক-আধদিন কথা উঠেছে এবং তাতে বন্ধুর ঘরনীও সানন্দে যোগ দিয়েছেন। বলেছেন, মেয়েটা ফূর্তি করতে জানে বটে। কিন্তু সব কথার সারমর্ম ভাবতে গেলে কোন মেয়ের পক্ষেই ও ধরনের পরিহাস বাঞ্ছনীয় নয়।

তবু সব মিলিয়ে মেয়েটিকে আমার ভারী মিষ্টি লেগেছে। তার প্রাণ-চঞ্চলতাটুকু ঘনিষ্ঠ মনে হয়েছে। প্রগল্‌ভ মনে হয়নি একবারও, অথচ ওই মেয়েটির নীরব কৌতুকে এক একদিন কম বিব্রত হইনি। কিন্তু সেজন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দায়ী করতে পারি? বৃষ্টি-ঝরা সকালেও ছাতা মাথায় করে বেরিয়েছিলাম কেন? আর বেরিয়েছিলাম যদি, ঠিক ওই বাড়ির কাছাকাছি এসেই গমন মন্থর হয়েছিল কেন? আর কেনই বা দু'চোখ ক্যাকটাস দেখার ওজুহাতে বাতায়ন-বর্তিনীর ঘরের দিকে ছুটেছিল?

বিদ্যুৎ চিনুভাই সেদিন হাতের খোলা বইটা নাকে মুখে চেপে হেসে অস্থির হয়েছিল।

ঠিক করেছিলাম জল পড়ুক, ঝড় উঠুক, আর ছাতা নয়। ফলে জলেভেজা অবস্থায় আর এক দিন ওই বাড়ির সামনের এক গাছতলার আশ্রয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। অবশ্য যে পরিমাণ ভেজা হয়েছে তারপরে আর আশ্রয় গ্রহণের খুব যে সঙ্গত কারণ ছিল তা যদি কেউ না মনে করেন দোষের হবে না। আমি কি আশা করেছিলাম দুরবস্থা দেখে কেউ ডাকবে? না, অতটা আশা করি নি। কিন্তু তা বলে সেই বিড়ম্বিত অবস্থাটা যে কারো আনন্দের কারণ হতে পারে, তাও ভাবিনি। অমন দিনেও প্রাতর্ভ্রমণের ঝোঁক দেখে বই হাতে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটি দেখেছিল খানিকক্ষণ। তারপর হাসি গোপন করার জন্যেই যেন সরে গিয়েছিল জানালার কাছ থেকে।

বন্ধু খুব মিথ্যে বলেননি। এক ছুটির দিনের নির্মেঘ সকালে জুহু বীচএ দেখা গেল তাকে। একা নয়, অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সমাবেশে। সকালে এখানে কেউ সে সময়ে সমুদ্রে চান করে না। কারণ, যেমন ঢেউ, তেমনি ব্রেকার। ওই সমুদ্রে নামার কথা ভাবতেই গা ছমছম করে। কিন্তু বিদ্যুৎ চিনুভাইয়ের অনুরাগীবৃন্দ সুইমিং কস্টিয়ুম পরে সেই অশান্ত সমুদ্রেই স্নানে নেমে গেছে। আর বিদ্যুৎ চিনুভাই একহাতে পরনের শাড়ি সামলে জলঘেঁষে নিরাপদে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল মুখে তাদের সকলের ওপরেই শাসন তর্জন চালাচ্ছে—কেউ যেন দূরে না যায়। মনে হল স্নান-পর্বটা শুধু তাকে খুশি করার জন্যেই।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হেসে ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। হাতের ইশারায় ছেলেগুলোকে উঠে আসতে বলছে। কিন্তু তাদের ওঠার নাম নেই, হুটোপুটি করে চান করছে। সুদর্শনার মিষ্টি অনুশাসন নিষ্ফল। নিরুপায় খুশিভরা মুখে সে আবারও এদিকেই ফিরে তাকালো। হালছাড়া নীবব অভিযোগে যেন বলতে চায়, দেখেছ কাণ্ড—এদের নিয়ে আমি করি কি!

শাঁ শাঁ সামুদ্রিক বাতাসে শুকনো খোলা চুল উড়ছে। হাতের ত্রস্ত শাসনে শাড়ি সামলানো দায়। দৃশ্য ভোলবার নয়। সেই লোভনীয় দৃশ্য দেখে সমুদ্রও বুঝি ঈর্ষান্বিত।

এর পর যথাপূর্বে আরো অনেকবার দেখা হয়েছে। যাবার সময় আলো-জ্বালা ঘরের জানালায়, ফেরার সময় দোলনায়। বিকেলে রাস্তায়ও দেখেছি এক-আধ দিন, সান্তাক্রুজএ দেখেছি। ছুটির দিনের জুহুতে তাকে মনে মনে আশা করেছি, আর, না দেখে একটু নিরাশও হয়তো হয়েছি।

সব কিছু বাদ দিয়ে একদিনের এক ছোট্ট ঘটনা বলে এই নীরব প্রহসন শেষ করা যেতে পারে।

সেদিনের সকালটাও মেঘলা মেঘলা ছিল। ফলে ভোরের আবছা আলোয় তখনো প্রায় রাতের আভাস। ক্যাকটাস গাছ ছাড়িয়ে পরিচিত ঘরের আলো দেখে প্রতিদিনের মতই ভালো লাগল। কিন্তু ঘরটা অতিক্রম করে যাবার আগেই হঠাৎ পা-দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল একেবারে।

—স্-স! সস্! চ্চ-চ্চ। চ্য-চ্য!

জিভ আর তালুর সংযোগে সেই অদ্ভুত ধরনের আহ্বান, আর সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত অথচ মৃদু হাততালির দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা।

আমি বিমূঢ়। এক ঝটকায় জানালা থেকে সরে গিয়ে বিদ্যুৎ চিনুভাই সেই ঘরের মেঝেতেই হুমড়ি খেয়ে কিছু যেন হাতে তুলে নিল। উঠে দাঁড়াতেই দেখি তার হাতে স্যাণ্ডেল-জোড়া। স্যাণ্ডেল হাতে শশব্যস্তে দরজার দিকে দৌড়াল সে।

নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে আমি গেটে এসে দাঁড়িয়েছি। বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসার ব্যস্ততাতেই বোধহয মেয়েটির হাতের একটা স্যাণ্ডেল মাটিতে পড়ে গেল। ত্রস্তে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে কোনদিকে না চেয়ে প্রায় পড়িমরি করে ছুটল গেটের দিকে।

আমি ঘাবড়ে গেছি। ঘাবড়ে গেছি কেন, ভয়ই পেয়ে গেছি। রাত-মেশানো ভোরের অন্ধকারে আমার সঙ্গে চুপিসাড়ে পালাতে চায়? না, এসেই এই স্যাণ্ডেলের দু-ঘা বসিয়ে দেবে! বন্ধুর স্ত্রীর উক্তিও মনে পড়ে, এখানকার মেয়েরা সাংঘাতিক প্রেম করতে জানে।

এই সব ভাবনাই দু-চার মুহূর্তের মধ্যে। বিষম ব্যস্ততায় কাছে এসেই গেট ধরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ের ধাক্কায় মেয়েটা যেন হকচকিয়ে গেল একেবারে। স্যাণ্ডেল হাতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মুখের দিকে। কোনো মেয়ের এমন বিমূঢ় বিস্ময় বোধহয় আর দেখিনি। কিন্তু কযেক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাতে হল। ব্যস্ততা সহকারে প্রায় আমার গা ঘেঁষেই গেট খুলে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকে গেল একজন।

সেই মুচি, বীচএ যাবার পথে যাকে মাঝে মাঝে দেখি।

ভিতরে ঢোকার পর আমাদের দু'জনকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বিস্মিত। একবার আমার দিকে আর একবার নারী-মূর্তির দিকে তাকাতে লাগল। মেয়েটি নির্বাক, আমি হতভম্ব, মুচিটি অবাক।

পর মুহূর্তে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখি মেয়েটির হাতের শৌখিন স্যাণ্ডেল জোড়ার এক পাটির দুটো স্ট্র্যাপ ছেঁড়া।

গেট ছেড়ে সরে এসে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। বীচএর দিকে না গিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকেই ফিরে চলেছি, তাও খেয়াল নেই।

এরপর যে-কদিন ছিলাম, রোজ আর জুহু বীচএ যাইনি। গেলেও জেলে পাড়া দিয়ে শর্ট-কাট করেছি।

অবতরণিকা।

পঞ্চম অঙ্কের পর আর বাকি থাকে কি? কিছুই না। যবনিকা।

অবনীশ মিত্তির বক্সিং ছেড়েছে, আর ক্লাবে আসে না, আড্ডা দেয় না, বন্ধুদেরও খোঁজখবর করে না। অনুচর সহচরেরা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবে কি হল, কি হতে পারে। ঘুরে ফিরে সেই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় তারা—এবারেও নিশ্চয় কোনো মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার।

এবারেও অর্থাৎ অন্য সব বারের মতই। অর্থাৎ, মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার হলে তার এ-ধরনের উপস্থিতি বিরতি এবং বৈরাগ্য আগেও দেখা গেছে। কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই অমন ডাকসাইটে জোয়ান মানুষের ভিতরটা একেবারে ময়দার ডেলার মত হয়ে যায় কি করে অনুগতদের তাও এক বিস্ময়। যেভাবে খুশি ডলে দুমড়ে একাকার করো তখন—সর্বংসহ একেবারে।

—অমুক মেয়েটা তোকে সত্যি ভালোবাসেরে অবনীশ, বা, অমুক মেয়েটাকে নিজের চোখে দেখলাম তোর বাড়ির উল্টোদিকের ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে সেই থেকে আর নাকের ডগা দিয়ে একের পর এক ট্রাম চলে যাচ্ছে—এ-ধরনের কথা তুলে দিয়ে ক্লাবের ছেলেরা তার ঘাড় ভেঙে অনেক চপ-কাটলেট খেয়েছে।

তার অনুপস্থিতিতে এই দুর্বলতা নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে কম আলোচনা হয় না। সঙ্গীদের মধ্যে কবি আছে একজন। সে বলে, লোকটার মধ্যে ভারী এক প্রেমিক মন লুকিয়ে আছে—বক্সিং করলে কি হবে।

মনোবিজ্ঞানীও আছে একজন। অর্থাৎ, অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির ছাত্র ছিল এক কালে। সে বলে, ছেলেবেলা থেকে মা নেই বলেই ও এ-রকম, আমি জানি মা না থাকলে অনেক সময় এমনি হয়।

কিন্তু ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বুড়োদত্ত, অর্থাৎ প্রায়-বৃদ্ধ দত্তমশাই বলেন অন্য কথা। অবনীশের চালচলনে তিনি রীতিমত বিরক্ত। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, বক্সিং-টক্সিং ওর যা হবার হয়ে গেছে, ওর আর কিছু হবে না। কোন্ দিন শুনবে কোন্ মেয়ের পিছনে ঘোরার ফলে হয় জেলে নয় হাসপাতালে পড়ে আছে। মার খেয়ে প্রথমে হাসপাতাল পরে জেল-দুই-ই হতে পারে।

ভবিতব্য এতটাই বিরূপ হবে তা অবশ্য ছেলেরা ভাবে না। তারা জানে, মেয়েদের সঙ্গে হৃদ্যতার ফলে অবনীশ আঘাত পায় বটে, কিন্তু সে-আঘাত তাকে বাইরে থেকে দেয় না কেউ। দিন কতকের উদ্দাম প্রগলভতার পরে হঠাৎ নিজেই একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলে নিস্পৃহ মুখে বলে, দুর...!

তার মানে যা ভেবেছিল তা নয়, যা আশা করেছিল তা নয়। সকলেই নিঃসন্দেহ,

কি ভেবেছিল বা কি আশা করেছিল সেটা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। মনোযন্ত্রের সঙ্গে বাস্তবের তবলাটা শেষ পর্যন্ত মেলে না। তাল কাটে, ছন্দ পতন ঘটে—এই পর্যন্ত।

কিন্তু এক ব্যাপারে দ্বিমত নয় কেউ। ফলাফল যাই হোক মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর কলা কৌশলে অবনীশ মিত্তির সুপটু কারিগর। আর সেই কারিগরিটা স্থূলও নয়, মেয়েলিও নয়। রীতিমত পুরুষকারব্যঞ্জক । যুনিভার্সিটিতে পড়তেই ছেলেদের সঙ্গে বাজী ধরে কত মেয়েকে অপ্রস্তুত করেছে, কত মেয়েকে নাজেহাল করেছে ঠিক নেই। এখন অবশ্য সেই সব ছেলেমানুষির ঝোঁক গেছে। কবিবন্ধু বলে, বক্সিং করুক আর যাই করুক, ভিতরে ভিতরে ওর মধ্যে সূর্যের থেকেও চাঁদের প্রভাব বেশি এখন।

কিন্তু বলাবলির মূল উপলক্ষ চাঁদ-সূর্য নয়। আসল সমস্যা অবনীশ মিত্তিরের এবারের বন্ধুবর্জন এবং বৈরাগ্যটা বড় বেশি এক-টানা দীর্ঘ হযে উঠেছে। বাড়িতে চড়াও হয়েও দেখা মেলে না। মিললেও আসবে কথা দিযে শেষ পর্যন্ত আসে না। বন্ধুদের পক্ষে এত বড় লোকসানটা মুখ বুজে বরদাস্ত করা সহজ নয়। অতএব তারা জটলা করে, আলোচনা করে। সেই একই পুরানো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় শেষে। অর্থাৎ, এবারেও কোন মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবে এবারের ব্যাপারটা জোরালো নিশ্চয়।

সিদ্ধান্তটা নির্ভুল।

প্রথম অঙ্ক।

মিনতি সরকারের সঙ্গে অবনীশ মিত্তিরের প্রথম যোগাযোগ ডবল ডেকার বাস-এ। টাল সামলাতে না পেরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওর গাযের ওপর। অবনীশের দোষ নেই। আবার একেবারে নেই বললেও ঠিক হবে না। চল্‌তি বাস হঠাৎ এত জোরে ব্রেক কষবে কে জানত! সে-দিক থেকে নির্দোষ। কিন্তু মাথার কাছে বড ধরে এগুনো চলত আর তাহলে এ বিভ্রাট ঘটত না। তবু সে দোষও নিজের নয। স্বভাবের। বলিষ্ঠ দেহটা কখনো কিছু আশ্রয করে এগোযনি। দু'পাযের ওপব বেজায আস্থা।

মহিলাটি ধড়-ফড় করে উঠল। অবনীশও। দাঁড়িযে মাথার ওপরের রডটা ধরে ফেলল সে। নারী-মুখে কুঞ্চনরেখা পড়ল গোটা কতক। শুধু বিরক্তিতে নয়, লেগেও থাকবে। কাঁধের আঁচলটা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে তুলে দিয়ে তাকালে।

উঠেই অবনীশ আরক্ত চক্ষুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ড্রাইভারের দিকে। এক চড়ে ওর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে বোধহয়। কিন্তু তার আগেই একজন পথচারীর উদ্দেশে ড্রাইভারের কটূক্তি কানে এলো। ...ওভাবে ব্রেক না কষলে লোকটা চাপা পড়ত হয়ত। দুই চোখে মিনতি নিয়ে রমণী-কটাক্ষের সম্মুখীন হল সে। কিছু বলা উচিত।...কিছুই বলা হল না।

পাঁচ-মিশেলি লোক বাস-এ। কারো ভালো লাগলো। কারো বা লাগলো না। একজনের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। রড ধরে এগুলেই হত, এ তো আর ফুটপাথ নয় যে গট-গট করে হাঁটলেই হল!

মাথার ওপর দু'হাত তুলে এবাঁরে রড ধরেই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল অবনীশ। ঘাড় ফেরালো।

উল্টো দিক থেকে আর একজনের সরস সহানুভূতি শোনা গেল। জবাব দিচ্ছে যেন। —কলকাতার ট্রাম-বাসে চড়তে গেলে এ-রকম হামেশাই হয় মশাই!

আবার ঘাড় ফেরালে অবনীশ। ডাইনে-বাঁয়ে তাকালো নিঃশব্দে। রড-ধরা। দুই নিটোল বাহুর দিকে চোখ গেল অনেকেরই। বাহুদ্বয় রসহানি ঘটালে। আর কোনো সাড়া-শব্দ শোনা গেল না। আড় চোখে মহিলার দিকে তাকালো অবনীশ। একবার নয়, একাধিক বার। প্রতি বারই চোখোচোখি হয়ে গেল। বিরক্তির চিহ্ন গেছে। রমণী কটাক্ষে কৌতুকের আভাস। সহযাত্রীদের মন্তব্যে ওর অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করেই মনে মনে হাসবে বোধ হয়। মনে মনে কেন, প্রকাশ্যেই হাসছে।

অবনীশও লজ্জা পেল। লোকগুলোর কথা শুনে যত রাগই হোক, সত্যিই কি সে মারামারি করত নাকি বাসের মধ্যে? সামনের দিকেই চেয়ে রইল। অফিস-টাইমের বাস, জোর ছুটেছে।... ড্রাইভারটা চালায ভালো। লোকটাকে খুব বাঁচিযেছে। বাস থামছে, লোক নামছে। বাস থামছে, লোক উঠছে। খুব সন্তর্পণে, খুব নিস্পৃহমুখে অবনীশ ফিরে তাকালো একবার। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হল। আচ্ছা মেয়ে তো!

অফিস কোয়ার্টার।

ঝুপ ঝুপ লোক নামতে লাগল। শেষ কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করে আর একজনও নেমে পড়ল টুপ করে। অবনীশের মনে হল অত বড় ডবল-ডেকারটা নিষ্প্রাণ হযে গেল। ধেৎ ছাই, কিছু বলাও হল না। গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। অবনীশ লাফিয়ে নেমে পড়ল।

রাস্তা পার হবার অপেক্ষায ছিল মিনতি সরকার। ওপারেই বিরাট সরকারী অফিস।...এখানেই চাকরি করে তাহলে।

—শুনুন।

ফিরে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ফেলল।

হাসল অবনীশও। —আপনার বোধহয় লেগেছে, কিন্তু আমি নিরপরাধ বুঝতেই পারছেন...তবু মার্জনা চাইছি।

মিনতি সরকার সকৌতুকে নিরীক্ষণ করল তাকে। আপনার নাম কি?

নাম? আমার?..অবনীশ হকচকিয়ে গেল কেমন, নাম বলল।

—ও।...আমি ভেবেছিলাম আপনার নাম ভীম সেন। এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে তরতর করে রাস্তা পার হয়ে অফিসের আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ল সে। আর ফিরেও তাকালো না। যতক্ষণ দেখা যায় তাকে অবনীশ দেখল।

কি দেখল? রূপ? সেটা এমন কিছু নয়। অন্তত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মত তো নয়ই। তাহলে কি? আর কিছু যেন। যা দেখার মত আর দু'চোখ ভরে নেবার মত। কিন্তু কি? অবনীশ ঠিক ঠাওর পেল না কি।

তাড়া ছিল। ফিরতে হল। নইলে ও যা অফিস, কলকাতার এমন লোক নেই বোধহয় যার চেনাশুনা কেউ না কেউ ওখানে কাজ করছে না। হাতে সময় থাকলে অবনীশ একবার নাড়া-চাড়া করে দেখত। বাসনা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

খেলার মাঠ। লোকারণ্য। তবু অবনীশের চোখে পড়েছে। শুধু অবনীশের কেন, অনেকেরই পড়েছে। জনতার তুলনায় এখানে নারীর সংখ্যা যতই হোক, নাম মাত্র। অন্ধকারে আলোর রেখা যেমন চোখে পড়বেই, এদেরও তেমনি চোখ এড়াবার উপায় নেই। এড়াতে চাইছেই বা কে? মিনতি সরকারের দেখতে পাওয়ার কথা নয় অবনীশকে। দেখতে যাতে পায় সেই ব্যবস্থা করল। একে ঠেলে ওকে ফেলে অবনীশ কাছাকাছি পৌঁছুল। কিন্তু আজ বরাত খারাপ বোধহয়। সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভিতরে ঢুকছে। কোনো দিকে হুঁশ নেই! সঙ্গী দু'জন। না, তিন জন। পুরুষ।

লাফালাফি করে তারা গ্যালারীতে উঠে জায়গা দখল করলে। চড়া মাশুলের জায়গা। হুটোপুটি করে দখল করার মত নয়। ওটা আনন্দসূচক। এবারে অবনীশ উঠতে লাগল। ধীরে সুস্থে। রয়ে সয়ে। যেন কোন শাহেনশা' বাদশা' সোপানে সোপানে সিংহাসনে উঠছেন। দুই চোখ রমণীমুখের উপর সংবদ্ধ। স্থির একাগ্র। পাশ করার তাগিদে ফেল করা ছেলে যেমন একাগ্রতায় সামনের ছেলের খাতা দেখে চেয়ে চেয়ে। মিনতির এবারে না দেখে উপায় নেই। দেখল। খেয়াল করল না। আবার দেখল। খেয়াল করল। ভুরু কোঁচকালো। মনে পড়ছে না। ...মনে পড়েছে। হেসে ফেলেছিল প্রায়। হাসি চেপে এবারে না দেখার ভান করল।

ওদের পিছনের গ্যালারীতে জায়গা নিল অবনীশ। পিছনের দিকে না ফিরেই মিনতি তার অবস্থান অনুমান করে নিল। কে হারবে কে জিতবে, তাই নিয়ে সাড়ম্বর গবেষণায় মেতেছে ওর সঙ্গীরা। হর্ষোৎফুল্ল বিবাদ শুরু হল তাদের মধ্যে। একজন বলল, আচ্ছা, লেডি'র মত কি আগে শুনি।

লেডি বলল, টস্ হোক।

রাইট, সমর্থন করল একজন, টস্ হোক!

তাড়াতাড়ি পার্স খুলে একজন একটা আধুলি গুঁজে দিলে মিনতির হাতে। সঙ্গীরা তিনজন একই টিমের সমর্থক। আধুলি হাতে নিয়ে মিনতি রায় দিল, হেড জিত, টেল হার। বলার সঙ্গে সঙ্গে আধুলিটা টং করে ছুঁড়ে দিল শূন্যের ওপর, কিন্তু ফিরে আর সেটা ধরতে পারল না, হাত ফসকে কোলের কাছে পড়ল, সেখান থেকে গ্যালারীর ফাঁক দিয়ে একেবারে নিচে। পড়ন্ত আধুলি ধরবার জন্য মিনতির ব্যর্থ চেষ্টাটুকুও নয়নাভিরাম। পড়েই গেল যখন, খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল—ঠিক

হয়েছে, খেলায় হারও হবে না, জিতও হবে না, ড্র হবে।

খেলা শুরু হল। খেলা দেখা মাথায় উঠল অবনীশের। ওদের আনন্দমুখর হাসি-চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার ওধারে বড় একটা চোখ যায় না। আজ যেন সুস্পষ্ট হল অবনীশের, রূপ ছাড়াও সেদিন চেয়ে চেয়ে কি দেখছিল সে। প্রাণপ্রাচুর্য।

হাফ টাইম।

এক পশলা ঝড় হয়ে গেল যেন। দর্শকরা অনেকেই ঝুপঝাপ নামতে লাগল। মিনতির সঙ্গীদের দু'জন তাড়াতাড়ি চলে গেল পরিচিত খেলোয়াড়দের ওপর ফোঁপরদালালি করতে। তারা শুধুই সমর্থক নয় বোধহয়। তৃতীয় সঙ্গীর দিকে চেয়ে মিনতি বলল, চীনেবাদাম নিয়ে আসুন মিঃ দত্ত, বেশ দেখে-শুনে টাটকা দেখে আনবেন, শুকনো বাসি না হয়।

কৃতার্থ হয়ে মিঃ দত্ত চলল টাটকা চীনেবাদাম আনতে। মিনতি ঘুরে বসল প্রায়। নীরব হাসিতে দু'চোখ ভরা। মুখে কিছু বলল না।

চিনতে পেরেছেন তাহলে? অবনীশ জিজ্ঞাসা করল।

পেরেছি, এখনো গায়ের ব্যথা মরেনি। সেদিন চ্যাপটা হয়ে গেছি, এখানে যদি ঘাড়ে পড়েন তাহলে রক্ষা নেই, একেবারে আলুর দম হয়ে যাব।

এখানে তো ড্রাইভার নেই, ব্রেক কষছে কে?

নেই? ছদ্ম বিস্ময়। —নেই যদি তাহলে এত বড় মাঠ আর এত লোকের মধ্যে আপনি ঠিক এইখানটিতে এসে বসলেন কি করে?

অবনীশ সজোরে হেসে উঠল। পরম আনন্দে হার মানল সে। সময় বেশি নেই জানে। এক্ষুনি চীনেবাদাম এসে পড়বে। বলল, আমি তো ভীম সেন, আপনার নাম কি?

গলা খাটো করে মিনতি জবাব দিল, সূর্পণখা।

নাক তো আছে দেখছি।

যেতে কতক্ষণ। নাম মিনতি সরকার। নাম জেনে কি করবেন?

অবনীশ মনে মনে বলল, জপ করব। মুখে বললে, আপনাদের আপিসে প্রায়ই যাই, বন্ধু-বান্ধব আছে—

সত্যি কথা নয়। সচরাচর সত্যি কথাই বলে থাকে অবনীশ। কিন্তু এ-সময় এ-রকম মিছে কথা বলাটা দোষের নয়। কিন্তু মিনতি সরকার ওকে নিরাশ করল। —আপিসে আমি একদম দুষ্প্রাপ্য।

খুব ব্যস্ত থাকেন?

খু-উ-ব।

অবনীশ ফিরে কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। চীনেবাদাম এসে গেল। এ দিকে মাঠে হুইস্‌লও বেজে উঠল। আর, যথাপূর্ব অপরিচিতার মূর্তি ধারণ করল মিনতি।

খেলা শুরু হল। পূর্বদৃশ্যের পুনরাবর্তন।

খেলা ভাঙল। সঙ্গীদের উল্লাস ধরে না। জিতেছে। মিনতির পূর্ব-ভাষণ ঠিক হয়নি।

আবার মাঠ-ভেঙে যাবার তাড়া। অবনীশ অনুসরণ করছে। মিনতি ফিরে দেখল একবার। অবনীশ জানত না এমন নিরাশ হতে হবে। পথের ধারে প্রতীক্ষমাণ একখানা ঝকঝকে গাড়িতে উঠে চার মূর্তি চোখের আড়াল হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবনীশ আপন মনে রোমন্থন করতে লাগল কি । ভালো লাগছে। এত ভালো শিগগীর লাগেনি। সকাল বেলার এক গণ্ডা কাঁচা ডিম আর পেস্তা-বাদাম মেশানো জামবাটি-ভরা দুধের থেকে ভালো। বার্বেল-মুগুরের থেকেও ভালো। ওই চোখ আর ওই ঝিকিমিকি দাঁত আর ওই সব কিছু। এ ভালোর আবেদন ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন।

তৃতীয় অঙ্ক।

সেই সরকারী অফিসে সত্যিই এসে হানা দিল অবনীশ। একজন পুরনো বন্ধুকে খুঁজেও বার করল। বন্ধু অফিসের ক্যান্টিনে এনে বসালো তাকে। অসময়ে ক্যান্টিন ফাঁকা। ভণিতা বাদ দিয়ে সরাসরি মিনতি-প্রসঙ্গে চলে এলো অবনীশ। সমাচার শুনে বন্ধু বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল, বাসের ড্রাইভার ব্যাটাচ্ছেলে একটা পথের লোককে বাঁচতে গিয়ে তোমায় মেরেছে দেখেছি। কিন্তু ভাই, তোমার মায়ের পুণ্যি যে একেবারে মরবার আগে আমার কাছে এসেছ—এবার কেটে পড়ো।

কতটা কি জানো, বলে ফ্যালো জ্যাঠামশাই।

বন্ধু ফোঁস করে আর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। —কিছুই জানিনে ভাই, কুমারী কি বিধবা কি সধবা কিচ্ছু না।

তার জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, ওটুকু আমিই জানি। বিধবা হলে সাজ-পোষাক চাল-চলন অন্য রকম হত, সধবা হলে সিঁথির সিঁদুর চোখে পড়ত।

বন্ধু মুখের দিকে চেয়ে রইল। মা যেমন ধাড়ী ছেলের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে সময় সময় চেয়ে থাকে। তারপর বলল, তোমার জানার বাইরেও স্বর্গে-মর্তে অনেক কিছু ঘটে বুড়ো-কার্তিক। যাদের কথা বলছি, তারা তোমার ঠাকুমা নয় যে সাজ-পোষাক চাল-চলন দেখে বিধবা কিনা বুঝবে। আর অনেক মেয়েরও আজ-কাল সিঁদুর দেখতে হলে মাইক্রোসকোপ লাগে। যাক, এত দিন কিছু না জেনে চোখ-কান বুজে পড়েছিলাম, যদি বলো তো এখন থেকে জানতে শুরু করি।

অবনীশ একাগ্র দৃষ্টিতে তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। যদি না-ই জানো তখন ও কথা বলছিলে কেন?

কোন কথা? মায়ের পুণ্যিতে বেঁচেছ? মিথ্যে বলিনি। সে ভাবে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জানি। এ আপিসে যে মিনতি সরকার, সেই প্রণতি মিত্র, সেই সুমতি ঘোষ—সব এক—এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়—এক ভাতে হাঁড়ির ভাত চেনে পাকা রাঁধুনী। নাকের ডগায় চশমা এঁটে এগারো বছর এখানে কলম ঘষ্টাচ্ছি বন্ধু, ভালো পরামর্শ দিই, কেটে পড়ো।

মনে মনে তাকে জাহান্নমে পাঠালো অবনীশ। কিন্তু মাথা গরম করতে আসেনি

এখানে। কথায় কথায় মেয়েদের ওপর তার রাগের কারণ আঁচ করল। এগারো বছরেও তার প্রমোশন জোটেনি অথচ অনেক মেয়ে পিছন থেকে এসে দিব্বি টপকে গেছে। অবনীশ আশ্বস্ত হল। কেরানীর জীবনে একটা প্রমোশন এতই বড় যে সেটা না পেয়ে রসকস তো গেছেই, মেয়ে জাতটার ওপর পর্যন্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছে।

বাড়ির ঠিকানাটি সংগ্রহ করে দিতে বলে অবনীশ উঠে পড়ল। একবার লোভ হল দেখা করে যায়। কিন্তু থাকগে। অত গরজ ভালো নয়। দেখা যখন খুশি হতে পারে, অফিসের পথে, ছুটির সময়, যখন খুশি—কে তাকে আটকাচ্ছে।

কিন্তু চোখের বার তো মনের বার। দিনকতক নিজের কতকগুলি কাজে জড়িয়ে থেকে অবনীশের চোখের ঘোর খানিকটা স্তিমিত হয়ে এলো। হচ্ছে হবে করে আরো কিছু দিন কেটে গেলো। ভোলেনি, আগ্রহও আছে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে ফেলার মত উষ্ণতা গেছে।

গেছে? অলক্ষ্য দেবতা হেসেছেন বোধহয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

ট্রাম একেবারে ডিপোয় এসে থামতে অবনীশ নামল আর অপ্রত্যাশিত আনন্দে একেবারে ডগমগিযে উঠল। রাস্তার ওপরে চুপচাপ দাঁডিযে আছে যে মেয়েটি সে মিনতি সরকার। দৃষ্টি সামনের অপ্রসর রাস্তার দিকে।

নমস্কার, আবার দেখা হল।

একটু যেন চমকে উঠে ফিরে তাকালো সে, পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বাভাবিক হাসি টেনে আনল মুখে। —ও আপনি...এদিকে কোথায়?

এদিকে ঠিক নয়, উল্টো দিকে যাবার কথা। আপনাকে দেখে এলাম।

মিনতি সরকার হাসল। কিন্তু অবনীশের মনে হল হাসিটা ঠিক তেমন করে ফুটল না। যেন শুকনো মুখ। সাগ্রহে বলল, এলেন যখন খানিকটা এগিয়ে দেবেন চলুন।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন?

ঈষৎ হেসে জবাব দিল, সঙ্গী খুঁজছিলুম, চলুন—

হেঁয়ালীর মত লাগছে অবনীশের। সেই অপরিসর রাস্তা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলল। একটু জোরেই হাঁটছে মিনতি। পিছনে ফিরে তাকালো একবার। পরে অনেকটা যেন কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলল, রাস্তাটা খুব ভালো নয় কি না, তাই...।

অবনীশ অবাক। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন বটে, কিন্তু সন্ধ্যা না হতে কলকাতা শহরে ভয় পাবার মত কিছুই নয়। বলল, এ পথে রোজ যাতায়াত করেন, ভয়টা কিসের? রোজই সঙ্গীর আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন নাকি?

মিনতি প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারলে বাঁচে যেন। বলল, রোজ নয় এই দিনকতক একটু একটু ভয় করছে। চট্ করে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিল। চকিত দৃষ্টি। পরে হাল্কা অভিযোগ করল, আপনি ভারী নবাবি-চালে হাঁটেন তো?

নিজের অজ্ঞাতে অবনীশও ঘাড় ফিরিয়েছে। কিছুই চোখে পড়েনি। দু'চার জন

লোক আসছে-যাচ্ছে এই পর্যন্ত। কেমন খাপছাড়া লাগছে অবনীশের। কথা জমল না, হাসি জমল না। এক একবার তার দিকে চেয়ে কথা বলার ছলে মিনতি একটু পরে পরেই পিছনের দিকে দৃষ্টি রাখছে যেন।

অবনীশ সরাসরি ঘুরে দাঁড়াল এবার। হ্যাঁ, চোখে পড়েছে। রুক্ষ পরুষাকৃতি একটা লোক সেই থেকে পিছন পিছন আসছে বটে। চোখ দু'টোও তাদের দিকেই আটকে আছে।

ও কি, থামলেন কেন? আসুন—!

আপনার ভয়ের কারণটা বুঝেছি, দাঁড়িয়ে মজা দেখুন।

তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল মিনতি, কিছু মজা দেখতে হবে না, শিগগীর আসুন, নয়ত চললাম আমি—!

অবনীশের মনে হল মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে মিনতির। চলতে চলতে বলল, দাঁড়ালেন না কেন? এই করেই তো এরা প্রশ্রয় পায়।

মিনতি প্রায় রুক্ষস্বরে জবাব দিল, আপনার গায়ে জোর খুব বোঝা গেছে, চলুন—রাস্তায় এ-সব ভালো লাগে না আমার।

অবনীশ হেসে উঠল। এ মেয়ে এমন ভীতু কে জানত! সে সঙ্গে আছে তবু ভরসা পেয়ে উঠছে না। চলতে চলতেই আর একবার ঘুরে দেখে নিল অবনীশ। মিনতির তাড়ায় দ্রুত হাঁটছে বলেই লোকটা কিছু পিছনে পড়ে গেছে নইলে ধীর পায়ে সেও আসছে ঠিকই।

বাড়ির গায়ে এসে মিনতি দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ি ঠিক নয়, সর্বাঙ্গের ছাল-চামড়া ছাড়ানো, হাড়গোড় বার-করা একটা ভগ্নপ্রায় কাঠামো। বলল, খুব কষ্ট দিলুম আপনাকে, মনে মনে নিশ্চয় রাগ করেছেন—আর আটকাবো না, একদিন অফিসে আসুন...বেলা একটা থেকে দু'টোর মধ্যে যে কোনো দিন, কেমন? আচ্ছা নমস্কার—।

দড়ি-বাঁধা বাঁশের গেট্ সরিয়ে মিনতি প্রস্থান করল। অবনীশ দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত। বাড়ি পর্যন্ত ডেকে এনে এ-রকম অভ্যর্থনা কল্পনাতীত। এতক্ষণের রোমাঞ্চকর আমেজটুকু হঠাৎ যেন ধুয়ে-মুছে গেল। এ রকম করল কেন? একবার ভাবল, তার সঙ্গে কি-ই বা আলাপ, কতটুকুই বা পরিচয় যে আদর-যত্ন করে বাড়ি এনে বসাবে। কিন্তু মন থেকে সায় পেল না। এ যেন বাসএর সেই মেয়েটি নয়। খেলার মাঠের তো নয়ই।

পায়ে পায়ে ফিরতে লাগল অবনীশ। খানিকটা আসতেই পা থেমে গেল। ...সেই লোকটা। পথের একধারে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। অবনীশকে দেখা মাত্র লোকটা যেন দুই চক্ষু দিয়ে গ্রাস করতে লাগল তাকে। অবনীশের খেয়াল হল, এরই জন্য অমন ভয়-চকিত দিশেহারা অবস্থা মেয়েটার। ট্রাম থেকে নেমে ভয়ে বাড়ি আসতে পারে না পর্যন্ত। সমস্ত রক্ত টগবগিয়ে উঠল অবনীশের। সোজা সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা-ভরা রুক্ষ লম্বা লম্বা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোটরগত চক্ষু আধময়লা, জামা-কাপড়, মুখে বিড়ি।

কি মতলব?

বিড়ি ফেলে লোকটা জিঘাংসু দৃষ্টিতে তাকালো শুধু, জবাব দিল না।

এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

খুশি। এটা সরকারী রাস্তা।

মেয়ে-ছেলের পিছু নিয়েছ কেন?

লোকটার দুই চোখে কুৎসিত বিদ্রূপের ছায়া পড়ল। জবাব দিল, আমি কেন, সবাই তো তাই নেয় দেখছি।

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে এত বড় দেহটা তার কাটা কলাগাছের মত উল্টো মাটির ওপর থুবড়ে পড়ল। কিন্তু অবনীশের তখন কাণ্ডজ্ঞান নেই আর। ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে তাকে তুললো খানিকটা, আবার মারল। আবারও।

হাত-পা ছড়িয়ে নিস্পন্দের মত পড়ে রইল লোকটা। জনাকতক পথচারী দৌড়ে এসেছে ততক্ষণে। অবনীশ সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল তাদের। শুনে কেউ বলল, আরো দিন না আচ্ছা করে দু'ঘা। কেউ বললে, পুলিসে দিন।

অবনীশ দেখল নাখ-মুখ দিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে লোকটার। সামনের কয়েকটা দাঁত একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে বোধহয়। এক হাতে করে অন্য হাতের মুঠোটা ঘষতে লাগল অবনীশ, ওর দাঁতে লেগে হাড়ের উপরকার চামড়া কেটে গেছে। বলল, কিছু করতে হবে না, এইতেই শিক্ষা হবে'খন।

কি ভেবে আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে চলল মিনতির বাসগৃহের দিকে। বার দুই ডাকাডাকি করতে মিনতি বেরিয়ে এলো। সবিস্ময়ে বলল, কি ব্যাপার, আপনি যাননি এখনো। সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

—না দাঁড়িয়ে থাকব কেন, আবার এলাম। বাড়িতে একটু আয়োডিন-টায়োডিন থাকে তো দিন, লোকটার দাঁতে লেগে চামড়া উঠে গেছে।

বিমূঢ় নেত্রে মিনতি তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অবনীশ বলল, আর বোধহয় ও লোকটা আপনাকে ফলো করবে না, গুটি তিনেক দাঁত তো গেছেই, আর যা গেছে তারও জের সামলাতে—

বাধা দিয়ে মিনতি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল প্রায়, আপনি ওঁকে মারলেন নাকি?

অবনীশ ঘাবড়ে গেল হঠাৎ। মুহূর্তে এত কাতরতা আর বুঝি কখনো দেখেনি। কিন্তু চট্ করে খানিকটা অন্তত সামলে নিল মিনতি। সহজ ভাবেই বলতে চেষ্টা করল, আয়োডিন...আয়োডিন তো ঘরে নেই। কোনো ডিসপেনসারী থেকে লাগিয়ে নিন... যান, আর দেরি করবেন না।

চলে গেল। নিষ্প্রাণ, নিঃসাড়।

পথের উপর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল অবনীশ। কতক্ষণ ঠিক নেই। আস্তে আস্তে ফিরে চলল আবার। সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে।

লোকটাকে সেই জায়গায় দেখতে পেল না। এরই মধ্যে উঠে গেছে। কঠিন প্রাণ তো! আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল তাকে। কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে টলতে

টলতে চলেছে। আস্তে আস্তে হেঁটেও নিঃশব্দে তার পাশে এসে পৌঁছলো অবনীশ।

লোকটা ঘাড় ফেরালো। চিনল। থেমে গেল। দু'চোখ টান করে তাকালো। শ্রান্তকণ্ঠে বলল, আবার মারবে?

কথা বলতেই বীভৎস দেখালো দাঁত-ভাঙ্গা রক্তাক্ত মুখ। শুধু তাই নয়। আবছা অন্ধকারেও অবনীশ দেখল কোটারগত দু'টো চোখ জলে ভরে আছে। হঠাৎ যেন মুগুরের ঘা লাগল অবনীশের বুকে। মনে হল, দেহের নয়, অন্তস্তলের কোনো ব্যথা বুঝি নিঃশেষে গলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওই দু'টো চোখ দিয়ে, কিন্তু পারছে না।

পঞ্চম অঙ্ক।

একখানি সচল ছবি দেখছে অবনীশ। মর্মছেঁড়া অভিশপ্ত এক অচল-জীবনের ছবি।

বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় পায়ে পায়ে ঘা খাচ্ছে বিধু সরকার। ওকালতি ছেড়ে ব্যবসায় নামল, ব্যবসায় ডুবে ইস্কুল মাস্টারীতে। আজীবন সফলতার স্বপ্নটাই শুধু বড় করে দেখেছে। শক্তি কিছু অর্জন করেনি। দিবা-রাত্র এক ব্যর্থতার কবরের মধ্যে মাথা খোঁড়ে। ঘরে বিধবা মা, বিকলাঙ্গ ভাই, আর বুকের কাছের আর একজন। বিধু সরকার ভাবে। ভাবনা দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে। আবার ভেবে ভেবেই অন্ধকার দেখে।

মিনতি জানালো সে চাকরি করবে।

চাকরি! বিধু সরকার অবাক। চাকরি দিচ্ছে কে? ওই তো আই-এ পাস বিদ্যে। কত ছড়াছড়ি যাচ্ছে—

—চেষ্টা করতে হবে, ঘরে বসে থাকলে কে আবার দেবে?

চেষ্টা চলল। বিধু সরকার অবাক হয়ে দেখল, মিনতি চাকরি জুটিয়েছে। যেমন-তেমন নয়, তার দেড়গুণ মাইনে।

—বলো কী, চেহারা দেখেই নাকি?

মিনতি ভ্রূভঙ্গি করে তেমনি জবাব দেয়, বোঝো তো সবই দেখি—।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। বিধু সরকার তেমনি আছে। কিন্তু তার ভাবনা এখন অন্য খাতে বইছে। মিনতির চালচলন সাজসজ্জা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। নিজেই বোঝে বিধু সরকার, দিনরাত বাড়ি থাকতে হত আগে, এখন বাইরে কাটাতে হয় ন'দশ ঘণ্টা করে—না বদলে উপায় কি! তবু কি এক ব্যবধান যেন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে তাদের মধ্যে মনে হয়, ওর কপালের আর সীমন্তের সিঁদুরও যেন নিপুণ প্রসাধনে ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে আসছে। ওদিকে বাড়িতে মা-ভাইয়ের কাছে তার কদর বাড়ছেই। বিধু সরকারের ওপর আর আস্থা নেই কারো, সপ্তাহের মধ্যে ইস্কুল কামাই তো লেগেই আছে, ক'দিন চাকরি থাকে ঠিক কি!

দিন যায়।

মিনতি সেদিন অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও যেতে দেরি করছে কেন বুঝতে

পারল না। আজ যেন মেজাজটা একটু ভালো আছে বিধু সরকারের। লক্ষ্য করে দেখল সুন্দর দেখাচ্ছে মিনতিকে। শাড়িটা বোধহয় নতুন কিনেছে। হাসি পেল। চাকরি বাকরির বাজার ভালো না। শুনেছিল অফিসে ছাঁটাইয়েব প্রসঙ্গ উঠেছে নাকি। ...তা চাকরি রাখতে গেলে...ক্ষতি কি ভালোই তো...যখন যেমন, তখন তেমন। কিন্তু মিনতির চেহারা এতটা ফিরেছে এ যেন চোখের সামনে দেখেও ঠিক খেয়াল করেনি।

দেরি করছ কেন, সময় হয়নি?

হয়েছে, মিনতি সাগ্রহে এগিয়ে এলো দু'পা। কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ আজ?

আমি! কেন ভালোই তো আছি, কি হযেছে আমার?

কিছু না। একজন ডাক্তারকে খবর দিযেছি, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তোমার, একবার দেখে যাক। এক্ষুনি এসে পডবেন।

বিধু সরকার অবাক। বিগত ক'টা দিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কই কিছু তো মনে পডছে না? একটানা দীর্ঘ সময় ঘুমিযে ওঠার পর যেমন লাগে তেমনি সর্বাঙ্গে একটা অবসাদ শুধু। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো সে।

কিন্তু মিনতি অন্য দিকে চেযে রইল। ইচ্ছে কবেই। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। বিধু সরকার কান পাতল, কি কথাবার্তা হচ্ছে? শুনতে পেল না। ডাক্তার এলেন এ-ঘরে, নামমাত্র পরীক্ষা করলেন। কথাই বললেন বেশি। দার্শনিক গোছেব কথা আব উপদেশ। আবার পাশের ঘবে ওঠে গেলেন প্রেসকৃপশান লিখতে। সন্তর্পণে উঠল বিধু সরকাবও। দরজাব আডালে দাঁড়িযে কান পাতল।...শুনতে পাচ্ছে।

ডাক্তার বিদায নেবার আগেই স্বস্থানে ফিরে এলো আবার। হাসি পাচ্ছে। যেমন ডাক্তার, তেমন এরা! মিনতি এলো। মুখ শুকনো। মাযের আকুতিও একটু আগে শুনেছে বিধু সরকার। ইচ্ছে হল হা হা কবে হেসে ওঠে সকলের ভযটা ভেঙ্গে দেয়। পারল না।...ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মিনতিকে। এতো সুন্দর ছিল কি...।

এবার যাচ্ছ?

যাব না বলছ? মিনতি ফিরে জিজ্ঞাসা করল।

একটা দুরন্ত বাসনা সবলে মনের মধ্যে গুঁড়িয়ে দিল বিধু সরকার। চেয়ে রইল। মিনতি বুঝল বোধহয়। ঈষৎ হেসে বলল, সময়টা ভালো না, না যাওয়া ঠিক হবে না, তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করব'খন, কেমন?

চলে গেল। বুকের ভিতরটা যেন খালি হয়ে গেল বিধু সরকারের।

...ছাঁটাই সুরু হয়েছে। মিনতি চিন্তিত। মা-ভাইও। দু' বছরও হযনি চাকরির। কি জানি কি হয়। তবে মিনতি মুখে আশ্বাস দিয়েছে তাদের। কিছু ভেবো না, চাকরি যাওযা অত সোজা নয়।

বিধু সরকারের মনে হল ওর সাজগোজ প্রসাধন যেন আরো বেড়েছে। সকাল সকাল বেরোয়, রাত হয় ফিরতে। স্বামীর অসুখের ভাবনাটাও আপাতত ধামা চাপা পড়ে গেছে। বিধু সরকার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওকে। মিনতি অনেকটা বিরক্ত হয়েই এড়িয়ে যায় তাকে। ব্যবধান বাড়ে। দিন রাত কিসেব একটা আগুন জ্বলতে থাকে

বিধু সরকারের মাথায়।

রাত্রিতে সেদিন ভয় পেলো মিনতি।

নিশুতি রাত্রি। ঘুম ভেঙ্গে দেখে ঘরে আলো জ্বলছে। বিধু সরকার নির্নিমেষে দেখছে তাকে। চিরে চিরে। বিশ্লেষণ করে। কিন্তু অত ভয় পেল কেন মিনতি? বিধু সরকারের চোখে কি দেখেছে? বিধু সরকারও জানে না।

পরদিনও তাই হল।

মিনতি ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তার পরদিনও। মিনতি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

ভোর হতে শোনা গেল মিনতি দিন কতক ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে থাকবে। সেখান থেকে চাকরি করবে। শাশুড়ীর অত চোখের জল, অত অনুনয় ব্যর্থ হল। অনেক দিন পরে আবার যেন তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল বিধু সরকার। শুকনো পাংশু মূর্তি —যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। হঠাৎ হাসল কেন বিধু সরকার? মনে নেই কেন। বিষম হাসি। বেদম হাসি।

তারপর কোথা দিয়ে কি ঘটেছে বিধু সরকারের মনে নেই। হঠাৎ একদিন দেখে, এক বিচিত্র পরিবেশে এসেছে সে। সেখানে তার মা নেই, বিকলাঙ্গ ভাইও নেই। মিনতি তো নেই-ই। কিন্তু অনেক সব অদ্ভুত অদ্ভুত লোক আছে। পবে বুঝেছে। আরো পরে জেনেছে, মিনতি তার অফিসেব কার মারফৎ আর পাঁচজনকে ধরেপড়ে এই ব্যবস্থা করেছে। ...মায়ের মুখেই শুনেছিল বোধহয়। তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ভাইয়ের বাড়ি থেকে মিনতি আর ফেরেনি বটে, কিন্তু এ সংসাবের খরচা এতকাল সে-ই চালিয়ে আসছে।

এত কাল? কত কাল? বিধু সরকার কত দিন ধরে আছে এখানে? এক বছর? দু'বছর? কি জানি, মনে নেই।

এই দিন কতক ছাড়া পেয়েছে। সে নাকি ভালো হয়ে গেছে কিন্তু কি হয়েছিল তার? কিছু যদি হয়েও থাকে, ভালো যে হয়ে গেছে এ-কথা মিনতি বিশ্বাস করে না কেন এখনো? কেন ভয় পায় তাকে দেখলে? কেন ফিরে আসে না? মিনতিকে হারিয়ে সে বাঁচবে কি করে? কেমন করে বাঁচবে বিধু সরকার?

নিঝুম রাত্রি।

এক সময় সম্বিৎ ফিরতে অবনীশ দেখল, ডেক-চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে লোকটা বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। মাথার ওপরে একটানা পাখা ঘুরছে বন বন করে। ঘরের সবুজ আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে লোকটার মুখ। সেই রক্ত পড়াটা একেবারে বন্ধ করতে পারল না অবনীশ। কষ বেয়ে আবার খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে এসে মিশছে। আরক-ভেজানো তুলোয় সন্তর্পণে মুছে দিল। জানালার কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াল তারপর।

...পঞ্চম অঙ্কের পর আর বাকি থাকে কি।

কিছু না।

যবনিকা।

বাইরের থেকে দ্বীপে এলে বাঙালীবাবুরা অন্তত এই সমুদ্রলগ্ন প্রান্তের দক্ষিণ ধারটায় এক-আধবার না বেড়িয়ে ফেরে না। দ্বীপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না তাহলে। এখানেও সেই সমুদ্র আর পাহাড় আর জঙ্গল। তবে এখানকার নির্জনতার একটা স্বল্প-মিয়াদী আকর্ষণ আছে। বাইরের ছেড়ে দ্বীপের শহরের লোকও এদিকটায় দু-দশদিন থাকতে হলে হাঁপিয়ে ওঠে। চারদিকের নিবিড় নির্জনতা বুকের ওপর চেপে বসতে চায়।

তবু সমুদ্র ডিঙিয়ে নেহাত বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে যদি কেউ, এই দক্ষিণ তল্লাটে সে একবার আসবে। কারণ দ্বীপের শহর দুদিনে ফুরিয়ে যাবে। তখন এই সুদূর দক্ষিণ তল্লাট-সংলগ্ন তিরুর জঙ্গলের ওধারে সেদিনের দুর্ধর্ষ জংলী জারোয়া বসতির কাছাকাছি আসার নিরাপদ রোমাঞ্চ তাকে টানবে। তাছাড়া, দেশে ঘরের পাশের রিফিউজিদের খবর জানা থাক আর না থাক, কালাপানিচালান রিফিউজিদের একটু-আধটু খোঁজখবর না করে দেশে ফেরাটা অনাবৃত স্বার্থপরতার মত।

এছাড়া জীবন-চিত্রকারেরাও এখানে আসে কেউ কেউ। ক্বচিৎ কখনো অবশ্য। জীবনের রসদ খুঁজতে খুঁজতে ছিটকে-ছটকে এসে পড়ে। নতুন বাস্তবের পটভূমিতে নতুন জীবন প্রতিফলনের আকর্ষণে আসে। সেটা দু-দশ ঘণ্টায় হবার নয়। দু-দশ দিনে হলেও হতে পারে। কারণ, আহরণ করে নেবার মত হৃদয়ের চিত্র এখানে একটাই আছে। সেটা সংক্ষিপ্ত, ছোট।

...কিন্তু গোটা সমুদ্রটা। ভরে নেবার মতই বোধ হয়।

বহিরাগত আগন্তুক দেখলে স্থানীয় লোকেরা ভিড় করে আসবে দেখতে। কথা বলবে, আলাপ করবে, বাইরের দুনিয়ার একটু আধটু খোঁজখবর নেবে। দু-চারদিন তাদের সঙ্গে, তাদের কাছে থাকা হবে শুনলে কৃতার্থ হবে—আনন্দে মাথায় করে রাখতে চাইবে। পরম আত্মীয় জ্ঞানে ধরে রাখতে চাইবে। গল্পে গল্পে আহার নিদ্রা ভুলে যাবে তারা। নিজেদের কথা বলবে, পড়শীদের কথা বলবে, বিনা অপরাধে দ্বীপান্তর বাসের বিধিলিপি স্মরণ করে সখেদে অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, অনেক অভাব অনটন দুর্দশার কথা বলবে। তারপর দ্বীপের গল্প করবে, দ্বীপের আবহাওয়ার গল্প করবে, চাষ-বাস মাটি-জঙ্গল গাছগাছড়া বুনো জানোয়ার—কিছুই বাদ যাবে না।

তবু এ-সবের কোনোটাই নতুন লাগবে না আপনার। উদ্বাস্তুর চেহারা সর্বত্রই প্রায় এক। আর কালাপানির এই দ্বীপগুলির চেহারাও সবই প্রায় জানা, সবই প্রায় দেখা।

কিন্তু এই গল্প করতে করতে দু-তিন দিনের মধ্যে কোনো একসময়ের অন্তরঙ্গ

আলাপের মুহূর্তের বিলির গল্পও করবে তারা। খুব খেয়াল করে শুরু নাও করতে পারে কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন। কারণ, আপনি এরকম কিছুর সন্ধানেই এসেছেন। আপনার খেয়াল করা দেখে তারাও খেয়াল করবে। আপনার শোনার আগ্রহ দেখে তাদেরও বলার আগ্রহ বাড়বে। তখন উদ্দীপনায় আর উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে নিবিড় করে দেখা, নিবিড়ভাবে জানা, সতের বছরের এক মেয়ের কাহিনী ফেঁদে বসবে তারা।

এই দ্বীপেরই এক মেয়ের কাহিনী। বিলির কাহিনী।....বিলি নয়, যুগলকিশোরের বি-ল্লি!

কিন্তু কাহিনীটা বিলি বা বিল্লির, কি সর্দার যুগলকিশোরের— জীবনশিল্পীর তাতে সংশয় দেখা দেবে।

দিনের বেলায় দূরের পেরিমিটার রোডের খানিকটা আগে গাছগাছড়ার ফাঁক দিয়ে যে দু-তিনটে কুঁড়েঘর দেখা যাবে, আঙুলের ইশারায় সেগুলো দেখিয়ে তারা বলবে, ওই যে ওইটেই বনমালীর ডেরা—ওই নেশাখোর বনমালীর ভাগ্নি বিলি। আর ওই যে উদিক-পানে একটা ছাড়া ঘর, ওখানে সুদাম থাকে—

কিন্তু সুদাম বা বনমালীকে খুঁজছেন না আপনি। এরপরেও আপনি বাড়তি ক'টা দিন থেকে গেলেন। কারণ, আপনার মনে হচ্ছে কাহিনীর সবটা সপল্লবে শোনা হলেও চিত্রটা কেমন যেন সম্পূর্ণ হয় নি। সেটা সম্পূর্ণ করার তাগিদে মনে মনে আপনি যাকে খুঁজছেন, ওদের সঙ্গে দ্বীপ আর জঙ্গল আর সমুদ্র দেখতে বেরিয়ে আপনার চোখ যাকে চাইছে, সে সুদাম বা বনমালী নয়। সে সর্দার যুগলকিশোর। দ্বীপের সর্দার আর বিলির সর্দার যুগলকিশোর।

কিন্তু দ্বীপের লোকেরা সে সম্ভাবনাটা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে। আপনার উদ্দেশ্য বুঝলে আপনাকেও নিরস্ত করবে তারা। বলবে, কোথায় কখন থাকে লোকটা ঠিক নেই। বলবে, বাঙালীর ওপরেই বেশি রাগ আর বিদ্বেষ ওর, দেখলেই বিড়বিড়িয়ে গাল দেয়—ওর দেখা না পাওয়াই ভালো—তার ধারে কাছে না ঘেঁষাই ভালো।

কিন্তু এই রাগ আর বিদ্বেষ সত্যি হলে দুয়ে দুয়ে চার মিল হয় না, কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটে—চিত্রটাতে খুঁত থেকে যায়।

অতএব আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। সন্ধানী চোখ নিয়ে ঘুরলে খোঁজ পেতে কত সময়ই বা লাগতে পারে। এলাকাটা ছোট নয়, কিন্তু কতই বা বড় আর। তাছাড়া দ্বীপ দেখাতে বেরিয়ে মিঠা বিলের দিকে ওরাই নিয়ে আসবে আপনাকে।

এখানকার একমাত্র পানীয়ের উৎস, মিষ্টি জলের উৎস, মিঠে বিল। বাঙালীর নামকরণ নিশ্চয়। অবাঙালীর সংখ্যাও একেবারে ফেলনা নয়। যাই হোক, বিলটার চারদিকে একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছে স্বাভাবিক। কিন্তু সামনের দিকটা আর ডাইনের সমুদ্রের দিকটা ছাড়া বিলের পিছন দিকে পা বাড়ালে সঙ্গীরা বাধা দেবে। পিছন দিকটা, অর্থাৎ তিরুর জঙ্গলের দিকটা। ওধারে সারি সারি চুগলুম গাছ, মস্ত মস্ত গর্জন আর প্যাডকের সারি, তাদের ফাঁকে ফাঁকে মুখিয়া-লতার শেকল, আর নিরন্ধ্র

বুনো বেত-ঝাড়। সেগুলোর ওধারে যেন গভীর জঙ্গল। মিঠে বিলের এধারে দাঁড়িয়ে রহস্যের মত মনে হবে। সে জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে আকাশের দিকে যাত্রা করেছে যেন। সমস্ত দ্বীপটাই পাহাড়ী ঢেউ খেলানো—ক্রমশ ঢালু হয়ে ওই গহন জঙ্গল থেকে নেমে এসেছে।

তিরুর জঙ্গলের এক মাথা মিঠে বিলের ওধারের ওই ছোটবড গাছ-গাছড়াগুলো সঙ্গে এসে মিশেছে। ঠিক না মিশলেও কাছাকাছি এসেছে। ঐ গাছ-গাছড়া ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে অনায়াসে তিরুর জঙ্গলে গিয়ে পডা যায়। সেই কারণেই সঙ্গীরা বাধা দেবে। বুনো জন্তুর হামলার ভয়ে নয়। এখানে জঙ্গলের জীব বলতে শুয়োর হরিণ আর পাহাড়ী সাপ। ওসবে এখানকার মেয়েদেরও ভয়-ডর নেই। এমনিতে জঙ্গলেও ভয়-ডর নেই কারো। দ্বীপের সর্বত্রই তো জঙ্গল।

কিন্তু তিরুর জঙ্গলে অন্য ব্যাপার। ওই অসূর্যম্পশ্য অরণ্যে জংলীর আবির্ভাব ঘটে। জারোয়া থাকে তিরুর জঙ্গলের কোনো দুর্গম গহনে, শরীরেব রক্ত হিম করে দেবার মত এই একটা খবরই যথেষ্ট। ভাববার অবকাশ পেলে আপনার হাসিই পাবে অবশ্য। কোথায় থাকে, ওই পুকুরটার ওধারে? না, তা থাকে না। তা থাকতে পারে না। লোকালয় থেকে বহ যোজন তফাতেই বাস তাদের। তবু যতদূরেই থাক, ওই তিরুর জঙ্গলের সঙ্গে যোগ তো আছে! এক-আধটা চলে আসতে কতক্ষণ?

একবার তো এসেছিল।

একবার নয, গ্রীষ্মকালে অন্তত এদিকটায় তাদের পদসঞ্চাবের আভাস বুশ-পুলিসরা পায়। তাদের বিশ্বাস, আর কোনো কারণে না হোক, পানীয় জলের জন্যেই তাদের এদিকটায় হানা দেওয়া অসম্ভব নয। একদিন এই পাহাড বন-জঙ্গল ছাড়া ওই মিঠে বিলও হযত জংলীদের দখলেই ছিল। সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপের রাজ্যে খাবার জলের মত এমন একটা মূল সমস্যা আর বোধহয় কিছু নয। এরকম একটা জায়গায় লোকবসতি গড়ে ওঠারও হয়ত এই একটাই কারণ—ওই মিঠে বিল। এই এলাকায় ওই বিল অমৃতের উৎস।

নিষেধ শুনে আপনার পা থেমে যাবে বটে, কিন্তু চোখ ছুটবে। একটু যেতে না যেতে চাপ-জঙ্গলে প্রতিহত হযে ফিরে আসবে চোখ দুটো। ওই পুকুরটার ওধারেই এসে থামবে আবার। তারপরেই ছোটখাটো একটা আবিষ্কারে রোমাঞ্চ নাচবে চোখে। কিছু গাছের ঝোপ আর বেতঝাড়ের ওধারে ওই বিশাল গর্জন গাছটার গা ঘেঁষে মাটি থেকে অনেকটা উঁচু একটা ঝুপড়ির ছাদ চোখে পড়েছে আপনার। দ্বীপের এই ঝুপড়িগুলো চেনা। ওর ভিতর মানুষ থাকে। বেতের বেড়া বেতের চালা—মাটি থেকে প্রায় পাঁচ হাত উঁচু মাচার মত ঘর। এসব জায়গায় মাটি থেকে ঘর তুললে সাপ জোঁক বা কানখাজুরার হাতে প্রাণ যাবে।

ওটা কি? ওই যে ঝোপের ওধারে ঝুপড়ির মাথার মত দেখা যাচ্ছে একটা?

শুনবেন, ওইটাই যুগলকিশোরের ডেরা। বিলি-কাণ্ডর পর ঠিক ওই জায়গাটাই বেছে নিয়ে ডেরা বেঁধেছে। পাগল আর কাকে বলে—

তাহলে আর ভয়টা কিসের?

ভয়, সবাই ওই লোকটার মত পাগল নয় বলে। ওটার কি মাথার ঠিক আছে, না প্রাণে ভর-ডর আছে কিছু! আর, ওদিকটায় পা বাড়ালে জংলীর দরকার হবে না, ওই যুগলকিশোরই দেবে এক গুলিতে জন্মের মত ঠ্যাঙ খোঁড়া করে। ক'বার ক'টা ছেলে-ছোকরাকে বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করেছে ঠিক নেই। ওদিক কাউকে এগোতে দেখলে ক্ষেপেই যায় লোকটা।

আপনি হদিস পেলেন। এরপর ফাঁক পেলে একাই আসবেন। কারণ জীবন-চিত্রটি সম্পূর্ণ করে নেবার তাগিদ কোনো তাগিদের থেকেই কম নয় আপনার। কিন্তু এসেও মিঠে বিলের এধারেই দাঁড়িয়ে থাকবেন হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ও-ধারে পা বাড়াতে ভরসা হবে না—নিজের পা দুটোর ওপর যথেষ্টই মায়া আছে আপনার।

প্রতীক্ষা। কিন্তু খুব একটা দুর্বহ প্রতীক্ষা নয়। ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা নয়। এখানকার এই স্তব্ধতার মূক-মুখর ভাষা আছে একটা। গাছ-গাছড়ার কানাকানি, সরসরানির মর্মকথাটি কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করবে। ...তারপর, আসা-যাওয়ার একটাই পথ যখন, লোকটার দেখাও মিলবেই।

কিন্তু অবাক লাগবে। এই সর্দার!

এ যে তালপাতার সেপাই! খুঁড়িয়ে চলাটা মিলছে বটে— কিন্তু এ-রকম কে আশা করেছিল! রোগা টিকটিক করছে, গায়ের তামাটে রঙে কালচে ছোপ লেগেছে, চোয়াল বার করা, চোখ দুটো গর্তে। ওই দো-নলা বন্দুক, সঙ্গীন, কার্তুজ-গোঁজা মোটা বেল্ট, পেল্লায় গামবুট, তক্‌মা, মোটা খাকীর হাফপ্যান্ট, কোট, বুকের দুধারে মেডেলের বোঝা, টুপি—এত সবের ভার বইতে গিয়েই লোকটার অতবড় লম্বা দেহটা সামনের দিকে বেঁকে গেছে যেন!

আপনি দেখবেন তাকে, সে-ও একসময় দেখবেই আপনাকে। কিন্তু তার সেই দেখাটা সহ্য করা খুব সহজ হবে না। অস্বস্তি লাগবে। মনে হবে কোটরগত দুটো চোখ আপনার মুখটা ফালাফালা করে দিয়ে অন্দরমহলে বিচরণ করছে। আপনি তবু হাসতেই চেষ্টা করবেন একটু, সবিনয়ে অভিবাদন জানাবেন, নিঃশব্দে বোঝাতে চেষ্টা করবেন, আপনি সামান্য একজন আগন্তুক মাত্র—প্রায় কেউ না। প্রথম প্রথম প্রায় একটা বিদ্বেষ নিয়েই অল্প অল্প খুঁড়িয়ে পুকুরের ওধারটায় চলে যাবে লোকটা। তার ডেরার দিকে। একবার হয়ত অসহিষ্ণু দৃষ্টি মেলে ফিরে দেখবে আপনি অনুসরণ করছেন কি না।

ক্রমশ একটু আধটু আলাপও হতে পারে। আলাপ শব্দটার প্রয়োগ নিজের মান বাঁচানোর জন্য। আলাপ সে করে না। সয়ে গেলে দু-দশ মিনিট কাছে বসতে পারে। দু-পাঁচ কথা বলবে তাও প্রায় কটূক্তি মনে হবে। প্রথম ধাক্কায় তার বাঙ্গালী বিদ্বেষটাও সত্যি বলেই মনে হবে। বিড়বিড় করে অনেকবার তাকে বলতে শুনবেন—বংগালী লোক একটুও ভালো না। তাদের দিল বড় কঠিন, সেই দিল কানুন পর্যন্ত মানে না—তামাম দুনিয়ায় তারাই সব থেকে নির্মম কঠিন শাস্তি দিতে

জানে। বংগালী তার মতে ক্ষমার অযোগ্য।

প্রথমটায় ধাক্কা খেলেও পরে আর ধাক্কা লাগবে না। কারণ সেই অবকাশে জীবন-চিত্রটি আপনার প্রায় সুসম্পূর্ণ।

পঞ্চাশ সাল থেকে দ্বীপের এই অঞ্চলটা বাসোপযোগী করে তোলার তোড়জোড় চলছিল। একান্নর শুরুতে লোক আসতে শুরু করেছে। বর্তমান উদ্বাস্তু সংখ্যা এখন হাজার বারোশ-র কম নয়। পর পর কয়েকটা জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারা। জায়গাগুলো জংলী গ্রামের মত দেখতে। নামকরণে দিশি-বিলিতির যোগ। মে পুর, কনলিন পুর, হারবার্টাবাদ ইত্যাদি। নামেই তফাত, জায়গাগুলোর চেহারায় তফাত খুব নেই। সর্বত্রই কাঠের পাটাতনের ওপর টিনের চালা ঘর—চারদিকে কাঠের বেড়া বা মাটির বেড়া।

তিরুর দিকটায় যারা বসবাস করছে বনমালী দাস সম্ভবত তাদের মধ্যে সব থেকে পুরনো বাসিন্দা। কালাপানি পেরিয়ে প্রথমে দ্বীপের শহরে এসে উঠেছিল। আশা ছিল সেখানেই থেকে যেতে পারবে। কিছু একটা ব্যবসাপাতির প্ল্যানও মাথায় ঘুরছিল তার। কিন্তু তার আগেই সরকারী ঠেলা খেয়ে সপরিবারে এখানে চালান হয়েছে। সে নিজে, বউ, দুটো কচি ছেলে আর আট-নয় বছরের ভাগ্নি বিলি—অবস্থা বিবেচনায় সংসারটা ছোট নয় আদৌ।

মেয়েটাকে সেদিন কেউ লক্ষ্য করে নি, করার কথাও নয়। মামীর বয়সও সে সময় খুব বেশি নয়। অষ্টপ্রহর বুক জ্বলত বলেই ওই মেয়েটাকে গঞ্জনা কম দিত না। সে তুলনায় মামা বরং একটু সদয় ছিল। ফলে মামার ওপর মামার রাগটা বিলির ওপরেই এসে পড়ত। কারণ মামর সঙ্গে লাগতে গেলে সে সকলের সামনেই হয়ত মামীকে দু-ঘা বসিয়ে দিত।

এখানে ছটকে আসার পর এই মামীকেই খানিকটা আপস করে চলতে হল বিলির সঙ্গে। মামাটি তখন গোটাগুটি হাল ছেড়ে আর গা ছেড়ে নেশা আশ্রয় করেছে। নেশার ঝোঁক চাপলে বউয়ের সঙ্গে এক-একদিন ঘটি-বাটি নিয়ে টানা হেঁচড়া। সে সময় মামীকে যা হোক সাহায্য করত সুদাম। ষোল-সতের বছরের জোয়ান ছোকরা। কিন্তু বাইরের ছেলে কত আর করবে! নিরুপায় মামী তখন বিলিকেই ছেলের কাজে লাগাল। আর নিজেও পুরুষের কাজে লাগল।

সরকার জমি দিয়েছে। লাঙ্গল-গরু দেয় নি। কোদালে চাষ কর। মাটি সোনা। মেহনত করলেই সোনা ফলবে দেখ। কিন্তু মেহনত করে কে? বনমালী যখন নেশা করে না তখন মাথা খাটিয়ে রাতারাতি দিন-বদলানর প্ল্যান করে, আর নেশা যখন করে তখন ঝিমোয় শুধু। অতএব মেহনতের দায়টা মামী নিজের হাতে তুলে নিল আর সে কাজে ন বছরের মেয়েটাকে সঙ্গে নিল।

মামীকে সাহায্য করতে পেরে বিলির আনন্দ ধরে না। বলত, মামার দরকার কি, তোমাতে আমাতে সব চালিয়ে নেব, দেখ—

মামী কখনো গোঁ গোঁ করত, কখনো বা খিঁচিয়ে উঠত, কিন্তু ডানপিটে মেয়েটা চালিয়ে যে অনেকটাই নিত—তাও দেখত। বিলির মনে হত কোদাল চালান, মাটি নিড়ানর মত আনন্দের কাজ আর বুঝি কিছু নেই। শুধু তাই নয়, সুতোয় বঁড়শী গেঁথে সমুদ্রে যেত মাছ ধরতে। নিরামিশ ক'দিন রোচে? বিলির এক একদিন ইচ্ছে হত ডিঙি চেপে খানিকটা ভিতরে গিয়ে মাছ ধরে কিন্তু মামী জানলে ধরে থেঁতলাবে তাকে। মাছ ধরতে যাচ্ছে টের পেলেই খ্যাচখেঁচিয়ে ওঠে, জলে নামবি না খবরদার—হাঙরে গিলবে। বিলির তখন মনের জোর এত যে তার বিশ্বাস হাঙরকেও বঁড়শীতে গেঁথে অনায়াসে জল থেকে টেনে তুলে ফেলতে পারে সে। তাও একটু ভিতরে গিয়ে চেষ্টা-চরিত্র করত—সুরমাই, লাল ভেটকি, সাগর চাঁদা, ম্যাকরেল—সেও ঠিক ধরতে পারত, কিন্তু অমনি মামীর কানে নালিশ যাবে—নালিশ তো তার নামে লেগেই আছে অষ্টপ্রহর। মামীর ওপরেই এক-একদিন রাগ হয়ে যায় বিলির, একটু ভালো-মন্দ মাছ হলে ঠাকরোনের ভাত তো রোচে বেশ!

মাংসর ওপরেও মামীর লোভ। দ্বীপে এক হরিণের মাংস ছাড়া আর কিছু জোটে না। শুয়োর এখানে সক্কলেই খায় প্রায়, কিন্তু মনে হলেই ঘেন্নায সব কিছু উগবে আসতে চায় বিলির। হরিণের মাংস সুদাম মাঝেসাঝে দিয়ে যায়। কিন্তু বিলি খায় না। একবারের এক স্মৃতি বুকের তলায় দগদগে হয়ে আছে।

সুদামকে নিয়ে হরিণ মারবে বলে কোমর বেঁধে জঙ্গলে ঢুকেছিল। ওর হাতে দড়ির ফাঁস, সুদামের হাতে লাঠি আর বাঁশ-কাটা হাত-দা একটা। লাঠি ছুঁড়ে হবিণের পা জখম করতে এরই মধ্যে ওস্তাদ বনে গেছে সুদাম। বিলিব মতলব অন্য রকম। দড়িটা একবারে গাছের ওপর থেকে হরিণের শিঙে ফেলে দিতে পাবলে বাছাধন কাত। তাই করেছিল। একটা বাচ্চা হরিণ। ওটাকে একাই জ্যান্ত ধরে বাড়ি নিয়ে আসার শক্তি রাখে বিলি। কিন্তু সুদাম এসেই গুপাগুপ ওটার ওপর লাঠি চালাতে লাগল। বিলি নেমে এসে বাধা দেবার অবকাশ পেল না। হরিণ শিশুর সেই অন্তিম চাউনি মনে হলে নিজের গাযের মাংস খুবলে তুলতে ইচ্ছে করে বিলির। মাংস বেঁধে মামী এরপর অনেকদিন রাগ করে চুলের মুঠি ধরে ওর মুখটা থালার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে, বিলির সমস্তদিন উপোসে কেটেছে, তবু মাংস-ভাত মুখে তুলতে পারে নি।

মেয়েটাকে অনেকেই লক্ষ্য করল, বছর চৌদ্দ বয়েস যখন। চৌদ্দ বছর কেউ বলবে না। সুদাম অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিল। ফাঁক পেলেই কাছাকাছি ঘুরঘুর করত সে। এক ধরনের ইঙ্গিত ইশারাও করত। কিন্তু বিলি খুব ভালো বুঝতে পারত না। ছেলে-ছোকরারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে তার মাটি কোপান দেখত। মামী দুচোখে যেন জ্যান্ত ভস্ম করতে চাইত তাদের। মিছামিছি ছেলেগুলোর ওপর মামীর অত রাগ কেন বিলি তাও বুঝত না। তবে একেবারে যে আভাস পেত না, তাও না। একটা অজ্ঞাত আভাস তো তার দেহের পরিবর্তনেই। সেখানে যে ঢেলে সাজার কাজ চলেছে কিছু একটা।

লক্ষ্য আর একজনও করল। সে তার মামা বনমালী। অবস্থা ফেরানর একটা নতুন পরিকল্পনা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল তার। নেশার ঝোঁক যখন থাকে না তখনই পরিকল্পনাটা দানা বাঁধতে থাকে। শেষে বিলি দেখত, মামার সঙ্গে কি নিয়ে যেন মামীর এক-একদিন তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়। মনে হয় ওকে নিয়েই। বেশি রাগলে মামা মামীকেই মারতে আসে। আর মামী রাগে ক্ষোভে এক-একসময় বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ বিলির চুলের মুঠি ধরে মাটিতে টেনে ফেলে গুমাগুম পিটতে থাকে। বিলি প্রস্তুত থাকলে অবশ্য পারে না। মামীর হাত দুটোই খপ করে ধরে ফেলে। মামী যত রাগে, ও তত হাসে হি হি করে। এই জোর ছেড়ে ওর দ্বিগুণ জোর থাকলেও ওই দস্যির হাত ছাড়ান সাধ্যে কুলাত না মামীর।

—মর মর, তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়, কবে তোকে ঠাকুর নেবে আমি সেদিন বাতাসা দেব—

বিলি হাসে। —কেন আমি কি করেছি?

মামী তখন কাঁদতে বসে।

বিলি ক্রমশ আঁচ করল ব্যাপারটা কি হতে পারে কিন্তু একেবারে সঠিক আঁচ করতে পারল না। মামার সঙ্গে সুদামের এখন খুব ঘনিষ্ঠতা দেখছে। সুদাম নেশার সামগ্রী যোগায়। দুই-একশ টাকাও মাঝেসাজে দেয় বোধহয়। মাসের মধ্যে হপ্তা দুই আজকাল দ্বীপের শহরে চলে যায়। কি করে, কি ক'রে টাকা রোজগার করে, বিলি ঠিক জানে না। নেশাভাঙ একটু আধটু সুদামও কবছে আজকাল। ওর সঙ্গে দেখা হলেই হাসে ফ্যাক ফ্যাক করে। হাসিটা বিচ্ছিরি লাগে বিলির। তার বিশ্বাস মামা ওকে লোভের জালে আটকেছে। ওর সঙ্গেই বিয়েটা দেবে ঠিক করেছে। সে-রকম কানাঘুষা শুনেছেও। সুদাম মামাকে একশ-র ওপরে টাকা দেবে শুনেছে। মামীকেও একটু ঠাণ্ডা দেখছে আজকাল।

একবারে মিথ্যে নয়, কিন্তু আসলে একটুও সত্যি নয়। অত কাঁচা মাথা নয় বনমালীর। নেশাভাঙ না করলে একেবারে সাফ মাথা। বনের চারটে পাখির লোভে সব না খুইয়ে হাতের একটা পাখি হাতে রাখা ভালো। যা ভেবে রেখেছে সেই রকমটি হলে সুদামের দিকে ফিরেও তাকাবে না তখন। এ-বুদ্ধিটা অবশ্য বউই তাকে দিয়েছে। বউয়ের সঙ্গে অত খটাখটি লাগত বিলিকে শহরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে। সেখানে একটা ঘর ভাড়া নেবে। তারপর? তারপর আর ভাবনা কি!

এই সহজ ব্যাপারটায় রাজী হত না বলে বউয়ের ওপর অত রাগ বনমালীর। নিরুপায় হয়ে রমণীটি তার ওপর দিয়েই আর এক প্যাঁচ কষেছে। বনমালী আপাতত তাইতেই ঠাণ্ডা। বউ বলেছে, মোটে তো চৌদ্দ বছর বয়েস, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে। এখন ঘর নিলে নেবে তো বস্তিঘর, আর আসবেও সে-রকমই সব লোক। তারা দেবে কি? তার থেকে ক'টা বছর অপেক্ষা করলে কি হতে পারে ভেবেছ? ভদ্রপাড়ায় ভদ্রঘর নিয়ে বসলে কারা এসে হুত্যে দিয়ে পড়বে, ভেবেছ? এতকাল গেছে আর তিন-চারটে বছর অপেক্ষা করতে পার না?

অনেকদিন বাদে বউকে আদর করতে ইচ্ছে করছিল বনমালীর। না, এত পাকা ভাবনা সে-ও ভাবে নি। ভদ্রঘরের ভদ্রলোককে টানতে না পারলে কি আর হল! দ্বীপের শহরে সব আছে, মেয়ে নেই। মনে ধরার মত মেয়ের দুর্ভিক্ষ। সমুদ্দুর ঠেঙিয়ে কে আসবে এখানে? কল্পনায় শহরের ওপর নিজের পাকা বাড়িঘর পর্যন্ত দেখে ফেলল বনমালী দাস।

বিলির আদর-যত্ন বেড়ে গেল। সুদামকে দিয়ে শহর থেকে সস্তা দুই-একটা প্রসাধন দ্রব্য আনিয়ে পর্যন্ত ভাগ্নীকে দিল সে। ওদিকে সুদামকেও হাতে রেখেছে। নইলে মাঝের এই তিনটে বছর তার চলে কি করে। —দেব দেব, তোর সঙ্গেই দেব রে বিয়ে, সবুর কর না দু-একটা বছর, সবে তো এগার বছর বয়েস রে মেয়েটার।

চোখ-কান বুজে চৌদ্দকে এগার বানিয়ে ফেলল সে।

ওদিকে মামী হাঁপ ফেলে বাঁচল। সাময়িক ফাঁড়া তো কাটল মেয়েটার। তিনটে বছর কম নয়, তারপর ঠাকুরের যেমন ইচ্ছে, হবে—।

ঠাকুরের ইচ্ছেয় বিলির সতের বছর বয়েসটা অন্তত ঠেকানো গেল না। একদিন এলই সেটা। এল যখন, বাইশ বছর বলে ভুল করাও বিচিত্র নয়। তখনো বিলিকে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয়, আগের থেকে আরো আশপাশের চেনা আর দূরের অচেনা মুখও আঙিনার এদিক সেদিক দেখা যায়। এখন আর মামীকে চোখ দিয়ে ভস্ম করতে হয় না তাদেব, বিলির নিজেরই এক-একসময় ইচ্ছে করে কোদাল করে ওদের মাথাগুলিই কুপিয়ে দেয়। আবার মজাও লাগে এক-একসময়।

এদিকে বনমালীর মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না সুদামের। ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে দিব্বি তো তিনটে বছর কাটিয়ে দিল। এখন তাগিদ দিতে গেলে উল্টে খেঁকিয়ে ওঠে। কিছুদিন হল শহরের একটা ঘর ভাড়া করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তাকে হামেশাই তাগিদ দিচ্ছে ভালো দেখে একটা ঘর, সম্ভব হলে দুটো ঘর, দেখে শুনে দিতে। দোকান করবে নাকি! আর বিলিকে নিয়ে তার মামী গিয়ে থাকতেও পারে মাঝে মাঝে, —দুটো ঘর হলেই ভালো হয়।

সুদামের সন্দেহ ঘোরালো হতে থাকে। দোকান করার পুঁজি যা আছে সে খুব ভালো করেই জানে। ...বিয়েটা দিচ্ছে না কেন! বিলিকেও নিয়ে যাবে বলছে। কি-রকম দোকান করবে তাহলে? সুদামও আজকাল লায়েক হয়েছে কম নয়। শহরে চোলাই মদ চালান করে বেশ দু-পয়সা রোজগার হচ্ছে। জুয়ার উপার্জনও একেবারে কম নয়। ব্যাপারটা সে মোটামুটি আঁচ করে নিল। মাথায় তার আগুন জ্বলতে লাগল।

সেদিন বিলির মামীর কাছে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল সুদাম। তিরুর জঙ্গলের থেকেই হয়ত হরিণ এসেছে একপাল এদিকটায়। কম করে চার-পাঁচশ হবে। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য ভাবা যায় না! পেরিমিটার রোডের জঙ্গল দিয়ে রোজ দুপুরে দল বেঁধে যাওয়া আসা করে—এমন দৃশ্য দ্বীপে এর আগে আর কেউ দেখে

নি কখনো।

মামীর মনমেজাজ ভালো না, হরিণ নিয়ে উৎসাহিত হবার মত অবস্থা নয়। এখন দুর্যোগ ঠেকাবে কি করে দিনরাত সেই ভাবনা। কিন্তু উৎসাহ যার বোধ করার, সে ঠিকই করল। সুদামকে কিছু বলল না, কিন্তু পারলে বিলি তক্ষুনি ছোটে।

দুপুরে জঙ্গলে গিয়ে একটা নিচু গাছের ডালে বসে রইল বিলি। চার-পাঁচশ হরিণ—গায়ের ওপর এসে পড়বে কিনা ঠিক কি! দেবে তাহলে শিঙ দিয়ে ফালাফালা করে। গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে উৎসুক নেত্রে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

আচমকা হ্যাঁচকা টানে অস্ফুট আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মাটিতে নয়, একজনের গাযেব ওপর।

সুদাম।

দু হাতে ওকে জাপটে ধরে মাটির ওপর থুবড়ে পডা থেকে বাঁচল সুদাম। তারপর হাসতে লাগল।

বিলি হকচকিয়ে গেছে একেবারে। দিশা ফিরল একটু একটু করে। ষড়যন্ত্রটা যেন বুঝতে পারছে। কুৎসিত কুটিল দেখাচ্ছে সুদামেব হাসিমুখ। চোখের কোলে পাপের কালি। এত কুৎসিত সুদামকে আর কখনো দেখে নি। দুটো হাতের শেকলে ও আটকা পডে আছে তখনো। তার চোখে চোখ বেখে চেযে আছে বিলি, ভেতব সুদ্ধু দেখে নিচ্ছে।

—হবিণ কোথায ?

দাঁত বাব কবে সুদাম বুকেব কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করল তাকে। বলল, এই তো।

হঠাৎ একধাক্কায তাকে সাত হাত দূরে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করল বিলি। কিন্তু সুদাম খুব ভালো করে চেনে ওকে, আগের থেকে প্রস্তুত ছিল। ধাক্কাটা সামলে নিযে গর্জে উঠল, ভালো হবে না বলছি, বেশি গণ্ডগোল করবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব তোকে।

কিন্তু মেযেটার গায়ে যে এত শক্তি, সুদাম কল্পনাও করে নি। এলোপাতাড়ি কিল চড় ঘুষিতে নাস্তানাবুদ করে তুলল। তার ওপর হাত কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। শেষের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সুদাম ওকে সুদ্ধু নিয়ে পড়ল মাটির ওপর।

তাইতেই তার সুবিধে হল। মাথায় খুন চেপেছে সুদামের। দু হাতে তার গলা টিপে ধরে অস্ফুট হুমকি দিল—ঠাণ্ডা হয়ে থাকবি, না, দেব গলা টিপে একেবারে শেষ কবে ?

নেহাত নিচে পড়ে গিয়েছিল, তবু এ পরিস্থিতিও হয়ত নিজের জোরেই সামলাতে পারত বিলি। তার দরকার হল না। কোথা থেকে যেন ভুঁই ফুঁড়ে এসে উপস্থিত মানুষটা। যুগলকিশোর।

বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে তেমনি এক হাতে অবলীলা ক্রমে বিলির বুকের ওপর থেকে টেনে তুলল সুদামকে। সুদাম থ। আর বিলিও হকচকিয়ে গেছে এমন, যে মাটি ছেড়ে উঠতে ভুলে গেছে।

গাল-কান বেড়িয়ে একটা চড় খেয়ে সুদামের চোখে রাজ্যের অন্ধকার ছেয়ে এল। দ্বিতীয় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ হাত দূরে মাটির ওপর বসে পড়ল সে। মাথার ঘিলুসুদ্ধু এক নিমেষে ওলট পালট।

বিলির সম্বিত ফিরেছে। স্রস্ত বসন ঠিক করে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে সে। লোকটাকে আবার সুদামের দিকে এগোতে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল সে, এই—!

রাগ এই লোকটার ওপর নয়। অথচ মাথায় যেন আগুন জ্বলছে বিলির। সেই ঝাঁঝটাই প্রকাশ হয়ে গেল।

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। দেখল। তারপর বিলির দিকেই হাত তুলল, মারেগা এক্—

রাগে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়েছে বিলি। ছ আঙুল জিভ বার করে তাকেই ভেঙিয়ে উঠল। তারপর দুপদাপ পা ফেলে চুলের ঝুঁটি ধরে সুদামকে টেনে তুলল মাটি থেকে। বলল, শিক্ষা হয়েছে, না আরো রস করার সাধ আছে? প্রাণে বাঁচার ইচ্ছে থাকে তো পালা এখন।

বিলি রাগে জ্বলছে তখনো, তবু এরই মধ্যে তার কেমন মনে হযেছে, লোকটা সুদামকে হয়ত মেরেই ফেলবে। প্রাণের দায়ে সুদাম ছুটে পালাল।

—তু কওন্?

—তোর ঠাকমা—

দুমদুম পা ফেলে বাড়ির দিকে রওনা হল বিলি। কিন্তু রাগ পড়ছে। যে বাঁচাল তার ওপর রাগ করতে গেল কেন ভেবে নিজেই অবাক বিলি! সন্তর্পণে পিছন ফিরে তাকাল আবার। লোকটা হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে।

যুগলকিশোর হয়ত এই প্রথম দেখল বিলিকে। কিন্তু বিলি অনেকদিন ধরে দেখছে তাকে। সে তার সব পরিচয় জানে। পেরিমিটার রোডের ওধারের জঙ্গলে বুশ-পুলিসদের সর্দার লোকটা। উঁচু-লম্বা বেতের মত শক্ত আর নরম যেন। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে যখন বেশ লাগে দেখতে। গায়ের রঙ লালচে তামাটে, পিঠে দো-নলা বন্দুক, গলায় পৈতের মত একটা মেডেলের মালা। বিলির মনে হত চমৎকার রোমাঞ্চকর জীবন ওর। বিলি মেয়ে না হলে ছেলে হলে ওই সর্দারের দলে গিয়ে ভর্তি হত।

ওই পেরিমিটার রোডের ওধারেই ঝুপড়িতে থাকে ওরা। চার-পাঁচজন করে এক-একটা দলে ভাগ হয়ে জঙ্গল পাহারা দেয়। জংলী ঠেকানর ডিউটি ওদের। রাতে আগুন জ্বেলে রাখে—সেই আগুনের আভা বিলিদের ঘর থেকেও দেখা যায়। এর ওপর কোনো গোলযোগ সন্দেহ হলেই ওরা টিন পিটোয়, টিকারা বাজায়। হৈ-হল্লা শুনলে জংলী কাছে ঘেঁষবে না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বিলি থমকে দাঁড়াল। নিজের বেশবাস ভালো করে দেখে নিল। মুখপোড়া সুদাম গায়ের জামাটা ছিঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু বিলি হাসছে। তার লজ্জাই করছে, আর রাগও হচ্ছে নিজের ওপর। খামোকা কেন যে ওই লোকটার ওপর এ-রকম ব্যবহার করতে গেল! আসলে রাগের চোটে মাথার ঠিক ছিল না বিলির। ...লোকটা ভাববে সুদামকে মেরেছে বলেই রাগ হয়েছে—কি না কি ভেবেছে কে জানে।

পরদিন বিকেলের দিকে পাযে পায়ে পেরিমিটার রোডের দিকে এসে উপস্থিত বিলি। একা আসা দূরে থাক, মেয়েরা আসেই না এদিকে। বিলি এদিক সেদিক দেখছে, বুশ-পুলিসদের ঝুপড়িগুলো দেখছে। সবেতে কৌতূহল। তাছাড়া সর্দারের চেলা হয়ে গেছে যখন, আসতে বাধা কি? কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল অদূরের ঝোপের দিকটায় জনা তিনেক বুশ-পুলিস বসে। তাকেই দেখছে। বিলির কেমন মনে হল, ওদের চাউনিটা সরল নয় খুব। বিলি অসহায় বোধ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াল।

এ অবস্থায় কি করা উচিত তা যেন বিলির জানাই আছে। লোকটা এগিয়ে আসার আগে সে-ই তাদের কাছে গিয়ে হাজির। —এই, তোমাদের সর্দার কোথায়?

—কওন সর্দার? —তারা এতটা আশা করে নি।

বিলি বিরক্ত। যুগল সর্দার আবার কোন্ সর্দাব। যেন তার খোঁজেই এসেছে সে।

ব্যস, ওরা জব্দ। কিন্তু সঙ্গীদের উদ্দেশে লোকটার অস্ফুট মন্তব্য শুনে বিলির কান গরম। সে চাপা গলায় সঙ্গীদের জানাচ্ছে, যুগলকী চিড়িয়া—

ওদের মধ্যে একজন একটা হুইসল বাজাতে খানিক বাদে কোথা থেকে যে সর্দার এসে হাজির, বিলি ঠিক ঠাওর পেল না। আর এখানে এই মেয়েটাকে দেখে যুগলকিশোর অবাক।

অন্য লোকগুলো কিছু বোঝার আগেই বিলি ডাকল—আমার সঙ্গে একটু এস—

হনহন করে আগে আগে জংলা পথ ধরে চলল সে। একটু বাদে বড় বড় পা ফেলে যুগলকিশোর ধরল তাকে। হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল—তুই এখানে এলি কোত্থেকে?

বিলি রাগ করে বলল—আকাশ থেকে। তোমার ওই লোকগুলো হাড় বজ্জাত।

যুগল থমকে দাঁড়াল। সে ভাঙ্গা বাংলা বলতে পারে আর বাংলা বোঝেও। এবারে ভাঙ্গা বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করল, কি করেছে ওরা?

অর্থাৎ, অপমানজনক কিছু করে থাকলে এক্ষুনি আগে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আসবে ওদের।

বিলি তাড়াতাড়ি বলল—কিছু করে নি আমার। এমনিই ভালো লাগে নি ওদের।

যুগলকিশোর হাসতে লাগল। জংলা পথ ভেঙে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল—তুই এদিকে এলি কেন?

এল কেন সেই জন্য নিজের ওপরেই রাগ বিলির। ভেবেছিল, হয়ত সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে দুটো ভালো কথা বলবে। পুরুষগুলো যে রাক্ষস এক একটা কে জানত! উল্টে ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল—কেন এদিকটা কি তোমাদের সম্পত্তি?

যুগলকিশোরের মজা লাগছে মেয়েটার কথা শুনে। সর্দারকে ভয়ই করে সকলে। চোখের দিকে চেয়ে কথা বলে না কেউ। অথচ মেয়েটা কালও তাকে দাবড়ানি দিয়েছে, আজও কড়া মেজাজ। নাঃ, কোনো মেয়ের সঙ্গে এ যাবৎকাল ঘনিষ্ঠভাবে মেশা হয়ে ওঠে নি তার। যে-সব মেয়ে চোখে পড়েছে এখানে, যুগল ফিরেও তাকায় নি। জীবনে কর্তব্যটাই সে বড় করে বেছে নিয়েছে, আর সব ভুয়ো।

কিন্তু এই অল্পবয়সী মেয়েটার কথাবার্তা বেশ লাগছে তার। মেয়েটা যেন ওর মত পুরুষের কাছ থেকেও স্নেহ কাড়তে জানে। বলল, এভাবে একা আসবি না এখানে, কালকের মত কেউ এসে তোর ওপর হামলা করে... তো?

বিলি ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল যুগলের দিকে। না, এ লোকটার মুখে কোনো দুরভিসন্ধি নেই। থাকতে পারে না। বিলি আজ ক'বছর ধরে দেখছে। ওর খুঁড়িয়ে চলা, ঘোরাফেরা, হাব-ভাব সব বিলির মুখস্ত। অথচ লোকটা কোনোদিন ওকে চেয়ে দেখে নি পর্যন্ত। বিলি তরল জবাব দিল—করলে যুগল সর্দার তার টুঁটি টিপে ধরবে—আর গালে থাপ্পড় দিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে দেবে।

যুগলকিশোর হাসল। —কি নাম তোর?

বিলির একটা পোশাকী নাম আছে। বিলাসী কোনোদিন সেটা ব্যবহারের সুযোগ হয় নি। ভাবল সেই নামটাই বলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেরই হাসি পেল সেটা বলতে। বলল, বিলি—

বি-ল্লি! যুগলকিশোর সকৌতুকে বিকৃত করল নামটা।

বিলি রাগ করল না। হাসছে। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে তারা। বিলির মনে হচ্ছে একজন পুরুষের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে সে। পুরুষ এই দ্বীপে একজনই আছে। বিলি লম্বা কম নয়, কিন্তু এই লোকটার কাঁধের কাছে পড়ে আছে সে।

জংলা পথ ছাড়িয়ে যুগলকিশোর তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইল। বিলি তাড়াতাড়ি বাধা দিল—না না তোমাকে আর আসতে হবে না, তুমি যাও।

কেন বারণ করছে যুগলকিশোর বুঝল হয়ত। তার অবাক লাগল। তার তো বয়েস হয়েছে, আর এই মেয়েটার কতই বা বয়েস! বারণ করে কেন!

এরপর দূর থেকে যাকে দেখত বিলি, তাকে কাছে থেকে দেখতে লাগল। লোকজন ধারে কাছে না থাকলেই ডেকে বসে, এই সর্দার।

যুগলকিশোর ফিরে দাঁড়ায়—বি-ল্লি!

সমবয়সীর মত জঙ্গলে বসেও আড্ডা হয় দুজনের। এক-একদিন বিলি রাগ করে ভেঙায় তাকে—বিল্লি বিল্লি বিল্লি! আমি কি বেড়াল?

যুগলকিশোর হা হা করে হাসে। বলে, তু বি-ল্লি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে ওদের জারোয়া পাহারা দেবার গল্প শোনে বিলি। জারোয়ারা কেমন দেখতে, শোনে। কি সাঙ্ঘাতিক হিংস্র নৃশংস ওরা, শোনে। তীরের অব্যর্থ নিশানার গল্প শোনে। যুগলকিশোরেরও শোনা গল্প—সেও সামনাসামনি জারোয়া দেখে নি কখনো। সামনাসামনি হলে হয় জারোয়া মরবে, না হয় নিজেকে মরতে হবে—একজনকে না একজনকে মরতেই হবে। তবে তিরুর জঙ্গলে জারোয়া পদার্পণের আভাস নাকি পেয়েছে যুগল সর্দার, অনেক দূর দিয়ে পালাতেও দেখেছে। কিন্তু শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে না হলে জারোয়া মারার নিয়ম নেই, সরকারের কড়া নিষেধ।

দু কান খাড়া করে গল্প শোনে বিলি। উত্তেজনায় একদিন বলে ফেলেছিল, তুমি একটা জ্যান্ত জারোয়া ধরতে পারলে বেশ হত।

—কি হত?

কি হত, বিলি কি ভেবেছে? দুষ্টুমি করে জবাব দিল—আমি সাদী করতাম।

জঙ্গল ফাটিয়ে হাসে যুগলকিশোর। তার এতকালের টান-ধরা স্নায়ুগুলো যেন শিথিল নরম হয়ে আসছে।

বিলির শিকার দেখার ঝোঁক খুব। অদম্য উৎসাহে হয়ত সঙ্গ নেয় যুগলকিশোরের। কিন্তু হরিণের দিকে বন্দুকের নিশানা করলেই বন্দুক নাড়িয়ে দেয় সে। কখনো বা শব্দ করে হরিণ তাড়িয়ে দেয়। যুগলকিশোর বিরক্ত হয়, আবার হেসেও ফেলে।

কৌতূহলের অন্ত নেই বিলির। ...তার পা খোঁড়া হল কেমন করে? গলায় অতগুলো মেডেলই বা কিসের?

যুগলকিশোর সেই গল্পও করেছে। মিলিটারীতে কাজ করত। পাহাড়ে থাকত তখন। পাহাড় থেকে একটা ছোট পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ছিল। নিচে সদলবলে মেজর সাহেব অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা টেরও পান নি। সেটা পড়লে কম করে পাঁচ-সাতজন মরে যেত। যুগলকিশোর মাটি থেকে খানিক ওপরে পাহাড়ে দাঁড়িয়েছিল। পা দিয়ে সে পাথরটা আটকাতে চেষ্টা করেছিল। ফলে পাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। সাহেবরা পরে তাকে সভা করে মেডেল দিয়েছিল। কিন্তু জখম পা নিয়ে তো মিলিটারীতে কাজ করা চলে না। তখন এখানে জেলের চাকরি দিয়ে পাঠান হয়েছিল তাকে। জেলটা উঠে যেতে এখন বুশ পুলিসের সর্দার হয়েছে।

তারপর আরো মেডেল পেয়েছে। জেল থেকে ডাকাত পালিয়েছিল, তাকে ধরে দিয়ে মেডেল পেয়েছে, বছরে সব থেকে ভালো কাজ করার জন্য ফি বছর মেডেল পেয়েছে একটা করে, বুশ পুলিসের কাজেও মেডেল পেয়েছে, এ-কাজ করতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর মদ চোলাই ধরে দিয়ে মেডেল পেয়েছে—মেডেল সে অনেক কিছুর জন্যে পেয়েছে।

যুগলকিশোরের লালচে উদ্দীপনায় মুখ আরো লাল দেখাচ্ছিল। হাত পা গলা শরীরের চামড়াও কেমন লাল লাল। বিলির ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ছুঁলে আঙুলে বুঝি আঁচ লাগবে।

একদিন বিলি এসে খবর দিল, দু-চারদিনের মধ্যেই মামার সঙ্গে শহরে বেড়াতে যাচ্ছে সে, মামা নিয়ে যাবে বলেছে।

ইতিমধ্যে ওদের ঘরের কথাও কিছু কিছু শুনেছে যুগলকিশোর। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, সাদীর ব্যবস্থার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি?

বিলি হাসতে লাগল।—তোমার মুণ্ডু, বেড়াতে যাচ্ছি বললাম না?

যুগলকিশোর বলল, নিশ্চয় তোর মামা কোনো ছেলের খোঁজ পেয়েছে, সেই জন্যেই নিয়ে যাচ্ছে তোকে—তোর খুব ভালো বিয়ে হবে, তুই খুব ভালো মেয়ে। হলে আমাকে খবর দিস, আমিও ছুটি নিয়ে বিয়ে দেখতে যাব।

বিলি থতমত খেয়ে গেল। মামা অত আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইছে কেন, তা তো ভাবা হয় নি! মামীর মুখই বা অত গম্ভীর কেন? আবার এই লোকটার এত আনন্দ আর উৎসাহ একটুও ভালো লাগছে না তার। ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলার জন্য বলল, হ্যাঁ, আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছে, যাকে তাকে আমি বিয়ে করতে গেলাম আর কি!

যুগলকিশোর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোর বয়েস কত?

বিলি একটু অন্যমনস্ক ছিল, নয়ত বাড়িয়ে বলত। এই লোকটা এমনিতেই খুকীগোছের ভাবে তাকে।

—সতের।

একটা বড় নিঃশ্বাস কানে আসতে সচেতন হল বিলি। যুগলকিশোর বলল, আমার ছত্তিরিশ।

বিলি চেয়ে আছে তার দিকে। হাসছে মিটিমিটি। ছদ্মগাম্ভীর্যে মন্তব্য করল—ছেলেমানুষ—

যুগলকিশোর হেসে বাঁচে না।

সেই রাতেই মামা যখন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন, বিলি সোজা মামীকে এসে চড়াও করল। —আমি শহরে যাচ্ছি কেন?

মামী চমকে উঠল প্রথম। তারপর শুকনো জবাব দিল—আমি কি জানি—

—কেন যাচ্ছি!

মামী অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

বিলি কাছে এসে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরল তার।

—কেন যাচ্ছি!

মামী ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। তারপর আভাসে যেটুকু ব্যক্ত করল, শুনে বিলি পাথর একেবারে। মামী বলল, যমের হাতে পড়েছিস, কি করে রক্ষা করবি নিজেকে কর, আমি বলেছি শুনলে গলা টিপে মারবে আমাকে—।

সেই রাত গেল। পরের দিন গেল। তার পরের দিনও।

এবারে রাত পোহালে যাত্রা। মামার সঙ্গে সুদামের গোপন আলাপ লক্ষ্য করেছে

বিলি। সুদামকেও দলে নিয়েছে বোঝা গেল। তাকে শহরে নিয়ে যেতে না পারলে তার সুবিধে হবে না। এমন একজন সহচর পেয়ে মামার বল-ভরসা অনেকগুণ বেড়েছে।

রাত পোহাল। কিন্তু বিলি নিখোঁজ! বনমালী দাস বউকে খুন করার ভয় দেখাল। কিন্তু সে সত্যিই জানে না মেয়েটা কোথায় গেল। সুদাম আতি-পাতি করে খুঁজছে।

সকাল থেকে বিলি মিঠে বিলের ওধারে, দিদু ঝোপের ওধারে, ওই মাথা উঁচু গর্জন গাছের নিচে বসে।

সকাল গেল। দুপুরও গড়াতে চলল।

বন্দুক বাগিয়ে যে লোকটা সামনে এসে উদয় হল সে যুগলকিশোর। ওকে দেখে হতভম্ব। বিলি খিল খিল করে হেসে উঠল।

—তুই এখানে? ...একা একটা মেয়ে বিলের এধারে বসে থাকতে পারে যুগলকিশোর কল্পনাও করতে পারে না।

বিলি রাগ করে বলল, সকাল থেকেই তো বসে আছি এখানে, তোমরা কি-রকম ডিউটি দাও?

যুগলকিশোর বসল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল।—সকাল থেকে বসে আছিস, খাওয়া হয়েছে?

বিলি বলল, হাওয়া খাওযা হযেছে।

—বাড়ি থেকে পালিযেছিস?

বিলি সুবোধ মেয়ের মত মাথা নাড়ল, তাই।

—কেন?

—শহরে যাব না।

যুগলকিশোর আবারও দেখল একটু।—কেন যাবি না?

—আমার খুশি।

খানিক চুপ করে থেকে যুগলকিশোর বলল—চল, বাড়ি দিযে আসি তোকে।

বিলি ঝাঁঝিয়ে উঠল, কেন আমাকে শহরে নিয়ে বেচে এলে তুমি খুব খুশী হও?

ব্যবসা করার কথাটা বিলির মুখে এলো না। কিন্তু যা শুনল তাতেই যুগলকিশোর তাজ্জব।

—বেচবে! ...টাকা নেবে? বিয়ে না—

বিলি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বিয়ে না। বেচা।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে যুগলকিশোর জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা পাবে তোর মামা?

বিলির চোখে দুষ্টুমি ভর করল এতক্ষণে। ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, পাঁচশ টাকা। তুমি দেবে?

নিস্পন্দের মত বসে রইল যুগলকিশোর। মনে হল জবাব দেবেই না। কিন্তু তা

না। যুগলকিশোর ভাবছে। ...পাঁচশ টাকা তার আছে। তার বেশিই আছে। এখানে খরচ আর কি। কিন্তু যে মাইনে পায় তাতে পাঁচশ টাকা অনেকদিনের সঞ্চয়। তাও অনায়াসেই দেবে। কিন্তু তারপর মেয়েটার কি হবে?

যুগলকিশোর ভেবে পেল না কি হবে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—দেব, চল—

তক্ষুনি আবার উল্টে রাগ বিলির। —কেন, দেবে কেন? আমি কি পুতুল, যে টাকা দিয়ে কিনবে? কেন, মামার কাছ থেকে কেড়ে আনতে পার না আমাকে? টাকার কথা বলেছ কি তোমার মুখ দেখব না।

ছত্রিশ বছরের যুগলকিশোরেব বুকের মধ্যে এত দাপাদাপি আর কখনো হয় নি। দুহাতে বিলির মুখখানা তুলে ধরে গভীর বিস্ময়ে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। তারপর কাছে টেনে নিয়েছে। বুকে টেনে নিয়েছে। নিজের অগোচরে তার হাত দুটো নারী দেহের রহস্য উপলব্ধি করতে চেয়েছে—নরম দুটো অধরে তার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটো এসে মিলেছে। কত কালের কত যুগের একটা জমাটবাঁধা বাষ্প যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে আর একটা প্রতিহত-দাবি যেন ক্রমশ অধিকার বিস্তার করছে ওর ওপর।

সেই দাবিটা বিলিও উপলব্ধি করছিল বোধহয়। এবারে সে ঘাবড়েই গেছে একটু। নিজেকে মুক্ত কবে সরে বসতে চেষ্টা করল। সমস্ত অঙ্গ কাঁপছে তাব।

যুগলকিশোরের হঠাৎ খেয়াল হল, সমস্ত দিন উপোস কবে সকাল থেকে এখানে পালিয়ে বসে আছে মেয়েটা। নিজেকে সবলে দমন করল সে। কিন্তু তবু আশ্বাস চায। জিজ্ঞাসা করল, কাল আসবি?

—কোথায়?

—এখানে। এই গর্জন গাছের নিচে। এটাই সব থেকে ভালো জাযগা।

—না, কাল না। মামা সন্দেহ করবে।

—পরশু?

—পরশু ঘরের অনেক কাজ, মামী ছাডবে না। ভিতবটা কাঁপছে এখনো বিলির। কিছুই বুঝতে পারছে না, সে কি করবে সে শুধু সময় চায।

—তার পরদিন?

বিলি হাসতে চেষ্টা করল। —দূর, তার পরদিন তো শনিবার, কেউ আসে?

—রবিবার?

বিলি চেয়ে আছে। ছত্রিশ বছরের এই লোকটাই যেন শিশু তার কাছে। শিশুর আকুতি। তবু বুক দুরু দুরু বিলির। বলল, যদি কিছু মুশকিল হয়...?

যুগলকিশোর মাথা ঝাঁকল। —আমি তো তোকে সাদী করব, মুশকিল কি হবে! আসবি?

বিলি মাথা নাড়ল, আসবে।

—এইখানে? রবিবার?

আবার ও মাথা নাড়ল।

যুগলকিশোর উঠে দাঁড়াল।—চল তোকে বাড়ি রেখে আসি।

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরল বিলির। বলল, বাড়ি গেলে মামা তো আধমরা করবে—

যুগলকিশোর ঝুঁকে টেনে তুলল তাকে। আবারও বুকে টেনে নিল। দুই ঠোঁটে গভীর আশ্বাস ছড়িয়ে দিল। তারপর বলল, চল।

তখনো বিকেল হয় নি। দূর থেকে ভাগ্নীকে দেখে মামা দাঁত কড়মড়িয়ে তেড়ে আসছিল। সঙ্গের লোকটাকে দেখে থমকে গেল হঠাৎ। সর্দারকে চেনে ত তল্লাটে সবাই। সুদামও উপস্থিত ছিল সেইখানে। দেখামাত্র বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল সে।

যুগলকিশোর অনুমানে মামাকে চিনে নিল। বনমালী দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মত। বেড়া খুলে বিলিকে সঙ্গে করে সর্দার ভিতরে ঢুকল। গম্ভীর মুখে প্রশ্ন কবল—বিল্লিকো মারেগা তুম?

বনমালী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

দুই কাঁধে সবলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যুগলকিশোব আবার জিজ্ঞাসা করল—বাতাও, মারেগা তুম উস্‌কো—

সেই ঝাঁকুনিতে বনমালীর হাড়পাঁজরসুদ্ধু নড়ে-চড়ে গেল বুঝি। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষে মাথা নাড়ল, মারবে না।

বিলিও দেখছে হাঁ করে। ওদিকে দোরের আড়ালে মামী দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

যুগলকিশোর অতঃপর মামাকে যা বুঝিয়ে গেল তার সাদা মর্ম, বিলির গায়ে যদি একটা আঁচড পড়ে অথবা তাকে যদি একটা কটু-কথা বলা হয, তাহলে তাকে গুলি করে মেরে কুচি কুচি করে কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত সে অনেক জানোযার শেষ করেছে।

বড় বড় পা ফেলে যুগলকিশোব চলে গেল।

না, এর পরের তিনটে দিনের মধ্যে বিলির গায়ে একটা আঁচড়ও পড়ে নি, একটা কটু-কথাও শুনতে হয় নি তাকে। মামা চুপি চুপি সুদামের সঙ্গে পরামর্শ করেছে আর বিলিকে তোয়াজ করেছে। কন্যাস্নেহে তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছে। আর বুঝিযেছে, কেন তার শহরে যাওযা দরকার। ভাগ্নীব খুব ভালো বিয়ে দিতে হবে, আর তারও নিজেকে চাকরি করতে হবে—তারপর সকলকেই নিয়ে যাবে সে সেখানে। কিন্তু এখানে থাকলে কিছুই হবে না, উপোস করে মরতে হবে সব—আর বিয়েও বিলির হবে না। বিলির মত লক্ষ্মী মেয়ে যেন যেতে আর আপত্তি না করে।

বিলি একটিও কথা বলে নি। মুখ বুজে শুনেছে শুধু। মামার মনে মনে আশা হচ্ছে মেয়েটা হয়ত শিগগীরই ঠাণ্ডা হবে।

সে ভাগ্নীকে সর্দারের সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু মামী করেছে। বিলি তাকে বলেছে, ও খুব ভালো লোক মামী, ও-ই তো বাঁচিয়ে দিলে—

মামী একটুও আশ্বস্ত হতে পারে নি। আবার জিজ্ঞাসা করেছে, ভালো লোকটাকে তুই পেলি কোত্থেকে?

বিলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, পাব আবার কোথায়, এখানেই তো থাকে।

মামী আর ঘাঁটাতে সাহস করে নি। সেদিনে সর্দারের ওই মূর্তি মনে হলে বুক কাঁপে তার।

এদিকে একটা একটা করে দিন গুনছে যুগলকিশোর। চারটে দিন যে এমন দুঃসহ লম্বা হতে পারে, জীবনে আর সেটা উপলব্ধি করে নি। কাজে মন নেই। আহার নিদ্রা ঘুচেছে। দুটো দিন যেতে কাজের ডাকে অবশ্য চনমনিয়ে উঠতে হয়েছিল। সাগরেদরা খবর দিয়েছে, কোনদিকে যেন তারা জংলীর আভাস পেয়েছে। হঠাৎ হরিণ ছোটাছুটি করে, শুয়োর ছোটাছুটি করে।

শোনামাত্র একটা অদ্ভুত সঙ্কল্প মাথায় এল যুগলকিশোরের। একটা জ্যান্ত জংলী ধরতে পারলে কেমন হয়? জ্যান্ত দাঁতোয়া!... বিল্লি বলেছিল। মেডেলের লোভে নয়, বিল্লি বলেছিল বলে। সঙ্গীরা তার মতলব শুনে হাঁ। দল বেঁধে অনেক ভাগে চুপিসাড়ে এগিয়েছে তারা। তিরুর জঙ্গলে নয়, অন্যধারে অন্যদিকেই জংলী এসেছে শুনেছিল। অতি সন্তর্পণে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে নানা দিক থেকে বন্দুক বাগিয়ে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিল তারা। কিন্তু শুধু শুধু হয়রানি। নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে।

এই তিনটে দিনের মধ্যে বিল্লি একটিবারও সামনের জংলা পথে আসে নি, যেখানে হামেশা আসত, দিনে দু-তিনবারও আসত। যুগলকিশোর এটা আশা করে নি। একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও তো মন জুড়োত।

চারদিনের দিন সকাল হতে বুকের ভিতর দাপাদাপি শুরু হল যুগলকিশোরের। শেষে থাকতে না পেরে তাদের ঘরের কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে বার দুই টহল দিল। যদি চোখে পড়ে একবার, যদি ক্ষেতের দিকটায় এসে দাঁড়ায় বিল্লি। আজই দুপুরে দেখা হবে, কিন্তু দুপুর যে অনেক দূর।

পথে দেখা একজনের সঙ্গে হল। সে বিলির মামা বনমালী দাস। বনমালী আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাল তাকে। সর্দারসাহেবের কুশল প্রশ্ন করল।

বিল্লি কেমন আছে?

—খুব ভালো আছে সর্দার। মেয়েটা সেদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আমি কি ওকে মারতে পারি! ওর ভালোর জন্যেই তো ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছি, এখানে থাকলে তো আর বিয়ে হবে না। অনেক বলে কয়ে বোঝাতে তবে রাজী হয়েছে।

যুগলকিশোরের বুকে যেন মুগুরের ঘা পড়ল একটা। তীক্ষ্ণ চোখদুটো বনমালীর মুখে বিঁধিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি রাজী হয়েছে? বিল্লি যাবে?

হঠাৎ এই উগ্রপরিবর্তনে ঘাবড়ে গেল বনমালী, তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। বলল, হ্যাঁ, যাবে তো বলেছে, দুই-একদিনের মধ্যে আমরা রওনা হব...খুব ভালো একটা

ছেলের খবর পেয়েছি তো—।

খপ করে বনমালীর একটা হাত ধরে তারই ঘরের দিকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল যুগলকিশোর। —আও, দরিয়াফ্‌ৎ করুঙ্গা।

অর্থাৎ বিলিকেই জিজ্ঞাসা করবে সে। বনমালী দাসের কাঁপুনি ধরেছে। মেয়েটা আবার কি ফ্যাসাদ বাধায় কে জানে! যাবে না বললে তো প্রাণটা আজ আর রক্ষা হবেই না বোধহয়।

মামাকে এভাবে টেনে নিয়ে আসতে দেখে বিলি নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মামা কাতর মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে বলল, আমরা দুই-একদিনের মধ্যেই শহরে যাব শুনে ইনি তোর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

যুগলকিশোর থমথমে মুখে জিজ্ঞাসা করল—তুই যাবি?

মামার সামনে এ অবস্থায় চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারল না বিলি। একবার মামার দিকে আর একবার লোকটার দিকে তাকাল।

—শহরে যাবি তুই? —অসহিষ্ণু গম্ভীর প্রশ্ন যুগলকিশোরের।

মামার চোখে ত্রাস। দুই চোখে বাঁচানর আকুতি ঠেলে উঠতে চাইছে। ওর একটা কথাতেই যেন জীবন-মরণ নির্ভর। যাবে না বললে মামার কি হাল হবে, তাও এক মুহূর্তেই অনুমান করে নিল বিলি। মামা পথে নিশ্চয় কিছু বলেছে। বিলির চোখে ভ্রূকুটি, বুদ্ধি দেখলে গা জ্বালা করে—যাবে কি যাবে না আজ দুপুরেই তো সেটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে, এটুকু আর সবুর সয় না! ব্যাপার দেখে হাসিই পাচ্ছে বিলির। এ অবস্থায় যাবে না বললে এই মুহূর্তে কিছু আর জানতে বাকি থাকবে নাকি? নাকি তারপর আর দুপুরে সেখানে যাওয়া যাবে!

বিলি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ শহরে যাবে। তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকে গেল তারপর।

মামার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! যুগলকিশোর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ। টেনে হিঁচড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেহটা বাইরে নিয়ে এল। জংলা পথে ঢুকল। অদূরে হরিণ চোখে পড়ল কতকগুলো। এলোপাতাড়ি গুলি করে মারল কয়েকটা। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

ডিউটি মনে নেই। কিছুই মনে নেই যুগলকিশোরের। উঠল আবার এক সময়। বাইরে এল। মাথার ওপরে রোদ চনমনিয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে সমুদ্রের দিকে চলল। বেলা কত খেয়াল নেই। সামনে জেলেদের ডিঙি নৌকো একটা। অসহিষ্ণু পায়ে ওটাতে উঠে ভিতর দিকে ঠেলে দিল। সে তা পারবে কেন, পড়েই ঢেউয়ের আঘাত বেশি। নৌকো সুদ্ধু জলে উল্টে পড়ল সে। কিন্তু উঠল না। বসেই রইল। একটার পর একটা ঢেউয়ের আঘাত এসে লাগছে। আঘাতে আঘাতে নিজেকে সচেতন করে তুলতে চাইছে যুগলকিশোর।

ওদিকে মিঠে ঝিলের ওধারে, দিদু ঝোপের ওধারে, গর্জন গাছের নিচে বসেই

আছে বিলি। আর অবাক হয়ে ভাবছে আসছে না কেন লোকটা! সত্যিই সে শহরে যাবে ভেবেছে নাকি! এমন বোকাও হয়!

লোকটা এল প্রায় বিকেলের দিকে। মিঠে বিলের এধারে দাঁড়িয়ে মাথা-উঁচু গর্জন গাছটাকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। পা টানছে ওধারটায়। মিঠে বিলের ওধারে, দিদু ঝোপের ওধারে—গর্জন গাছের নিচে। জীবনের একদিনের, একটা ঘণ্টার স্মৃতি টানছে তাকে।

মিঠে বিলের ওধারে, দিদু ঝোপের ওধারে, গর্জন গাছের নিচে।...

যুগলকিশোর স্থির নিস্পন্দ পাথর একেবারে। তারপরেই গুলিবিদ্ধ জানোয়ারের মত আকাশ-ফাটান একটা অন্তিম চিৎকার করে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল।

...বিলি এসেছে। মাটিতে শুয়ে আছে। নারী অঙ্গে তীর বিঁধে আছে বিশ-পঁচিশটা। ঐ বিষাক্ত তীর তার চেনা। পিছনে তিরুর জঙ্গল।

উদ্বাস্তুদের মুখে দুটি জীবন-চিত্রের আভাস নিয়ে কাহিনীটা আর কেউ আর কোনোভাবে সাজাত কিনা জানি না। কিন্তু ঘাড়-পিঠ দুমড়োন ওই অকালবৃদ্ধ যুগলকিশোরের দিকে তাকালে আর তার ছাড়া-ছাড়া খেদগুলো কান পেতে শুনলে গল্পের কাঠামোটা বদলান যায় বলে আমার মনে হয় না। দুই-একদিন দু-পাঁচ মিনিট বসেওছে কাছে, ওই দোষারোপ করা ছাড়া আর অন্য একটা কথাও বলে নি। তার সেই বিড়বিড় অভিযোগ কানে লেগে আছে, আসার দিনও শুনেছি। ...বাঙালী বড় নির্দয় নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে জানে। এমন আর কেউ জানে না। সে অপরাধ করল, কাজে গাফিলতি করল, জংলীর তীরে একটা মেয়ে মরে গেল—তার বাঙালী অফিসার তবু তাকে শাস্তি দিল না, তার বন্দুক কেড়ে নিল না, তার মেডেল খুলে নিল না, তাকে নিয়ে জেলে পুরল না। আগের দিন হলে তাকে জেলে পোরা হত, তারপর তার ফাঁসী হত, তারপর লাশটা সমুদ্রের হাঙরদের খাওয়ান হত। আর্মিতে থাকলে তার বিচার হত তারপর। কিন্তু তার বাঙালী মুরুব্বী সব জানল, সব শুনল, সব খোঁজখবর নিল—তারপর তাকে আগের মতই সর্দার করে জঙ্গলের পাহারায় বসিয়ে রাখল। ...এমন শাস্তিও মানুষ মানুষকে দেয়!

বিড়বিড় করে বকতে বকতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে মিঠে বিলের ওধারে চলে গিয়েছিল। দিদু ঝোপের ওধারে। গর্জন গাছের নিচে। সেখানে সে নিজস্ব একার ঝুপড়ি বেঁধেছে। সেখানে আর কারো পদার্পণ নিষেধ।

বিশ্বাস, পিছনের তিরুর জঙ্গল থেকে আচমকা এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর তাকেও কোনো একদিন মাটিতে শুইয়ে দেবে, এই আশায় আছে সে। সে বিষে তার বুকের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োতে পারে।

মুখে বলুক না বলুক, গগন আচার্যকে একটু আলাদা মর্যাদা সকলেই দেয়। তার কাছে গেলে খরচ বেশি। কিন্তু সেও খুব গায়ে লাগে না। পাড়ায় পাড়ায় আজকাল প্রতিমার মুখশ্রী নিয়ে রেষারেষি হয়। খবরের কাগজে সারি সারি প্রতিমার ছবি ওঠে। মায়ের শ্রী-বিচারে কোন্ পল্লী সকলকে ছাড়াল—পাড়ায় ছেলে-ছোকরা মাতব্বরদের মধ্যে এ নিয়ে নরম-গরম আলোচনা হয়। তাই এ ব্যাপারে দশ-বিশ টাকা বেশি খরচ, বেশি বলে ভাবে না কেউ।

ফলে পূজোর ক'মাস আগে থেকেই কাজের চাপে গগন আচার্য হিমসিম খায়। সময়ে তাকে ধরতে না পারলে বিড়ি টানতে টানতে একগাল হেসেই সে খদ্দের ফেরায়। মিষ্টি করে বলে, এ বছর আর হল না বাবুমশায়রা, আসছে বারে করে দেব।

যারা ভালো করে জানে না তাকে, এই জবাবের পরেও তারা সময় নষ্ট করে, জোর-জুলুম করে। কেউ ভাবে, মোচড় দিয়ে লোকটার টাকা আদায়ের ফন্দি। কেউ বা সরাসরি টাকার টোপ ফেলে। সহাস্যবদন গগন আচার্যর ওই একই জবাব, এবছর হাতজোড়া বাবুমশায়রা, সামনের বারে আগে থাকতে আসবেন। মায়ের কথাটাই আগে ভাববেন।

কিন্তু আসে যারা তারা কেউ সামনের বারের কথা ভেবে আসে না। তাই অনেকে এমন মুখ করে ফেরে যেন জীবনে আর এমুখো হবে না। গগন আচার্যর হাসিমুখ দেখে আমার হাসিও পায়, আবার অবাকও লাগে। এই সাদাসিধে লোকটার মধ্যে কোথায় যেন ভারি সহজ একটা জোরের উৎস আছে। যার দরুন এযুগেও তার কারো মন জুগিয়ে চলতে হয় না। এমন এক-একটা কথা অনায়াসে বলে বসে যা শুনলে অনেক সময়ে ধাক্কা লাগে, চমক লাগে, মুখে কথা সরে না। অথচ সে-সব কটু-কথা নয়, মিষ্টি কথা। কটু-কথা বলতে তাকে কখনো শুনি নি আমি।

পূজোর সময় কলকাতায় থাকলে আমি মাঝে মাঝে তার কাছে আসি। চুপচাপ বসে তার কাজ দেখতে ভালো লাগে। গগন আচার্য বিড়ি টানে আর তুলি চালায়। কোনো সূক্ষ্ম রেখা বিন্যাস করার সময় বিড়ি দাঁতে কামড়ে ধরে, চোখ দুটো পাথরের মত নিশ্চল করে কাঠামোর দিকে চেয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে কিছু একটা জটিলতার সমাধান করে নেয়। তারপর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিড়িতে সুখটান দেয়, নয়ত নতুন বিড়ি ধরায়। গোড়ায় গোড়ায় পকেট থেকে সিগারেট বার করে দিতাম। সৌজন্যের খাতিরে নিত। কিন্তু হৃদ্যতা বাড়ার পর মুখ ফুটে বলেছিল, সিগারেট মুখে নিয়ে কাজে মন বসে না বাবুমশায়, বিড়ির দাস হয়ে গেছি—আপনি আমার একটা বিড়ি খেয়ে দেখেন বরং।

হাল্কা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গগন আচার্য এটা-সেটা বলে, গল্প করে। তার রঙ-তুলির গল্প নয়, পেশার কথা নয়। দিনকালের কথা। রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে এমন এক-একটা প্রশ্ন করে বসে যে কখনো থতমত খেতে হয়, কখনো হাসি পায়। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে এ সময়ে খদ্দেরদের সঙ্গে তার বচন-বাচন শুনতে। রসিয়ে মজিয়ে বেশ শোনার মত কথা বলে গগন আচার্য।

কিন্তু আগে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই আর একটু বলে নেওয়া দরকার। গগন আচার্য প্রতিমা গড়ে না, প্রতিমা রঙ করে। বংশপরম্পরায় তারা এই রঙের কাজই করে আসছে। নিজে সে মাটির কাজও জানে, নিজের হাতে প্রতিমা গড়লে লাভের অংশ বাড়ত। কিন্তু সে লোভ নেই। তার জমিতে তিন-চার ঘর কুমোর বসিয়েছে। তারা প্রজা। অনেক কাল আগে সস্তা-গণ্ডার দিনে গগন আচার্য খানিকটা জমি কিনে রেখেছিল। সেই জমির দাম এখন সোনার দামে চড়েছে। নিজের ভিতরটুকু রেখে বাকিটুকু বেচে দিলে, গগন আচার্য তো বটেই, তার ছেলেদুটোও স্বচ্ছন্দে পায়ে পা-তুলে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ চিন্তাও গগন আচার্যর মাথায় ঢোকে নি। অতএব তার জমিতে যারা আছে তারা আছেই। গগন আচার্য সামান্য ভাড়া পেয়েই খুশী। অবশ্য এখানে মূর্তি যারা গড়ে তারা তার নির্দেশ মতই গড়ে। গগন আচার্য ন্যায্য মূল্য দিয়ে কেনে সেগুলো। তারপর রঙের কাজ করে।

এই জন্যেই তার প্রতিমার দাম বেশি। সাধারণত কাঠামো যারা গড়ে তারাই রঙের কাজ করে। তাই লাভের সঙ্গে তার ইচ্ছেমত আপস করতে পারে। কিন্তু গগন আচার্যর সে উপায় নেই। একটি চুক্তির মধ্যে তার নিজের পোষাতে হবে, আর মাটির কারিগরেরও পোষাতে হবে।

লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ বছর কয়েক আগে। নিজের কোনো কাজে তখন পটশিল্পীদের কিছু গল্প-কথা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন এই একজনের নাম অনেকের মুখে শুনেছি। অনেকে বলেছে, আপনি আচায্যি মশায়ের কাছে যান বাবু, উনি গুণী লোক, আঁকা-ইস্কুলের পাস-করা লোক—উনি অনেক গল্প শোনাতে পারবেন আপনাকে।

শুনে বেশ অবাক হয়েছিলাম। আর্ট স্কুলের পাস-করা লোক প্রতিমার রঙ করে—এ আর শুনি নি। কৌতূহল নিয়ে এসেছিলাম। বছর পঞ্চাশ হবে বয়েস। কদম-ছাঁট চুলের প্রায় সবই সাদা। তার মজবুত দেহ না হলে বুড়ো ভাবতুম। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি। একটু বাদে বাদেই বিড়ির খোঁজে ফতুয়ার পকেট হাতড়ায়। দেখলে পাস-করা আর্টিস্ট কেউ বলবে না। জানা থাকলেও সত্যি কিনা সন্দেহ হবে।

কথাবার্তায় এমন নম্র তেমনি সহজ। আমার কাজ মিটে যাবার পরেও এই লোকটি আর তার এই কাজের পরিবেশ আমাকে টানত। ফাঁক পেলেই আসতুম। লোকটা খুশিতে গলে যেত। এই থেকেই হৃদ্যতা। আমি লিখি বলে আমাকে মস্ত গুণী লোক ঠাউরেছে সে। আমি যে আরো অনেক বড় গুণীর জীবনের তাপ আর স্পর্শ নিতে আসি, সে আর মুখ ফুটে বলতে পারি না। অনেকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও খদ্দেরদের

মত সে আমাকেও বাবুমশাই বলে। আগে তো এলেই পায়ের ধুলো নেবার জন্য হাত বাড়াত। আমি রাগ করতে তবে সে-চেষ্টা ছেড়েছে। কিন্তু আফসোসের সুরে বলেছে, আপনি বামুন, নিতে দোষ কি!

দোষগুণের প্রসঙ্গ ছেড়ে বলেছি, বামুন তো আপনিও।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে চার আঙুল জিভ্ কেটে যেন শোনার পাপ খণ্ডন করতে চেয়েছে। বলেছে, আমরা বামুনের কলঙ্ক, এমন কথা বলবেন না বাবুমশায়।

এ-কথার তাৎপর্য পরে বুঝেছি।

পূজোর ক'মাস আগে থেকেই সারি সারি কাঠামোয় উঠোনগুলো ভরে ওঠে! ছোট বড় নানা আকারের। কিন্তু আমি একটার সঙ্গে তার একটার তফাত করতে পারি না খুব। সবই একরকম লাগে। ওতে একটা আকারের আভাস আছে শুধু। কিন্তু গগন আচার্য তুলি আর রঙের মালসা নিয়ে বসলে, অন্য ব্যাপার। তার কাজ শেষ হলে দেখি কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। কোনো মুখ হাসি হাসি, কোনো মুখে বরাভয়ের আশ্বাস, কোনো মুখে স্বলন্ত রোষ। লোকটির সব থেকে বেশি নিবিষ্টতা দেখি প্রতিমার চোখ আঁকার সময়। সেই চোখের আলোই যেন শেষ পর্যন্ত মুখে ঠিকরোয। চোখের কাজ সবশেষে। তখন অন্যান্য কারিগররাও এসে নিঃশব্দে দাঁড়িযে দেখে। গগন আচার্যর লেখাপড়া-জানা ছেলেও মাঝে মধ্যে এসে চুপচাপ দাঁড়িযে থাকে, এমন কি আচার্যর বউকেও এক আধ সময দেখা যায় কোনো এক কোণে এক-গলা ঘোমটার ফাঁকে স্বামীর কাজ নিরীক্ষণ করছে।

কিন্তু দিনকাল বদলেছে। বদলাচ্ছে। নতুন মানুষেবা ধারা-বদল চাইছে। তাই গগন আচার্যর যে প্রশংসাই জোটে সবসময়, তা নয়। পুরোন খদ্দেররা এসে প্রতিমার অর্ডাব দেয়, আবার অসন্তোষও প্রকাশ করে। বলে, তোমার কাজ বড় একঘেযে হযে যাচ্ছে আচায্যি মশাই, নতুন কিছু কর—সেই তো একরকমই দেখে আসছি।

গগন আচার্য হাসে। যেন ভারী মজার কথা কিছু। বলে, জন্মেতক তো চন্দ্র-সূয্যিটাকেও একরকমই দেখে আসছেন বাবুমশাযরা—

সেবারে এই নিয়েই এক পয়সাওয়ালা পুরনো পার্টির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল। গগন আচার্যর কতটা লোকসান হয়েছিল বলতে পারি না। আমার কিছু লাভ হয়েছিল।

দলের এক আধুনিক পাস-করা আর্টিস্টকে দিয়ে প্রতিমার ছবি আঁকিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা। ঠিক এই রকমটি গডে দিতে হবে। আঁকাটা দেখে গগন আচার্য গম্ভীর। একটি কথাও না বলে সে উঠে ভিতরে চলে গেল। ছবিটা সেই অবকাশে আমিও দেখলাম। মায়ের তীক্ষ্ণ অস্ত্র অসুরের বুকে যতটা না বিঁধেছে, তার থেকে অনেক বেশি বিঁধেছে মায়ের লাস্যময়ী রূপের শর। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সকৌতুকে তাদের সমুদ্র-যৌবনা মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখছে যেন।

গগন আচার্য ফিরে এল, তার হাতে মোটা একটা বাঁধান অ্যালবাম। বলল, এই থেকে একটা বেছে নিন বাবুমশায়রা, এর বাইরে আমি আর কিছু করতে পারব না।

টাকাওয়ালা দলের মুখ ঘোরালো গম্ভীর। অ্যালবামের নমুনা দেখল। দলের মাতব্বর ঝাঁঝালো প্রশ্ন করল, তুমি ঠিক এই রকমটি গড়ে দেবে কিনা?

গগন আচার্য হাসিমুখে মাথা নাড়ল। বলল, আমার অত বিদ্যে নেই বাবুমশায়রা, পারলে দিতুম।

ওরা রাগ করে চলে গেল। গগন আচার্য হাসতে হাসতে বিড়ি ধরাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, পুরনো খদ্দের ভাঙল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা দিত?

—অনেক।

নরম করে বললাম, আপনি লেখাপড়া-জানা পাস-করা আর্টিস্ট, একটা কিছু করে দিলেও তো পারতেন, ওরা একজায়গা না একজায়গা থেকে তো করাবেই—

গগন আচার্যর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বিড়ি হাতে নিয়ে বলল, আমি অতি নগণ্য, আপনি তো কত লেখেন, কত পড়েন—মায়ের সঙ্গে ছেলের খারাপ সম্পর্কের কথা লিখে সমর্থন করতে পারেন?

কানে ঘা লাগার মত কথা। শুনতেও অস্বস্তি। খানিক চুপ করে থেকে আবার বললাম, এ না-হয় নাই করলেন, কিন্তু দিনকাল বদলাচ্ছে, লোকেরা পছন্দ বদলাচ্ছে, একটু-আধটু নতুন কিছু তো আপনি ইচ্ছে করলেই করতে পাবেন।

পারে কি পারে না, সে-জবাব দিল না। বলল, করা নিষেধ আছে।

—কার নিষেধ?

—গুরুর।

আমি গল্পকার। গল্পের ঘ্রাণ পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার গুরু কে?

বিড়ি ফেলে গগন আচার্য উঠে দাঁড়াল। ডাকল, আসুন—

সঠিক না বুঝেই অনুসরণ করলাম। তার বউ ঘোমটা টেনে চকিতে আড়ালে সরে গেল। ঘরের মধ্যে একটি মাটির মূর্তি। খালি গা, হাঁটু অবধি কাপড় পরেন। খুবই সাধারণ চেহারা, কিন্তু ভারী জীবন্ত। গলায় টাটকা ফুলের মালা।

—ইনি গুরু?

—হ্যাঁ। আমার বাবা।

এবারে খুব সংক্ষেপে গগন আচার্যর জীবনের একটুখানি সঞ্চয়ের কথা ব্যক্ত করব।

তাদের আদি নিবাস ছিল শান্তিপুরে। গগন আচার্যর বাবা জীবন আচার্য শুধু বাবুদের বাড়িতেই কাজ করত। এই রঙের কাজই। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, কার্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা—সংবৎসর কোনো না কোনো পূজা লেগেই থাকত বাবুদের বাড়িতে। কিন্তু সব থেকে ঘটা হত, ধূমধাম হত দুর্গাপূজার সময়। অনেক আগে থাকতেই সাড়া পড়ে যেত।

বাবুরা বলতে গেলে জীবন আচার্যকে পুষতেন। বাবুদের বাবার আমল থেকে জীবন আচার্যর বাবা এই রঙের কাজ করে আসছে। তাঁদের কাছ থেকে জায়গা-জমি

পেয়েছে, ঘর তোলার টাকা পেয়েছে, তাই বংশপরম্পরায় বাবুদের অনুগত দাস তারা। জীবন আচার্যর রঙের কাজে নাম ছিল। বড়কর্তাবাবু কুমোরকাকাকে বলতেন, নিজে মাতব্বরি না করে আচায্যিকে ডেকে আগে বুঝে নে, কি রকম হবে-টবে। তার কাজ শেষ হলে তবে বুঝব কি করেছিস।

জীবন আচার্যকে ডেকে বলতেন, দেখ হে আচায্যি, নাম যেন থাকে।

খুব ছোটবেলার কথাও মনে আছে গগন আচার্যর। মাটির কাজ শেষ হয়ে গেলে রঙের মালসা আর তুলি নিয়ে বাবা এসে বসত ঠাকুর দালানে। চুপচাপ চেয়ে চেয়ে সেই মাটির মূর্তি দেখত প্রথম। কতক্ষণ ধরে দেখত ঠিক নেই। এক-সময় মনে হত বাবার বুঝি হুঁশ নেই।

তারপর একসময় দিশা ফিরত যেন। প্রতিমার পায়ে আলতা পরিয়ে কাজ শুরু করত। তারপর ক'টা দিন আর নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকত না। টেনে তুলে নিয়ে যেতে হত। গগন আচার্য হাঁ করে বাবার রঙ-বোলানো দেখত। ভাবত, বাবা বুঝি ম্যাজিক জানে। রঙের ম্যাজিক।

সবশেষে প্রতিমার চোখ বসান হত। চোখ বসানোর সময় যত কাছে এগিয়ে আসত বাবা তত গম্ভীর হয়ে যেত। মনে হত বাবার চোখের মধ্যে একগাদা জল জমাট বেঁধে আছে।

চোখ বসান হলেই বাবার কাজ শেষ। তারপর আর সেই ঘরে ঢোকা নিষেধ। তারা অন্ত্যজ বামুন। পুরুত এসে আসনে বসে প্রথম মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর তাদের ঠাকুরদালানে ঠাঁই নেই। কিন্তু পূজোর ক'টা দিন ঠাকুরদালান ছেড়ে নড়তে চাইত না গগন আচার্যর বাবা। দূরে এক কোণে দুহাত জোড় করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। সকলে তার প্রশংসা করত। বলত, মা যেন হাসছে। এক জন আর একজনকে ডেকে মায়ের চোখ দেখাত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, এই চোখে যেন কত কি....। পুরুতের যান্ত্রিক মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত চলত! ফুল ছুঁড়তেন, চন্দন ছিটোতেন জল ছিটোতেন। পূজোর অঙ্গ সে-সব, তাই কারো চোখে কিছু পড়ত না। কিন্তু তার বাবার চোখে অনেক সময়েই বিঁধত কিছু। পুরুতের অনবধানে সেই জলের ছিটে চন্দনের ছিটে প্রতিমার নাকে মুখে এসেই লাগত। গগন আচার্য লক্ষ্য করত, তার বাবার মুখখানা তখন ব্যথায় কুঁচকে উঠত। এত যত্নের রঙ-করা মুখে একটু জলের দাগও সহ্য করতে পারত না তার বাবা।

গগন আচার্য যখন ম্যাট্রিক পাস দিয়ে ফেলল, সেটা সকলের কাছেই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার তার বাবার কাছেই। হেসে নেচে ছোটাছুটি করে আনন্দে আটখানা একেবারে। বাবুদের কাছেই দৌড়ে গেল প্রথম। বাবুরা বাহবা দিলেন। বললেন, ছেলে যা পড়তে চায় পড়াও, খরচ দেব'খন।

জীবন আচার্যর আরো আনন্দ ছেলে আঁকার ইস্কুলে পড়বে শুনে। তার মত হেঁজি-পেঁজি আঁকিয়ে নয়, পাস-করা আর্টিস্ট হবে ছেলে। গগন আচার্য কলকাতায় এসে আঁকার ইস্কুলে ভর্তি হল। ক'টা বছব গেল। ছুটিতে দেশে আসে। বাবুরা,

গণ্যমান্য জনেরা, তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলে। গগন আচার্য চালচলনে তখন পাক্কা আর্টিস্ট বনে গেছে। বাবরি চুল রেখেছে, সপ্তাহে একদিনের বেশি চুলে তেল পড়ে না। ধপধপে ফর্সা ধুতি পরে, লম্বা পাঞ্জাবি গায়ে দেয়। সিগারেট খায়।

জীবন আচার্য হাঁ করে কৃতী ছেলেকে দেখে, আর আনন্দে গর্বে ভরপুর হয়ে ওঠে। ছেলে বাপকে সামনা-সামনি ব্যথা দেয় নি কখনো, কিন্তু বাপের প্রতি তার বেশ অবজ্ঞা ছিল। বাপ যে আঁকার কিছুই জানে না সেটা ততদিনে সে ভালোই বুঝেছে। বুড়ো লাইট অ্যাণ্ড শেড বোঝে না, তার পার্‌সপেকটিভ জ্ঞান নেই, প্রোপোরশন জানে না, অ্যানাটমি জানে না। গগন আচার্যর মা আর বউ মুগ্ধ হয়ে শোনে তার কথা। পাস-করার আগেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিল জীবন আচার্য। এইসব দুর্বোধ্য শব্দ বাপের কানেও যায়, হাঁ করে শোনে, আর আনন্দের বন্যায় ভাসে।

গগন আচার্য পাস করে বেরুল। তাদের ছোট্ট পরিবারে আবার খুশীর জোয়ার এল। কিন্তু বিধাতা সেই বছরই এক বিচিত্র রকমের গোলযোগ ঘটিয়ে বসলেন। জীবন আচার্য অনেকদিন ধরেই অসুখে ভুগছিল। পূজোর মুখে অসুখটা বাড়াবাড়ির দিকে গড়াল। তাকে টেনে তোলার জন্যে কর্তাবাবুরাই কবিরাজ পাঠালেন। কবিরাজ ওষুধের পর ওষুধ দিয়েই চলেছেন। কিন্তু দিনে দিনে জীবন আচার্যর দেহ-যন্ত্রটি বিকলই হতে লাগল।

এখন প্রতিমার কাজ কে করে? কিন্তু সে-জন্যে ভাবনা নেই জীবন আচার্যর, তার ছেলে আছে, কৃতী ছেলে। বাবুরা শুনে বললেন, বেশ কথা, সেই এক রকমই তো হয়ে আসছে, এবারে নতুন হাতে নতুন কিছু হবে।

বাবুরা খুশী, শয্যাশায়ী জীবন আচার্য নিশ্চিন্ত, গগন আচার্য মনে মনে গর্বিত।

তার চালচিত্রের নমুনা দেখেই কিন্তু জীবন আচার্য একটু খুঁত খুঁত করতে লাগল। বারবার দেবদেবীর যুদ্ধবিগ্রহ দিয়েই চালচিত্র এঁকে এসেছে সে—এবারেও তাই আছে। কিন্তু এইসব দেব-দেবীদের যেন একটু কষ্ট করে চিনতে হয।

বাপের দ্বিধা দেখে ছেলে হাসে। বলে, হবে যখন তখন দেখ, এখন ঠিক বুঝবে না।

জীবন আচার্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রোগে রোগে ভালো কিছু বোঝার ক্ষমতাই গেছে তার। এ-যাত্রা আর উঠে দাঁড়াবে কিনা কে জানে!

কাজ শুরু হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত গ্যাসের আলো জ্বেলে কাজ করে গগন আচার্য। তারপর কাপড় দিয়ে প্রতিমার মুখ ঢেকে রেখে চলে আসে। একটা রাত যায় আর পাস-করা গগন আচার্যর মুখ থমথমিয়ে ওঠে। চেনামুখ এড়িয়ে চলে সে, বিশেষ করে বাপের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বেশি ডাকাডাকি করলে ধমকায়, সব ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। ...বাবুদের সামনে পড়লে হাসি হাসি মুখ করে থাকে, হাসি মুখে কথা কয়। কিন্তু নিরিবিলিতে দারুণ অস্বস্তি। সমস্ত রাত যেন কাল-ঘাম ছোটে গগন আচার্যর, একটার পর একটা সিগারেট পোড়ে, মায়ের মুখের আঁকা রঙ তুলতে বসে, চোখ ঘষে মুছে সমান করে দিয়ে নতুন করে রঙের তুলি হাতে নেয়।

শেষের রাত। এই রাত পোহালে প্রাথমিক অনুষ্ঠান। গগন আচার্যর হাড়-পাঁজরসুদ্ধ ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। রাত বাড়ছে। শিয়াল ডাকছে। তারা যেন সোল্লাসে গগন আচার্যর মৃত্যু ঘোষণা করছে। শেষবারের মত শেষ চেষ্টা করে তুলি ফেলে দিল গগন আচার্য। উঠে দাঁড়াল। পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। সে-ই নিশুতি রাত সেখানকার! গগন আচার্যর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। কি করবে সে? আত্মহত্যা করবে? যে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি ˙ জ্বলন্ত চোখে সেই মূর্তির দিকেই তাকাল সে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। বাবার ঘর। মায়ের ঘুম গাঢ়। জাগবার ভয় নেই। ঘুমন্ত বাবার গায়ে হাত রাখল। কিন্তু হাতে যেন তপ্ত ছ্যাঁকা লাগল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ঘরের আবছা অন্ধকারে জীবন আচার্য চমকে উঠল। —কে?

—আমি খোকা।

জীবন আচার্য সত্রাসে উঠে বসতে চেষ্টা করল। ছেলের হাতে ভর করে বসতে পারল। —কি হয়েছে?

অস্ফুট চাপা ঝাঁঝে ছেলে বলল, তোমাকে একবার আসতে হবে।

রোগেজর্জর জীবন আচার্য দিশেহারা! —আমাকে, কোথায়?

—বাবুদের ঠাকুরদালানে।

জীবন আচার্য স্থাণুর মত বসে। যেন হুঁশ নেই। অনেকক্ষণ বাদে জীর্ণ দুমড়োন দেহটা সোজা করে চৌকি থেমে নামল। বিছানা থেকে মোটা চাদরটা তুলে গায়ে জড়াল।

—চল।

জংলা রাস্তা ধরে ছেলের বাহুতে ভর করে সে ঠাকুরদালানে এসে দাঁড়াল। প্রতিমার দিকে চেয়েই পাথর একেবারে। ছেলে চিত্রার্পিতের মত পিছনে দাঁড়িয়ে।

আস্তে আস্তে ঘুরে তাকাল তার দিকে। জরাজীর্ণ পাংশু মুখে দুটো চোখ যেন ধকধকিয়ে জ্বলছে। ছেলে মাথা নামিয়ে নিল।

চারদিকে পোড়া সিগারেটের টুকরোয় একাকার। জীবন আচার্য আদেশ দিল, এগুলো পরিষ্কার কর।

বাকী সমস্ত রাত কাজ চলল। গগন অসাড় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

ভোর রাতে তুলি রাখল জীবন আচার্য। মেরুদণ্ডটা এবারে দ্বিগুণ বেঁকে গেল। আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে প্রতিমা দেখল। বিশীর্ণ দুই হাত জুড়ে কপালে ঠেকাল। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল শুধু। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি যে প্রতিমার, তারই কাছে ছেলের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে গেল, ছেলে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে।

পরদিন, আর তার পরদিন। পূজা শুরু হয়েছে। দলে দলে লোক আসছে। প্রতিমা দেখছে। গোড়ায় গোড়ায় দুই-একজন খুঁতখুঁত করেছে, কেমন যেন হল। অবশ্য

নতুন লাগছে বটে। নতুনের সঙ্গে পুরনোর মিশেল। কর্তাবাবু জবাব দিয়েছেন, নতুন তো লাগবেই, পাস-করা আর্টিস্টের কাজ। ...অনেকে বলাবলি করেছে, মায়ের মুখখানা এবারে একটু বিষণ্ন গম্ভীর, চোখদুটোও তেমন হাসি-হাসি নয়। মুরুব্বিরা বলেছেন, কথা মিথ্যে নয়, কিন্তু কাজটা ঠিকই হয়েছে। দিনকাল যা পড়েছে, মায়ের হাসিমুখ হবে কোথা থেকে! পাস-করা আর্টিস্টের চিন্তার বাহাদুরি আছে।

শুধু একজনই জানে—মা কেন বিষণ্ন, মায়ের চোখ কেন হাসছে না! শুধু একজনই জানে, কতটা হয়েছে আর তার কতগুণ হয় নি।

আবারও রাত গভীর। কিন্তু গগন আচার্যর মা তখনো ঘুমোয় নি। ঘরে বউও ঘুমোয় নি বোধহয়। কিছু একটা ঘটেছে ভেবে তারাও শঙ্কিত। কিন্তু কি-যে হয়েছে ভেবে পায় নি। বাবার গলা শুনে মা ধড়মড়িয়ে উঠে গেল। অন্ধকারে বাবা বলেছে, আলোটা জ্বাল।

মা দরজার বাইরে থেকে প্রায় নিবন্ত হারিকেনটা এনে উসকে দিল। বাবার পা দুটো আঁকড়ে ধরে সেই পায়ে মাথা গুঁজে পড়ে আছে ছেলে। ফুলে ফুলে কাঁদছে।

জীবন আচার্য হাসছে। ছেলেকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করে বলল, ওঠ, কাঁদিস না, তোর চোখ খুলেছে যখন, সব হবে। সামনের বারে আরো অনেক ভালো হবে দেখিস, মাযের কাছে আমি শুধু বলেছি, মা ওকে চোখ দিও। মা আমার কথা শুনেছে, কাঁদিস না, ওঠ—

বিজযা দশমীর তিনদিন পরে জীবন আচার্য চোখ বুজেছে।

বোরখা

নায়ক ছেড়ে এই কাহিনীর লেখকও আমি নই। আমি অনেকটা মুনশীর কাজ করছি। অর্থাৎ, কারো কাছ থেকে শুনে লিখছি। কিন্তু শোনাটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নয়, ডাইরেক্ট। এর নায়ক বা নিয়ামক আমাদের কুঞ্জলাল।

আমাদের কুঞ্জলাল বলতে যাঁরা আমাদের সতীর্থ বা সমসাময়িক, তাঁরাই চিনবেন। কারণ, কুঞ্জলালকে সেদিন য়ুনিভার্সিটির তো বটেই, আশপাশের কলেজের বহু ছেলেমেয়েও চিনত। প্রণয়ের ব্যাপারে কন্দর্পদেবটি তার বক্ষ-বরাবর একখানি শর উঁচিয়েই ছিলেন। কুঞ্জলালের অবিমিশ্র বাঙালী-প্রীতি আমাদের চক্ষু এবং জঠরগত লাভের কারণ ছিল। তার পয়সায় রেস্টুরেন্টে কত চপ-কাটলেট খেয়েছি, কত ছবি আর খেলা দেখেছি ঠিক নেই।

ইউ.পি-র শেঠেরা টাকা চেনে শুনেছিলাম। ব্যবসা ছাড়া এমনিতেও টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ায়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কুঞ্জলাল শেঠ-কুলের কলঙ্ক! সে টাকা

গোছাতে জানে না, টাকা ছড়াতে জানে।

তার বাবা মানিকলাল শেঠ লক্ষ্ণৌয়ের নাম-করা চিকন কাপড়ের কারবারী। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছিল, কিন্তু একটাও টেঁকে নি। কুঞ্জলালের দু বছর বয়সের সময় তার মাসি তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। ছেলে নেই ভাবলে যদি ছেলে থাকে, সেই চেষ্টা করতে তাঁর আপত্তি নেই। এই উপায়টা ছেলের মাসি আর আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছিল। বলা বাহুল্য, যে যোগাযোগেই হোক এই ছেলেটা বেঁচেছে, অন্যথায় এ কাহিনীর সূত্রপাত হত না।

কুঞ্জলাল কলকাতায় ম্যাট্রিক পাস করার পর তার বাবা তাকে কারবারে নিয়ে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কারণ তখনো ফাঁড়ার ভয় একেবারে কাটে নি। আই-এ পাস করার পর ছেলেকে নিয়ে যাবার আগ্রহ আর একটু বেড়েছিল, কিন্তু মাসি দেন নি। বি-এ পাস করার পর তো রীতিমত বকাবকি করেছিলেন, ছেলের এত বিদ্যে তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছেলে নিজেই তখন বেঁকে বসেছে—এম-এ সে পড়বেই। তারপর এই দুই বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, সত্রাসে লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁকেই বার কয়েক কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে।

একবার, যখন রত্না বোসকে সপ্তাহে সাতদিন, মাসে তিরিশ দিন কুঞ্জলাল মাসির গাড়িতে চড়াতে শুরু করেছিল। মাসির ছোট গাড়িটা সর্বক্ষণ তারই হেপাজতে থাকত। সে গাড়িতে আমরাও হামেশা চড়তাম, কিন্তু সেটা তেমন কারো চোখে পড়ত না। রত্না বোস চড়লে পড়ত। বেগতিক দেখে মাসি বাপকে খবর দিয়েছিলেন। বাপ রাশভারি লোক, বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতির। অন্যান্য সকলের দেখাদেখি ছেলেও তাঁকে কম সমীহ করে না। কিন্তু সেই নতুন বয়সের রোমান্সের জট ছাড়াতে ভদ্রলোকটিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে মেয়ের বাপের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। মেয়ের বাপেরও অবস্থা ভালো, কিন্তু কুঞ্জলাল যে এমন নিরেট অবাঙালী, সেটা তার বাবাকে না দেখা পর্যন্ত ভদ্রলোক অনুমান করতে পারেন নি। একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই দুজনকেই বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়েছেন। মেয়ের বাবার অবস্থা যদিও ভালো, তবু এই খরচের ভারটা কুঞ্জলালের বাবা বহন করেছেন কিনা, সেই সংশয়ে অনেককে কানাকানি করতে দেখা গেছে। কুঞ্জলাল আমাদের মতই ফূর্তি করে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, আর বিষণ্ন মুখে বিলেতগামী জাহাজ সী-অফ করেছে।

এম-এ পড়তে পড়তেই কুঞ্জলাল দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার প্রেমে পড়েছে। এরাও বাঙালী মেয়েই। প্রৌঢ় মানিকলালকে আরও বার কয়েক কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তবে এগুলো প্রথমবারের মত অত জোরাল প্রেম নয়। মানিকলালকে এগুলোর ধকল সামলে উঠতে খুব বেগ পেতে হয় নি। ত্যাজ্যপুত্র করার ভ্রূকুটিতেই ছেলে ঠাণ্ডা হয়েছে।

এই কুঞ্জলাল একযুগ ধরে আমার সহপাঠী। স্কুল-কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে তার মার্কা-মারা সাজ-সজ্জায় বদল হয় নি, জামাকাপড়ের মাপ বদলেছে শুধু। চিকনের

কারুকার্য-করা পাঞ্জাবির ওপর কুর্তা চাপিয়ে আসত। আমাদের অনেক চিকনের জামা টামা উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে লোভ থাকলেও আমরা ভরসা করে সেগুলো নিতে পারি নি। বরাবর চিকন পরত বলে ওকে সকলে বলত 'চিকন-বাবু'। আমাদের কি বলবে ঠিক কি!

তাছাড়া আমাদের বেশভূষা চাল-চলনের প্রতি তির্যক দৃষ্টি হানবার মত অভিভাবক ছিলেন বাড়িতে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা চলতে পারে। লুকিয়ে সাজ-সজ্জা চলবে কেমন করে?

এম-এ পাস করার পর তার বাবার কবলে পড়ল কুঞ্জলাল। ওদের সতের পুরুষের মধ্যে কেউ এম-এ পাস করে নি। তাই কুঞ্জলাল তার বাপের কারবারে টিঁকে থাকবে এ আমরা একবারও ভাবি নি। কুঞ্জলালও ভাবে নি বোধহয়। লক্ষ্ণৌতে সে একটা বড় চাকরিই বাগিয়ে বসেছিল, শুনেছিলাম। সাতদিন না যেতে চাকরি ছেড়েছিল, তাও কানে এসেছে। কুঞ্জলাল লিখেছিল, বাংলা দেশে এতকাল থাকলাম, সেখানেই মানুষ হলাম, কিন্তু চাকরি কি করে বরদাস্ত করতে হয়, তাই শিখলাম না।

চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ক্রমশ স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। তারপর স্মৃতিও মুছে গেছে। এমন কি বিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌ এসেও কুঞ্জলালের কথা একটি বার মনে পড়ে নি।

নবাবের দেশ, ইতিহাসের দেশ, বিপর্যয়ের দেশে এসে আমি শুধু লেখার রসদ খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি যাঁর আশ্রিত তিনি এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। ভদ্রলোক ডাক্তার। সুরসিক। সাইকেল রিক্স আর টাঙ্গায় আপাদমস্তক কালো বোরখা-ঢাকা মহিলাদের প্রতি আমার একটু বিশেষ.লক্ষ্য দেখে তিনি অনেকরকম ঠাট্টা-ইশারা করেছেন। এমন কি কলকাতায় আমার গৃহিণীকে সাবধান করবেন বলেও শাসিয়েছেন।

কিন্তু সত্যিই আমার রহস্যের মত লাগত। বোরখা-ঢাকা প্রায় মুখগুলোই দেখতে ইচ্ছে করত। বোরখা জিনিসটার উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তির খবর জানি না। এককালে ওটা হয়ত নিষেধেরই নিদর্শন ছিল। কখনো-সখনো পুরুষ সন্নিধানে আসতে হলে চোখের আঁচ ঠেকাবার উপকরণ ছিল হয়ত ওটা। কিন্তু এখন অন্তঃপুরিকাদের পুরুষের সমান তালে পথে বেরনো নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই ওটা আর এখন নিষেধের বস্তু মনে হয় না, অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয়। সহজ সান্নিধ্যেও নিজেকে আড়ালে রেখে পুরুষ-চেতনা সচেতন রাখার মত লোভনীয় অঙ্গ-সজ্জা। যা দেখলে কৌতূহল জাগে, কল্পনার জাল বুনতে ইচ্ছে করে।

সামনে দিয়ে সেদিন ঝকঝকে একটা প্রাইভেট টাঙ্গায় দুজন বোরখা-ঢাকা মহিলা যাচ্ছিলেন। এক নজর তাকালেই অভিজাত মনে হয়। আমি কত নজর তাকিয়েছিলাম বলতে পারব না। টাঙ্গা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এই বোরখা-পরা মেয়েরা প্রায় সবাই কি অপরূপ সুন্দরী?

সঙ্গী জবাব দিলেন, সুন্দরী অনেক আছে, কিন্তু প্রায় সবাই কেন হবে? কেন বলুন তো?

—আমার তো প্রায় সকলকেই ভারী সুন্দরী বলে মনে হয়। হাতের আর পায়ের যতটুকু দেখা যায় ফুটফুট করছে—

সঙ্গী ঠাট্টা করলেন, সকলেই যেন চাঁদে ধোয়া, কেমন?

—তাই তো। দেখতে ইচ্ছে করে...

—আচ্ছা, আপনাকে চেষ্টা করব দু-চারটে দেখাতে। তারপর আর দেখতে ইচ্ছে করবে না—এতদিন ধরে এখানে ডাক্তারী করছি, দু-চারটে ছেড়ে দু-চারশ দেখেছি বোধহয়। প্রথম প্রথম ওই হাত দেখে আর পা দেখে আপনার মতই খুব দেখতে ইচ্ছে করত। মাথা ধরার ওষুধ নিতে এলেও, চোখ দেখা আর জিভ দেখার নাম করে কম দেখতাম না। এখন আর একটুও দেখতে ইচ্ছে করে না।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না, বিস্ময় লক্ষ্য করেই ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন।—আরে মশাই, এটা রঙের যুগ, ভুলে যান কেন? মনে রঙ এলে বাজারেব রঙ ঘরে আসতে কতক্ষণ! কত সুবিধে বলুন তো, শুধু হাত দুখানা আর পা দুখানা রঙ-পালিশ কবে নিলেই হল। আব নিখুঁতভাবে কবতেও পারে এরা, হাত দেখলে মনে হবে চাঁপার কলি, পা দেখে ভাববেন চরণকৌমুদি।

ছন্দপতন। ডাক্তার হলেই কি এমন বেরসিক হতে হয়! আমার সৌন্দর্য-কল্পনার জালটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এই জাল নিযে এরপর কোনো সত্যিকারের সুন্দরীকে ছেঁকে তোলা শক্ত।

এবারে কুঞ্জর কথা বলি। অর্থাৎ কুঞ্জলালের কথা। গৃহিণীর জন্য একখানা চিকন শাড়ি নিয়ে যাব বলে এক মস্ত দোকানে ঢুকে পড়েছি। মাঝে বিশটা বছরের ব্যবধান—লক্ষ্ণৌয়ে এসেছি, চিকন শাড়ি কিনব বলে এসেছি—তখনো কুঞ্জলালের কথা একটি বার মনেও পড়ে নি। সামনের গদির বৃদ্ধটি পরম সৌজন্যে আহ্বান জানালেন, আইয়ে—

ভিতরে মস্ত ফরাসে বড় কাঠের ক্যাশ-বাক্সর সামনে বসে যে লোকটি, সেও সবিনয় আপ্যায়ন জানাতে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দুজনের এই থমকানি থেকেই সংশয় দূর হয়ে গেল। কুঞ্জলাল ক্যাশ-বাক্স টপকে দুহাতে আমাকে জাপটে ধরে দু-চার ঝাঁকানির পরেই এমন একটা কাণ্ড করে বসল, যা দেখে দোকানের কর্মচারীরা আর অন্যান্য ক্রেতারা হাঁ। আমার শরীরের ভারও নেহাত কম নয়, ফলে আমাকে নিয়ে ফরাসের উপরেই একপ্রস্থ গড়াগড়ি। পরে দম নিতে নিতে বলল, তুই একটা ইডিয়ট, তুই একটা রাবিশ, কতকাল পরে দেখলাম রে তোকে! তুই একটা জেম্! পাকাপোক্ত লেখক বনে গেছিস একেবারে—অ্যাঁ? ...চোখ পাকাল, তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেই আমি কিনে ফেলি সে-খবর রাখিস? খাকিস কোন্ চুলোয়? প্রথম বই পড়ে দশ বছর আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম —নো রিপ্লাই। উঃ, তোকে এখন খুন করতে ইচ্ছে করছে আমার—

সকলের অগোচরে তার হাতের কাছ থেকে একটু সরে বসে হাসতে লাগলাম। কর্মচারীরা বা ক্রেতারা বাংলা না বুঝলেও উচ্ছ্বাস বুঝল। সামনের বৃদ্ধটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন আর হাসছেন মিটিমিটি। কুঞ্জলালের বাবা মানিকলাল নন, তাঁকে আমি কলকাতায় দেখেছি।

আজকের মত কুঞ্জলালের দোকানে বসা হয়ে গেল—আমার চিকন শাড়ি কেনাও। আমাকে নিয়ে উঠে পড়ল। বৃদ্ধটিকে বলল, কাকাজী, আমার পুরনো বন্ধু এসেছে—একসঙ্গে দশ বছর পড়েছি আমরা—আমি এখন দোকানে থাকছি না।

তারপর কয়েকটা দিন কুঞ্জলালের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় কেটেছে। কুঞ্জলাল বিয়ে-থা করেছে, ছেলেপুলে আছে। না বাঙালী মেয়ে নয়, স্বজাতীয়াকেই বিয়ে করেছে। তার বাবা বছর তিন-চার হল মারা গেছেন। এতবড় কারবারের সেই মালিক এখন।

এই সাক্ষাতের ফলে আমার কলকাতায় ফেরাই দিন কতক পিছিয়ে গেল। সকালের দিকে তার আড়তে বসে কথাবার্তা গল্প-গুজব হয়। মস্ত আড়ত। চিকনের কারিগররা সব এখানেই আসে। পারিশ্রমিক নেয়, অর্ডার-পত্র নয়। মেয়ে-পুরুষ দুই রকমের কারিগরই আছে। এর মধ্যে বর্ষীয়সী কয়েকটি রমণীর আপাদমস্তক বোরখা-ঢাকা কয়েকটি মেয়েকেও দেখলাম। কারো হাত-পা তেমনি ফুটফুটে ফর্সা। কিন্তু ডাক্তার-বন্ধু আমার রূপাভিসার কল্পনার ঝোঁকটা বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। এদের হাত-পায়ের দিকে চেয়ে আমি এখন উল্টে আসল রঙ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি।

কারিগরদের কাছে কুঞ্জলাল মনিব কড়া দেখলাম। কাজ মনের মত না হলে রূঢ় কথা মুখে আটকায় না—তা সে মেয়ে হোক, বা পুরুষ হোক। তবে কাজের হাত যাদের ভালো, তাদের সে অবজ্ঞা করে বলে মনে হল না। কিন্তু অন্যেরা তটস্থ তার সামনে।

সেদিনও তার আড়তে এসে দেখি, বোরখা-পরা একটি মেয়ে বসে। আগেও দেখেছি, কিন্তু দেখার মত নয়। অর্থাৎ, হাত আর পা শ্যামবর্ণা। তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হয়। মেয়েটি স্থির বসে আছে, আর কুঞ্জলাল তার সামনে ঝুঁকে বসে সাগ্রহে কতকগুলো অর্ডার বুঝিয়ে দিচ্ছে। রাজা-মহারাজার ঘরের অর্ডার, এর দায়দায়িত্ব এবং মুনাফা, সবই বেশি।

মেয়েটি মাঝে মাঝে সায় দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলছে, জী—।

অর্থাৎ, যা তাকে বোঝানো হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ওইটুকু থেকেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি মিষ্টি মনে হল আমার। অর্ডারগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যেই বিনীত অভিবাদন জানিয়ে মেয়েটি শান্ত পায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কোনো কারিগরের প্রতি কুঞ্জলালের এতটা সম্ভ্রমপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহার আর দেখি নি। মেয়েটি চলে যাবার পরেও কুঞ্জলালকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাল যেন। একটু বাদে আমাকে বলল, এই মেয়েটি আমার কারবারের সব থেকে সেরা কারিগর, মাস

গেলে কম করে পাঁচ-ছ'শ টাকা রোজগার করে। শী ইজ এ রিয়েল আর্টিস্ট।

এত ভালোর কদর হতেই পারে। কিন্তু কুঞ্জলালের হাব-ভাব আমার কেমন যেন লাগল—এর সবটুকুই ব্যবসায়সুলভ মনে হচ্ছে না। প্রশংসাটুকু একটু যেন আবেশ-মেশান। অথচ মেয়েটি তো চোখে পড়া বা মনে ধরার মত কিছু নয়। তার ওই হাত আর পায়ের আভাসের ওপর সাদাটে গোলাপী রঙ চড়ালে বরং চোখে অন্য রকম লাগতে পারত।

কি মনে হতে কুঞ্জলাল নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। সাগ্রহে বলল, তুই তো লেখক বনে গেছিস—একটা গল্প শুনবি? এ লাইফ?

আমি শঙ্কা বোধ করলাম। কুঞ্জলাল বিয়ে করেছে, ছেলেপুলের বাপ, বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—কিন্তু য়ুনিভার্সিটির সেই রোগ এখনো আছে নাকি!

কুঞ্জলাল আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের কথাটা বুঝল বোধহয়। বলল, তুমি যা ভাবছ বন্ধু, তা নয়—মেয়েটিকে আমি আজ পর্যন্ত চোখেও দেখি নি।

কুঞ্জলাল গল্প শুনিয়েছে। গল্পটা ভোলা সম্ভব নয়। শোনার পর মনে হয়েছে, না শুনলে লক্ষ্ণৌ আসা আমার ব্যর্থ হত।

বাপ বেঁচে থাকতেই কুঞ্জলাল কারবারের সমস্ত ভার নিজে নিয়েছিল। বাপ মানিকলাল প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কুঞ্জলাল আর ওই কাকাজীকে কারবার দেখতে হত। কুঞ্জলালের আমলে কারবারের অনেক উন্নতিও হয়েছে। সেই সময় ওই মেয়েটি কিছুদিন হয় কাজে লেগেছে। নাম রুমাবাঈ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের কাজ, কথা মত কাজ দিয়ে যায়—একটা দিনের জন্যেও কথার খেলাপ করে না। কুঞ্জলালের তখন কারবার ফাঁপানোর নেশা, যে ভালো কাজ করবে, যার কাজ দেখে ক্রেতা মুগ্ধ হবে, তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে, বা দ্বিগুণ কাজ দিতে তার আপত্তি নেই। দেখতে দেখতে রুমাবাঈয়ের রোজগার সকলকে ছাড়িয়ে গেল। সব থেকে সেরা অর্ডার নেবার জন্য তারই ডাক পড়ে।

অন্যান্য কারিগররা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ক্রমশ। তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল একটু একটু করে। একটু-আধটু রটনা শোনা যেতে লাগল। ব্যাপারটা কাকাজীর চোখেও ঘোরালো ঠেকল কেমন। মেয়েটি রূপসী মনে হলে আগেই সন্দেহ হত তাঁর, আগেই উতলা হতেন। কিন্তু রটনা কানে আসতে আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। ভাইপোর কলকাতার কাণ্ডকারখানা ভালোই জানেন। রূপ থাক আর না থাক, কে কোথায় মজে ঠিক কি! মেয়েটির হাতের কাজ ভালো তিনিও স্বীকার করেন, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাটাই আরো বড় করে দেখলেন তিনি। শুধু কাজ ভালো হলেই এত কদর হয় না—ভালো কাজ করে এমন বয়স্ক অভিজ্ঞ কারিগরও তো আছে!

ব্যাপারটা অগ্রজ, অর্থাৎ মানিকলালকে জানানো কর্তব্য বোধ করলেন তিনি। জানালেন। শুনেই মানিকলাল ত্রাসে অস্থির। ছেলের বিয়ে-থা দিয়ে তার নতুন বয়সের রোগটার

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। সেইদিনই রুমাবাঈকে আড়তে ডেকে পাঠালেন। শুধু কাকাজী আছেন তাঁর সঙ্গে, আর কেউ না।

রুমাবাঈ এল। হিসেব-পত্র করাই ছিল। মানিকলাল তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে আর প্রয়োজন নেই, আর এস না।

রুমাবাঈ স্থির পাথরের মত বসে রইল কিছুক্ষণ। মুখ না দেখা গেলেও মুখের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, মালিক কি আমার কাজে কোনো গাফিলতি পেয়েছেন?

মানিকলাল বললেন, না, আমার আর দরকার নেই।

নরম অথচ স্পষ্ট করে রুমাবাঈ বলল, কিন্তু আমার যে বড দরকার মালিক। হঠাৎ এভাবে কাজ বন্ধ করে দিলে বড় অসুবিধেয় পড়ব—মালিক দয়া করে আর ক'টা দিন সময় দিলে—

মানিকলালের মেজাজ চড়েছে। সাফ জবাব দিলেন, আর একদিনও না, অন্য জায়গায় কাজ দেখে নাও গে, যাও।

কিন্তু রুমাবাঈ উঠল না। তেমনি সবিনয়ে বলল, মালিক যে কারণে আমাকে তাড়াতে চাইছেন সেটা একেবারে মিথ্যে। ছোট মালিক কাজ বোঝেন, কাজের সমঝদার তিনি, কাজ দেখে খুশী হয়েছিলেন বলে আমার নসীব ফিরেছিল। তিনি শুধু কাজই দেখেছেন, আমাকে কখনও দেখেন নি।

শোনামাত্র মাথায় রক্ত চড়েছিল মানিকলালের। তিনি চেঁচিয়ে উঠেছেন, কি সত্য আর কি মিথ্যে, কে তোমার কাছে শুনতে চেয়েছে? ছোট মালিক কি দেখেছে না দেখেছে কে তোমার কাছে জানতে চেযেছে? তোমাকে আমার দরকার নেই, তুমি চলে যাও, ব্যস।

কিন্তু রুমাবাঈ তবু গেল না। নিশ্চল মূর্তির মত আরো খানিকক্ষণ বসেই রইল। তারপর তেমনি নম্র অথচ দ্বিধাশূন্য স্পষ্ট গলায় বলল, মালিক কেন আমাকে তাড়াচ্ছেন, আমি তা জানি। ওদের হিংসা আমিও দেখেছি। রটনা যে একটুও সত্যি নয়, আমি যদি তার প্রমাণ দিতে পারি, তাহলেও কি মালিক আমাকে রাখতে আপত্তি করবেন?

ওই কথা ক'টি, কণ্ঠস্বর, আর আচরণের মধ্যেও কিছু বোধহয় ছিল। কাকাজী বোবার মত দাঁড়িয়ে। আর মানিকলালও কৌতূহলে থমকালেন ঈষৎ।

কি প্রমাণ দেবে?

প্রমাণ রুমাবাঈ মুখে কিছু দিল না। আস্তে আস্তে ঘন কালো বোরখাটা খুলে ফেলল শুধু। খুলে সেটা সরিয়ে রাখল। তারপর মানিকলালের দিকে দুচোখ মেলে তাকাল শুধু।

এতবড় বিস্ময় কাকাজী আর মানিকলালের জীবনে এই প্রথম।

কাকে দেখছেন তাঁরা কিছুই বুঝছেন না। রূপসাধক কোনো শিল্পীর আঁকা যেন—নাক-মুখ-চোখ—সমস্ত নারী-অঙ্গ। জ্যোৎস্না ধোয়া ধপধপে গায়ের রঙ। শুধু হাতের খানিকটা আর পায়ের খানিকটা কালো রঙ করা—বোরখা পরা থাকলে যতটুকুর

আভাস পাওয়া সম্ভব ততটুকু।

মানিকলাল আর কাকাজীর চোখে পলক পড়ে না, মুখে কথা সরে না।

রুমাবাঈ তেমনি শান্ত মুখে বলে গেল, যে সন্দেহ করে মালিক আমাকে তাড়াতে চাইছেন, তা সত্যি হলে টাকার জন্যে এ-পথে আসার দরকার হত না বোধহয়—মেহেনতী কাজ করতে হত না। তা চাই না বলে হাতে-পায়ে কালো রঙ মেখে সকলের চোখ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে সম্মানের উপার্জনে লেগেছি।

দু-চার কথায় এরপর পিতৃসদৃশ মানিকলাল আর কাকাজীর কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছে সে। এই রূপই তার জীবনের সব থেকে বড় অভিশাপ, দুষ্টু লোকে তার নামে কলঙ্ক দিয়ে তার স্বামী কেড়ে নিয়েছে—একটি ছেলে নিয়ে তাকে পথে দাঁড়াতে হয়েছে। সেই ছেলেটিই এখন প্রাণ তার। তাকে সে মানুষ করছে, ভালো জায়গায় রেখে পড়াচ্ছে। তাকে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করলে সেই ছেলে বড় হবে কি করে, মানুষ হবে কি করে? মালিক যেন দয়া করে কাজ থেকে না ছাড়ান তাকে, ছোট মালিক কোনোদিন তার মুখ দেখেন নি, কোনোদিন দেখবেনও না।

কাকাজীর কাছে কুঞ্জলাল এ-সব শুনেছে বাবার মৃত্যুর অনেক পরে। শুনেছিল, কারণ কুঞ্জলালই একবার তাকে কাজ থেকে জবাব দেবে স্থির করেছিল। যে মেয়ের কাজে কখনো কোনো ত্রুটি দেখে নি, তারই কাজে পর পব অনেকদিন গাফিলতি দেখেছে। সময়ে কাজ নেয নি, সময়ে কাজ দেয় নি, যাও দিয়েছে তাও মনোমত হয নি। কুঞ্জলাল ভেবেছিল, রোজগারের দেমাকে এই অধঃপতন। তার ওপর একটা বড় কাজের জন্য দু-তিনবার তার কাছে কর্মচারী পাঠাতে সে বলে পাঠিয়েছিল, এখন অসুবিধের মধ্যে আছে, ভারি কাজ নেওযা এ সময়ে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কুঞ্জলাল তেতে ছিল, এইবার আগুন হয়ে উঠল। তাছাড়া মেয়েটার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করার লোকও সর্বদাই আছে। কর্মচারীদের অনেকেই ঠাট্টা করেছে, নাগর জুটেছে বোধহয়, এখন ভারী কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করবে কেমন করে।

কুঞ্জলাল মেয়েটিকে জবাব দেবে স্থির করেছে শুনে কাকাজী তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, তার ছেলের খুব অসুখ—আমাকে সে জানিয়েছে।

কুঞ্জলাল সে-কথা কানে তোলে নি। আবার ছেলেও আছে শুনে মনে মনে উল্টে সে অশ্লীল কটূক্তি করেছে। ছেলে থাকলেও সুস্থ সামাজিক সন্তান ভাবে নি। আর ছেলের অসুখ তাও বিশ্বাস করে নি। সে ব্যবসায়ী, ব্যবসা সব কিছুর আগে—অসুখের বিন্যাস শোনার আগ্রহ তার নেই।

এরপর রুমাবাঈ আবার একদিন কাজের জন্য আসতে সে জবাব পাঠাতে যাচ্ছিল, কাজ নেই। কিন্তু কাকাজী আবার বাধা দিয়েছেন। তাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই একদিনের ঘটনা বলেছেন। শুনে কুঞ্জলাল কতক্ষণ স্থাণুর মত বসেছিল, ঠিক নেই। ইতিমধ্যে কাকাজী রুমাবাঈকে পরদিন আড়তে এসে মালিকের সঙ্গে দেখা করে কাজ নিয়ে যেতে বলে দিয়েছে।

রুমাবাঈ এসেছিল। কুঞ্জলাল প্রথমেই ছেলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছে। জবাব

দেবার আগে রুমাবাঈ চুপ করে বসেছিল খানিক। ছেলের অসুখের খবরটা সে একমাত্র কাকাজীকেই গোপনে দিয়েছিল। অস্ফুট শান্ত জবাব দিয়েছে, মালিকের আশীর্বাদে ভালো আছে।

কুঞ্জলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। চুপচাপ চেয়ে চেয়ে সেই কালো বোরখা আর কালো হাত-পা দেখেছিল। তারপর নিঃশব্দে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

রুমাবাঈয়ের এই কালো বোরখা যেন স্পষ্ট নিষেধ। কিন্তু নিষেধ মানতে চায় নি কুঞ্জলাল। একদিন ওই বোরখা সরাবার জন্য অনুনয় করেছিল। কাকাজীর কাছে সব শুনেছে জানিয়ে একটিবার মাত্র তাকে দেখতে চেয়েছিল।

কিন্তু ঘন-কালো বোরখার আড়ালে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতই বুঝি বসে ছিল রুমাবাঈ। তারপর খুব নরম করে আস্তে আস্তে বলেছে, কথা দিয়ে সে কখনো কথার খেলাপ করে নি—বড় মালিককে সে কথা দিয়েছিল। ছোট মালিককে সে শ্রদ্ধা করে, তিনি যদি চান সে বোরখা সরাবে। ...কিন্তু তাহলে আর তার কোনোদিন এখানে কাজ নিতে আসা হবে না।

কুঞ্জলাল তা চায় নি।

আরোগ্য

ব্যবস্থা দেখে রাধারাণী খুশী।

জীবন এখানে যত্নের জিনিস, লালনের সামগ্রী। পায়ে পায়ে ক্ষয়ের খোড়ল হাঁ করে নেই। এখানে শুধু জীবনের মূল্যবোধটুকুই স্পষ্ট। চারদিক শুচিশুভ্র আরাম দিয়ে ঘেরা। বেশ ঠাণ্ডা নিরাপদ আরাম।

ঘরের দুই কোণে দুটো তকতকে বেড। এর অর্ধেকেরও অনেক ছোট ঘরে চারজনে থেকে অভ্যস্ত তাঁরা, ওইটুকুর মধ্যেই একটা গোটা সংসার। বিবাহিত জীবনের বাইশ বছরের মধ্যে এই প্রথম যেন নতুন বাতাসের স্বাদ পেলেন রাধারাণী। বাঁচার আগ্রহ বোধ করতে লাগলেন, মনের তলায় এক ধরনের উৎসাহ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

দিনে ছ টাকা চার্জ। তাও ভূতনাথবাবু ওপরওলাদের ধড়ে পড়ে অর্ধেক দক্ষিণায় রাজী করতে পেরেছেন বলে। নইলে চার্জ বারো টাকা। কিন্তু দিনে ছ টাকাই রাধারাণীর কাছে আঁতকে ওঠার মত—মাসে একশ আশি টাকা! তার ওপর ওষুধ-পত্র ফল-টলে মাসে কম করে আরো পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা—হল দুশ তিরিশ! শুনেই রাধারাণী বিগড়ে গিয়েছিলেন। ক'মাস থাকতে হবে কে জানে...। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন দেখেই মুখ কালো করে ভূতনাথবাবু সরাসরি তাঁকে এখানে এনে ফেলেছেন। রাধারাণী সাহস করে আর আপত্তি করতে পারেন নি। মুখ খুললেই

কুরুক্ষেত্র বাধবে জানেন, তখন আর ভদ্রলোক রোগিণী বলে রেহাই দেবেন না ওঁকে। ছেলেমেয়ের সামনেও এমন কথা বলে বসেন যে চামড়ার নিচে হাড়-পাঁজরসুদ্ধু খটখটিয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে জীবন-রক্ষার উপকরণ দেখে রাধারাণীর মনে হল তাঁদের সত্যিই টাকা নেই—নইলে, এর তুলনায় দিনে ছ টাকা ছেড়ে বারো টাকাও কিছু নয়।

ও পাশের বেডে যে মেয়েটি থাকে তার বছর তিরিশ বয়েস। কিন্তু এবই মধ্যে কঠিন রোগ বাধিযে বসেছে। পেটে জল হযেছে নাকি। দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু বড বেশি রকম অবুঝপনা আর বাযানাক্কা। রোজ চারটে বাজতে না বাজতে মেয়েটির স্বামী দেখতে আসে ওকে—কালো মোটাসোটা, বছর চল্লিশ হবে বযেস। সচ্ছল অবস্থা বোঝা যায়। রাধারাণী শুনেছেন কাগজের কারবার তাদের। লোকটি রোজই কিছু না কিছু হাতে করে নিযে আসে। দুর্মূল্যের ফল, দামী দামী টনিক, ফুড, গল্পের বই, শখের ব্লাউস, রুমাল, এমন কি গয়নাও। রাধারাণী দূর থেকে লক্ষ্য করেন, কিছুতে যেন মন ওঠে না মেয়েটাব—কোনো কিছুতেই তুষ্ট নয। লোকটি ঘড়ি ধরে পুরো দু-ঘণ্টাই বসে থাকে তার শয্যার পাশে, স্ত্রীর সব কথাতেই সায় দেয, সব আক্ষেপে সান্ত্বনা দেয়। দু-তিনদিন অন্তব বছব আটেকের একটি ছেলেও আসে বাপেব সঙ্গে মাকে দেখতে। রাধাবাণী শুনেছেন, ওই একটিই ছেলে ওদের, পুরনো ঝিযের জিম্মায থাকে, বাড়িতে আর দ্বিতীয কেউ নেই।

বাধারাণী অবাক হযে ভাবেন, ছেলেটা রোজ আসে না কেন, আব ওই মা-ই বা ছেলেকে রোজ না দেখে থাকে কি করে! ওদিকে স্বামীটির আসতে আধ মিনিট দেরি হলে আধঘণ্টা তার জের চলতে দেখেছেন রাধারাণী। অনেক অনুনয় অজুহাত সাধ্য সাধনাযও সহজে মন গলে না। রাধারাণীর এক একসময় রাগই হয় মেয়েটার ওপর, অত পায় বলেই পাওযার ওপর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। হত তাঁর ঘরের লোকটির মত, এক দাবডানিতে সব ঠাণ্ডা।

যাই হোক, এখানকার এত সব সুব্যবস্থার মধ্যে এসে পডেও রাধারাণীব মনের তলায কোথায় যেন যাতনার মত একটু। দু বেলা খাবার সময় মন বেশ খাবাপ হয়। দীর্ঘকাল রক্তাল্পতার রোগী তিনি, হাসপাতালের নির্দেশ অনুযায়ী আহারের রাজসিক ব্যবস্থা। মাছ-মাংসর ছডাছডি। রাধারাণী অর্ধেকও খেয়ে উঠতে পারেন না। এমনি একটুকরো মাছ বাড়িসুদ্ধু লোকের একবেলার বরাদ্দ। এখন খরচের ধাক্কায় তাও জুটছে না নিশ্চয়। মেয়েটা কলেজের আগে ছেলেটাকে সময়মত দুটো ভাত ফুটিযে দিতে পারে কিনা তাই সন্দেহ। তার ওপর উঠতে বসতে বাপের বকুনি তো আছেই ——বকুনির চোটেই এখন সারা হল বোধ হয় দুটোতে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেডের মেয়েটির কথা মনে হয়, আর তার স্বামীর কথা। অবশ্য সাত তাড়ার মধ্যেও ভূতনাথবাবু প্রায় রোজই একবার করে দেখে যান তাঁকে। দরকারী ওষুধ-পত্র সবই কিনে দেন, তাঁরও মিটিসেফে ফলমূল থাকে কিছু। কিন্তু সে-সবই কিসের বিনিময়ে আসছে সেটা রুক্ষ মূর্তিটির দিকে একবার তাকালেই বোঝা

যায়। ভিতরে ভিতরে গুমরে ওঠেন রাধারাণী, এতবড় অসুস্থতার চিন্তাটাও মানুষটার সব থেকে বড় চিন্তা নয় যেন, এখানে এসেও দু-দণ্ড হাসিমুখে কথা বলার নাম নেই। ফলে মেজাজ সব দিন রাধারাণীরও ঠিক থাকে না, এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দেন। বিশেষ করে ওই বেডের মেয়েটির স্বামীটিকে দেখে দেখে তাঁর সহিষ্ণুতা কমেছে। অন্যের ঘরে কি, আর তাঁর ঘরেই বা কি...।

সেদিন ভূতনাথবাবু আসতে ইঙ্গিতে রাধারাণী ওই মেয়েটিকে দেখিয়ে কথায় কথায় বললেন, কাল সরস্বতীপূজো উপলক্ষে ওর স্বামী ওকে চমৎকার একজোড়া ফরাসডাঙার শাড়ি এনে দিয়েছে—আমাকে আবার ডেকে দেখাল। ...ভদ্রলোক কত তোয়াজে রেখেছে মেয়েটাকে, রাধারাণী সেই গল্পও করলেন।

ভূতনাথবাবু হঠাৎ রুক্ষ বিরক্তিতে বলে উঠলেন, আমার তো সাধ্য নেই তোমাকে এখন ফরাসডাঙার শাড়ি এনে দিই—এইতেই তো শেষ হয়ে গেলাম।

শুনে রাধারাণী গুম হয়ে বসে রইলেন। তিনি শাড়ি চান নি। ওই রকম মনটি চেয়েছিলেন। ওই রকম অনুরাগটুকুই লোভনীয় ছিল।

এক মাসের মাথায়, এই ঘরে একটি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল।

ওই মেয়েটার আয়ু দিনে দিনে নিবতে লাগল। পেটের জলে সর্বাঙ্গ ঢোল। মেয়েটির স্বামী দু ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা ছ ঘণ্টা কাটিযে যেতে লাগল। শেষ অবস্থা বলেই অনুমতি মিলেছে বোধ হয়।

সেদিন দুপুর থেকেই অক্সিজেন চলছে।

রাধারাণীর বুকের ভিতরটা সারাক্ষণ কাঁপছে থরথর করে। ওই মেয়েটার ভাগ্যের ওপর চোখ দিয়েছিলেন বলে ভিতরে ভিতরে অপরিসীম যাতনা একটা। দুপুরে খুব কেঁদেছেনও, আর প্রার্থনা করেছেন, ঠাকুর ওকে বাঁচিয়ে দিও!

সন্ধ্যে থেকে তার স্বামী নিজেই অক্সিজেন ধরে বসে আছে। শান্ত বিষণ্ণ মূর্তি। রাধারাণীর সেদিকে তাকাতেও কষ্ট। ..একসময় দেখলেন, লোকটি অক্সিজেনের নল রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চুপচাপ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বুকের কাছে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল।

রাধারাণী চমকে উঠলেন। বুকেব উপর ভেঙে পড়বে নাকি—এখনো যে শেষ হয় নি। অবশ্য শেষ হতে বাকিও নেই...কিন্তু লোকটা করছে কি!

রাধারাণী হঠাৎ নিস্পন্দ কাঠ একেবারে।

লোকটি মেয়েটির গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি, বালা, আঙটি, সব একে একে খুলে পকেটে ফেলল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। ডাক্তার মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

রাধারাণীর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত তখনো। চেয়ে আছেন বিস্ফারিত নেত্রে। দেখছেন।

...লোকটি শান্ত মুখে একটা ঝোলার মধ্যে স্ত্রীর শাড়ি ক'টা নিল, মিটসেফ খুলে নিজের আনা ফলমূলের খাবার আর টনিকগুলো দেখে দেখে পুরল, তারপর ভালো করে স্ত্রীকে আর একবার দেখে নিয়ে শ্রান্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাধারাণী চিত্রার্পিত।

ছেলে এবং লোকজন নিয়ে লোকটি ফিরল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে। বারান্দায় খাটিয়া পাতা—ওখান থেকেই শ্মশান-যাত্রা।

এই একমাসে শরীরের আশাতিরিক্ত উন্নতি হয়েছিল রাধারাণীর। কিন্তু এর পরের তিনদিনের মধ্যেই অনেকটা খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুম নেই, চোখ বসা, আহারে রুচি নেই, হজমে গোলমাল। দিনরাত গুম হয়ে ভাবেন কি যেন! ছেলে আসে, মেয়ে আসে, ভূতনাথবাবু আসেন—রাধারাণী ভালো করে কথাও বলেন না কারো সঙ্গেই। সকলেই চিন্তিত।

সেদিন সকালে ছেলে একটা ওষুধ দিয়ে যেতে এসেছিল। রাধারাণী তার হাতে খুব যত্ন করে বাঁধা একটা পুঁটলি দিয়ে বললেন, সাবধানে নিয়ে দিদির হাতে দিবি, ওনার বড় ট্র্যাঙ্কের একেবারে তলায় রেখে দেয় যেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হতভম্ব মুখে মেয়ে এসে হাজির। এক নজরে দেখে নিল মায়ের হাতে শুধু দুগাছা শাঁখা আর একটা লোহা।

—ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন মা?

রাধারাণী নিস্পৃহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুলে রেখেছিস?

—না, চাবি তো বাবার কাছে, বাবা বাড়ি নেই, তুমি—

—বাড়ি নেই তো তুই ওগুলো কার কাছে রেখে এলি? ভয়ানক রেগে গেলেন রাধারাণী, কে তোকে এখানে আসতে বলেছে এখন?

—কিন্তু তুমি হঠাৎ ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন?

—পাঠিয়েছি, আমি মরলে ওগুলো তোদের কাজে লাগবে বলে, সবেতে তোর বাড়াবাড়ি—যা শীগগীর। ...খানিক বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, শরীরের যা অবস্থা, এখানে এ-সব পরে থাকা ঠিক নয়—শেষে হয়ত এটুকুও যাবে তোদের।

মেয়ে কাঁদ কাঁদ মুখে উঠে চলে গেল।

রাধারাণীর গত তিনদিনের জ্বালা একটু জুড়োল যেন। টাকাওয়ালা লোকেরই স্ত্রীর প্রতি যে দরদ দেখেছেন...নিজেদের তো প্রতি পয়সার হিসেব! তাঁর অন্তিম শয্যায় কেউ তাঁর গায়ের গয়নার কথা ভাবছে সে-দৃশ্য কল্পনা করেও রাধারাণী বারবার শিউরে উঠেছেন।

সেই পুঁটলি হাতে মেয়ে কাঁদ কাঁদ মুখ করেই বিকেলে ফিরল আবার। রাধারাণী সমাচার শুনলেন। ...ছেলে বাপের হাতে পুঁটলিটা দিয়েছিল, আর মেয়েকে বলতে হয়েছিল মায়ের অবুঝপনার কথা। শুনে উনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ, তারপর আচমকা এক চড়ে ছেলের গালে পাঁচটা আঙুলই বসিয়ে দিয়েছেন, গয়নাগুলো ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিয়েছেন, তারপর না খেয়ে অফিসে চলে গেছেন।

প্রত্যেকটা খবরই রেগে ওঠার মত। রাধারাণী রাগতে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু রাগটা তেমন হল না।

সেদিন আর ভূতনাথবাবু তাঁকে দেখতে এলেন না। তার পরদিনও না।

তার পরদিন এলেন।

গয়না ক'টা রাধারাণী আবার পরেছেন। একখানা মোটামুটি ভালো শাড়িও পরেছেন। একটু বোধহয় প্রসাধনও করেছেন। শয্যায় বসেছিলেন, বললেন, বোসো—

ভূতনাথবাবু টুলটা টেনে বসলেন। তারপর চুপচাপ চেয়ে রইলেন।

কোটরগত চকচকে দুটো অনুযোগ-ভরা চোখ, হাড় বার-করা চোয়াল, আর শুকনো কালচে মুখের দিকে চেয়ে রাধারাণীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কেমন। সব সময় এই ক্ষয়ের জ্যোতি পোড়া চোখে প'ড়েও পড়ে না। বিনা ভনিতায় বললেন, আর কতকাল পড়ে থাকব এখানে, সেরেই তো উঠেছি, ডাক্তারকে বল, বাকি চিকিৎসা বাড়িতেই হতে পারবে—আর ভালো লাগছে না।

ভূতনাথবাবু চেয়েই আছেন।

কি কারণে মিট-সেফটাই একবার খুলে দেখা দরকার হয়ে পড়ল রাধারাণীর। তাড়াতাড়ি ঘুরে বসে ঝুঁকে সেদিকে হাত বাড়ালেন।

সিদ্ধি পোখরী

গ্রাম ছাড়িয়ে শহরেও খবরটা রটে গেল। ধর্ম মানে না, সংস্কার মানে না, আচার অনুষ্ঠান পালন করে না যে বিক্রম সাহেব—এটা তার মুখেরই ঘোষণা। একটা মাস এক মস্ত অশান্তি নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে কাটিয়েছে সকলে। কি অভিশাপ জানি লাগে। শাসনকর্তা তাদের মত মানুষকে শায়েস্তা করতে পারে, মানুষের সঙ্গে যুঝতে পারে—কিন্তু দেবতার রোষ ঠেকাবে কি করে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। বিশেষ করে হনুমন্তখোলার ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সক্কলে। বিক্রম সাহেব এই গাঁয়েরই ছেলে। হনুমন্তখোলার খালের ওধারে তাদের মস্ত পাথরের বাড়িটাতে এখনো তার আত্মীয়-পরিজনরা বাস করে। ওই বাড়ির ছেলে হোমরাচোমরা শাসনকর্তা হয়ে বসলেও বাড়ির লোকের গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে এখনো আগের মতই ব্যবহার করে। তা ছাড়া শাসক হোক আর যাই হোক, গাঁয়ের অনেক বৃদ্ধ অনেক প্রৌঢ়র চোখে সেদিনের ছেলেটা বই তো নয়। বয়েস বোধ হয় চল্লিশও ছোঁয় নি এখনো। তার কত কীর্তি-কলাপ তো তাদের চোখের ওপর ভাসছে। গত এক মাস ধরে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত তারা, শঙ্কিত। আজও তাদের উত্তেজনা

কম নয়। কিন্তু এ উত্তেজনায় শঙ্কা নেই। আনন্দ আছে। নিশ্চিন্ততা আছে। কিছুটা বিস্ময়ও আছে। সকলের মুখেই এক কথা। সিদ্ধি পোখরীর কথা। বিক্রম সাহেবের ঘোষণার কথা।

বিক্রম সাহেব বলেছে, সিদ্ধি পোখরীতে যেও না কেউ, সিদ্ধি পোখরীর জলে বিষ আছে। মুখে না বললেও বিক্রম সাহেব প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে, সিদ্ধি পোখরীর জলে পশুপতিনাথের গায়ের জ্বালা মিশে আছে, নীলকণ্ঠের বিষাক্ত নিঃশ্বাস পড়েছে।

হনুমন্তখোলার অনেক বৃদ্ধ এর পরেও পশুপতিনাথের চরণে বিক্রম সাহেবের কল্যাণ কামনা করেছে। গত মাসে সিদ্ধি পোখরীর জলে যে তোলপাড় হয়েছে, তার জন্য ছেলেটার যেন কিছু অশুভ না হয়! শেষ পর্যন্ত তো সুমতি হয়েছে তার। তাই পশুপতিনাথ খামখেয়ালী ছেলেটার ওপর যেন কোনো রাগ না রাখেন। শাসকদের সম্পর্কে এ-যাবৎ দেবতার চরণে বিপরীত প্রার্থনাই করে এসেছে। এ-পর্যন্ত শাসকদের নির্মম শোষক হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত তারা, নির্যাতনের যন্ত্রস্বরূপ ভেবে অভ্যস্ত। রাজ্যছাড়া ব্যতিক্রম হয়েছে এই একজনের বেলায়। ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ একদিন যখন একেবারে খোদ হর্তা কর্তা হয়ে বসল সে, সকলে সচকিত সন্ত্রস্ত। কি না জানি কাণ্ড শুরু হয় এবার। শাস্ত্র মানে না যে, তার হাতে কিনা শাসনের ভার!

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে ভিতরে ভিতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে সকলেরই। তার শাসনকালে পাহাড়ী পথঘাটের চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে, হনুমন্তখোলার খালের নড়বড়ে পুল গিয়ে স্থায়ী পাকাপোক্ত পুল হয়েছে, ক্ষেতখামারের কত উন্নতি হয়েছে ঠিক নেই। বাইরে থেকে চাষের কত জিনিস তারা পেযেছে, গ্রাম শহরে অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত কমে গেছে। খাজনা দিতে না পারলে পেয়াদা এসে গলায় পাথর ঝুলিয়ে ধরে নিয়ে যায় না, বরং অতি সহজে খাজনা দেবার মিয়াদ বেড়ে যায়। কোনো শাসকেব আমলে এমনও যে হয়, নেপালখণ্ডের এই ক্ষুদ্র অংশের লোকেরা অন্তত তা জানত না।

সংস্কারান্ধ এই মানুষেরা ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানের গাফিলতি কখনো ক্ষমার চোখে দেখে না। কিন্তু বিক্রম সাহেব বা কমলবিক্রমের আচার-আচবণের ত্রুটি ধরা দূরে থাক, তার ঘরে কাশ্মীরী বউকে নিয়েও এখন আর তারা নিজেদের মধ্যে জটলা করে না। সেই ভিনদিশি মেয়ের নাক-মুখ-চোখ কিছুই তাদের মেয়েদের মত না হলেও এ-পর্যন্ত কোনো অকল্যাণের ছায়া তো গ্রাম-দেশে পড়ে নি। উল্টে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু হচ্ছে না। এমনি করেই লোকটি সকলের বুক জুড়ে বসেছিল। তারা শুধু খামখেয়ালী মানুষ বলেই জানত তাকে। তাব মঙ্গল কামনা করত।

কিন্তু হঠাৎ এই লোক সব ছেড়ে সিদ্ধি পোখরী নিযে উঠে পড়ে লাগতে একটা শিহরণ দেখা দিল। অনেকের সন্দেহ হল, আসলে লোকটা পাগল কিনা। নইলে কোথায লোকালয় বর্জিত জঙ্গলের ধারে সিদ্ধি পোখরী পড়ে আছে—তার ওপর হামলা করার ঝোঁক চাপল কেন?

কিন্তু যারা আর একটু ভালো করে জানে তাদের শাসক বিক্রম সাহেবকে, তারা এই পাগলামি নিয়ে নিজেদের মধ্যে গোপন কথা বলাবলি করতে লাগল। এই গোপন কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

ছেলেবেলা থেকে বলতে গেলে কলকাতাতেই মানুষ হয়েছে কমলবিক্রম। সেখানেই লেখাপড়া শিখেছে—স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে। তবু দেশের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মানসিক যোগ ছিল তার। বছরে দুবার দেশে যেত। গরমের সময়, আর পূজোর সময়। পূজো গেলে প্রতীক্ষা করত কবে গরম আসবে, গরম গেলে ভাবত কবে পূজো আসবে। তাদের পাহাড়ী হনুমন্তখোলা গ্রামটা যেন সর্বদাই টানত তাকে।

বাবাকে মনে পড়ে না, তার জ্ঞান-বয়সের আগে থেকেই বাবা পরলোকে। মা আছে। কিন্তু মায়ের শিথিল শাসন বড় মানে নি কখনো। আট-দশ বছর বয়েস পর্যন্ত পাহাড়ে-জঙ্গলে নেচে-কুঁদে বেড়াত। গাঁয়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন তারা, অঢেল জায়গা-জমি, মস্ত পাথরের বাড়ি। দিব্বি মনের আনন্দে ছিল।

কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন টিকল না। তার কাকা থাকত কলকাতায়। শিক্ষিত লেখাপড়া-জানা মানুষ। তাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা তখন হাতে গোনা যায়। কাকা কলকাতায় ভালো চাকরি করত। একবার দেশে গিয়ে কাকা তাকে কলকাতায় নিয়ে এল, তারপর ইস্কুল নামে একটা কয়েদখানায় পুরে দিল।

কমলবিক্রমের সর্বদা মন ছটফট করত, মন কাঁদত। বেশি খারাপ লাগত সঙ্গী-সাথীদের কথা মনে হলে। ঘড়ি দেখত আর ভাবত সুবর্ণবীর এখন কি করছে। ছুটিতে সেই অনুপস্থিতির খেদ পুষিয়ে নিত। মায়ের কাছে যেত বটে, কিন্তু ঘরে বড় থাকত না। মা বলত, তোর ছুটি ফুরোলে বাঁচি।

সুবর্ণবীর আর শ্যামকলি দুজনেই থাকত হনুমন্তখোলার পুলের এধারে। ওরা কেউ তাদের মত অবস্থাপন্ন নয়। তাদের বাপ-দাদারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে। শ্যামকলির আবার বাপ নেই, দাদাই কর্তা। কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অবস্থা-টবস্থার ধার ধারত না। যার যত বেশি গায়ের জোর আর মনের জোর, সে তত বেশি মাতব্বর। এদিকে থেকে সুবর্ণবীরের জুড়ি ছিল না। যেমন গোঁয়ার তেমনি দুরন্ত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমলবিক্রম পেরে উঠত না। হনুমন্তখোলার খালের জলে তাকে অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়েছে সে। সাঁতারে তার সঙ্গে বড় বড় জোয়ানেরাও পারত না। বছর কতক কলকাতায় থাকার পর কমলবিক্রমের কত অধঃপতন হয়েছে, শুধু সে-ই জানে। সুবর্ণবীরের সঙ্গে দূরে থাক, সাঁতারে বা পাহাড়ী ক্ষেতে দৌড়ে, ওই মেয়েটার সঙ্গেও সে পেরে উঠত না। অবলীলাক্রমে তাকে হারিয়ে দিত তারা।

মনে মনে কমলবিক্রম কোনোদিনই সুবর্ণবীরের ওপর খুশী ছিল না। সে থাকতে কারো কোনো রকম সর্দারি করার উপায় নেই। কমলবিক্রমের সঙ্গে তার প্রকাশ্যে রেষারেষি হত, অপ্রকাশ্যেও। ছুটিতে দেশে গিয়ে গায়ের জোর আর বেপরোয়া সাহসের বদলে সে তার ওপর শিক্ষা আর বুদ্ধির টেক্কা দিয়ে চলতে চেষ্টা করত। দলবলের সঙ্গে সুবর্ণবীরও এক-একসময় আজব শহর কলকাতার গল্প শুনত, ইস্কুলের লেখাপড়ার

গল্প শুনত। মনে মনে কমলবিক্রম আশা করত সেও এবার তাকে একটু আধটু সমীহ করবে, মান্যগণ্য করবে। কিন্তু শেষে দেখা যেত শহুরে বুদ্ধিসুদ্ধি শিক্ষাদীক্ষার কোনো দামই নেই তার কাছে। আর সকলে যখন মান্যগণ্য শুরু করেছে তাকে, তখনো সে-যে কতভাবে তাকে অপদস্থ করেছে, হেলাফেলা করেছে, ঠিক নেই। মোট কথা, তার বন্য দুরন্ত স্বভাবটিই সর্বদা সব কিছুর ওপরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমলবিক্রমের বছর আঠার বয়স তখন। সুবর্ণবীরেরও তাই হবে। পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে কমলবিক্রম দেশে গেছে। চলাফেরায় আচারে-ব্যবহারে কথাবার্তায় আরো ভদ্র হয়েছে সে। শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে শিখেছে। পরীক্ষা ছিল বলে এবারে অনেক দিন পরে দেশে এল। সুবর্ণবীরের সঙ্গে এবারে আর ছেলেমানুষি রেষারেষি করবে না, ঠিক করেছিল। সে-যে উঁচুস্তরের মানুষ সেটা সুবর্ণবীর এবারে টের পাবে।

কিন্তু এসেই মায়ের মুখে শুনল শীগগীরই শ্যামকলির স্বয়ম্বর হবে। আর হবে সুবর্ণবীরের সঙ্গেই। শ্যামকলির বারো বছর বয়স পেরিয়ে গেছে, স্বয়ম্বর হবার বয়স হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় থাকে বলে এ-সম্ভাবনার কথা একবার মনেও হয় নি তার। শুনল, স্বযম্বর করাচ্ছে পাড়াপড়শী মাতব্বরেরা! কারণ, শ্যামকলির দাদা ফৌজী দলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। গত বছরই স্বয়ম্বর হবার কথা ছিল, কিন্তু তার দাদা আসবে আসবে করে হয নি। এ বছর সেই দাদা আরো দূরে কোথায় চলে গেছে। তাই শ্যামকলির মায়েব অনুরোধে পড়শীরা এগিযে এসেছে।

শোনামাত্র শিক্ষার গর্ব গিযে কমলবিক্রমের বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠল। আগে খেয়াল থাকলে এই স্বয়ম্বরটা তার সঙ্গেই হতে পারত। তারাও ছত্রী। পাত্র হিসেবে শ্যামকলির মা তাকে আকাশের চাঁদ ভাবত। কিন্তু মনেই ছিল না তার। এখন আর কি করবে। তবু যোগাযোগটা হয়েছে ভালো। কমলবিক্রম তা মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না। দুটিই সমান দস্যু। যেমন সুবর্ণবীর তেমনি শ্যামকলি। কেউ কারো থেকে কম যায না।

কমলবিক্রম স্বয়ম্বরে এল। ছেলেমেয়ে দুই তরফ থেকেই নেমন্তন্ন তার। নেপালের ছত্রীদের পাকা-দেখাকে স্বয়ম্বর বলে। বিয়ের থেকেও এটা বড ছাড়া ছোট অনুষ্ঠান নয়। বিয়ে সুযোগ সুবিধে মত পরে যে কোনো সময়ে হতে পারে। অনেক বছর পরেও হতে পারে। এই স্বযম্বরটুকু হয়ে গেলেই সব হয়ে গেল। মেয়ে সম্প্রদান হয়ে গেলে এই বিধানের আর নড়চড় নেই।

কমলবিক্রম স্বয়ম্বর দেখল। ভারি ভালো লাগল তার। এমন কি আজ সুবর্ণবীরকেও ভালো লাগল। সুন্দর সেজেছে। কোমরে তলোয়ার গুঁজেছে, মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে। এমনিতেই তরতাজা সুন্দর চেহারা, দৃপ্ত চাউনি। এখন আরো সুন্দর লাগছে। ঝকঝকে রাজপুত্রের মত। আর শ্যামকলির তো তুলনাই নেই। ডানপিটে মেয়েটাকে এমন রূপসী কোনোদিনও মনে হয় নি। বসনের ওপর দিয়ে ফিনফিনে চাঁপারঙের ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। কিন্তু মুখটা পরিষ্কারই দেখা যায়। তার পায়ে পাওজে, গলায় হাঁসুলি, কানে পাকা সোনার দুল। এ ছাড়া গলায় বাহুতে ফুলের গয়না। প্রথমে সুবর্ণবীর

নিজের গলার মালা তুলে নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিল। মালা পরিয়ে শ্যামকলির আঙুলে ঝকঝকে আঙটি পরাল একটা। তারপর শ্যামকলি মালা পরাল, আঙটি পরাল। উৎফুল্ল মুখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কমলবিক্রম। মালা আঙটি পরানোর সময় শ্যামকলির ঠোঁটের ফাঁকে সে দুষ্টু দুষ্টু হাসি লক্ষ্য করেছে।

স্বয়ম্বর হয়ে গেল।

এবারের দীর্ঘ অবকাশে সুবর্ণবীরের আর একটা নেশা ধরেছে দেখল কমলবিক্রম। শিকারের নেশা। গেল বছর বন্দুক কিনেছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে শিকার করে বেড়ায়। এই শৌর্যের ব্যাপারটাও যেন তাকেই শুধু মানায়। দৃপ্ত পায়ে শিকারের সন্ধানে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ভর ডর বলতে কিছু নেই। দেখে দেখে কমলবিক্রমের এখন এক-এক সময় ঈর্ষা হয়। কিন্তু সেটা আর প্রকাশ পায় না এখন। শিকার জিনিসটা তারও ভালো লাগে। তার সঙ্গে সেও ঘোরে।

একদিন সুবর্ণবীর প্রস্তাব করল, সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গলে যাবে পাখি শিকার করতে। সেখানে অনেক পাখি।

কমলবিক্রমের ভিতরে অনেকদিনের একটা সংস্কার নাড়া খেল। সিদ্ধি পোখরীতে সে অনেকবার গেছে বটে, দূরে থেকে জঙ্গল দেখেছে, দূরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধি পোখরীর কালো জল দেখেছে। কিন্তু জঙ্গলে ও ঢোকে নি কোনোদিন, জলেও পা ছোঁয়ায় নি। সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গল সম্বন্ধে অবশ্য কোনোদিন কোনো নিষেধ-বচন শোনে নি। পুকুরেই নামা নিষেধ শুধু। নিষেধ অমান্য করে ওই পুকুরে নেমে প্রাণ দেওয়ার এত গল্প ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে, দলবেঁধে ছাড়া কেউ ওদিক মাড়ায় না। গোটা এলাকাটাই উঁচু প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের ওধারে পুকুরটা নাকি মায়া-পুকুর, মানুষ খায়। জলে নামলেই টেনে নেয়। ওদের পণ্ডিতেরা বলে, হর হর মহাদেও সমুদ্রমন্থনের বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়াবার জন্যে ওই পুকুরে নেমেছিল, ওই জলে তার বিষ-নিঃশ্বাস মিশেছে। সেই বিষই মানুষ টেনে নেয়।

সুবর্ণবীর ফিসফিস করে বলেছিল, শ্যামকলিকে সে বলেছে আজ তাকে পাঁচটা পাখি এনে দেবেই। একটা পশুপতিনাথের নামে, একটা তার নিজের নামে একটা শ্যামকলির নামে একটা শ্যামকলির মায়ের নামে, আর একটা কমলবিক্রমের নামে। ভারি ধুমধাম হবে। সিদ্ধি পোখরীতে গেলে নিশ্চিত পাখি মিলবে।

কমলবিক্রম জানে শ্যামকলির সঙ্গে গোপনে দেখা করে এই রকমই এক-একটা বীরত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে সে। কিন্তু সিদ্ধি পোখরী নিয়ে এই ছেলেমানুষি তার ভালো লাগল না। বলল, সিদ্ধি পোখরীতে যাবে?

সুবর্ণবীর হাসল। বলল, তোমার ভয় করে তো তুমি যেও না, আমি একাই যাব। একা আরো গেছি।

—শ্যামকলি জানে তুমি সিদ্ধি পোখরীতে যাচ্ছ?

সুবর্ণবীর তেমনি হেসে বলল, ফিরে এলে জানবে।

কমলবিক্রম ভাবল একটু। ভাবল, শ্যামকলি আরো জানবে যে সে ভয় পেয়ে

সুবর্ণবীরের সঙ্গে যায় নি। জানবে সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গলে সুবর্ণবীর একা গিয়েছিল পাখি শিকার করতে। কমলবিক্রম গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেও ভীরু নয়।

কিন্তু আকাশে বাতাসে সেদিন সঙ্কট লেখা ছিল তারা কেউ জানত না। নিয়তি জাল ফেলে টেনে নিয়ে গেল তাদের, তাও তারা জানত না। যা ঘটবার তা বড় আকস্মিক ঘটে গেল। পঞ্চম পাখিটাই ঘুরতে ঘুরতে জলে পড়ল। ওটাই একজনের নিয়তি। আর, ওই নিয়তির দূত কমলবিক্রম নিজে। অতগুলি গুলির শব্দে জঙ্গলের পাখি উড়ে গিয়েছিল। অনেক ধৈর্যের পর সুবর্ণবীর এই শেষেরটা পেয়েছিল। কিন্তু ওটা জলে পড়তে সে হতভম্বের মত কমলবিক্রমের দিকে তাকিয়েছিল। আর তক্ষুনি কমলবিক্রমের মুখ দিয়ে বিদ্রূপ মেশান কথা ক'টা বার হয়ে গিয়েছিল।

——শ্যামকলিকে কি বলবে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ফেলে সুবর্ণবীর সিদ্ধি পোখরীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কমলবিক্রম বাধা দেবার অবকাশ পায় নি। মস্ত দীঘির মাঝামাঝি জায়গায় পড়েছে পাখিটা। বড় বড় হাত ফেলে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে সুবর্ণবীর। তার মত সাঁতারু কে আছে?

কিন্তু পাখি নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি সে। তার আগেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কিছু যেন তার পায়ে জড়িয়ে গেছে। কমলবিক্রম মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে দেখেছে তাকে। চোখে মুখে অব্যক্ত ত্রাস দেখেছে। বাঁচার আকুতি। তার দিকে চেয়ে মরণ যাতনায় প্রাণ ভিক্ষে চেয়েছে, সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু কমলবিক্রম অসাড় পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে। তার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেছে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে! পারে নি। তার কোনো শক্তি ছিল না। শুধু চেতনা ছিল।

কলকাতায় ফিরেও বহুদিন পর্যন্ত এই বিভীষিকা মন থেকে যায় নি। যখন তখন আঁতকে ওঠে, শিউরে ওঠে। শ্যামকলির কথা মনে হলে দুচোখ জলে ভরে যায়। তাদের সমাজ-ব্যবস্থা বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। স্বয়ম্বরার পর ভাবী স্বামী মারা গেলে সেই মেয়ে চির-বিধবা।

ভাবতে ভাবতে শেষে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ল কমলবিক্রম। দেশ থেকে তার মাকে নিয়ে আসা হল। তারপর অনেক বছর আর সে দেশে যায় নি। তার মা কলকাতাতেই চোখ বুজেছে।

সময় অনেক ভোলায়। কমলবিক্রমও অনেক ভুলেছে। নিজের অগোচরেই কখন সেই বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, শ্যামকলির স্মৃতিও আর তাকে পীড়া দেয় না।

দেশে এল প্রায় সাত বছর বাদে। কলেজের লেখাপড়া শেষ করে। তখন আর এক মানুষ সে। সকলে সমীহ করে, সম্ভ্রমের চোখে দেখে। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো স্মৃতি খচখচিয়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা আর বোঝা যায় নি। সকলের সঙ্গেই দেখা হয়েছে, দেখা হয় নি শুধু শ্যামকলি আর তার মায়ের সঙ্গে। সেখানে সে যায় নি।

কিন্তু সেখানে না যাক, অন্যত্র গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসে শ্যামকলিকে। শ্যামকলি তার পাহাড়-ঘেরা জমিটুকুতে নিজেই ক্ষেতের কাজ করে। তার মা বুড়ো হয়েছে,

পারে না। পয়সা দিয়ে লোক রাখারও সঙ্গতি তাদের নেই। তাদের দেশে অনেক মেয়েই ক্ষেতে কাজ করে। সেটা বিসদৃশ কিছু নয়। তবু কমলবিক্রমের কষ্ট হত। তাদের ক্ষেতে তো কত মজুর খাটে। ইচ্ছে হত দুটো লোক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পারত না।

দূর থেকে দেখত শ্যামকলিকে। একমনে কাজ করে। কখনো পাহাড় ডিঙ্গিয়ে দূরের আকাশের দিকে তার দুচোখ আটকে থাকে। তার কাছে যাবার দুর্বার আগ্রহ হত কমলবিক্রমের, কিন্তু সে-কথা মনে হলেই পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে থাকত।

পাহাড়ী পথেই একদিন মুখোমুখি দেখা। সেদিন আর নিজেকে আড়াল করতে পারল না কমলবিক্রম। জিজ্ঞাসা করল, শ্যামকলি আমাকে চিনতে পার?

শ্যামকলি দেখল তাকে। হাসল। বলল, পারি। তুমি রোজ এসে এসে চোরের মত দাঁড়িয়ে থাক কেন?

এতবড় বিদ্বান কমলবিক্রম দুচোখ ভরে দেখল তাকে। উনিশ-কুড়ি বছরের অস্থিরযৌবনা মেয়ের মধ্যে যেন স্থির প্রশান্তি দেখল সে। এই মেহেনতীর কাজ তাকে স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য দিয়েছে, যৌবনপ্রাচুর্য দিয়েছে। কিন্তু সব প্রাচুর্যই যেন এক সহজ শাসনের গণ্ডিতে বাঁধা।

আর চোরের মত পালিয়ে থাকল না কমলবিক্রম। ক্ষেতে আসত। ঘোরানো ক্ষেত, সকলের সব-সময় চোখে পড়ত না। পড়লেও তাকে অবিশ্বাস করত না কেউ। তাদের দেশে স্বয়ম্বরা বিধবার সঙ্গে কেউ প্রেম করে না। কিন্তু অবিশ্বাস প্রথমে শ্যামকলি করল। বলল, তুমি এত ঘন ঘন এস না।

কমলবিক্রম বলল, আমি সমাজ মানি না, সংস্কার মানি না, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

শ্যামকলির স্থিরযৌবনে নাড়া পড়ল। নিজেকে সংযত করে বলল, তোমার যাওয়াই ভাল।

এরপর বার বার শ্যামকলি তাকে ফিরিয়েছে। তবু বার বার সে এসেছে। সেই এক কথা তার। চল চলে যাই। শ্যামকলির বুকে দোলা লাগে। অবসন্ন অবকাশে যে-যাতনা দেহের কানায় কানায় আকুলি-বিকুলি করে, সেটা এখনই ভেঙে পড়তে চায়। সে রাগ করে, ভ্রূকুটি করে, কটূক্তি করে। তবু কমলবিক্রম আসে, বলে, চল চলে যাই এখান থেকে।

একদিন। আকাশে থমথমে কালো মেঘে জমেছিল। শ্যামকলি আপন মনে ক্ষেতের কাজ করছিল আর গুনগুনিয়ে গান গাইছিল : বোল্অত ভনে সাইনো মেরে সাইনো।...তুমি আমার কেউ নয়, তোমাকে আমি কি নামে ডাকব।

গান থেমে গেল। পিছনে না তাকিয়েই শ্যামকলি টের পেল পিছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে। আকাশের মেঘের মতই মুখ গম্ভীর হল তার। গাঁয়ে এখন একটু আধটু কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুধু এই লোক বলেই জোর গলায় কেউ কিছু বলছে

না, বা খুব খারাপ কিছু ভাবছে না।

শ্যামকলি একটি কথাও বলল না। হাতের কাজ সেরে বাড়ির দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলল। পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য তবু লোকটা অনুসরণ করছে তাকে। শ্যামকলি মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করল : পশুপতিনাথ প্রভু লাই, নমস্কার গর ছু ছিন ছিন মা। ...পশুপতিনাথ তোমার অনুগত আশ্রিত আমি, তোমাকে নমস্কার করি।

তখন সূয্যি ডুবেছে। পাহাড়ে মেঘলা আকাশের আঁধার নেমেছে। হঠাৎ ঝড় উঠল। পাহাড়ী ঝড়। ভয়াবহ ঝড। কিন্তু ঝড়ের থেকে শ্যামকলির বেশি ভয় পিছনে যে আসছে তাকে। না, ঠিক তাকেও নয়। ওই লোকেব থেকে এ-পথে ঝড়ে জলে অনেক বেশি অভ্যস্ত। সে অনাযাসে ঠেলে ফেলে দিতে পারে তাকে, কিন্তু তা যে পারবে না। ভয় তার নিজেকেই।

কমলবিক্রম বোধহয় এই রকমই একটা দিনেব প্রতীক্ষায ছিল। এদিকে ঝড বাড়ছেই। পাথবের গাযে কোথাও ঠেস দিয়ে আশ্রয না নিলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু শ্যামকলি আবো দ্রুত পা ফেলে চলেছে। কমলবিক্রম দৌড়ে এসে দুহাতে জাপটে ধরল তাকে। টেনে নিযে একটা বিশাল পাথরের গায়ে ঠেস দিযে দাঁড়াল। বৃষ্টির মুষলধারা গায়ে মুখে বিঁধছে।

শ্যামকলি হাল ছেড়ে দিল। ওই বুকেই মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল সে। আব সে পারবে না। আর সে যুঝবে না! কমলবিক্রম নিবিড় করে আগলে রইল তাকে। কোমল গলায বলল, শ্যামকলি, চল এখান থেকে চলে যাই। পশুপতিনাথ আমাদের আশীর্বাদ করবে।

শ্যামকলি আস্তে আস্তে মুখ তুলল। চেয়ে চেয়ে দেখল তাকে। বলল, চল। কবে যাবে?

—কালই।

পরদিন। মায়ের দিকে মুখ তুলে একবারও তাকাচ্ছে না শ্যামকলি। নিজের সঙ্গে বোঝাপোড়া তার শেষ হয়েছে। মায়ের চলে যাবে একরকম করে। কমলবিক্রমের মজুরেরা জমি চষে দেবে। দুপরে বাক্স খুলে দুই-একটা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। এই রাতেই পালাবে তারা। কমলবিক্রম বলেছে, পশুপতিনাথ তাদের আশীবাদ করবে।

সহসা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল একটা। তারপরেই বিবর্ণ পাংশু একেবারে। বাক্স থেকে তার হাতে উঠে এসেছে ঝকঝকে একটা আঙটি। স্বয়ম্বরার আঙটি। সুবর্ণবীরের আঙটি।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হতে চলল। আঙটি হাতে শ্যামকলি ঠায় বসেই আছে মূর্তির মত। বুকের ভিতরটা ঘলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। সুবর্ণবীর যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে। নির্নিমেষ দেখছে। সেই হাসিখুশী জ্বলজ্বলে মূর্তি। সে যেন এখনো তার প্রতীক্ষায় বসে আছে, তেমনি বেপরোয়া, তেমনি নিশ্চিন্ত।

দুদিন বাদে শ্যামকলির দেহের সন্ধান মিলেছে সিদ্ধি পোখরীর জলে।

সকাল থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক লাগিয়ে সিদ্ধি পোখরীর জল থেকে কত মণ ঝাঁঝি বা জলজ উদ্ভিদ তুলিয়েছে এলাকার শাসনকর্তা বিক্রম সাহেব তার ঠিক নেই। পুকুরের ধারে ধারে ঝাঁঝির পাহাড় হয়ে গেছে। ওই ঝাঁঝি পায়ে জড়িয়ে মানুষ ডোবে। একটি লোকেরও জীবন সংশয় ঘটতে দেয় নি বিক্রম সাহেব। জলে অনেক বোট নামিয়েছে, আর কোমরে রসি বেঁধে লোক নামিয়েছে। সে নিজেও একটা বোটে বসেছিল সমস্তক্ষণ। কিন্তু বিক্রম সাহেব খবর পেয়েছে জলে যারা নেমেছিল তাদের প্রতিটি লোক বিষম অসুস্থ। জলেই বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তারা।

শুধু অফিসের জনা-কতক লোকই জানে বিক্রম সাহেব অনেক ভেবে শেষে সিদ্ধি পোখরীর জল পাঠিয়েছিল বাইরের কোনো এক গবেষণাগাবে। সেখান থেকে রিপোর্ট এসেছে, জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম ক্ষতিকারক রাসায়নিক সংমিশ্রণ আছে।

বিক্রম সাহেব সেইদিনই ঘোষণা করেছে, সিদ্ধি পোখরীর জলে বিষ আছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে না হতে সিদ্ধি পোখরীর রাত্রি গভীর। সেখানে একজন ভিন্ন আর জনমানব নেই। জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। চাঁদ হাসছে। আর, কমলবিক্রমের মনে হচ্ছে সিদ্ধি পোখরীর চকচকে কালো জলে দুটি মুখও হাসছে।

কর্তা

ঈশানের মেঘ না বর্ষানো পর্যন্ত শান্তি নেই।

কর্তার রাগও সগর্জনে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত বাড়ির কারো স্বস্তি নেই। কখন ভাঙবে, কার ওপর ভাঙবে, ভেবে সন্ত্রস্ত সচকিত সকলে। বাড়ির গিন্নি বউদের কাছে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ গো বউমারা, এদিকে আবার কি হল?

বউ দুটিও ভয়ে ভয়ে এই জটলাই করছিল নিজেদের মধ্যে, কি হল। তারা বলে, কি জানি মা বুঝছি না তো—

কিন্তু না বোঝা পর্যন্ত ভাবনা ঘোচে না। কে আসামী ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঘুচবেও না। শাশুড়ী সরে যেতে মুখ কালো করে ছোটবউ বলে, পরশুদিনও খাবার সন্দেশে চিনি বেশি পড়ে গেছে, আগের দিনও তাই, সেজন্যে নয় তো দিদি?

বড়বউ বলল, সে তো তোকে ডেকে বলেই দিলেন। অত ছোট ব্যাপার নয়, আমার মনে হয় আমরা পুরী যাচ্ছি বলে—

সেটা আবার তেমন বড় ব্যাপার মনে হয় না ছোটবউয়ের কাছে। ছেলের একঘেয়ে

অসুখ লেগেই আছে, ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছে, তাছাড়া শ্বশুরমশাই নিজেই ভাসুরের ছুটির জন্যে অফিসের বড়কর্তাকে চিঠি দিয়েছেন। শ্বশুরের রাগ বাড়িসুদ্ধু লোকের ত্রাসের কারণ বটে, কিন্তু রাগের হেতুটা যখন প্রকাশ হয়, দেখা যায় সেটা একেবারে অনর্থক নয়।

ওদিকে আহ্নিকে বসেও গিন্নি চিহ্নিত। জপের অভ্যাসে জপ করেন, মনে মনে কর্তার এই গুরুগাম্ভীর্যের কারণ খোঁজেন। কি আবার হল, কি হতে পারে! তাঁরও ভয়, তিনিই আসামী কি না। ...তরশু বিকেলে স্বর্ণসিন্দুর খাবেন বলেছিলেন, দিতে ভুল হয়ে গেছে, সেইজন্যে? নাকি তার আগের দিন ভাড়াটে তোলা নিয়ে একটু মন কষাকষি হয়েছিল, সেইজন্যে? গিন্নি বলেছিলেন, ভাড়াটে তোলো, নইলে জায়গায় কুলোয় না। কর্তা বলেছিলেন, ভাড়াটে তুললে ট্যাক্স চালাবে কে? গিন্নি বলেছিলেন, তিনতলা তোলো তাহলে। কর্তা বলেছিলেন, টাকা কোথায়, সব তো এইতেই ঢেলেছি—তোমার নবাব ছেলেরা ভাড়াটে তুলবে, না তিনতলা তুলবে ভাবলেই পারে—সবেতে আমার কাছে কেন আব!

পূজোয় বসে একটা করে কারণ হাতড়ে চলেন গিন্নি, কোনোটাই আসন্ন ঝড়ের উপাদান বলে মনে হয় না। শেষে শুকনো মুখে হাল ছেড়ে জপে মন ফেরাতে চেষ্টা করেন তিনি।

ছেলেদেরও মুখ শুকনো। বড়ভাই সতু ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করে, কি রে তুই কিছু বলেছিস-টলেছিস নাকি?

ছোটছেলে নিতু ভীতু আবো বেশি। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আমি আবার কখন কি বললাম, আমি এদিকে ভাবছিলাম তোমার মুখেই বেফাঁস কিছু শুনে-টুনে ফেলেছেন কি না!

দুই ভাই অফিস থেকে ফিরে যে যার স্ত্রীকে নীরব ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, খবর কি? তারাও ইশারায় মাথা নাড়ে তেমনি। অর্থাৎ খবর নেই, একই অবস্থা।

বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত চুপ মেরে গেছে। তাদের দাপাদাপি লাফালাফি কমেছে। দাদুর কাছে ঘেঁষতে ভরসা পায় না। ঘেঁষতে গেলেও তাদের মায়েরা সত্রাসে ধরে নিয়ে আসে। বড়দের শাসায়, বুড়োধাড়ীরা—একটুও বুদ্ধি যদি থাকত!

অতএব তারাও বুদ্ধি খাটায়, এবং বুদ্ধি খাটিয়ে আর কিছু না বুঝুক, দাদুর সামনাসামনি অবস্থান নিরাপদ নয় খুব, এটুকু অন্তত বোঝে।

বিধুভূষণবাবু সাত-আট মাস হয় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। মার্চেন্ট অফিসে বড় চাকরিই করতেন, মোটা গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফণ্ড নিয়ে বেরিয়েছেন। এর ওপর নির্ভর করে আগেই বাড়ি ফেঁদে বসেছিলেন। টাকা হাতে আসা মাত্র ধারদেনা শোধ করেছেন। ট্যাক্সের ঝামেলা এড়ানোর জন্যে দুই ছেলের নামে বাড়ি হয়েছে। ছেলেদের নিজের অফিসে অনেক আগেই ঢুকিয়েছেন। মোটামুটি ভালো রোজগারই করে তারা এখন। ছেলেদের বিয়েও দিয়েছেন অনেকদিন হল। মেয়ের বিয়ে তারও আগে হয়ে গেছে। সকল দিকে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা।

ভদ্রলোক এমনিতে হাসিখুশী দরাজ অন্তঃকরণের মানুষ। নাতি-নাতনী নিয়ে হৈ-চৈ

করেন। গৃহিণী, ছেলে, ছেলের বউ সকলের সুবিধে অসুবিধের দিকে সজাগ দৃষ্টি। মেজাজ প্রসন্নই থাকে সাধারণত। সে-সময়ে কারো তেমন সঙ্কোচ নেই তাঁর কাছে। এমন কি বউরা পর্যন্ত প্রয়োজনে কিছু আব্দার করে বসতে দ্বিধা করে না। কারণ, যে যতই স্বাধীন হোক, বাড়ির আসল কর্তাটি কে, সেটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না কেউ।

কিন্তু কোনো কারণে আঁতে তেমন ঘা লাগলে এই মানুষই একেবারে ভিন্ন মানুষ। সেই রাগ সেই স্তব্ধতা সেই গাম্ভীর্য সবই পুরুষের। সেটা এমন পুরুষের যে গৃহিণীর তখন কাঁপুনি, বউরা ভয়ে জড়সড, ছেলেদেরও মুখ কালো। কর্তার কথা বন্ধ হবে, সমস্ত মুখ থমথমিয়ে উঠবে, দু চোখ যেন কঠিন দুটো পাথরের টুকরো। আসন্ন ঝড়ের মুহূর্তটি পলে পলে উদগ্র হতে থাকবে। সেই সময় একবারের বেশি দুবার সাধলে ভাত ফেলে উঠে যাবেন। সকালে দুধ আর বিকেলে সন্দেশ খান, তখন কিছুই খাবেন না, ইঙ্গিত মাত্র সামনে থেকে সরে না গেলে হাত থেকে দুধের গ্লাস বা সন্দেশের ডিশ নিয়ে সবসুদ্ধ নিচের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

গৃহিণী, দুই ছেলে এমন কি ছেলের বউদেরও এক-আধবার এই বিপর্যযের মুখে পড়তে হয়েছে। ঠাকুরের রান্না একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, একটু দেখে শুনে ব্যবস্থা না করলে মুখে রোচে না, পেটেও সহ্য হয় না। একদিন বললেন, দুদিন বাদে আর একদিন বললেন, তিনদিন বাদে হয়ত আর একদিন। সেই বলাতে কেউ অনুমানও করতে পারবে না, তারই মধ্যে দুর্যোগের ছায়া প্রচ্ছন্ন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যাবে স্তব্ধ, নির্বাক, কঠিন তিনি। ব্যাপার বুঝে তখন মনোমত দশ ব্যঞ্জন এনে সামনে ধরে দিলেও নিস্ফল। এই ধরনের কোপগুলো সাধারণত স্ত্রীব ওপরে এসে পড়ে। ঝামেলা এড়ানোর জন্যে বুদ্ধির দোষে সত্য গোপন করার ফলেও অনেক সময় গিন্নিকে শেষে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হয়।

শরীর অসুস্থ হয়েছে, ছেলেরা হয়ত যে-যার তালে আছে—ঠিকমত খবর করে নি, সময়ে ডাক্তারও ডাকে নি। সেই দুর্যোগ যখন ভেঙে পড়ল, ছেলেরা ঘেমে নেয়ে অস্থির।

ছোটবউ হযত বাড়ির কোনো প্রয়োজন তুচ্ছ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে, বড়বউ হয়ত অনবধানে শাশুড়ীর মুখের ওপর বিসদৃশ কিছু বলে ফেলেছে। এর কোনোটাই হয়ত তেমন বড় করে দেখে নি কেউ! মাঝখানে হঠাৎ দেখা গেল কর্তা গম্ভীর। সেই গাম্ভীর্যের অবসানে ডাক পড়বে, বউবউয়ের বা ছোটবউয়ের। কাঁপতে কাঁপতে বক্তব্য শুনে যেতে হবে। শ্বশুরের সামনে কাঠ একেবারে। তারপর ঘরে ফিরে কেঁদে শান্তি।

ছেলেরা, ছেলের বউয়েরা যাবে থিয়েটার দেখতে, চারখানা টিকিট কাটা হয়েছে হয়ত দুদিন আগে, অন্যথায় টিকিট মিলবে না। বিধুভূষণবাবুর এ-সব শখে একটুও আপত্তি নেই। উল্টে হয়ত নাতির মুখ দিয়ে ঠাট্টা করেছেন, জিজ্ঞেস করে আয় আমাকে নেবে কি না। নির্দিষ্ট দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়ে এসে হাজির। মেয়ে থাকে হুগলীতে। সে এলে সকলেই খুশী হয়। খুশী হলও। খুশীর ফাঁকেই ছেলে

ছেলের ব`~ থিয়েটারটা দেখে এলে, যাবার সময় বললও, আর একখানা টিকিট যোগাড় ·রা ʼগলে বেশ হত। তারপর হাসি আমোদের মধ্যে কেটে গেল দুটো দিন। মে· চ· গেল।

যাবার ~ দেখা গেল, শিন্ভূষণবাবুর মুখে সেই ভয়াবহ গাম্ভীর্য। গাম্ভীর্য অন্তে ছেলেদের আর বউদের আর একটা ছোটখাটো থিয়েটার দর্শন। বিয়ের পর বাড়ির মেয়েও আদরের অতিথির মতই। তাকে ফেলে সকলের থিয়েটার দেখতে যাওয়ার এই আধুনিক নজিরটাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কটূক্তিতে তচনচ করে তবে ক্ষান্ত।

কিন্তু এইবারে কি? অবসর গ্রহণের পর গত সাত-আট মাসের মধ্যে কোনোদিন তো অপ্রসন্ন দেখা যায় নি তাঁকে? মেজাজ বরং আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছিল।

বাড়িসুদ্ধু লোক বিস্মিত, শঙ্কিত এবং বিভ্রান্ত। দুদিন কি বড় জোর তিনদিনের মাথায ওই স্তব্ধতা যার মাথায়ই হোক খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু একে একে সাতদিন যায়, না গর্জন, না বর্ষণ!

প্রত্যেক দিনের থেকে প্রত্যেকটা দিন ভারি মনে হয়। সেই স্তব্ধতা ক্রমশ একটা যাতনার মত চেপে বসছে সকলের বুকে। এমন, যে একটা কাশির শব্দ শুনলেও সচকিত সকলে। গৃহিণী ভাবেন এবার তাঁর কপালে দুঃখ আছে, বউয়েরা ভাবে তাদের কপালে, ছেলেরা ভাবে তাদের।

দুভাই চুপি চুপি সেদিন গিযে উপস্থিত থাকোবাবুর বাড়ি। বাবার বন্ধুদের মধ্যে থাকোবাবু অন্যতম। এই একজনের কাছে বাবা কোনো কিছু গোপন করেন না। হয়ত তিনি বলতে পারবেন!

কিন্তু থাকোবাবুও কিছু জানেন না। ক'দিন ধরে গম্ভীর খুব, এটুকুই শুধু লক্ষ্য করেছেন, শেষের এই দু-তিনদিন তো বেড়াতেও আসেন নি! অথচ, থাকোবাবুকে পর্যন্ত এড়িযে গেছেন! বুড়ো বাপের সেবা-যত্ন প্রসঙ্গে কিছু উপদেশ গলাধঃকরণ করে পাংশুমুখে দুই ছেলে বাড়ি ফিরল। পরশু পুরী যাবার কথা বড়ছেলের, তাব তোড়জোড করা দূরে থাক, সাহস করে কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে নি এখনো।

সেদিন সন্ধ্যার পরে। একটা ঘরে গৃহিণী দুই ছেলে আর দুই বউ। এই ঘরেই আলোচনা বসছে দুদিন ধরে। আলোচনার বদলে মুখ শুকিয়ে চুপচাপ বসেই থাকে বেশিক্ষণ।

হঠাৎ একসঙ্গেই চমকে উঠল সকলে।

দরজার কাছে কর্তা দাঁড়িযে।

এরই মধ্যে বেড়িয়ে ফেরাটা অপ্রত্যাশিত।

ছোটছেলে সামনে ছিল। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

বিধুভূষণবাবু ভিতরে এসে চেয়ারটা দখল করলেন।—কিসের মিটিং বসেছে?

সকলেই চুপ। বুক দুরু দুরু।

বিধুভূষণবাবু বড়ছেলের দিকে তাকালেন, তোর যাবার ব্যবস্থা সব রেডি?

বড়ছেলে আর বড়বউয়ের মুখ আমসি, কোপটা তাহলে তাদের ঘাড়েই পড়বে....

বড়ছেলে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ, কিছুই রেডি নয়।

—হয় নি কেন, আর কবে করবি। ...ছোটছেলের দিকে ফিরলেন তিনি, ছুটি-ছাটা পাওনা আছে, না সব খতম করে বসে আছ?

বড়ছেলে আর বড়বউয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এবারে ছোটছেলে আর ছোটবউয়ের ত্রাস। ছোটছেলে ছুটি-ছাটা একটু বেশিই নেয়, তবু প্রশ্নটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না কারোরই। ছোটছেলেও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ছুটি পাওনা আছে।

গিন্নি মনে মনে প্রমাদ গুনলেন এবারে, কারণ কর্তার চোখ এবারে তাঁর দিকে। অজ্ঞান অপরাধটা তাহলে তাঁরই।

—তোমার তো উঠতে বসতে সতেব ঝামেলা, এই দুদিনের মধ্যে সব গোছগাছ করে নিতে পারবে?

কি গোছগাছ করতে হবে, কেন গোছগাছ করতে হবে, কিছু না বুঝেই গৃহিণী মাথা নাড়লেন, পারবেন।

—সতুর সঙ্গে আমরাও যাই, একঘেয়ে বসে বসে আর ভালো লাগে না। ...বিধুভূষণবাবু ছোটছেলের দিকে ফিরলেন আবার—তুই কালই অফিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করে দে, বাবাকে চেঞ্জে নিযে যেতে হবে লিখিস...বড়ছেলেকে বললেন, কাল আমার থেকে টিকিটের টাকা নিয়ে যাস।

গাত্রোত্থান করলেন তিনি।

ঘরের মধ্যে বাকি পাঁচজন মূর্তির মত বসে। এতবড় ঘটনাব এমন শান্ত পরিণাম স্বপ্নেরও অগোচর। ফাঁসীর আসামীব বিনা কারণে হঠাৎ বেকসুব খালাস পেলে যেমন হয। বিশ্বাস করতেও ভবসা হয না চট কবে।

রাত বাড়ছে।

বিধুভূষণবাবুর চোখে ঘুম নেই। ঘুম না হলে তাঁর মেজাজ বিগড়োয। পবদিনে শরীর খারাপ হয়। কিন্তু আজ একটুও তিনি ক্লেশ বোধ করছেন না। মেজাজ আজ এত ভালো বলেই চোখে ঘুম নেই তাঁর।

অনিদ্র শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবছেন তিনি, মিছিমিছি বাড়িসুদ্ধ লোককে কষ্ট দিলেন এই ক'টা দিন। থাকোবাবু যাই বলুন আর যাই বোঝান, অবসর নেবার আগে যেমন তিনি কর্তা ছিলেন বাড়ির, এখনো তেমনিই আছেন। ছেলে, ছেলের বউ, এমন কি নিজের স্ত্রীর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা-অবহেলায় থাকোবাবু মর্মাহত। সখেদে সেটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিক পবিণতি বলেই বুঝিয়েছেন বিধুভূষণবাবুকে।

কিন্তু বিধুভূষণবাবু নিশ্চিন্ত। তাঁর সে ভয নেই।

খবরটা ভালো করে শোনার আগেই আমার ঘরের রমণীটির মুখখানা যা হল, তা দেখলে কোনো ভদ্রলোকের আর খবর দেখার উৎসাহ বোধ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ভালো খবর শোনাতে গেলেও যদি এই মুখ হয়। কিন্তু ঘরে তখন তার বড় জাটিও ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সহৃদয়া। ছোট জায়ের নিস্পৃহ অবহেলা তুচ্ছ করেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন, থামলে কেন, কি হল, বল না শুনি?

আমি প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক নই। অর্থাৎ, ঘরনীর মুখের প্রায়-অপমানকর অভিব্যক্তিসহ 'হুঁ:!' বচনের ঘায়ে পুরুষকার আহত হবার মত ভদ্রলোক নই। তা ছাড়া খবরটাও ফেলনা নয় যখন, ভ্রাতৃজায়ার আগ্রহটুকু অবলম্বন করেই উৎসাহের আঁচটা আর একবার উঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার আগে তাঁর উদ্দেশ্যে স্ত্রীটি ছোটখাটো ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শুনবে আবার কি? ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এবার লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে বল গে। শুনতে হয নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসে, শোন গে, রাত জেগে আমাকে এখন এক গাদা খাতা শেষ করতে হবে—

বিরাগের যথার্থ হেতু আছে। তার স্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষার শ-চারেক খাতায় নম্বর বসাতে হবে। আর পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই ছুটি শেষ। স্কুল খুললেই মেয়েরা নম্বর নম্বর করে মাথা খাবে। সংসারের ঝামেলায় গোটা ছুটিতে পঞ্চাশটা খাতাও দেখা হয় নি। কোনোদিন হয়ও না। এ-ব্যাপারটায় বরাবরই সে আমার সাহায্যপ্রত্যাশী। এবারেও যথারীতি কথা দিয়েছিলাম দেখে দেব। কিন্তু দেব দেব করে এ পর্যন্ত একটা খাতা ওলটানোরও ফুরসত হয় নি। ফলে ভালো খবর শোনারও ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা গেছে। বিছানায় খাতার গাদা ছড়িয়ে বসেছে।

কথা না বাড়িয়ে আমি পকেট থেকে লম্বা খামটা বার করলাম। তার ভিতরে বস্তুটি বার করতে গিয়ে খামের একটা ধার ছিঁড়ে গেল। একটানে আমি বাকিটুকুও ছিঁড়ে ফেললাম। খামের ভিতর থেকে যা বেরুল, দেখে আচমকা দুজনেই তারা মন্ত্রমুগ্ধ। কড়কড়ে নোট একতাড়া। সব একশ টাকার। কড়া কলপ-দেওয়া ইস্তিরি-করা নতুন জামাকাপড়ের মত খড়খড়ে নতুন।

বউদিরই বাক্স্ফুরণ হল প্রথম—ও-মা, সত্যিই তো রে! কত টাকা?

—আড়াই হাজার। পরে আরো আড়াই হাজার পাব।

বাকী খবর শোনার ধৈর্য থাকল না। এক-গাল হেসে খবরটা দাদাকে অবিলম্বে শোনাবার জন্যে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অতঃপর স্ত্রীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি। কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোর একেবারে কাটে নি। নোটের তাড়া হাতে তুলে নিল। দেখল! নিজের অগোচরে নাকেও ঠেকাল একবার।

—টাকার গন্ধই তো?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল। —বেশ যাও! ছড়ানো খাতাগুলো এক-হাত ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিল। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বসতেও পারি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বইটা নিলে?

—বই না, ছোটগল্প। বাড়িয়ে দিতে হবে—

—কোন গল্পটা?

হেসে বললাম, তোমার সেইটাই।

খুশী হবে জানতাম। শীলা ভারি খুশী। নাম শীলা বটে, কিন্তু আজকাল নামটা খুব মানায় না ওকে। সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। আমার ওপর হামেশা তার রাগ-বিরাগের ঝাপটাটা খুব নিভৃতের ব্যাপার নয় এখন। তবু এই নাম এখন আর যে ওকে মানায় না, এ-কথা এক আমার ছাড়া আর বোধহয় কারো মনে হয় নি। 'সেই গল্পটা' বলার পিছনে আর তার খুশীর পিছনে একটা মানসিক যোগ আছে।

গোড়ায় গোড়ায় আমার সব লেখার প্রতি তার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। কি লিখছি, কি লিখব, কি লেখা উচিত, সে-সম্বন্ধে আলোচনা হত। কোন গল্পের পরিণতি কি হওয়া উচিত, তাই নিযে অনেক সময় বিভ্রান্তও করত। উল্টো বাস্তায় গিযে অনেকবার মন কষাকষিও হযেছে। কিন্তু সাংসারিক স্রোতের ধারায় পডে লেখার ওজন টাকার ওজনে মাপতে মাপতে স্বাভাবিক আগ্রহটুকু এখন স্বাভাবিক নিস্পৃহতায় এসে ঠেকেছে। কিছু লিখতে বসলে বড জোর জিজ্ঞাসা করে, কার জন্যে লিখছ, বা কত টাকা দেবে? উপন্যাস লিখতে বসেছি দেখলে তবু একটু খুশী হয। এর পিছনে কিছুটা স্ফীত অঙ্কের আশ্বাস আছে। সংসার নির্বাহের প্রয়োজনে এই আশ্বাস না থাকলে সবই অন্ধকার, তা আমিও জানি। তবু কোনো আশ্বাসের কথা না ভেবেই আগে এক-একটা উপন্যাসের জট ছাডিয়ে লক্ষ্যের মোহনায পৌঁছানর চেষ্টায় দুজনের অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে। সেই সব স্মৃতি কেন জানি আমার ভিতর থেকে মুছে যায় নি একেবারে।

কিন্তু আমি ওর দোষ দিই না একবারও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাডভাঙা খাটুনির পরে সাহিত্যপ্রীতির ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। যত রাত বাড়ে তত মেজাজ চডে। মেয়েটা তেমন দোষ না করেও ঝাঁঝালো কথা শোনে, সময়ে না ঘুমুলে অবুঝ ছেলেটার পিঠেও দু-চার ঘা পডে। তারপর নিজে গজগজ করতে করতে শোয়। কিন্তু রাতের গজগজানি বেশিক্ষণ শুনতে হয় না, অভিযোগের তালিকার মাঝামাঝি পৌঁছানর আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তার সব থেকে বেশি রাগ স্কুলটার ওপর। আমার লেখার অনিয়মিত রোজগারের সঙ্গে ওর স্কুলের নিয়মিত দেড়শ টাকা যুক্ত না করলে দুহাতে কচুরি-পানা ঠেলেও সংসার-তরীটি মাসের শেষের মাথায় টেনে নিয়ে যাওয়া শক্ত। আজ তিন বছর ধরে চাকরি ছাড়ার জন্যে এক পায়ে প্রস্তুত সে। ওর দেডশ টাকার জায়গায় আমার রোজগার আর একশটা টাকা বাড়লেই চাকরির মুখে ঝাঁটা মেরে চলে আসবে তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার রোজগার বাড়বে সে প্রত্যাশা আর বোধহয় করে না। অথচ আমার রোজগার আসলে সত্যিই কিছু বেড়েছে। সংসারের খরচ সেই তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে বলে বাড়তিটুকু আর চোখেই পড়ে না। সে-কথা বলতে গেলে চোখে খোঁচা পড়বে। তাই এ-ব্যাপারে আমি প্রায় মৌনী।

তার অভিযোগ স্কুলের হেড মিসট্রেস, অ্যাসিস্টেন্ট হেড মিসট্রেস, সিনিয়র টিচার, সেক্রেটারী সকলেই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে! চাকরি করছে বলে মাথা কিনেছে ভাবে। একধার থেকে ওর ঘাড়ে ক্লাস চাপায় আর খাতা চাপায় আর উপদেশের ছলে কড়া কথা বলে। অভিযোগগুলো সত্যি কিনা আমি কখনো যাচাই করে দেখি নি। হতেও পারে সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, চাকরিটা চক্ষুশূল বলেই অভিযোগগুলো চার-গুণ সত্যি হয়ে সর্বদা ওর মাথায় ঘোরে। তাছাড়া ওপরওয়ালা বরদাস্ত-করা ধাত নয় যার, ওপরওয়ালার সহজ কথাও সে বাঁকা শুনে থাকে। কিন্তু এইসব বিশ্লেষণ আমার একান্ত নিভৃতের।

এবারে সেই গল্পটার ইতিবৃত্ত বলি। লম্বা ছুটিছাটা এলে ঘরনীর মেজাজ সর্বদাই অতটা সপ্তমে চড়ে থাকে না। তখন ইচ্ছেমত সংসার আর ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করেও আমার সদ্য কোনো লেখা নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামানোর অবকাশ পায়! 'সমাপিকা' গল্পটা ওর গত ছুটিতে লেখা। গল্পটা লেখার সময়ে একটা ত্র্যহস্পর্শের যোগ হয়েছিল। অর্থাৎ শীলার অবকাশ ছিল, আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, আর সম্পাদকের গল্পটা অবিলম্বে হাতে পাওয়ার তাড়া ছিল। লিখে উঠতে পারছিলাম না, শীলা আমার হয়ে কলম ধরেছে। আমি বলেছি, ও লিখেছে। ফলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মতান্তর ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত ওর মনোমতই গল্পটা খাড়া করে তুলেছিলাম। শেষ হতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলেছিল, সত্যিই গল্পটা ভালো হয়েছে।

আমি যেমনই লিখে থাকি, গল্পটা ওর ভালো লেগেছিল। আমার নির্বাচিত সঙ্কলনে ও-গল্পটার স্থান দিই নি দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলেছে, ওকে জব্দ করার জন্যেই সঙ্কলনে এটা বাতিল করা হল।

কিন্তু গল্পটা সত্যিই এমন কিছু অভিনব নয়। লেখকের বা লেখকসঙ্গিনীর দরদটুকু ছেঁকে তফাত করে দিলে এমন কিছুই নয়। তবে দরদের ওজনটাও একেবারে ফেলনা নয় বটে। এখানে গল্পের বিষয়বস্তু দু-একথায় বলে নেওয়া দরকার। একটি সাধারণ ঘরের ছেলে একটি সাধারণ ঘরের রূপসী মেয়েকে ভালোবাসত। দুজনেরই সংগ্রামী জীবন। ছেলেটি মরীচিকার আশায় ক্রমশ বাঁকা পথে তলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ যুগেও একটি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ের অনেক শক্তি। সে সোজা রাস্তা ধরেই দৃপ্ত চরণে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুজনের মানসিক ব্যবধান বাড়ছে, বস্তুতন্ত্রীয় ফারাক বাড়ছে। উপসংহারে চূড়ান্ত স্খলনের এক বেদনা-করুণ মুহূর্তে মেয়েটি অনেক প্রলোভন তুচ্ছ করে ছেলেটিকে আবার সুস্থ জীবনের পথে টেনে তুলল।

গল্পটা কেন শীলার এত পছন্দ হয়েছিল, সেটা এবারে সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, তার অতটা আগ্রহে বোনা বলেই হয়ত আমারও

নিতান্ত মন্দ লাগে নি। আরো দু-চারজন যখন প্রশংসা করেছিল গল্পটার, তখন এমনও মনে হয়েছিল নির্বাচিত সঙ্কলনে ওটা দিলেই হত। বইটির পরের সংস্করণে ওটা জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আছে।

এই 'সমাপিকা' গল্পটাই এক নামকরা চিত্র-প্রযোজকের মনে ধরেছে। তারই ফলে আমার নগদ আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্তি। আর, ওটা ঠিকঠাক করে দিলে আরো আড়াই হাজারের প্রতিশ্রুতি।

একটা দিনের মধ্যে বাড়ির হাওয়া বদলে গেল। গল্পটা ভালো করে বানিয়ে দেবার জন্যে শীলা উঠতে-বসতে তাড়া দিতে লাগল। সংসার আব স্কুলের খাটুনির পরেও রাত জেগে শোনে কতটা কি কবলাম। তর্ক কবে, পরামর্শ দেয, কোথায অদল-বদল করা দরকার, নির্ভয়ে আর নির্দ্বিধায তা ব্যক্ত করে। নিজের দিক থেকে এবারে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি, আর পরিশ্রম সার্থক হল বলেও ভাবছি।

শীলার খেদ, অনেক আগেই চিত্র-জগতের দিকে চোখ রেখে লেখা উচিত ছিল। তার আশা, এ ছবিটা ভালো হলে বছরে একটা করে অন্তত ছবিব কণ্ট্রাক্ট হবেই। আর তাহলেই সে অনায়াসে স্কুলের চাকরি ছাড়তে পাববে। এই লেখাটা শেষ হলে আর একটা ছবির প্লট ভাবার তাগিদও দিযে রেখেছে সে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 'সমাপিকা' লেখার কাজ শেষ হল। প্রযোজক শুনলেন। শুনে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর ছবির সুনিশ্চিত আর্থিক লাভের দিকে চোখ রেখে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করে ফেললেন। ছবির গল্পে কোন ধরনের আবেগের প্রাধান্য থাকা দরকার, প্রথম-প্রণয়পর্বটি কতটা উষ্ণ-ঘন হওয়া অনিবার্য, নাযক-নায়িকার আবেগ-মধুর সান্নিধ্যের উপযোগী কিছু সিচুয়েশনের অবতারণা, ইত্যাদি। তাঁব নির্দেশ, গল্পের এই ত্রুটিগুলো বেশ ভেবেচিন্তে সেরে দিতে হবে।

স্টুডিওতে প্রযোজকের ঘরে বসেই আবার দিনকতক ধরে মেবামত আর নতুন সংযোজনের কাজটি সম্পন্ন করতে হল। শুনে প্রযোজক বললেন, মোটামুটি হযেছে, এখন এঁরা কি বলেন দেখি।

এঁরা অর্থাৎ, পরিচালক, আলোকশিল্পী, এডিটব প্রভৃতি। সকলকে নিয়ে প্রযোজকের ঘরে আবার একদিন শোনার আসর বসল। শোনার পরে সকলেই ঠিক প্রযোজকের মতই নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি দুরু-দুরু বক্ষে তাঁদের মতামতের অপেক্ষায় বসে আছি।

পরিচালক নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, গল্প ভালোই, তবে অনেক জোড়াতাপ্পি লাগবে এখনো। তাঁর মতে গল্পে বিস্ময়সৃষ্টির দিকে আমি আদৌ চোখ দিই নি। যা ঘটতে পারে তাই শুধু ঘটেছে, অপ্রস্তুত দর্শককে হকচকিয়ে দেবার মত ঘটনা-সংযোজন দরকার। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কমিক রিলিফ না থাকলে গল্প দর্শকের বুকে চেপে বসবে। সেদিকে চোখ রেখে দুই-একটা চরিত্র আমদানী করতে হবে। এ ছাড়া আভাসে-ইঙ্গিতে যা-কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করে সাধারণ দর্শকের বোধগম্য

করে দিতে হবে—পয়সা তো তারাই দেয়।

প্রযোজক এবং আর সকলে একবাক্যে সমর্থন করলেন তাঁকে। এরপর আলোকশিল্পী তাঁর ক্যামেরা-স্কোপ প্রসঙ্গে কিছু পরামর্শ দিলেন, আর এডিটর ছবির স্পীড প্রসঙ্গে।

মাথাটা কি এক দুর্বোধ্য বাষ্পে ভরাট হয়ে উঠেছিল। বাকি পাওনা আড়াই হাজার টাকার অঙ্কটাও কেমন ঘষা-মোছা লাগছে।

যাই হোক, প্রযোজকের অফিস-ঘরে বসে আবার পনের-বিশদিনের একাগ্র পরিশ্রমের পর অদল-বদল সংযোজন-বিয়োজনের পর ব্যাপারটা সম্পন্ন হল। কিন্তু কি যে দাঁড়াল আমি সঠিক বলতে পারব না! গভীর মনোনিবেশ সহকারে কর্মকর্তারা শুনে মন্তব্য করলেন, চলতে পারে—।

আমার বুক থেকে যেন পাহাড় নামল। কিন্তু না নামাই উচিত ছিল। এর দিন কযেক পরে বাকি টাকাটা পাওয়ার আশাতে প্রযোজকের কাছে এসেছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, এসেছেন খুব ভালো হয়েছে, আপনাকে খবর দেবার জন্যে এক্ষুনি লোক পাঠাব ভাবছিলাম। চলুন একবার ঘুরে আসি—

—কোথায় ?

—আসুন না—

প্রযোজকের গাড়িতে চেপে যে বাড়ির গেটের সামনে এসে থামলাম, সেই বাড়িটা আমি চিনি না। কিন্তু গাড়িতে বসে শুনেছি কার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে চলেছি। শোনাব পর থেকে মনে মনে আমি বিলক্ষণ বিচলিত। নাম শোনা আর বহু ছবিতে দেখা যশস্বিনী চিত্রতারকার আবাসে এসেছি আমরা। বর্তমান ছবিটির ইনিই নায়িকা। উনি নিজেই নাকি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন। প্রযোজককে বলেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আছে।

খবর পেয়ে মহিলা এলেন। আমি যুক্তকরে বি-নত হলাম। প্রযোজক হেসে বললেন, আসামী হাজির, আপনি বোঝা-পড়া করে নিন।

আসামীর মুখ দেখে মহিলাটির হয়ত করুণা হল। বললেন, আগে একটু চা হোক, কেমন ?

আমি কৃতার্থ হয়ে বোকার মত মাথা নেড়ে বসলাম, অর্থাৎ, চায়ের তৃষ্ণা আপাতত নেই জানালাম। মহিলা সরাসরি কাজের কথায় এলেন। বললেন, আপনার ভালো, কিন্তু আপনার নায়িকার প্রতি আপনি সুবিচার করেন নি। আগুনের ফুলাকর মত মেয়ে—তার কাজ আর সংলাপও তেমনি হওয়া দরকার। নায়কের প্রতিটি চাল-চলন তার চোখের ওপর থাকবে, নায়ককে সে লাগামের মুখে রাখবে, সংঘাত আরো জোরালো হবে—অথচ ভিতরে ভিতরে সে কাঁদবে। এ-ধরনের কিছু সিচুয়েশান ভাবুন, নইলে মেয়েটির আদর্শ তেমন উঁচু হয়ে উঠছে না।

প্রযোজকের সপ্রশংস অভিব্যক্তি। ফেরার পথে গাড়িতে বসে বললেন, আপনার গল্প পছন্দ হয়েছে বলেই এতটা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে—ভালোই তো হল, ওকে যত বেশি ছবিতে দেখানো যায়। যা বললেন, ভেবেচিন্তে করে দিন।

করে দিলাম।

এরপর টাকার জন্য আবার দিন কয়েক প্রযোজকের স্টুডিও অফিসে হানা দিয়েছি। কিন্তু ছবির প্রাথমিক কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে আগমনের উদ্দেশ্যটা আমি বলে উঠতে পারছিলাম না। সর্বদাই পাত্র-মিত্র পরিবৃত হয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু অদৃষ্টে তখনো কিছু বাকি ছিল জানতুম না।

সেদিন এসে দেখি ঘরে গুরুগম্ভীর মুখে ছবির নায়ক বসে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক তাঁর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন একটু। তারপর আমাকেই বললেন, ইনি তো আপনার এই গল্পে কাজ করতে চাইছেন না।

আমি হতভম্ব। এই নায়কটিও যশস্বী শিল্পী। হেলাফেলার লোক নন। কম্পিতবক্ষে আমি তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসলাম। কিন্তু নায়কটি আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন।

আমি অপরাধীর মত প্রযোজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল—

নায়ক আমার দিকে ফিরলেন এবার। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্ত মুখে বললেন, লেখকদের গল্প বেশির ভাগই নায়িকা-প্রধান হয়, কিন্তু এতটাই যদি হবে, নায়ক চরিত্রের দরকার কি? শুধু নায়িকা দিয়েই গল্প হয না?

আমি নির্বিরোধী মানুষ তবু একটা রুক্ষ জবাবই মুখে এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এক ঘর উৎসুক লোকের চোখের ঘাযে মুখেব জবাব মুখেই থেকে গেল।

নায়ক ধীরেসুস্থে বললেন, আপনার নাযিকার পাশে নায়কটি ডলপুতুলেব মত হযে গেছে—তার স্কোপ বলতে কিছু নেই। সে অধঃপাতে যাক বা যেখানেই যাক, তার মধ্যে জ্বালা থাকবে, যাতনা থাকবে, পুরুষকার থাকবে। প্রতিষ্ঠা পেল না বলে একটা মেয়ের হাতে খেলনা হয়েও যে থাকতে রাজী নয সে, এটা স্পষ্ট কবে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে আমার এতে এসে লাভ কি?

প্রযোজক তাড়াতাড়ি বললেন, সব হবে, সব হবে, আপনি ভাবছেন কেন! আপনার রোল ছোট হলে তো আমার ছবি মার খাবে।...আমার দিকে তাকালেন, এঁর দিকটা সত্যিই ভালো করে ভাবা হয় নি, সব শুনলেন তো চরিত্রটা এবারে বেশ করে ফুটিয়ে তুলুন।

তাও তুলেছি। সব মিলিয়ে কি করেছি আমার ভাবার শক্তি নেই। বাকি আড়াই হাজার টাকাও পেয়েছি। টাকাটা শীলার হাতে তুলে দিতে সে খুশীতে আটখানা। শিগগীরই স্কুলের চাকরিটা ছাড়া অসম্ভব হবে না ভাবছে সে। এরপর অন্য লেখা নিয়ে বসতে দেখলেও ভুরু কুঁচকেছে, বলেছে, ছবির আর একটা গল্পটল্প ভেবে রাখলে হত না!

ছবির কাজ যত শেষ হয়ে আসছে আমার তত মুখ শুকাচ্ছে। এদিকে আমার আপনজনেরা ছবির মালিকের প্রচারের ছটায় মন্ত্রমুগ্ধ। তাই আমার শুকনো মুখ কারো চোখে পড়ছে মনে হয় না। সারাক্ষণই কি এক অস্বস্তিকর যাতনা। অবশ্য সে-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করেছি।

বাজার সরগরম করে একদিন ছবির মুক্তি ঘোষণা করা হল। বাড়িতে একটা আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। হলের সামনে কত লম্বা লাইন হয়েছে আর কত মাথা গিসগিস করছে তার প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা যেতে লাগল। ছবির প্রশংসাও কানে আসতে লাগল। আমি যে চুপি চুপি ছবিটা একদিন দেখে এসেছি সে-কথা আর কাউকে বলা গেল না। শীলা আমার নিস্পৃহতা দেখে রীতিমত বিস্মিত। সেদিন দশ বছরের মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে বলল, বাবা, আমাদের ক্লাসের মেয়েরা তোমার ছবি দেখতে চাইছে।

হঠাৎ একটা ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল সে। তার মা ঘরে থাকলে বিলক্ষণ অবাক হত। আদরের মেয়েকে কখনো বকি না বলেই তার রাগ।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে শীলাও হাসিমুখে বলল, কয়েকজন টীচার ধরেছে ছবি দেখাতে হবে—দুই-একজন দেখেও এসেছে, খুব ভালো বলছিল। এরা পাশ-টাশ দেবে তো? না কি?

আমি একটা দরকারী চিঠি লিখছিলাম, জবাব দেবার ফুরসত হয় নি।

আর্টদিনের দিন খবরের কাগজের সমালোচনা বেরুল। বাড়িতে আর এক-প্রস্থ খুশীর তরঙ্গ বয়ে গেল। কাগজওয়ালারা মোটামুটি প্রশংসাই করেছে ছবিটার। বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, সবল নারীসত্তার শক্তি-মাধুর্য, পুরুষের আচ্ছন্ন পুরুষকার, ইত্যাদি অনেক গাল-ভরা শব্দও চোখে পড়েছে। কিন্তু 'সমস্যাসঙ্কুল ছবিটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর হাসির খোরাক আছে'—পড়ে শীলা অবাক।—এ গল্পে আবার হাসি কোথা থেকে এল?

তার দিকে চেয়ে প্রথম আমার হাসি পেয়েছিল।

সেই সকালেই স্বয়ং প্রযোজক বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর ধারণা ছবি 'হীট' করবে। অবিলম্বে আর একটা গল্প লেখার জন্য উৎসাহিত করে গেলেন তিনি। শুনে শীলা মুখ বাঁকাল।—গরীবের কথা বাসি হলে ফলে, আমি যে ক'মাস ধরে তাগিদ দিচ্ছি, কানেই যায় না!

ওর ধারণা, ও বলেছে, বলেই কানে যাচ্ছে না, নইলে কানে যেত।

শীলা আর বউদি দলবলসহ ছবিটা দেখে এল আরো এক সপ্তাহ বাদে। বাড়ির কর্ত্রী সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যেমন নিজে আহারে বসে, এই ছবিটা দেখার ব্যাপারেও তার তেমন মনোভাব। সকলে দেখেশুনে তৃপ্ত হোক, তারপর নিজে দেখবে।

তারা ছবি দেখে ফেরার একটু আগে শীলার বোন আর ভগ্নিপতি এসে উপস্থিত। তারা দিনকতক আগেই ছবি দেখেছে। এরা ফিরতে সোৎসাহে ছবির আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বউদি বললেন, বেশ ছবি হয়েছে, আমার বাপু ভালোই লেগেছে। ভালো কোথায় কার লেগেছে সেই বিশ্লেষণ চলতে লাগল। শীলা হাসিমুখে শুনেছে, আর এক-একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবিয়ে আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। শীলা ওপাশে শয্যা নিল টের পেলাম। মাঝে ছেলে ঘুমিয়ে অনেকক্ষণের একটানা নীরবতার পরে অন্ধকারে

ছেলের গা ডিঙিয়ে একখানা হাত আমার বাহুতে ঠেকল। —ঘুমুলে?

—না।

—কি ভাবছ?

একটু থেমে বললাম, ছবির প্লট।

শীলার হাতটা আমার বাহুর ওপর থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। একটু বাদে গালের নিচে হাত রেখে আধ-শোয়া হয়ে ছেলের গাযের ওপর দিয়েই এদিকে ঝুঁকল। আমার মুখ দেখতে চেষ্টা করছে হয়ত। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, আমাদের যে-ভাবে চলছে চলে যাবে, টাকার জন্যে আর তোমাকে ও-সব লিখতে হবে না, বুঝলে?

আবছা অন্ধকারে এবারে আমি তার মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। একবার ইচ্ছে হল আলোটা জ্বেলে দেখি। তা করি নি। অন্ধকারেই কতক্ষণ চেয়ে ছিলাম বলতে পারব না। হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলে কতক্ষণ বাদে দুচোখ নিমীলিত করেছি, তাও জানি না।

না। শীলাকে আমি সত্যি কথা বলি নি। আমি ছবির প্লট ভাবছিলাম না। কিছুই ভাবছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, আমার নিজস্ব গতিশূন্য পথে আমি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী।

এখন মনে হল, তা নয়। সঙ্গিনী আছে।

শোক

বেলা তখন দুটো। বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তাড়াতাড়ি যাবার তাড়া ছিল। দূরে মোড়ের মাথায় ফুলের দোকানের সামনে যে-লোকটার ওপর চোখ পড়ল তাকে দেখলে অনেক তাড়াই ভুল হয়ে যায়। আমার তো যায়ই। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল দুটো বাস ছেড়ে দিলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

যারা চেনে তাকে, দেখলে দূর থেকেও চিনবে। সকলের মাথার ওপর তার মাথাটা আধ হাত উঁচিয়ে থাকে সব সময়। তেমনি রোগা আবার। ঢোলা হাতার ঢলঢলে মোটা পাঞ্জাবি, আলখাল্লার মত দেখায়। মাথায় একরাশ কাঁচা পাকা মরচে-ধরা চুল। চেনা-জানার মধ্যে এই বয়সে কারো চুল এত পাকতে দেখি নি।

বিমল ফুলই কিনছিল। অনেক ফুল।

তার ভাইয়ের বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র চলছে শুনেছিলাম। বিয়ে হয়ে গেল নাকি! ভাইয়ের বিয়েতে আমাকে বলবে না, তাও আবার কেমন যেন।

পিছন থেকে বললাম, কি হে ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল?

ঘুরে দাঁড়াল। শুকনো বিমর্ষ দেখলাম মুখখানা। কথা বলার সময় ঠোঁট দুটো হাসি হাসি দেখায়, তারও ব্যতিক্রম।

বলল, না শোভাদি মারা গেলেন।

ছ্যাঁৎ করে উঠল। শোভাদির অসুখ জানতাম, হাসপাতালে আছেন জানতাম, বাঁচবেন না, তাও জানতাম বোধ হয়। তবু মৃত্যুর কথা অস্বাভাবিক নতুন কথা যেন। তাছাড়া কোথায় বিয়ে, কোথায় মৃত্যু! ফুলের সঙ্গে বিয়ের যোগটাই মনে এসেছে, মৃত্যুর যোগটা মনে হয় নি।

হওয়া উচিত ছিল বলে সঙ্কোচও হল।

ফুলের বোঝা হাতে নিয়ে বিমল বলল, একবার হয়ে যাবে নাকি? পথেই তো হাসপাতাল—

চুপচাপ সঙ্গ নিলাম। দু-পাঁচ পা এগিয়ে বিমল একহাতে ফুলগুলো বুকের সঙ্গে চেপে ধরে অন্য হাতে ঢোলা পাঞ্জাবির পকেট হাতড়াতে লাগল। কিছু একটা মনে পড়েছে। যা খুঁজছে বেরুল। পুরনো খাম একটা। আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমার কাছে যেতাম আজই, সময় পাচ্ছিলাম না—শোভাদির এই ছবিটা আমার কাছে ছিল, পারলে তোমাদের কাগজে ছেপে খবরটা বার কর।

আমি কাগজের অফিসে চাকরি করি। অফিসেই চলেছি। ছবিটা নিলাম।

মৃতের সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। মাঝখানে অনেককাল বিরোধ ছিল। সেটা মানসিক বিরোধ।

শোভাদি আমাদের থেকেও পাঁচ-ছ বছরেব বড়। আমাদের থেকে মানে, আমার আর বিমলের থেকে। বছর ছেচল্লিশ হবে বয়েস। হার্টের ব্যামোয় বছরখানেক ভুগলেন প্রায়। শেষের একমাস হাসপাতালে ছিলেন, হাসপাতাল থেকেই গেলেন। টাকা থাকলে সংকটে হাসপাতালের ব্যবস্থা করাই ভালো আজকাল। অঢেল না হোক ভালো রকম চিকিৎসা করবার মত টাকা অন্তত শোভাদির ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে শোভাদি হাসপাতালে গেছেন শুধু ভালো ব্যবস্থার আশাতেই নয়, রোগে শান্তিতে চোখ বোজার মত আর তাঁর কোনো জায়গা ছিল না।

বিমলের মাসতুত বোন শোভাদি। মামার বাড়িতে থেকে মানুষ দুজনেই। শোভাদিকে বলতে গেলে আমিও তিরিশ বছর ধরেই জানি। বিমলের অন্তরঙ্গ যারা, সবাই জানে। বিমলের ছেলেবেলায়, শোভাদি ছিলেন তার আধা-গার্জেন। আর বিমলের বয়েস যখন কুড়ি-বাইশ, শোভাদি তখন শুধু বন্ধুস্থানীয়া নন, শিষ্যাও। বিমল তখন তাঁকে ছবি-আঁকা শেখাত।

শোভাদির বহুমুখিপ্রতিভায় একজনেরও যদি আস্থা থেকে থাকে, সেটা ছিল বিমলের। নিজে যে সে প্রতিভাবান শিল্পী, সেটা তার একদিনও মনে হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু শোভাদির এক-একটা প্রতিভা আবিষ্কার করে বহুদিন বিস্ময়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হতে দেখেছি তাকে।

ছেলেবেলা থেকেই শোভাদির অনেক গুণাবলীর গল্প শুনে আসছি আমরাও। শোভাদি চমৎকার গল্প বলেন, শোভাদি সুন্দর ছবি আঁকেন, শোভাদি কান-জুড়নো গান করেন, শোভাদি পড়াশুনায়ও তেমনি ভালো। কিন্তু প্রতিভা জিনিসটা ঠিক যে

কি, আমরা তা-ই ভালো করে বুঝতাম না তখন। শোভাদির মুখখানি মিষ্টি, তাঁর কথাবার্তা মিষ্টি, হাসিখুশীটুকু আরো মিষ্টি। এগুলোই প্রতিভা বলে মনে হত আমাদের। ভালো লাগত।

দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলেন শোভাদি। তৃতীয় বিভাগে আই-এ। বি-এ-টা আর পড়াই হল না তার আগেই বিয়ে হযে গেল। সেখানেও ছন্দপতন। শোভাদির স্বামী বে-সরকারী কলেজের মাস্টার মাত্র।

নিজের প্রতিভার প্রতি শোভাদির নিজেরও কিছুটা বিশ্বাস ছিল বোধ হয়। পড়াশুনায় সুবিধে হল না, বিয়েটাও তেমন পছন্দ হল না। বছর দুই বাদে ভেবেচিন্তে শোভাদি আবার গান নিয়ে পড়লেন। কোলে ততদিনে ছেলেও এসেছে একটি।

আমরা প্রায়ই শুনতাম, শোভাদি রেডিওতে গাইবেন, গান রেকর্ড করাবেন। বিমলই বলত। আমরা কোনোদিন রেডিওতে শোভাদির গান শুনি নি, রেকর্ডেও না। অবশ্য তাঁর বাড়ি গিয়ে সামনাসামনি বসে শুনেছি। ভালোও লেগেছে। তবে এমন গান আর কখনো শুনি নি—এমন মনে হয় নি।

কিন্তু গান খুব বেশিদিন চলল না। কলেজের মাস্টারের পক্ষে বড় ওস্তাদ রেখে বউকে গান-বাজনা শেখানো তেমন হয়ে উঠল না। তার থেকেও এ যুগের নিস্পৃহতার প্রতিই বিমলের বেশি অভিযোগ। অনেক রত্ন ধুলোয় ঢাকা, অনেক রত্ন সাগবেব নিচে।

গানের পরে শোভাদি গল্প লেখায় হাত মক্স করতে লাগলেন। এতে শুধু সময় খরচ আর কিছু কাগজ খরচ—টাকা খরচ নেই বললেই চলে। সেই গল্পও আমাদের প্রায়ই শুনতে হত। বিমলই নিয়ে আসত, সাগ্রহে পড়ে শোনাত। এক-একটা গল্প ভালো যে লাগত না, তাও নয়। কিন্তু যেটা ভালো লাগত না, বিমলের মুখের দিকে চেয়ে সেটাও ভালো বলতে হত। শোভাদির ব্যক্তিগত ঘোরাঘুরি আর সুপারিশের ফলে মাসিক সাপ্তাহিকে দুটো একটা গল্প ছাপাও হতে লাগল। প্রথম নিজের গল্প ছাপার অক্ষরে দেখলে কত আনন্দ হয়, সে-অভিজ্ঞতা একটু আধটু আছে। কিন্তু তাই দেখে আর একজনের যে কত আনন্দ হতে পারে তা বিমলকে না দেখলে ধারণা করাও শক্ত। বিমল বলত, শোভাদি শিগগীরই বড় উপন্যাস ধরবেন একটা, গল্পটা শুনেছি, দেখ'খন কিছু একটা হবে।

কিন্তু লেখার বাজারটা বুঝে নিতে শোভাদির খুব বেশি সময় লাগে নি। কাজেই কিছুই হল না। শোভাদি লেখা ছেড়ে ছবি আঁকা ধরলেন। খরচ নেই এতেও। রঙ-তুলি-কাগজ বিমল যোগায়—গুরুও সে-ই। তাছাড়া শোভাদির মনের রঙও কম নয়। ফলে বিমলের দেখা পাওয়া ভার হত তখন। তিন মাসের মধ্যে শোভাদির হাত যা হয়েছে সেটা নাকি বিস্ময়ের ব্যাপার। সেই হাতের নমুনা আমাদের মাঝে মাঝে এনে দেখাতো সে। ছবির কি-ই বা বুঝি। বিমলের প্রশংসায় সায় দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না।

সে-ই সব ছবির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ কবে বোঝাত আমাদের। তারপর

আমাদের মতামতের আশায় উদগ্রীব হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকত। যেন আমাদের সুসঙ্গত মতামতের ওপরেই সব নির্ভর। সে নিজে যে সোনার মেডেল পাওয়া আর্ট কলেজের সেরা ছাত্র—তাও মনে থাকত না।

কিন্তু এমন ঢিমে-তালে সার্থকতার শিল্পীজীবনে শোভাদির লেগে থাকার কথা নয়। থাকলেনও না।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল শোভাদি ছবিতে নেমেছেন। একটি ছেলের পর তাঁর তখন মেয়েও হয়েছে একটি। শুনে কেমন লাগল যেন। বিমলকে জিজ্ঞাসা করতে সে মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল, হ্যাঁ—কোনো লাইনেই ঠিক মন বসছে না, হয়ত এতেই হবে কিছু। কাব ভিতরে কি আছে কে জানে। ঠিক লাইনটি খুঁজে বার করা বড় শক্ত।

ঠিক লাইনই এতদিনে খুঁজে বার করেছেন শোভাদি। কারণ শেষ পর্যন্ত সেই লাইনেই টিকে গেলেন। কিন্তু তার আগে ওলট-পালটও হয়ে গেল কিছু। শোভাদির স্বামী কলেজের মাস্টার, তাঁর আপত্তি থাকার কথা। ছিলও, কিন্তু সে আপত্তি টেকে নি। ছবির বাজারে স্ত্রীর একটু আধটু উঠতি-মুখেই ভদ্রলোক শহরের চাকরি ছেড়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে মফস্বল কলেজে চাকরি সংগ্রহ করে চলে গেলেন। কিন্তু সেটা কিছুকাল পরের কথা।

প্রথম দিকের দু-চারটে ছবিতে ছোটখাটো ভূমিকায় দেখা গেল তাঁকে। ওইটুকু থেকে সার্থক সম্ভাবনার আঁচ পাওয়া শক্ত। বিমলের সঙ্গে তখনো মাঝে-সাঝে শোভাদির বাড়ি যেতাম। কিন্তু বিমলের আগের মতো তেমন আর উৎসাহ দেখতাম না। শোভাদিও বদলে যাচ্ছেন টের পেতাম। বেশির ভাগই ছবির গল্প করতেন, গালে ঠোঁটে রঙ মাখতেন, বাড়িতেও বেশ-বিন্যাস করে থাকতেন। অপরিচিত লোকের আনাগোনা দেখতাম, তাদের সঙ্গে হাসাহাসি গল্প-গুজব করতে দেখতাম। সে-সময় গিয়ে পড়লে, আমাকে ছেড়ে বিমলকে দেখলেও শোভাদি খুব খুশী হতেন বলে মনে হত না। তাছাড়া কারো না কারো গাড়ি থাকতই তাঁর বাড়ির দোরে! অভিনেত্রী হবার আগেই শোভাদি গাড়িতে কম চড়েন নি।

এর পর শোভাদি ভালো রোলে নেমেছেন শুনে বিমলকে নিয়ে তাঁর আরো দুটো ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। ভূমিকা আগের থেকে বড়, আর তাতে প্রতিভা প্রকাশের সুযোগও বেশিই বটে। কিন্তু নায়িকার ভূমিকা নয় একটাও। প্রথম ভূমিকাটি নায়িকার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। নায়কের প্রণয়লাভে তাঁর ছলা-কলা এবং ব্যর্থপ্রয়াস দর্শকের উপভোগ্য হয়েছিল । তারা হাসাহাসি করছিল। আমার ভালো লাগছিল না খুব। উনি যে অভিনেত্রী, শোভাদি নন তাই ভুলতে পারছিলাম না হয়ত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বিমল বিকৃত মুখে আর একদিকে চেয়ে বসে আছে। পরের ছবিটিতে এক বারবনিতার আত্মত্যাগের ভূমিকা শোভাদির। কিন্তু আত্মত্যাগ পর্যন্ত আমাদের আর দেখা হয়ে ওঠে নি। প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে প্রচার-বিজ্ঞাপনের স্থূল কারুকার্য দেখেই বিমল আর ভিতরে ঢুকতে চাইছিল না। টিকিট নষ্ট হবে বলে টেনে এনে

বসিয়েছিলাম। মাঝের বিরতির সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত মুখে বেদনার ছাপ একটা।

বলেছিল—তুমি বসবে তো বসো আমি চললাম।

এরপর দীর্ঘদিন আর শোভাদির নামও মুখে আনে নি বিমল। তবু কি করে যেন খবর সবই কানে আসত। ছেলেমেয়ে নিয়ে শোভাদির স্বামীর মফস্বল কলেজে চলে যাওয়ার খবর, বাড়ি ছেড়ে শোভাদির অন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়ার খবর, ছবির খবরও। ছোট-বড় আরো অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও ভাগ্যবতী চিত্র-তারকার নাম-ডাক যেমন হয় শোভাদির তেমন হল না। তিনি মাঝারির দলেই থেকে গেলেন। ঠিক মাঝারির দিকেও নয়, ভূমিকার প্রাধান্য বিচারে ক্রমশ সরেই আসতে লাগলেন তিনি।

তার প্রধান কারণ বোধহয় শোভাদির বয়েস, বযেসের দাগ। যত চেষ্টা আর যত যত্নই করুন, ও-দাগটা বড় বিশ্বাসঘাতক।

শেষের দিকে অবশ্য মা মাসি পিসি বা বর্ষীয়সী দিদির ভূমিকায় কাগজে শোভাদির প্রশংসা বেরুচ্ছিল একটু-আধটু। খুশী হয়ে বিমল সেই সব ছবি দেখেছে। এবং দেখে আরো খুশী হয়েছে। আবারও শোভাদির প্রতিভার কথা মনে হযেছে তার। অভিনয়ে স্নেহসিক্ত ব্যথাজর্জর মাতৃত্বের এতটুকু স্পর্শ পেলেই মুগ্ধ। কোনো কোনো ছবি দুবারও দেখেছে, উচ্ছ্বাসভরে আগের মতই ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছে তাই নিযে। এতদিনে যেন শোভাদির নারীপ্রতিভা নিজ উৎস-মুখটি খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু শুধু এইটুকু সার্থকতার আড়ালে শিল্পী-জীবনের কত যে দীর্ঘশ্বাস, তা উপলব্ধি করেছিলাম শোভাদিকে দেখে। এই সময়ে শোভাদি আবার বিমলকে মাঝে-সাঝে ডেকে পাঠিয়েছেন। দুই-একদিন আমিও গেছি তার সঙ্গে। শোভাদি মৃদু অনুযোগ করেছেন, তোমারা যে একেবারেই বর্জন করলে আমাকে। ...ছবির প্রসঙ্গে বলেছেন, আঃ ভাই এ-জীবনে হল না কিছু—

আমার সত্যিই দুঃখ হয়েছে! কিন্তু বিমল খুশীতে আটখানা। বাইরে এসে বলেছে, শোভাদি সত্যিকারের শিল্পী, শিল্পী কখনো নিজের সৃষ্টিতে তুষ্ট থাকতে পারে! শিল্পীর এই ব্যথাই নাকি তার সৃষ্টির পাথেয়।

হাসপাতালের কাছাকাছি এসেই আমি হাঁ, বিমল অভিভূত। এমন ব্যাপার কল্পনাও করি নি। এই হাসপাতালে শোভাদির মৃত্যুর খবর এরই মধ্যে কি করে যেন ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। গেলেও সেটা যে এতবড় অন্তরস্পর্শী ব্যাপার হতে পারে কল্পনাও করি নি। হাসপাতালের আঙিনায় ফুটপাতে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। নানা বয়সের, নানা স্তরের মানুষ। অনেক মেয়েছেলেও আছে তার মধ্যে! গাড়ি গাড়ি পুলিশ এসে ভিড় নিয়ন্ত্রণ না করলে ট্রাম-বাসও একেবারে বন্ধ হত।

বেঁচে থেকে শোভাদি যা পান নি, শোভাদি কি মৃত্যুতে তাই পেলেন। শোভাদি কি দেখতে পাচ্ছেন তা?

আমি নির্বাক।

বিমলের চোখে জল।

ভিড় ঠেলে শোভাদির কেবিন পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে আমরা গলদঘর্ম। ভিতরেও শুভার্থী-শুভার্থিনীর সংখ্যা কম নয়। শোভাদির কর্মস্থলের অনেক সতীর্থও এসেছেন লোকান্তরিতার প্রতি শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

শোভাদি চিরনিদ্রায় শয়ান। যেন ঘুমিযে আছেন। শান্ত, প্রসন্ন।

শোভাদিকে এত সুন্দর আমি আর কখনো দেখি নি।

এক ফাঁকে বিমলকে বললাম, আমি যাই, দেরি হলে খবরটা কাগজে ভালো কবে বার করা যাবে না।

অফিসে এসে এই একটা কাজই করলাম সেদিন। চিত্র সম্পাদকের সাহায্যে শোভাদির অভিনয-জীবনেব তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিতে বেশি বেগ পেতে হল না। আর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভালোবাসা? সে তো আমি নিজের চোখেই দেখে গেছি।

অফিস থেকে বেরিযে সোজা বিমলের বাড়ি এলাম যখন রাত তখন এগারটা। বিমল তখন বাইরের ঘরেই ছিল। ফুলস্পীড পাখার নিচে বসে চুপচাপ আঁকছিল কি। কি আঁকছিল, কি আঁচড় কাটছিল, সে-ই জানে, তার আঁচড়গুলোই আঁকার মতো। খানিক আগে চান করেছে বোঝা যায়।

—বোসো। মুখ তুলল না, হাত চলছে।

চেযার টেনে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কতক্ষণ ফিরলে?

—এই তো।

—শ্মশানেও তেমনি ভিড় হয়েছিল?

না আমরাই জনকতক।

নিজের প্রশ্ন নিজের কানেই বিসদৃশ ঠেকল। এই শোকের মুখে শোকের আড়ম্বরের কথাটাই প্রথমে মনে এলো কেন কে জানে পরে জিজ্ঞাসা করলেই হত।

বললাম, আমি নিজেই লিখে দিয়ে এলাম যতটা সম্ভব লিখেছি—ছবিসুদ্ধু কাল প্রথম পাতাতে বেরুবে।

কি লিখেছি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। কাগজে আঁচড় কেটে চলল। শুধু আঁচড়গুলো একটু জোরে জোরে পড়ছে মনে হল।

একটু বাদে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, কোথাও একটা টেলিফোন করে ওটা ছাপা বন্ধ করা যায় না?

আমি হতভম্ব, ঠিক শুনেছি কি না সেই সংশয়। —কি ছাপা বন্ধ করবে?

—শোভাদির খবরটা। যা লিখে এলে—

আবারও অবাক খানিকক্ষণ। ভাবলাম, শোভাদি বেঁচে থেকে কিছু পেলেন না, শোকের মুখে এখন সেই খেদটাই বড় হয়ে উঠেছে হয়ত। সেইজন্যই বলেছে। ওর শোকের পরিমাণ অনুমান করতে পারি।

সান্ত্বনার সুরে বললাম—না, বন্ধ করা যায় না, খবরের কাগজে খবর বেরুবেই। তাছাড়া খবরটাও তো ছোট নয়, ছবির শিল্পীকে সাধারণ লোক এত ভালোবাসে, এত সম্মান করে আমার ধারণা ছিল না। দুঃখ করো না, শোভাদি কম পান নি।

পেন্সিলটা কাগজের ওপর রেখে এতক্ষণে মুখ তুলল। চেয়ে রইল একটু, তারপর নিস্পৃহ গলায় বলল, শোভাদি কিছুই পান নি। শোভাদির মত ছবির শিল্পীকে তারা ভালোও বাসে না, সম্মানও করে না।

আমার নির্বাক বিস্ময়ের ওপরেই শান্ত মুখে আর একটা ঘা দিল সে। বলল, যারা এসেছিল তারা কেউ শোভাদি মারা গেছে বলেও আসে নি, শোভাদিকে দেখতেও আসে নি। ছবির নামজাদা সব নায়ক-নায়িকারা এসেছিল হাসপাতালে, দেখেই তো গেছ। ভিড়টা তাদের দেখার জন্য। সেই লোভেই এসেছিল তারা, সেই লোভেই দাঁড়িয়েছিল। কাড়াকাড়ি করে তারা তাদেরই দেখেছে।

আমি চিত্রার্পিত।

দ্বীপ

'তোমাকে খবরটা কেমন করে জানাব ভাবছি। তুমি বার বার বলে দিয়েছিলে, ভালো হোক মন্দ হোক; যেমন খবরই হোক জানাতে। বলেছিলে তুমি সহ্য করতে পারবে। ...খবরটা যে শুভ নয় সে তো তুমি নিজেই মন দিয়ে বুঝেছিলে। তুমি যা অনুমান করেছিলে তা-ই সত্যি। দত্ত সাহেব বেঁচে নেই। যুদ্ধে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি। তুমি শক্তিমতী। তোমার সন্তান বীরের সন্তান। তোমার ছেলে বড় হোক, গর্বের কারণ হোক—এই প্রার্থনা।'

চিঠিটা শেষ করে খাম বন্ধ করার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। হাত থেকে ছেড়ে দিলেই এটা একদিন গিয়ে পৌঁছুবে সাগর-বসতির দেশে। কালাপানির এক দ্বীপের মেয়ের কাছে। সে এই চিঠিখানাই আশা করছে। আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম দেশে ফিরে এসে লিখব। ...লিখেছি।

চিঠিতে যার কথা লিখেছি, তাকে, অর্থাৎ দত্ত সাহেবকে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিও নি। সে বেঁচে আছে কি মারা গেছে জানি না। কোনোদিন সে যুদ্ধে গিয়েছিল কিনা তাও জানি না।

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের দায় আমার নয়। আমি প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। করি নি এখনো, করতে যাচ্ছি।

চিঠিখানা যথাস্থানে পৌঁছুলে পরে কি হবে অনুমান করা শক্ত নয়। চিঠি হাতে

মেয়েটি ঠাণ্ডা মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে খানিক। এরই আশায় ছিল বটে, তবু চট করে বিশ্বাস হবে না যেন। কারণ মেনল্যাণ্ডের লোকের প্রতিশ্রুতির উপরে তার আস্থা গেছে। উল্টে-পাল্টে দেখবে চিঠিখানা। কালো দুচোখ চকচকিয়ে উঠবে খুশীতে। পড়তে পারবে না। পড়তে জানে না। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। ভাঙা হিন্দী বলতে পারে। ভাঙা ইংরেজী আর একটু বেশী বলতে পারে।

ছেলে কোলে তুলে নিয়ে কারো কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে, বলবে, ইংরেজী চিঠিটা পড়ে দিতে হবে। ...মুখে আশার আলো জ্বেলে বলবে। তারপর যে পড়বে তার মুখের দিকে চেয়ে ওর মুখ শুকোবে একটু একটু করে। আর, চিঠির বারতা বোঝার পর ছেলেসুদ্ধু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়বে হয়ত। তারপর কাঁদবে হাপুস নয়নে। দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে যাবে। বয়স্ক বা আধবয়সী মাতব্বরেরা এগিয়ে আসবে তাদের প্রাক্তন সর্দাবের এই অদ্ভুত স্বভাবের মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে। মেয়েরা সম্ভ্রমভবা চোখে দূর থেকে দেখবে চেয়ে চেয়ে। ছেলে-ছোকরারা বোবা চোখে।

সকলে ভাববে, আধাপাগলা মেয়েটা এবাবে গোটাগুটি না পাগল হয়। যাও আশা নিয়ে ছিল, তাও গেল।

মেয়েটা উঠবে একসময়। লোকজনেরা তাকে ডেবায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। সকলে চলে গেলে ছেলেটাকে কিছু খেতে দিয়ে ঠাণ্ডা করবে। তাবপর চুবড়িতে যত্ন করে তুলে বাখবে চিঠিখানা। তাবপর মুখ-হাত ধুয়ে নিজে ঠাণ্ডা হয়ে ছেলের পাশে বসবে। তাবপব আমাকে ধন্যবাদ দেবে। ভাঙা ইংরেজীতে বলবে, মে গড ব্লেস ইউ, স্যার—

মেয়েটিব গল্প প্রথম শুনি জাহাজের ডেকে বসে রমেশচন্দ্রের মুখে। রমেশচন্দ্র বাঙালি নয়, ইউ পির লোক। গত বার-তের বছর ধরে পোর্টব্লেয়ারে আছে। ম্যাচ-ফ্যাক্টরীর পদস্থ কর্মচারী। বছরান্তে একবার কলকাতা ঘুরে দেশে যায়। তখন দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। তখনো ভালো লাগত, এখনো লাগে। হাসিখুশী মানুষ গল্প করতে পেলে আর কথা নেই।

পোর্টব্লেযার থেকে জাহাজে চলেছি কর-নিকোবর দ্বীপে। সেখানে কি একটা উৎসব উপলক্ষে চীফ কমিশনার যাচ্ছেন। আমার উদ্দেশ্য বেড়ানো। সঙ্গী রমেশচন্দ্র। মাদ্রাজের পথে জাহাজ এখানে এক বেলা থামে। উৎসবান্তে চীফ কমিশনার, রমেশচন্দ্র মাদ্রাজে চলে যাবেন। রমেশচন্দ্র মাদ্রাজ থেকে কলকাতা হয়ে দেশে যাবে। আমি দিন তিনেক নিকোবরে থেকে এক মস্ত ব্যবসাযীর মোটর লঞ্চে পোর্টব্লেযারে ফিরে আসব। রমেশচন্দ্রেব পাকা ব্যবস্থা।

প্রবাল দ্বীপ কথাটা কবে প্রথম মনে গেঁথেছিল জানি না। কিন্তু তখনো পর্যন্ত প্রবাল দ্বীপ, স্বপ্নের দ্বীপ। অনেকদিন পর্যন্ত ওটা কল্পনাগম্য দ্বীপ বলেই জানতাম। সত্যি সত্যি সেই দ্বীপে চলেছি, ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন একটু উত্তেজনা ছিল, রোমাঞ্চ ছিল। রমেশচন্দ্রকে সেই উত্তেজনা বা রোমাঞ্চের সঙ্গী করে নিতে পারি নি। কারণ,

এ পর্যন্ত অনেকবার সে নিকোবরে এসেছে। এই দ্বীপ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আর কৌতূহল অনেক সময় তার হাসির খোরাক হয়েছে।

সমুদ্রপথে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর-নিকোবর একশ তেতাল্লিশ মাইল। বেলা তিনটে নাগাদ জাহাজ ছেড়েছে, পরদিন সকালে পৌঁছে দেবে। রাত্রিতে ডেকে বসে রাতের সমুদ্র দেখছি আর রমেশচন্দ্রের সঙ্গে এটা-সেটা গল্প করছি।

হঠাৎ মনে পড়ল, নিকোবরে আসাটা বরাতজোরে ঘটতে চলেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে আসার পারমিট সংগ্রহ করা শক্ত হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের তদবির-তদারকে ছাড়পত্র মিলেছে। একই সরকারের তত্ত্বাবধান দুই দ্বীপে—যাতায়াতে পারমিট লাগবে কেন, ভেবে পাই নি। তারপর পারমিট সই করে নিতে এসে দেখি দশ ঝামেলা। কাগজে-কলমে নাম-ধাম বংশপঞ্জী কবুল করতে হল, বিশদভাবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা হল। দৈর্ঘ্য প্রস্থ, গায়ের রঙ, চুলের রঙ—এমন কি, সনাক্ত করা যেতে পারে অবয়বে তেমন কোথায় কি চিহ্ন বা ক্ষতচিহ্ন আছে তাও লেখা হল। তারপর, কেন যাচ্ছি, কদিন থাকব, ইত্যাদি!

যেদিন পারমিট মিলছে সেইদিনই যাত্রা। কাজেই তাড়াহুড়োয় এই সব আনুষঙ্গিক সতর্কতা পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করার কথা মনে ছিল না। এখন মনে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, নিকোবর আসতে হলে এত সব আইনকানুনের ফ্যাকড়া কেন হে, কি ব্যাপার?

রমেশচন্দ্র মুচকি হেসে জবাব দিল, তুমি যে সেখানে গিয়ে প্রেমের জাল বিছিয়ে বসবে না, তার বিশ্বাস কি?

—বসলে কি হবে?

—কি আর হবে, ফলটল যদি ধরে কিছু তার সব দায়-দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে, পালিয়ে রেহাই পাবে না।

আমি অবাক—এ-রকমও হয় নাকি?

—এখন বিশেষ হয় না, আগে হত। আগে তো শুধু ফুর্তি করার জন্যেই নিকোবরে যেত লোকে—একটা জাতকে জাত বিষিয়ে গেছে ওই করে, শতকরা সত্তরটা ছেলেমেয়ের খারাপ রোগ।

বিশদ বিবরণ শোনার পর আমি চুপ একেবারে। সভ্য মানুষের এই লোভের ইতিবৃত্ত নতুন কিছু নয়। সেদিকে তাকালে এই সভ্যতার মশালে অনেক আহুতির নজির মিলবে, অনেক ক্ষুধার বিভীষিকা দগদগিয়ে উঠবে। ...সমুদ্র-বুকের ওই আদিমানুষেরা সমুদ্রের মতই উন্মুক্ত, উচ্ছল, উদ্দাম। আনন্দের সঙ্গে ওদের সত্তার যোগ। প্রথম চেতনার আলো দেখিয়েছিল তাদের ক্রিশ্চিয়ান মিশনরীরা। তারা হৃদয়ের বেসাতির উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। তারা সফল হয়েছে। আজও এদের সঙ্গে ওই আদিবাসীদের হৃদযের সম্পর্ক। এখনো সেখানে মিশনরীদের রীতি-নীতির প্রাধান্য বেশী।

কিন্তু এর পরে সেই ইংরেজ শাসনের যুগেই যারা এসেছে, তারা বেসাতির উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে শুধু। আদিবাসী পুরুষেরা তাদের গতর দিয়ে সোনা যুগিয়েছে, আর

রমণীরা যৌবন দিয়ে দেউলে হয়েছে। তারা 'না' বলতে জানে না, এখনো জানে না ভালো করে। জীবন আনন্দের বস্তু, ভোগের বস্তু—দেবতাসদৃশ এই বিদেশী সভ্য অতিথিদের আনন্দের আমন্ত্রণে আর ভোগের আয়োজনে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকতে শেখে নি। তারা বিমুখ করতে জানে না কাউকে।

ব্যভিচার ?

ব্যভিচার কাকে বলে সেটাই তারা ভালো করে জানে না। তাদের নিজেদের রীতিনীতি সামাজিক বিধিব্যবস্থা আছে। কিন্তু পরদেশী অতিথিদের সম্ভ্রমেব চোখে দেখত, আলোর মানুষ বলে ভাবত। এখনো দেখে, এখনো অনেকটা সেই রকমই ভাবে। তাদের আনন্দের জন্যে, খুশীর জন্যে নিজেদের রীতিনীতি শিকেয় তুলে রাখতে আপত্তি কি ?

তা ছাড়া যারা আসত, তারা খালি হাতে আসত না, সভ্য জগতের লোভের সামগ্রী নিয়েই আসত। তুচ্ছ জিনিসকে এদের তুচ্ছ বলে জানতে অনেক সময় লেগেছে। আজও ভালো করে জানে না, কোন্‌টা তুচ্ছ আর কোন্‌টা নয়। আলো দেখলে পতঙ্গ ধেয়ে আসবে না ?

এর পর যারা এসেছে, আদিবাসীরা তাদের শুধু সম্ভ্রমের চোখে দেখত না, শুধু অতিথি বলেই ভাবত না। বিদেশী শাসনের শেষের যুগে রাজকর্মচারী আর ব্যবসায়ীদের বেশ সমীহ করতে, ভযও করত। এদের নগ্ন চাহিদার রূপটা ওরা খানিকটা চিনেছিল, কিছুটা হযত বুঝেছিল। কিন্তু অস্ত্র যাদের হাতে, ইচ্ছেয় না দিলে তারা যে আদায করে নেবে—সেই সঙ্গে এটাও জেনেছিল।

ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। একটা জাতির মেরুদণ্ডে রোগের ঘুণ ধরেছে। বংশ বংশ সেই রোগ টানছে তারা। সমুদ্রের বুকের এই মানুষেরা আজও যৌন ব্যাধিতেই চোখ বোজে সব থেকে বেশী। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় ওই রোগের নিরসন সমস্যাটাই সব থেকে বড়। সেই জন্যেই ওখানে পদার্পণের এত বিধিনিষেধ এত কড়াকড়ি।

কথায় কথায এরপর দত্ত সাহেব আর ববির গল্প করেছে রমেশচন্দ্র। আজও ওরা কত সহজ, কত সরল, কত বিশ্বাসপ্রবণ, সেই গল্প বলেছে, গেলেই মেয়েটাকে দেখতে পাবে—ভারি সুন্দর দেখতে—একটা ছেলে আছে বছর তিনেকের। আজও দত্ত সাহেবের আশায় বসে আছে, তপস্বিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। ওর বিশ্বাস দত্ত সাহেব যুদ্ধে গেছে, একদিন না একদিন ওর কাছে ফিরে আসবেই।

গল্পটা শুনেছি। এ-রকম বিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতার গল্প কোনো একটা বিশেষ দেশের বিশেষ গল্প কিছু নয়। ববি নিকোবরিদের এক সর্দারের মেয়ে। আসল নামটা কি রমেশচন্দ্র জানে না। মিশনরীদের দেওয়া ওই নামটাই চালু। ববির বাবা বিদেশীদের সুনজরে দেখতো না খুব, তার কারণ সম্ভবত ববির মায়ের অকালমৃত্যু। তার মাও সেরা সুন্দরী ছিল দ্বীপের। যৌবন-দাক্ষিণ্যে ভরপুর ছিল। ববির বাবার মুখ থেকেই রমেশচন্দ্র শুনেছে সে কথা। মেয়েটার সাত-আট বছর বয়সে ওর মায়ের সেই সুন্দর

দেহ রোগে খেয়েছে। পরদেশী বাবুদের সঙ্গে মাত্র দু-তিন বছর মেলামেশার পরেই তাকে হারাতে হয়েছে।

ববির বাবাও বেঁচে নেই আজ। যখন ছিল, দত্ত সাহেবের সঙ্গে মেয়ের মেলামেশা বরদাস্ত করে নি। এমন কি মেয়ে সহায় না থাকলে লোকটার প্রাণসংশয় হত। ববি বুক দিয়ে আগলেছে তাকে। শুধু বাবার হাত থেকে নয়, যে দু-চারজন মরদ ওকে পাবার আশায় দিন গুনছিল, তাদের কোপ থেকেও। ববির মন পাওয়ার আশায় ওদের মধ্যে অনেকেই কেনোয় চেপে চৌড়া দ্বীপে পাড়ি দিয়েছে অনেকবার। নিকোবরি রমণীরা বীরভোগ্যা, বীরত্বের অনুরাগিণী। চৌড়া দ্বীপে পাড়ি দিল না যে, সে করুণার পাত্র। ববির বাবা সানন্দে যখন জামাই ছাঁটাই বাছাই করেছে মনে মনে, সেই সময়ে দত্ত সাহেবের আবির্ভাব।

পোর্টব্লেয়ারের এক নামজাদা ব্যবসায়ীর সঙ্গেও বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল তার। লোকটার সাহসও আছে, বুদ্ধিও আছে। তার ওপর ঘরকুনো নয়, চলমান স্রোতে জীবন ভাসাতে একপায়ে রাজী। পোর্টব্লেয়ারের বাঙালী অবাঙালী সকলেই জানে তাকে। মালিকও সুনজরে দেখতো। ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানে প্রায়ই নিকোবরে পাঠাত তাকে। ববির কথা আর তাদের প্রণয়ের কথা প্রথমে তার মুখ থেকেই শুনেছিল রমেশচন্দ্র। হা-হা হাসত দত্ত সাহেব আর নিজের কেরামতির কথা বলত। বলত, কবে শুনবে ওখানকার ওই লোকগুলোর হাতেই প্রাণটা গেছে আমার, ব্যর্থ-প্রেমিকরা সব ছুরি শানাচ্ছে, বাপটাও সদয় নয়।

ওই বাপকে আর ব্যর্থ-প্রেমিকদের ভোলাবার জন্যে রমেশচন্দ্র পোর্টব্লেয়ার থেকে অনেকবার অনেক কিছু কিনে নিয়ে যেতে দেখেছে তাকে। এরপর শুনেছে, মালিকের ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্যে পাকাপাকিভাবে একজনের থাকা দরকার সেখানে। অতএব দত্ত সাহেব চলেছে থাকতে।

যাবার আগে উদ্দেশ্যটা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে রমেশচন্দ্রের কাছে। ওই মেয়েই প্রথম মেয়ে নয় তার জীবনে। কিন্তু ও-রকম মেয়ে সে আর দেখে নি। সমুদ্র অনেক দেখেছে কিন্তু কোনো মেয়ের বুকে যৌবন-সমুদ্র অমন আর দেখে নি। মেয়েটা মাতাল করেছে তাকে, পিপে পিপে মদ গিলেও ও-রকম মাতাল হওয়া যায় না। মেয়েটার বাপ বেঁচে নেই তখন, মাতব্বর দলের সঙ্গে দত্ত সাহেবের একটা রফা হয়ে গেছে। অবশ্য ওই মেয়ের চেষ্টাতেই হয়েছে সেটা। তারা বলেছে, বিয়ে করতে হবে। ...দত্ত সাহেব বলেছে, রাজী। ...কি সব অনুষ্ঠানের পর তারা বলেছে, বিয়ে হয়ে গেল তোমাদের। ...দত্ত সাহেব বলেছে, বেশ কথা।

—এখন বউ ছেড়ে আমি এখানে পড়ে থাকি কি করে? ...দত্ত সাহেব মুচকি হেসেছিল।

বয়সে ছোট কিছু, রমেশচন্দ্র সতর্ক করেছে তাকে, কাজটা ভালো করছ না কিন্তু—

দত্ত সাহেবের রক্তে নেশা তখন, ভালোমন্দ বিচারের বাইরে। উল্টে ঠাট্টা করেছে, খোলা আকাশের নিচে আর খোলা সমুদ্রের চড়ায় কোনো সমুদ্রকন্যার সঙ্গে রাত

কাটিয়েছ কোনোদিন, না দ্বীপের নির্জন বনে ছোটাছুটির পাল্লায় হারিয়ে কোনো বন্য মেয়েকে দস্যুর মত শেষ পর্যন্ত দুহাতের বেড়েতে আটকাতে পেরেছ কখনো! তোমরা ভালোমন্দ খতিয়ে দেখ, আমি চল্‌তি।

তার সে কামনা-গলানো উদ্দীপনা দেখে রমেশচন্দ্রের মনে হয়েছিল জাহাজে পৌঁছানর একটা দিনও নষ্ট না করে এই মুহূর্তে সমুদ্রটা সাঁতরে পাড়ি দিতে পারলে দিত।

এর পরের সমাচার সংক্ষিপ্ত। এক বছরের মধ্যে দত্ত সাহেব একবারও পোর্টব্লেয়ারে আসে নি। রমেশচন্দ্র ছুটিতে দেশে এসেছিল। ফিরে গিয়ে শুনেছে, বিশেষ জরুরী কাজে ছুটি নিয়ে দত্ত সাহেব নিকোবর থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা গেছে। তার মালিকের মুখেই খবরটা শুনেছিল রমেশচন্দ্র। মালিক চিন্তিত, দত্ত সাহেবের ছুটির মিয়াদের দ্বিগুণ কাবার, অথচ একেবারে নিপাত্তা সে। তার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখেও কোনো খবর মেলে নি। মালিক খোঁজ করতে এসেছিল, রমেশচন্দ্র তার কোনো চিঠি পেয়েছে কি না, বা তার কোনো খবর রাখে কি না।

কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যেও খবর মেলে নি। আর মিলবেও না জানা কথা। ইতিমধ্যে বার কয়েক নিকোবরে গেছে রমেশচন্দ্র। সেখানকার খবরটাই খবর। নিকোবরিরা সকলেই জানে, সরকারী পরোয়ানা পেয়ে দত্ত সাহেবকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। কোথায় যুদ্ধ, কার সঙ্গে যুদ্ধ, তারা জানে না। তবে যুদ্ধ বোঝে, যুদ্ধের বিভীষিকা জানে। সদ্যগত যুদ্ধের ধকল তাদের ওপর দিয়েও গেছে কিছুটা। জাপানীরা ওই দ্বীপ দখল করেছিল।

তিন বছরের মধ্যেও লোকটার কোনো খবর না পেয়ে তারা ম্রিয়মাণ। এখন স্পষ্টই মনে তাদের অশুভ ছায়া পড়ছে। দেশের ডাকে বীরের মতই হাসিমুখে গিয়েছিল মানুষটা, বীরের মতই তাদের মধ্যে ফিরবে আবার—সেই আশা করেছিল। কি যে হল তারা ভেবে আকুল।

আরো আকুল ববির অবস্থা দেখে। অমন মেয়েটা আস্তে আস্তে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিন বছরের ছেলে নিয়ে আজও প্রতীক্ষায় আছে। তার প্রেম, তার ভালোবাসা আজ একটা আদর্শের মত হয়ে উঠেছে ওই দ্বীপে। সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে তাকে। ওখানাকার মেয়েদের জীবন থেকে একজন পুরুষ সরে গেলে আর একজন পুরুষের আবির্ভাব হতে সময় লাগে না। কিন্তু ববির আগের প্রণয়ীরাও এখন আর বাসনার আওতায় পেতে চায় না ওকে। বরং মনে মনে আশা করে, লোকটা ফিরে আসুক। কোথাও কোনোরকম ব্যভিচারের ছায়া পড়লে ববির নজির দেখায় বৃদ্ধ মেয়ে-পুরুষেরা। ওকে দেখলে একধরনের সংযম-চেতনা উঁকিঝুঁকি দেয় কেমন। ওদের বেপরোয়া খুশীর জীবন আর ফুর্তির জীবনটা অমনি সাদা হওয়া দরকার, সেই উপলব্ধিও জাগে বোধ হয়।

ববির ঘরে একটা ফোটো আছে দত্ত সাহেবের। সেই ফোটোটাই এখন প্রাণ তার। জাতীয় উৎসবে পার্বণে সেই ফোটো সঙ্গে নিয়ে যায়। ফোটোতে শূকর-রক্তের ফোঁটা পরায় তখন। রোজ মালা পরায়, ফুল দেয়।

অন্য পরিবেশে বসে শুনলে এই গল্প কেমন লাগত, বলতে পারি না। কিন্তু অফুরন্ত আকাশের নিজে অফুরন্ত সমুদ্রের বুকে বসে অদেখা এক আদিবাসী রমণীর অদৃষ্ট-বঞ্চনা আমাকে স্পর্শ করেছিল। রাতের আবছা আলোয় ঢেউগুলো জ্বলছিল। আর ভিতরে ভিতরে আমিও একধরনের জ্বালা অনুভব করছিলাম।

পরদিন সাতটা নাগাদ জাহাজ থামল। কিন্তু থামল তীর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। এত দূর থেকে নিকোবর দ্বীপ বড়সড় একচাপ ঝোপের মত দেখায়। শুনলাম, এখানকার সমুদ্রের গভীরতা সুনির্বিঘ্ন নয় বলে বড় জাহাজ পাড়ের দিকে ঘেঁষে না। এখান থেকে ডিঙ্গির মত ছোট ছোট মোটর বোটে পাড়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

ধুতি-পাঞ্জাবি সামলে কোনোরকমে মোটর বোটে উঠে বসলাম। কিন্তু তার পরেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ঢেউয়ের ঝাপটায় একবার করে মহাশূন্যে উঠছি আর একবার করে অতলে নামছি। যে-কোনো রকমে একবার ছিটকে পড়লেই অতল-সমাধি। অথচ এটাই নাকি সমুদ্রের শান্তরূপ। ভয়ে কাঠ আমি, কোনোরকমে নৌকো আঁকড়ে বসে আছি। রমেশচন্দ্র বার দুই আশ্বাস দিল, কিচ্ছু ভয় নেই, চুপচাপ বসে থাক।

যাই হোক, তীরের কাছাকাছি এসে মোটর বোটও থেমে গেল। আশ্চর্য, এখানকার জল পুকুরের মত নিস্তরঙ্গ, ঠাণ্ডা! ঢেউ তো নেই-ই, স্রোতও নেই যেন। নিকোবরি আদিবাসীরা এক একটা ক্ষুদ্রাকৃতি কেনো নিয়ে মোটর বোটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লম্বা সরু ভেলার মত, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তলা দিয়ে দুটো বড় বাঁশ আড়াআড়ি বাঁধা। ওই ভেলায় চেপে আমরা তীরে উঠব।

পাড়ে নিকোবরি পুরুষ-রমণীর ভিড। পুরুষদের পরণে পাতলা রঙিন হাফপ্যান্ট, গায়ে রঙবেরঙের হাফ-হাতা জামা বা গেঞ্জি। মাথায় অনেকেরই কাঁটার মুকুট জড়ান। এক-একজনের এক-একরকম। যার যেমন পছন্দ। মেয়েদের পরনে রঙিন সায়া, গায়ে রঙিন ব্লাউস। লক্ষ্য করলে অন্তর্বাসও চোখে পড়ে। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই গায়ের রঙ লালচে, তামাটে।

প্রথম দর্শনে প্রবাল দ্বীপ দেখে নিরাশ হয়েছি সত্যি কথা। এই প্রবাল দ্বীপে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার প্রবাল দ্বীপের অস্তিত্ব লুপ্ত। একটুও মেলে না। গাছ-গাছড়া ঝোপঝাড়ে ভরা পূর্ব বাংলার গাঁয়ের মত। প্রস্তরীভূত প্রবালকীটের অস্তিত্ব দেখব, এ আশা যদিও হাস্যকর, তবু এমন গদ্যাকারের প্রবাল দ্বীপ দেখব ভাবি নি।

আদরযত্ন করে আমাদের আধ মাইল দূরের একটা প্যাণ্ডেলের নিচে নিয়ে যাওয়া হল। একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। মেয়ে-পুরুষ সকলেই আমাকে যেন একটু বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। চীফ কমিশনার এবং অন্যান্য গণ্যমান্যজনের সমাবেশেও আমি লক্ষণীয় কেন, সেটা বুঝতে অবশ্য বেগ পেতে হল না। একমাত্র আমারই পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। এটাই ওদের চোখে বিশেষ বৈচিত্র্যের মনে হল।

নিকোবরি মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে জন-গণ-মন জাতীয় সঙ্গীত শোনাল প্রথম। আমি অভিভূত। পুষ্ট গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ, আর সেই অবিকৃত সুর, যে সুরের সঙ্গে নাড়ির যোগ। অনেক অভিজাত সমাবেশে নিজের দেশের মেয়েদের গলায়ও এই

জন-গণ-মন অনেক সময় মেকী মনে হয়েছে।

গানের শেষে চীফ কমিশনার ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন একটা। তারপর ভোজনপর্ব। মাংস-ভাত আর চাটনি। সঙ্গে যে যত খেতে পারে টাটকা ভাঙা ডাবের জল। যাঁর আতিথ্যে তিনটে রাত আমি কাটাব এখানে, রমেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক কেরালার অধিবাসী।

কিন্তু সব ছেড়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আর একদিকে। অদূরের একটা নারকেল গাছের পাশে দাঁড়ান একটি মেয়ের দিকে। সুশ্রী, গম্ভীর, বছর তিনেকের একটি ছেলে হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা মায়ের হাত ছাড়িয়ে এদিকে চলে আসতে চাইছে, কিন্তু শক্ত হাতে ধরা বলে পারছে না।

মেয়েটি সেই থেকে নিষ্পলক চেয়ে আছে আমার দিকে।

কেউ না বলে দিলেও আমি যেন চিনেছি মেয়েটিকে! তবু ইশারায় রমেশচন্দ্রকে দেখালাম। রমেশচন্দ্র মাথা নাড়ালে, সে-ই বটে। ববি।

—কিন্তু সেই থেকে দেখছে কি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে?

রমেশচন্দ্রও ঠিক ঠাওর করতে না পেরে মৃদু ঠাট্টা করল, ভাবনায় ফেললে, তোমাকে পছন্দ হয়ে গেল না তো!

যতবার চোখ গেছে, চোখোচোখি হয়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একভাবেই চেয়ে আছে। আমার কি রকম অস্বস্তি একটা। কেমন মনে হল, চাউনিটা সদয় নয়।

চীফ কমিশনার এবং জাহাজ থেকে আর যাঁরা এসেছেন সকলেরই এবারে জাহাজে ফেরার তাড়া। পায়ে পায়ে আবার সমুদ্রপাড়ের দিকে এগোলেন সকলে। স্থানীয় ভদ্রলোক আর নিকোবরি মেয়ে-পুরুষেরা সঙ্গ নিয়েছে। আমি আর রমেশচন্দ্র পাশাপাশি আসছি। তাকে ছেড়ে এই দ্বীপে তিনটে রাত কাটাব ভাবতে কেমন যেন লাগছে।

হাতে চাপ দিয়ে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমাদের দশ-পনের হাতের মধ্যে সেই মেয়েটি—ববি। ছেলের হাত ধরে নিজের অগোচরে আসছে যেন। স্থির কঠিন দুই চোখের আওতায় আমায় আটকে নিয়ে পথ ভাঙছে যেন।

রমেশচন্দ্রও এবারে অবাক একটু। বলল, ওদের দু-চারজন লোক আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল, কোন দেশের লোক তুমি, কোথায় থাক...। কলকাতায় শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল...। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো—

হঠাৎ কিছু বুঝি মনে হল তার। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল আমাকে, তারপর, হেসে বলল, বুঝেছি। ...এগোতে এগোতে বলল, দত্ত সাহেবও প্রায়ই ধুতি পরত। এখানে ধুতি পর আর যাই পর, বাইরে থেকে এলেই সাহেব। শুধু ধুতি পরার জন্যই নয়, সেও তোমার মত অমনি করেই ধুতির কোঁচা পাঞ্জাবির বাঁ-পকেটে গুঁজত। এই থেকেই মেয়েটা কিছু একটা ভেবেছে হয়ত।

—কি সর্বনাশ! আমি তাহলে এই জাহাজেই পালাই।

রমেশচন্দ্র হাসতে লাগল। ...বললাম বলেই যাওয়া সম্ভব নয়। জাহাজ যাচ্ছে মাদ্রাজে; আমাকে ফিরতে হবে পোর্টব্লেয়ার। রমেশচন্দ্র আশ্বাস দিল, না হে না,

খুব অতিথি-বৎসল ওরা, দেখ'খন।

অতিথিরা কেনোয় উঠলেন, কেনো থেকে মোটর বোটে। মোটর বোট আবার তাঁদের জাহাজে পৌঁছে দেবে। সকলেই দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রুমাল নাড়ার ধুম পড়ে গেল দুদিক থেকে।

ধুতিপরা লোকটা আমি থেকে গেলাম, সেটা এবারে নিকোবরি মেয়ে-পুরুষদের চোখে পড়ল বিশেষ করে। ঈষৎ বিস্ময়ে স্থানীয় কর্মচারীদের তারা এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, নিজেদের মধ্যেও কি বলাবলি করতে লাগল।

একদিকে ঘাড় ফেরাতেই আবারও রীতিমত ধাক্কা খেলাম একটা।

মেয়েটি চেয়েই আছে। স্তব্ধ কঠিন মূর্তি। নিষ্পলক। দুই চোখে সাদা আগুন। আদিবাসী মেয়ে-পুরুষরা অনেকে তাকেও দেখছে চেয়ে চেয়ে। কেউ কেউ তাকে বলেছে কিছু। আমি অবাক, ধুতিপরা এই বাঙালী মূর্তি দেখে মেয়েটার স্মৃতির বেদনা উপচে ওঠেও যদি, তার হাবভাব এমন কঠিন হবে কেন, চাউনিটা এমন অকরুণ হবে কেন! বরং আমাকে তো প্রীতির চোখে দেখার কথা তার!

কেরালাবাসী ভদ্রলোকটির সঙ্গে পায়ে পায়ে ফিরে চলেছি। সকলেই ফিরছে। কিন্তু আর একবারও না তাকিয়েও সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল, ওদেরই মধ্যে ছেলের হাত-ধরা কোনো বিশেষ এক মেয়ের দুই চোখ ছুরির ফলার মত আমার গায়ে বিঁধে আছে। ...অস্বস্তি।

আরও আধমাইলটাক দূরে এসে থামলাম। গলাউঁচু বাঁশের মাচার ওপর মৌচাকের আকারে খড়ের চাল দেওয়া কাঠের ঘর একটা। সেই ঘরেই আমি থাকব এই তিন রাত। তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে ওই রকমই আর একটা ঘরে সঙ্গী ভদ্রলোকটি থাকবেন। দুপুরের খাওয়ার ঝামেলা নেই। ছোট দ্বীপে আমাকে যথেচ্ছ বেড়াতে বলে ভদ্রলোক নিজের কাজে চলে গেলেন।

নিকোবরি মেয়েরা চলে গেছে, পুরুষরা অনেকেই এগিয়ে এল। 'সাব সাব' বলে আদর-অভ্যর্থনা করল। ভাঙা ইংরেজী বললেও ইংরেজী বেশ বোঝে। হিন্দীও বোঝে। কোথায় থাকি, পোর্টব্লেয়ারে কেন এসেছি, এখানে কতদিন থাকব, ইত্যাদি। নিবাস কলকাতায় শুনে আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

আমাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে তারা চলে গেল। বিকেলে আবার আসবে বলে গেল। তিনদিন এখানে থাকব শুনে সকলেই খুশী।

ঘড়ি দেখলাম, বেলা এগারোটা মোটে। জাহাজের ধকলে শরীর দুলছিল কেমন, দড়ির খাটিয়ায় ঘণ্টা দুই গড়াগড়ি করে উঠলাম আবার।

পথ চিনি না। চেনার দরকারও নেই। যে পথেই যাই একসময় দেখব সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। পায়ে পায়ে অনির্দিষ্টভাবে হেঁটে চলেছি। কোথাও জঙ্গল কোথাও ফাঁকা। ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখছি। নারকেলের জঙ্গলই বেশী। বেশ একটা রোমাঞ্চকর নির্জনতা, এই দ্বীপে আমিই একমাত্র মানুষ, ভাবতেও কষ্ট হয় না। ভাবলে কেমন

গা ছমছম করে, অথচ ভালোও লাগে। আমি কোনো একটা পরিত্যক্ত ধার দিয়েই চলেছি বোধ হয়, নইলে নিকোবরে শুনেছি জায়গার আয়তনে লোকবসতির চাপ বেশী।

হঠাৎ পা দুটো থেমে গেল আমার। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

অদূরে দুটো ছোট গাছের ফাঁকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে—ববি। কোনো মেয়ের মুখে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ আর দেখি নি। হকচকিয়ে গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক নেই। দিশা ফিরে পেয়ে দু-পা এগোতেই মেয়েটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা অজানা শঙ্কার মত বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটা কি ভেবেছে? মেয়েটা এমন করছে কেন?

বিকেলটা সেই ভদ্রলোক আর আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাটল। পরদিন সকালটাও। তবু আমার কেমন মনে হত, কোন অলক্ষ্য থেকে কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে।

দুপুরে আবার সেই ব্যাপার। গত কাল যে দিকে এসেছিলাম আজ তার উল্টো দিকে এসেছি। জাযগাটাও একেবারে নির্জন নয়। গাছগাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে আদিবাসীদের কুটির দেখা যাচ্ছে। সরু একটা পাযে-চলা পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখি অদূরে পথ আগলে ববি দাঁড়িয়ে। দু-হাত কোমরে, দৃপ্ত ভঙ্গি। লালচে মুখে নির্বাক রোষ। শুকনো মুখে কিছু একটা অটুট সংকল্প।

দেখামাত্র মনে হল, এগিয়ে গেলেও আজ আর সরে যাবে না। গেলও না। কাছে এসে দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকালাম, নমস্তে—

এই নমস্কারটা ওরা বোঝে দেখেছি। আদিবাসীদের অনেকেই আমাকে এভাবে অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে।

জবাবে ববি মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল খানিক। মুখের কঠিন রেখা একটুও নরম হল বলে মনে হল না। কোমর থেকেও হাত সরাল না। ছুরির ফলার মত দুটো চোখ যেন আমার সমস্ত মুখটা ফাল ফালা করে ভিতরটা দেখে নিচ্ছে।

ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াই আর ইউ হিয়ার? ...এখানে কি মতলবে এসেছ?

সব বিস্ময শিকেয় তুলে অতিথিসুলভ জবাব দিলাম, তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।

এই জবাব দেব, জানত যেন। তেমনি অস্ফুট ঠাণ্ডা গলায় আবার প্রশ্ন হল, এখানে দেখার কি আছে?

জবাবই কি দেব? বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে বললাম, দেশ বেড়াতে আমার ভালো লাগে। তোমরা কি চাও না, বাইরের লোক এখানে আসে?

—আমি চাই না। ...আই ডু নট ওয়াণ্ট। আই হেট!

আমি নির্বাক।

—তোমার নাম কি?

আমি যেন বিচারের আসামী। নাম বললাম। মনে হল আমার এই নামটাও সে বিশ্বাস করল না।

—ইউ নো দতো সাব? ...দত্ত সাহেবকে চেন?

মাথা নাড়লাম, চিনি না।

অবিশ্বাসে এবার হিসহিসিয়ে উঠল মেয়েটা। —তুমি ক্যালকাটায় থাক না?

মাথা নাড়লাম, তাই থাকি। এটাই যেন চরম মিথ্যা উক্তি আমার। নির্বাক রোষে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার সমস্ত মুখ। আবারও আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একদফা। বিশেষ করে আমার পাঞ্জাবির বাঁ-পকেটে কোঁচা গোঁজাটা। এবারে আমার বলা উচিত ছিল, ওকে বোঝান উচিত ছিল, কলকাতায় কত লোক থাকে, কত লোক এমনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, কত লোক জামার পকেটে কোঁচা গোঁজে। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি নির্বাক, নিস্পন্দ।

তেমনি ধীর অথচ অসহিষ্ণু কণ্ঠে হিন্দীতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, কতদিন থাকার মতলব তোমার এখানে?

বললাম, পরশু চলে যাব।

আবারও খানিক চেয়ে থেকে ববি অস্ফুট রায় দিল, যদি না যাও, তোমার বিপদ হবে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। একটা বড় ঝোপের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে ঠিক নেই। পায়ে পায়ে ডেরায় ফিরেছি একসময়। বিকেলেও কারো সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারি নি ভালো করে। কেরালাবাসী ভদ্রলোকটিকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। কি ভেবেছে মেয়েটা একটুও ঠাওর করে উঠতে পারি নি। অথচ বিষম কিছুই যে ভেবে বসে আছে সন্দেহ নেই। দত্ত সাহেবের দেশের মানুষ বলে যেখানে ওর কাছে আরো বেশী খাতির পাবার কথা, সেখানে উল্টে এই ব্যবহার কেন!

পরদিন।

কিছুতে জট ছাড়িয়ে ওঠা গেল না। যত ভেবেছি তত দিশেহারা হয়েছি। অথচ অন্যান্য আদিবাসীরা ভারি সদয় আমার ওপর। দত্ত সাহেবের দেশের লোক বলেই যেন, ক্যালকাটার লোক বলেই যেন। ওদের অনেকেই সেদিন সাগ্রহে দত্ত সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছে আমাকে। সকলেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে সে আবার ববির কাছে ফিরে আসুক, ওদের মধ্যে ফিরে আসুক। আগামী কাল আমার পোর্টব্লেয়ারে ফেরার কথা। ওই মেয়েটার ভয়ে নয়, তবু স্টীম লঞ্চ পেলে আজই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে আপত্তি ছিল না আমার।

সকাল, দুপুর বা বিকেলের মধ্যে মেয়েটাকে আর দেখি নি। অথচ মনে মনে দেখার আশা। সন্ধ্যার পর ডেরায় বসে ছিলাম। খানিক আগে কেরালাবাসী ভদ্রলোকটি রাতের খাবার আয়োজনের ব্যবস্থায় উঠে গেছে। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি, দরজার

কাছে বছর পনের ষোলর একটা আদিবাসী ছেলে দাঁড়িয়ে।

—সাব—

উঠে এলাম।

সে চেষ্টাচরিত্র করে যা বোঝাল, তার সারমর্ম, ববি একবার আমাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছে, জরুরী কথা আছে তার, এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

আমি হতভম্ব। রাজ্যের অস্বস্তিও। কি করব, যাব? ছেলেটার দিকে চেয়ে মনে হল, সে যেন বুঝেছে আমি দ্বিধাগ্রস্ত, হয়ত বা ভয়ই পেয়েছি ভাবছে।

বেশী পথ ভাঙতে হল না। এই রকমই আর একটা ডেরায দরজার কাছে ববি দাঁডিযে। ছেলেটাকে ইশারায চলে যেতে বলল। আমাকে ডাকল, কাম ইন সাব—

সিঁডি দিযে মাচার ঘরে এসে দাঁডালাম। আমার বাহ্য চেতনা সক্রিয় নয় খুব। তকতকে পরিচ্ছন্ন ঘর। মেঝেতে তিন বছবেব ছেলেটা বসে খেলা করছে। আমাকে দেখে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিক, তারপর আমার দিকে ছোট একটা বেতের ডালা এগিযে দিয়ে ভাব করতে চেষ্টা কবল। ছেলের মাযের দিকে চেযে ছেলেটার দিকে এগোতে ভরসা হল না। সেই মুখ আগেব দিনের মত না হলেও থমথমে গম্ভীর।

ঘরেব কোণে একটা তাকের দিকে চোখ গেল। তাকের ওপর ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালী তরুণের ফোটো একটা। বেশ সুশ্রী চেহাবা। ফোটোতে মালা জড়ান, সামনেও ফল কতকগুলো।....এই তাহলে দত্ত সাহেব।

ববি জিজ্ঞাসা করল, গোইং টু-মরো? ...কাল যাচ্ছ?

মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ, যাচ্ছি।

সেটা শুনে নিযে আতিথ্যেব কথা মনে হল বোধহয। ঠাণ্ডা আপ্যায়ন জানাল, সিট ডাউন সাব—

মেঝেতে নারকেলপাতার চাটাইয়ের মত পাতা। বসলাম।

ছেলেকে সামনে টেনে নিয়ে অদূরে মেঝেতেই বসল ববি। আমাকে ভব্যতার সম্বন্ধে সচেতন রাখার জন্যেই ছেলেটাকে কাছে টেনে বসিযেছে মনে হল। তারপর মুখের ওপর দুচোখ আটকে নিয়ে দেখল খানিক।

ভাষা বুঝুক না বুঝুক, লক্ষ্য করলে আমার অসহায় বিস্ময়টুকু উপলব্ধি না করার কথা নয়। আর করলও বোধহয়। ইংরেজী আর হিন্দীতে মিশিয়ে বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি সাহেব, তুমি মনে কিছু কর না।

মাথা নেড়েছি, কিছু মনে করি নি। তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করছি।

হঠাৎই আবার সে জিজ্ঞাসা করল, দত্ত সাহেবকে চেন তুমি?

কাল চিনি না বলাতে বিশ্বাস করে নি। হোক মিথ্যে, তবু মেয়েটার ক্ষত যদি একটু ঠাণ্ডা হয়, সত্যি বলে কাজ নেই। ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, আমি চিনি নে ঠিক, কলকাতা মস্ত জায়গা, অনেক লোক—তবে তাঁর নাম শুনেছি, তিনি নামকরা লোক, দেশের জন্যে যুদ্ধে গেছেন।—

কিন্তু আর বলা হল না। মেয়েটা যেন দপ করে জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তপ্ত

যাতনায় অস্ফুট গলায় কথাগুলো যেন দাঁতের চাপে ভাঙতে ভাঙতে বলে উঠল—ইউ লাইং...তুমি মিথ্যে কথা বলছ। সে কোনোদিন যুদ্ধে যায় নি। এখানকার লোকদের কাছে আমি বানিয়ে বলেছি সে যুদ্ধে গেছে। সে আমার সব কিছু লুঠ করে নিয়ে চোরের মত সরে গেছে এখান থেকে, বেইমানি করে পালিয়ে গেছে, আই হেট হিম, আই হেট হিম!

জীবনে এমন পরিস্থিতিতে আর কখনো পড়েছি কিনা, এত বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছি কিনা জানা নেই। বোবার মত খানিক বসে থেকে শেষে সহজ স্বীকৃতির রাস্তাটাই বেছে নিলাম আমি। ওকে বুঝিয়ে বললাম, দত্ত সাহেবকে আমি কোনোদিন দেখি নি, নামও শুনি নি কখনো, পোর্টব্লেয়ারে এসে তার কথা শুনেছি, ববির কথা শুনেছি—ববিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই ওটুকু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম, আর কোনো কারণে নয়—শুধু এই জন্যেই।

ববি খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে, বিশ্বাস করবে কি করবে না, সেই সংশয়। —আমাদের কথা তুমি কার কাছে শুনেছ?

রমেশচন্দ্রের নাম করলাম।

খানিক থেমে আবারও জিজ্ঞাসা করল, তোমার দেশের লোকের বেইমানির কথা শুনে তোমার কি মনে হয়েছে?

বললাম, আমি লজ্জা পেয়েছি, দুঃখ পেয়েছি—কিন্তু আমার দেশের সব লোকই যে এইরকম নয়, তোমাকে বোঝাব কেমন করে?

ববি চুপ করে ভাবল একটু, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

বললাম, তুমি বিশ্বাস করতে চাইলেও পারবে কি?

এই জবাবটা পছন্দ হয়েছে মনে হল। আমার আন্তরিকতার সম্বন্ধে তত আর সংশয়াপন্ন নয় যেন। শান্ত মুখে বলল, ভালোমন্দ সব দেশেই আছে, তোমার দেশের একজন লোক খারাপ কাজ করেছে, তুমি ইচ্ছে করলে একটা ভালো কাজ করতে পার, করবে?

আমি নীরব, জিজ্ঞাসু।

—তুমি ক্যালকাটার লোক, তোমার কথা এখানে সকলে বিশ্বাস করবে, ক্যালকাটা থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখে জানাবে, দত্ত সাহেব যুদ্ধে মারা গেছে। লিখবে?

বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি বোবা খানিকক্ষণ। নিজের অগোচরেই দত্ত সাহেবের ফোটোটার দিকে চোখ গেল আবার। ফুল আর মালা এখনো শুকোয় নি, আজই দিয়েছে বোঝা যায়।

আমার নীরব বিস্ময়টুকু উপলব্ধি করল ববি। চোখোচোখি হতে বলল, আই হেট হিম!

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে ফুল দাও কেন, মালা পরাও কেন?

ববি জবাব দিল, এই দ্বীপে ভালোবাসার একটা নজির রাখার জন্য। সাদা নজির—এ হোয়াইট লেসন।

সহজ কথাক'টার এক বর্ণও বোধগম্য হল না। স্থানকাল ভুলে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

কিন্তু মেয়েটা যেন হঠাৎ নিজের মধ্যে তলিযে গেছে। লালচে তামাটে মুখখানা সত্যিই তপস্বিনীর মত লাগছে এখন। ছেলেটাকে নিজের আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে একটা গাল তার ঝাঁকড়া-চুল মাথার ওপর ঘষল একটু। তারপর আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল, আমার বাবা এই দ্বীপের সর্দারদের একজন ছিল, তার বাবাও তাই ছিল। তারা দ্বীপের ভালো-মন্দ বুঝত, ভালো-মন্দ ভাবতে পারত। আমার বাবা আমাকে নিষেধ করেছিল, আমি শুনি নি। বাবা বলত, ওরা শুধু ফুর্তি করতে আসে, রোগ ছড়াতে আসে—সেই ফুর্তিতে আর সেই রোগে আমার মা মরেছে। আমি তবু শুনি নি।

ববি সোজা হযে বসল। মুখের দিকে চেযে কার সঙ্গে কথা কইছে সেটাই যেন ভালো করে দেখে নিল আর একবার। তার পর ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে আবারও বলে গেল, আমার মত এই দ্বীপের অনেক মেয়ে শোনে নি, অনেক মেয়ে শোনে না। তারা ফুর্তি করে, ফুর্তির লোক চলে গেলে আবার নতুন ফুর্তির আশায় বসে থাকে, নয়ত দ্বীপের ছেলেছোকরাদের নিয়েই ফুর্তির নেশা করে। তারপর রোগে পড়ে আর রোগ ছড়ায়। গোটা দ্বীপে এই রোগের ঘা। আমি এই ঘা সারাব, ফুর্তির নেশা ছাডাব। আমি আমার জীবন দিযে এই দ্বীপে ভালোবাসার নজির রাখব, এদের ভালোবাসা শেখাব। আমাকে দেখলে ওদের মন জাগবে, ফুর্তির নেশা ছুটে যাবে, লোভ কুঁকড়ে যাবে। আমি শেখাব ওদের, আমার ছেলে শেখাবে—এই করে রোগ ছেড়ে যাবে—যাবে না সাহেব?

আশায় উদ্দীপনায় সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল। আমার গলার কাছে কিছু একটা আটকেছে যেন। চোখের কোণ-দুটো শিরশির করছে। লবণাক্ত সমুদ্র-ঘেরা এই দ্বীপের রাত্রিতে মাচার ঘরে বসে এক নিরক্ষরা আদিবাসী রমণীর মুখে আমি যা শুনেছি তা কোনোদিন ভোলবার নয়। আমার সাগরপারের শিক্ষিত মন আর শিক্ষিত বুদ্ধির নিক্তি দিয়ে একবারও তা বিশ্লেষণ করা বা সম্ভব-অসম্ভব ওজন করার কথা মনে হয় নি আমার। আমি মাথা নেড়েছি, বার বার বলতে চেয়েছি—যাবে, নিশ্চয় যাবে।

ববির মুখে আর রাগ-দ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই, ক্ষোভের একটুকু ছায়া নেই। রমণী-মুখে যেন গোটা-দ্বীপের আঁধার-ঘোচানো শিখা জ্বলছে। বলল, দত্ত সাহেব আমার ক্ষতি করলেও দ্বীপেব উপকার করেছে, আমার রাগ করা ভুল, আর রাগ করব না। কিন্তু এই দ্বীপের জন্যে যে আরো অনেক বড় নজির দরকার, অনেক বেশী সাদা নজির—তুমি ক্যালকাটা থেকে ওই চিঠিখানা লিখবে সাহেব? লিখবে?

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, লিখব।

পরদিন যথাসময়ে স্টীম লঞ্চ এসেছে। স্থানীয় কর্মচারীটির সঙ্গে অনেক আদিবাসীও সমুদ্রতীরে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে আমাকে। ছেলের হাত ধরে ববিও এসেছে। তার চোখে সেই নীরব আকূতি...সাহেব লিখবে তো? ভুলবে না তো?

বিদায় নিয়ে কেনোতে উঠেছি, কেনো থেকে ছোট মোটর বোটে। মোটর বোট থেকে স্টীম লঞ্চে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে তখনো। হাত নাড়ছে, রুমাল নাড়ছে...আর, ওই এক পাশে ববি দাঁড়িয়ে আছে ছেলের হাত ধরে।

সেদিকে চেয়ে এই প্রথম মনে হল প্রবাল দ্বীপে এসেছিলাম। ...প্রবাল দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

প্রতিহারিণী

ভদ্রলোককে প্রথম দেখেছিলাম সমুদ্রের ধারে। প্রথম বলতে পর পর কয়েকদিনই। নিরিবিলি একটা দিকে একা বসে থাকেন। একটা কাঠি দিয়ে বা আঙুল দিয়ে আর্দ্র পলি-বালির ওপর দাগ কাটেন। এ-ধার ও-ধার দিয়ে কেউ গেলে ফিরে ফিরে দেখেন। মুখখানা হাসিহাসি, চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল। চোখোচোখি হলেই মনে হয় একটু কিছু কৌতুকের সন্ধান পেয়েছেন।

মাথায় একরাশ কাঁচা পাকা চুল। কাঁচার থেকে পাকার ভাগ বেশী। দূর থেকে দেখলে বয়েস বেশি লাগে। কাছের থেকে দেখলে তা মনে হবে না। বয়েস এখনো পঞ্চাশ ছাড়ায় নি, শক্ত সমর্থ উঁচু লম্বা চেহারা। মুখখানা ভারি কমনীয়। এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন বোঝা যায়।

সঙ্গীর মুখে শুনেছিলাম, লোকটা টাকার কুমীর। মস্ত বড় কাপড়ের আর কাচের চুড়ির ব্যবসা। নাম মনোহর ভার্মা। শুনে বলেছিলাম, ব্যবসার গদিতে বসে টাকা গোনা ছেড়ে বিকেলে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে আসে—এ কেমন ধারা ব্যবসায়ী!

এর সদুত্তর কিছু পাই নি। কোনোরকম কৌতূহলও ছিল না। টাকার কুমীরদের আমরা অনেকটা অকারণেই এড়িয়ে চলে থাকি, আর প্রায় তেমনি অকারণেই খুব সুনজরে দেখি না। আমার সঙ্গী কিছুটা দূর দিয়ে যেতে যেতে তাঁর দিকে চেয়ে হেসে অভিবাদনের মত করে মাথা নাড়লেন একটু। তিনি আরো বেশি হেসে আরো বেশি মাথা ঝাঁকালেন, আরো একটু ঘুরে বসে নতুন মুখ, অর্থাৎ আমাকে দেখলেন।

সঙ্গীটির ছুটির দিন ছাড়া বেড়াবার অবকাশ হয় না। অফিস থেকে ফেরেন সন্ধ্যার পর। এরপর দিন তিনেক আমি একাই গেছি সমুদ্রের ধারে। ভদ্রলোককে ঐ একই নিরিবিলি জায়গায় দেখেছি। আমি প্রথম দুদিন দূর দিয়ে পাশ কাটিয়েছি। ভদ্রলোক যে ভাবে তাকিয়েছেন আমার দিকে, মনে হয়েছে কাছে গেলে আলাপ পরিচয় করতে আপত্তি নেই। তৃতীয় দিনে সমুদ্রের ধারে ধারে হাঁটলাম। অর্থাৎ এভাবে এগোলে তাঁর কাছ ঘেঁষেই পাশ কাটাতে হবে। আজও দূর থেকে একটা কাঠি দিয়ে বালিতে আঁচড় কাটতে দেখেছিলাম। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে হাতে করে বালিগুলো

লেপে দিলেন তিনি। আমি হাসি গোপন করলাম। ভিজে বালিতে কাঠি দিয়ে ব্যবসায়ের লাভের হিসেব করেন নিশ্চয়। সমুদ্রের হাওয়া খেতে মগজ লাগে না। মনে মনে ভাবলাম, এখানে এলে বোধ হয় খোলা হাওয়া হিসেবের মাথাটা ভালো খোলে ভদ্রলোকের।

উনিই ডাকলেন। পরিষ্কার বাংলায় অভ্যর্থনা। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মাদ্রাজে নতুন এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বেড়াতে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ বেশ, বসুন। বাংলা দেশের গল্প শুনি একটু। কলকাতার লোক নিশ্চয আপনি!

কলকাতার লোক আমার গায়ে লেখা ছিল না। হাসি মুখে তাঁর পাশে বসলাম। মাথা নেড়ে বললাম, বাংলা দেশ আর কলকাতা আপনার খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে।

বললেন, পরিচিত মানে! সেখানে থেকেই তো মানুষ আমি— অমানুষও বলতে পারেন। ...হেসে উঠলেন।

—কলকাতায় ব্যবসা করতেন?

—ব্যবসা! ও, আমি ব্যবসাদার লোক শুনেছেন বুঝি! না মশাই, ব্যবসা করতাম না, হাওযায় উড়ে বেড়াতাম।

টাকার কুমীর আর ব্যবসায়ী হলেও ভদ্রলোকের মেজাজ রসকষ-শূন্য নয। বরং বেশ সুরসিক মনে হল। এখানে কতদিন থাকব, কলকাতায় কোথায় বাড়ি, সেখানে কি করি ইত্যাদি খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

অন্তরঙ্গ বচন শুনে হঠাৎ ভয় ধরল, দামী শাড়ি-টাড়ি কিছু গছাবার মতলব না কি! কিন্তু কাগজের অফিসে কাজ করি শুনে ভদ্রলোকের যেন শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমার ওপর। বার কতক আমাকে 'গুণী লোক' বলে ফেললেন। আমিও সৌজন্যবোধেই ভয়ে ভয়ে তাঁর ব্যবসা সম্বন্ধে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু ব্যবসাযের আলোচনায় তেমন উৎসাহ দেখলাম না ভদ্রলোকের। বললেন, রোজই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসেন, একগাদা লোক আছে তারা ব্যবসা দেখে। উনি টাকার হিসাব নিয়েই খালাস।

হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন আবারও।

এর দিন চারেক বাদে ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার যেখানে দেখা, সেখানে আমি আদৌ আশা করি নি তাঁকে। আর্ট একজিবিশনে। মস্ত আর্ট একজিবিশন শুরু হয়েছে এখানে। নামকরা সমস্ত ভারতীয় শিল্পীদের বাছাই-করা ছবির প্রদর্শনী। বস্তুতঃ এই উপলক্ষেই কাগজের অফিসের মুরুব্বিদের ধরে পড়ে আমার এখানে আসা। তাতে খরচের সুরাহা, ছুটির সুরাহা, খাসা বেড়ানো সুযোগ লাভ। যোগ্য ব্যক্তির অভাবে দরকার হলে শিল্প-কলা প্রসঙ্গে কাগজে আমিই বার্তাবহের কাজ করে থাকি। নিজেকে

বাঁচিয়ে গুরুগম্ভীর সমালোচনাও করতে হয় অনেক সময়। কিন্তু জানি কতটুকু, সে শুধু আমিই জানি।

কলকাতায় কোনো ছবির একজিবিশনে কখনো কোনো চালের ব্যবসায়ী বা কাপড়ের ব্যবসায়ী বা চুড়ির ব্যবসায়ীকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই ব্যবসায়ী টাকার কুমীর মনোহর ভার্মাকে এখানে দেখে অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। আরো আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁর সঙ্গে একটি মহিলা। তাঁর স্ত্রী-ই হবেন, গায়ের রঙ বেশ মাজা, লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। টাকার কুমীরের গৃহিণীর মত ঢিলেঢালা মেদবহুল নয়। দূব থেকে বয়েস কত ঠাওর হয় না। বযেস যাই হোক, বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হয়।

এখানে এই দম্পতির উপস্থিতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে বসলে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। এক, বিত্তের পরিমাণ যাদের পরিমাপের বাইরে, এই শিল্প-প্রীতি তাদের কালচারের অঙ্গ। দুই, মহিলাটি হয়ত বা যথার্থই শিল্পানুরাগিণী, টাকার বস্তা বিয়ে করেছেন বলেই এই রুচিটুকু একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি। তিনি এসেছেন, তাই উনিও।

কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করার পর উপসংহার দুটোর একটাও যথার্থ মনে হল না। ভদ্রলোক একট ছবির সামনে দাঁড়াচ্ছেন, তন্ময হযে দেখছেন। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে হয়ত দশটা ছবি অতিক্রম করে গেছেন, তারপর আবার ফিবে এসে তাঁর সঙ্গ নিয়েছেন। কখনো বা তফাতে দাঁড়িয়েই তাঁর অপেক্ষা করেছেন। বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের এ-ধরনের তন্ময়তা খুব স্বাভাবিক মনে হয নি আমার। কিন্তু কৃত্রিমতা থাকলে সেটুকুও চোখে না পড়ার কথা নয। কৃত্রিমতা দীর্ঘমেযাদী হয় না বড়। এত লোক আসছে, যাচ্ছে। বেশির ভাগই কেতাদুরস্ত মেয়ে-পুরুষের ভিড। আমি ছবি যত না দেখছি, তাদের তার থেকে কম দেখছি না। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করে দেখারও নেই কিছু, এক মাসের একজিবিশন একদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ধীরে-সুস্থে দেখলেই হবে।

কিন্তু যতবার চোখ গেছে মনোহর ভার্মার দিকে ততবার একই দৃশ্য দেখেছি। শিল্পকারুর খুঁটিনাটি উপভোগ করছেন যেন। কারো দিকে চোখ নেই, কারা আসছে যাচ্ছে, একবার ফিরেও দেখছেন না। আমাকেও দেখেন নি।

পরদিনও তাঁকে একজিবিশনে দেখা গেল। এ-দিন একা! ছবির সংখ্যা অসংখ্য। এভাবে রসাস্বাদন করলে এক মাসেও তাঁর একজিবিশন দেখা হবে কি না সন্দেহ। এই দিনে অবশ্য ইচ্ছে করেই তাঁর সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি হেসে কুশল প্রশ্ন করেছেন, দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথাও কয়েছেন। তারপরেই উশখুশ করে আবার ছবির দিকে ফিরে গেছেন।

এমনি করে এই এক জায়গাতেই পরপর অনেকদিন দেখা হল। ভদ্রলোকের সেই প্রথম নিবিষ্টতা অবশ্যই কেটেছে। এই দেখাটা ধীরে-সুস্থে রসিয়ে দেখার মত। ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা গল্পগুজব হয়েছে। আমি প্রশংসাও করেছি, আপনার তো এদিকে ভারি ঝোঁক দেখি!

প্রশংসা কানে যায় নি নিঃসন্দেহে। একটা ছবির মধ্যে তখন নতুন কিছু আবিষ্কার করছিলেন হয়ত। ঘুরে ঘুরে একসঙ্গে ছবি দেখেছি, তাঁকে পরখ করার জন্যেই ছবির প্রসঙ্গে এটা-ওটা বলেছি। খেয়াল না করেই তিনি অনেক কথা বলেছেন। কোনো

ছবিটার ডেপথ ওয়াণ্ডারফুল, কোনোটার এয়ার-এর প্রশংসা না করে পারা যায় না, কোনোটার কম্পোজিশন চার্মিং, কোনোটার পারসপেকটিভ ব্যালান্সিং সিম্পলি বিউটি, ইত্যাদি। মোট কথা, কোনো ছবিরই নিন্দা করলেন না উনি, যেটা মনে ধরল না সেটার প্রসঙ্গ শুধু এড়িয়ে গেলেন।

দেখে-শুনে আমি হাঁ। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক কোনো কাপড়ের আর কাচের চুড়ির ব্যবসায়ীর এমন শিল্পানুরাগ কে কল্পনা করতে পারে? আমার এখনো সংশয় যায় নি, ছবির প্রসঙ্গে উপরোক্ত শিল্প-রসিকজন-সুলভ উক্তিগুলো বাঁধা-বুলি কি না বুঝছি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে-রকম মনে হয় নি একবারও। অথচ, বিশ্বাস্যও নয়।

সেদিন একজিবিশনের দালান থেকে দুজন বেরিয়ে আসছিলাম। সিঁড়ির মুখে সঙ্গীর সঙ্গে দেখা। আমার খোঁজেই এসেছিলেন। মনোহর ভার্মা তাঁকে হাসিমুখে বললেন, আপনার বন্ধুটি খুব ছবির ভক্ত। ...আমি যেমন ভক্তই হই, মনোহর ভার্মার এই শিল্প-কলাপ্রীতি প্রসঙ্গে ক'দিনই সঙ্গীর কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। তাই তাঁকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্যেই হয়ত সঙ্গী গম্ভীর মুখে জবাব দিয়ে বসলেন, ভক্ত না হলে আর অতবড় একটা কাগজের আর্ট ক্রিটিক হবেন কি করে!

মনোহর ভার্মার দুই চক্ষু বিস্ফারিত প্রথম।

—কে আর্ট ক্রিটিক? উনি? কোন্ কাগজের?

আমি বিব্রত বোধ করেছি। এদিকে বন্ধু আমাব গুণের ব্যাখ্যায আর এক ধাপ চড়লেন।

শুনে মনোহর ভার্মা খুশীতে আটখানা।—অ্যাঁ! বলেন কি মশাই! আপনি তো আচ্ছা ফাঁকি দিচ্ছিলেন আমাকে। তাই ভাবি রোজ এখানে দেখি কেন!

উৎসাহের আতিশয্যে তিনি তাঁর বাড়িতে আসার জন্য বেপরোয়া আক্রমণ করে বসলেন আমাকে। এবং ধরে নিয়ে এসে তবে ছাড়লেন। বন্ধু কাজের অজুহাতে আমাকে তাঁর হেপাজতে ছেড়ে দিয়ে পালালেন।

ছবির মত মস্ত বাড়ি। ভিতরে ঢুকেই চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন তিনি। যেন ভারি দুর্লভ একটি রত্ন হস্তগত করে বাড়িতে ঢুকেছেন। স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁকডাক করলেন। তিনি এলে বললেন, শীলা, দেখ কতবড় একজন গুণী লোককে ধরে এনেছি, বাংলা দেশের এক নামকরা কাগজের আর্ট ক্রিটিক! নিজের পরিচয়টি পর্যন্ত দেন নি, ভাগ্যে এঁর বন্ধুর মুখে শুনলাম!

আমি হকচকিয়ে গেছি। আবারও মনে পড়েছে ভদ্রলোক টাকার কুমীর, আর সেই টাকা, শাড়ি আর কাচের চুড়ির ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে।

তাঁর স্ত্রীটি কিন্তু এমন একজন গুণী লোক দেখেও তেমন বিগলিত হলেন না। নমস্কার জানিয়ে বসতে আপ্যায়ন করলেন, হাসলেন মুখ টিপে, জলযোগ করালেন। মাঝে মাঝে এসে বসে চুপচাপ আমাদের আলোচনা শুনলেন। মহিলার বয়েস চল্লিশের কিছু ঊর্ধ্বেই হবে হয়ত, চোখের দৃষ্টি গভীর। স্বল্পভাষিণী। আর একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, এমন সাজান-গোছান শৌখিন ড্রইংরুমের দেওয়ালে শিল্প-প্রীতির একটিও নিদর্শন নেই। একটি ছবি বা একটি অয়েল পেন্টিং নেই।

এরপর আরো দিন কয়েক ভদ্রলোক তেমনি জোর করেই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু জোর না করলেও হয়ত আমি আসতাম। কারণ ভদ্রলোককে আমার শুধু ভালো লাগে নি, তাঁকে নিয়ে মনের তলায় বেশ একটা কৌতূহলও দানা বেঁধে উঠেছে। আলোচনা ছবির আর শিল্পী প্রসঙ্গেই হয়। মোট কথা তাঁর কাপড়ের ব্যবসা বা কাচের চুড়ির ব্যবসা নিয়ে কোনোদিন একটা কথাও হয় নি। দেশ-বিদেশের শিল্পীদের কথা তোলেন, কার ছবি ভালো লাগে জিজ্ঞাসা করেন, আর্টের ধারা নিয়ে প্রশ্ন করেন, মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে মতামত শুনতে চান। আমি শুধু বিব্রত নয়, ভয়ানক অসহায়ও বোধ করতাম। চোখ কান বুজে একদিন বলেই ফেললাম, দেখুন ভার্মাজী, আর্ট সম্বন্ধে আমি কিছুই প্রায় জানি না, আমাদের কাগজের তেমন কোনো আর্ট ক্রিটিক নেই বলেই মাঝে মধ্যে ঠেকা দিই—এক এক সময় বেফাঁস লিখে বসে মালিকদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াই। মালিকরাও আর্ট বোঝেন না—তাঁদের কানে আবার বাইরে থেকে কেউ লাগান-ভজান দেন।

শুনে খুব হাসলেন মনোহর ভার্মা। এই স্বীকারোক্তির ফলে তাঁর হৃদ্যতায় চিড় খেল না। গোটাগুটি বিশ্বাসও করলেন না। তা ছাড়া জানি আর না জানি, একজনের সঙ্গে বসে শিল্প-চর্চা করতে পেরেই তিনি খুশী যেন।

আমার আর একটু কৌতূহলের কারণ তাঁর স্ত্রীটি। শীলা ভার্মা। সৌজন্যে অথবা অতিথি-আপ্যায়নে ত্রুটি দেখি নি। তবু আমার কেমন মনে হয়েছে, শিল্প-কলা বিষয়ক এত আলোচনা তাঁর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে এসে বসেন, আমাদের কথা শুনে মুখ টিপে হাসেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, একটুও না নড়ে একভাবে তিনি ঠায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারেন, যতক্ষণ খুশি ঠোঁটের এক ধরনের হাসিটুকু ফুটিয়ে রাখতে পারেন, বহুক্ষণ নিষ্পলক চেয়েও থাকতে পারেন।

আমার মাদ্রাজে থাকার মিয়াদ ফুরিয়ে এল। মনোহর ভার্মা আমাকে আরো বিব্রত করেছেন। স্ত্রীর জন্যে দামি শাড়ি আর একরাশ বাছাই-করা শৌখিন কাচের চুড়ি উপহার দিয়েছেন। যে ভাবে দিয়েছেন, না নিয়ে উপায় ছিল না। আর বার বার বলেছেন, কতগুলো দিন খুব ভালো কাটল তাঁর, চমৎকার কাটল।

আসার আগের দিন বিকেলে সমুদ্রের ধারে গেছি। দূর থেকে দেখলাম, মনোহর ভার্মা তাঁর সেই নিরিবিলি জায়গাটিতে বসে। দেখব আশাই করেছিলাম। একটা কাঠি দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আর্দ্রপলি-বালিতে আঁচড় কাটছেন। আমি আবারও ভাবলাম হিসেবে মগ্ন। এত মগ্ন যে একেবারে কাছে এসে না দাঁড়ান পর্যন্ত টেরও পেলেন না। পেলেন যখন চমকে ফিরে তাকালেন। তারপর হেসে ফেললেন।

কিন্তু যা দেখলাম, আমি হতভম্ব একেবারে। ভিজে বালির ওপর কাঠি দিয়ে এমন শিল্পকারু সম্ভব, কল্পনা করা যায় না। আর, ভালো করে দেখলে স্নায়ুতে ঝাঁকুনিও লাগে।

বালিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঋজু কঠিন একটা প্রাসাদ দুর্গ, তার জটিলতা প্রায় দুর্ভেদ্য। তারই এক নিভৃততম পাষাণ অবরোধে বন্দী একটা মানুষ। একটা মাত্র ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। এই অবরোধ এই প্রাসাদ-দুর্গ চৌচির করে বেরিয়ে আসার জন্য তার সে কি মর্মান্তিক আকুতি!

এবারে ছোট একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে পারি।

প্রথমে কলকাতায় পরে শান্তিনিকেতনে বহু অবাঙালী শিল্পীর মতই একমনে ছবি আঁকা শিখতেন একজন—তাঁর নাম মনোহর ভার্মা। তাঁর ওপর বিধাতার কিছু অকৃপণ দান ছিল। সেটি তাঁর চেহারা। পয়সার অভাব ছিল, কিন্তু যেখানে গিয়ে দাঁড়াতেন—কেউ ফিরিয়ে দিত না। কর্মকর্তাদের অনুগ্রহে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পর্ব তিনি সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন।

তাঁর এক অবস্থাপন্ন কাকা ছিল। বাবার অবর্তমানে তিনিই অভিভাবক। ইউ-পির নামকরা উকীল ছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর পয়সা যত না ছিল তার থেকে পয়সার টান ছিল অনেকগুণ বেশি। ভদ্রলোকের ছেলে ছিল না, চারটি মেয়ে। এ-ক্ষেত্রে ভাইপোকে তাঁর স্নেহ করার কথা। করতেনও হয়ত। কিন্তু ভাইপোর এই আঁকার মতিগতি তিনি একটুও পছন্দ করতেন না। তাঁর ধারণা, অকর্মা ছাড়া কেউ শিল্পী হয় না। ভাইপোকে আইন পড়াতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শুধু আইন ভঙ্গ করে এসেছে যে তাকে তিনি এ-ইচ্ছের বশীভূত করবেন কি করে? পারেন নি। এবং না পেরে ভাইপোর ব্যাপারে হাত ধুয়ে বসেছিলেন। অর্থাৎ,যা খুশি করুক, তিনি সাতে পাঁচে নেই।

কিন্তু ভাইপোর জীবনের মোড় তিনিই ঘুরিয়ে দিলেন।

মনোহর ভার্মা তখন ছন্নছাড়ার মত এখানে সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ কাকার জরুরি তলব এল শিগগীর একবার আসতে হবে, ভয়ানক দরকার। ঘরে ফিরে কাকার তিনখানি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। ভয়ানক দরকারের মাথামুণ্ডু ভেবে না পেয়ে তিনি কাকার কাছে এলেন। কাকা এবারে তাঁকে একটু খাতির-যত্নই করলেন। তারপর বললেন, বিয়ে করতে হবে।

মনোহর ভার্মা আকাশ থেকে পড়লেন। বিয়ে! কি বিয়ে, কাকে বিয়ে!

কাকা কিছু গোপন করলেন না। মেয়েটি তাঁরই খুব অবস্থাপন্ন এক মক্কেল বন্ধুর মেয়ে। সুন্দরী। শিক্ষিতা। সব থেকে বড় কথা, ওই এক মাত্র মেয়ে ভদ্রলোকের।

মনোহর ভার্মা তখনো দিশেহারা। এক মাত্র সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে অবস্থাপন্ন মক্কেল-বন্ধু তাঁর মত ছেলের হাতে দেবেন কেন?

কেন দেবেন তার কিছুটা কাকার মুখে, কিছুটা কাকিমার মুখে, আর কিছুটা খুড়তুত বোনদের মুখে শুনলেন।

মেয়েটি খেয়ালি। আঁকা-টাঁকা পছন্দ করত। কিন্তু বছর দুই হল পারিবারিক কারণে সর্বদা বিষণ্ন। অনেক ডাক্তার বদ্যি করানো হয়েছে, বিশেষ ফল হয় নি। মানসিক চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন, ভালো একটি ছেলে দেখে যথাশীঘ্র তার বিয়ে দিতে। এখন মেয়ের বাবা খুব সুশ্রী একটি সুপাত্র চান। এই গুণের ওপর মনোহর ভার্মা শিল্পী শুনে মেয়ের বাবা তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার ওপর অকৃত্রিম উকীল বন্ধুর ভাইপো যখন। সম্প্রতি খুব চড়া ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন ভদ্রলোক, অনেকবার রক্ত নিষ্কাশন করতে হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি তিনিও মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতে চান।

. মেয়ের বিষাদ রোগের কারণটিও মনোহর ভার্মা জেনেছিলেন। অবশ্য আরো ভালো

জেনে ছিলেন বিয়ের পর। এগারো বারো বছর বয়সে এত আদরের মেয়েকে হঠাৎ তার বাবা এক-রকম জোর করেই হস্টেলে রেখে পড়াতে শুরু করেছিলেন। মেয়ে যেতে চায় নি, মেয়ের মা তাকে বুকে আঁকড়ে ছিলেন—কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তার বাবা এই ব্যবস্থা করেছেন।

ব্যবস্থার পিছনের আসল কারণটা স্ত্রীলোকঘটিত। এর মাস ছয়েক আগে ভদ্রলোকের স্ত্রী একদিকে পক্ষাঘাত হয়ে শয্যা নিয়েছিলেন। রোগ নিরাময়ের কোনো আশা ছিল না। সংসারের সুব্যবস্থার জন্যে মহিলা তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনকে বাড়িতে আনিয়েছিলেন। বোন ওই জায়গাতেই একটা প্রাইমারি মেয়ে স্কুলের সামান্য শিক্ষয়িত্রী। দুঃস্থ অবস্থা। বিধবা।

বোন সংসারের দায়িত্ব হাতে নিলেন, গৃহিণীর অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষাও করতেন। বোনের ওপর খুশী ছিলেন তিনি। কিন্তু মেয়ের দেখাশুনা ঠিক মত হয় না, মায়ের অসুখের অছিলায় মেযে প্রায়ই স্কুলে যায় না, সারাক্ষণ অসুখের আবহাওয়ায় থাকে—এসব নিয়ে ভদ্রলোকের ক্রমশ অভিযোগ বাড়তে লাগল, আর, মেযেরও বাবার ওপর অকারণ ক্ষোভ বাড়তে লাগল, মাসিকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। মাসি মাযের মত সব কাজ করে, বাবা অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করেন—এ-সব তার আদৌ ভালো লাগে না। পড়া ফেলে যখন-তখন বাবার ঘরে ঢুকে পড়লে বাবা রাগ করেন, আর মাসিও উপদেশ দেন পড়ার সময় পড়াশুনা কবা উচিত। এদিকে মাকেও সে মোটেই কাছে পায় না, তাঁর ঘরে সর্বদা একজন নার্স মোতায়েন—দিনে. রাতে চব্বিশঘণ্টা। মাকে কোনোরকম বিরক্ত করা নিষেধ। তাঁর অবস্থা ক্রমশ মন্দব দিক ছেড়ে ভালোর দিকে যাচ্ছিল না।

মেয়েকে হস্টেলে যেতে হল। সপ্তাহে সপ্তাহে আসত। একদিন থেকে আবার চলে যেত। বাবা তখন তাকে খুব আদর করতেন। এ ভাবে আরো বছর খানেক কেটে যেতে মেয়ে হঠাৎ একদিন অনির্দিষ্ট দিনে দুপুরে বাড়ি এসেছিল। কোনো কারণে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে এ-রকম আগেও যে না এসেছে তা নয। ড্রাইভারকে স্কুল থেকে ফোন করলেই সে এসে নিয়ে যেত। সব দিন ফোনও করতে হত না। মায়ের নির্দেশে ড্রাইভার প্রায়ই হস্টেলে গিয়ে মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসত।

খুশী মনে দুপুরে বাড়ি এসে মেয়ে সোজা বাপের ঘরে ঢুকে ছিল। বাবা বাড়ি আছে ভাবে নি, ঘরের দরজা ভেজানো দেখে ঠেলে ঢুকেছিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল আবার। ঘরে বাবা ছিলেন, মাসি ছিলেন।

বেরিয়ে আসার পরে মেয়ের চোখে মুখে অব্যক্ত ত্রাস ছিল।

সেই বিকেলেই তাদের ড্রাইভারের চাকরি গিয়েছিল।

এর পরে এত বছরের মধ্যেও মেয়ে অ-দিনে বাড়ি আসে নি। মা তার স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন, আর কলেজের পড়া শেষ না হতে মেয়েকে বাড়িতে আনা হয়েছিল। কারণ, হস্টেলের কর্তৃপক্ষ তার সম্বন্ধে তার বাবাকে কিছু জানিয়েছিল হয়ত।

বাড়ি এসে মেয়ে তার মাসিকে দেখে নি। বাবা বলেছেন, মাসি চলে গেছে।

বাবা অসময়ে প্রায়ই বেরিয়ে যেতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, কাজে যাচ্ছেন।

অনেক ভেবে মনোহর ভার্মা বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন। মনের রঙ হাতে নিশপিশ করলেও বাজারের রঙের দাম চড়া। কাগজ-ক্যানভাস কেনার পয়সা পর্যন্ত হাতে থাকে না। আর সব থেকে বড় স্বপ্ন যা, মডেল রেখে আঁকবেন—সে আশা তখন পর্যন্ত স্বপ্নই। বিয়ে করলে এই সব স্বপ্নই সত্য হতে পারে।

হল। মেয়ের বাবা তাঁকে দেখেই পছন্দ করলেন। মেয়ে নিজেও পছন্দ করল হয়ত। একটু আধটু আলাপ-সালাপের পরেই তার মুখে হাসির ছোঁয়া দেখল সকলে। সে সাগ্রহে তাঁর আঁকা দেখত। প্রশংসা করত।

মনোহর ভার্মারও খারাপ লাগে নি তাকে। খারাপ লাগার খুব কারণও ছিল না।

বিযে হয়ে গেল। বছর খানেক বেশ কেটেছিল। মনোহর ভার্মার শ্বশুর মারা যাবার পরে কাকার চেষ্টায় যাবতীয় সম্পত্তি মেয়ে-জামাইয়ের হস্তগত হয়েছে। ভদ্রলোক উইল করে আরো কাউকে কিছু দিযে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা পাকা উইল নয়। কাকা সেটা সহজেই কাঁচিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

মনোহর ভার্মা মনপ্রাণ ঢেলে আঁকায় মন দিয়েছিলেন। বাড়িতে স্টুডিও করেছিলেন। মডেল রেখেছিলেন। নাম-ডাকও হচ্ছিল। কিন্তু বছর না ঘুরতে স্ত্রীর মানসিক রোগ বাড়তে লাগল। তাঁকে সন্দেহ করত। কখনো গুম হয়ে থাকত। মনোহর ভার্মা তার অনেক চিকিৎসা করিযেছেন। অনেক করে বোঝাতেন তাকে। ভালো থাকলে নিজের ব্যবহারের জন্য স্ত্রী লজ্জিত হত। অন্য সময় ভুলে যেত।

বছর পাঁচেক বাদে এই অবিশ্বাস চরমে উঠেছিল। গলা ছেড়ে বকাবকি করত তাঁকে, গালাগালি করত। মডেলকে যা মুখে আসে তাই বলত, অপমান করত। যখন তখন ঝড়ের মত স্টুডিওয় এসে ঢুকত। কল্পনা থেকে অন্য কোনো মেয়ের ছবি আঁকলেও অবিশ্বাস করত। শাসাতো, এই মেয়ে কে বল শীগগীর! ...তার ধারণা তিনি যত মেয়ের ছবি আঁকেন তাদের সকলের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ আছে তাঁর।

বেগতিক দেখে, মনোহর ভার্মা বাড়ির দোতলায় স্টুডিও সরিয়ে আনলেন। সর্বদা স্ত্রীর চোখের ওপর কাজ করতেন। এমন কি মডেল নিয়ে যখন কাজ করতেন, তখনো দরজা বন্ধ থাকত না। চাকর-বাকর বা অন্য লোকের ঢোকা নিষেধ ছিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রী যখন খুশি আসতে পারতেন—এসে নিজের চোখে দেখতে পারতেন, অবিশ্বাসের কিছু নেই। স্ত্রী আসতও, দেখতও। কিন্তু তাতেও রোগ নিরসন হল না। শুধু এরই মধ্যে এক আধ সময় যখন ভালো থাকত, তখন ভয়ানক লজ্জিত হত, অনুতপ্ত হত। এমন কি তখন নিজে মডেলের কাছেও ক্ষমা চাইত পর্যন্ত।

রোগ যখন চরম, স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। বিবাহের পঞ্চম বছর সেটা। স্ত্রী সন্তান চেয়েছিল। চিকিৎসকও অনুকূল পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, রোগও তত চরমে উঠতে লাগল। ব্লাডপ্রেসার দুশোর কাছাকাছি। চিকিৎসকরা প্রমাদ গনতে লাগলেন, মনোহর ভার্মা ভেবে ভেবে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। স্ত্রী তখন বদ্ধ পাগলের মতই বকাবকি করত তাঁকে। মনোহর ভার্মা তখন মডেলকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় নি, তার অবিশ্বাস তখন দুরপনেয়।

একদিন। স্ত্রী অকথ্য গালাগাল করছেন। তিনি শুনছেন। হঠাৎ এক চরম সঙ্কল্প নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন মনোহর ভার্মা। স্ত্রীর দুই কাঁধ ধরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে আগে নিরস্ত করলেন তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে তুমি সুস্থ হবে, ভালো হবে? বল, কি করলে তোমার অবিশ্বাস দূর হবে? আঁকা ছেড়ে দিলে বিশ্বাস হবে?

স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ হবে, আঁকা ছেড়ে দাও তুমি!

সেই দিনই স্টুডিও ভেঙে দিলেন তিনি। সাজ-সরঞ্জাম সব বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন। এমন কি ঘরে একটা ছবিও রাখলেন না।

স্ত্রী সুস্থ হল। কিন্তু সে শুধু পাঁচ-সাতদিনের জন্য। আধ ঘণ্টার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুলেও তার সন্দেহ হত, কোথাও আঁকতে যাচ্ছেন তিনি।

এর দিন কয়েক বাদে মৃত-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। স্ত্রীও মারা গেল।

স্ত্রী মারা গেল? এই পর্যন্ত শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম।

অন্যমনস্কের মত মনোহর ভার্মা জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ মারাই গেল।

আমি হতভম্বের মত বললাম, ও, এখন যাঁকে দেখছি, আপনার প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁকে বিয়ে করেছেন?

সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে ধীর গম্ভীর স্বরেই মনোহর ভার্মা জবাব দিলেন, না। প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতেই এঁকে বিয়ে করেছিলাম, প্রথম বিয়ের দুবছরের মধ্যেই। ইনিই আমার সেই মডেল। ...তখনো এক-বিয়ের আইন পাশ হয় নি।

আমি চিত্রার্পিত বিমূঢ়। শীলা ভার্মার চেহারাটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই জন্যেই একভাবে অতক্ষণ স্থির বসে থাকতে পারেন, এক রকম হাসির আভাস ফুটিয়ে রাখতে পারেন, আর, বহুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থাকতে পারেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে আবারও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তারপর আর আপনার আঁকার বাধা হল কিসে? প্রথম স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে আঁকা ছেড়েছিলেন বলে?

মনোহর ভার্মা হাসলেন একটু, হাতে করে বালুর দুর্গ-প্রাসাদ সব মুছে দিতে দিতে বললেন, না। প্রথম স্ত্রীর অবিশ্বাস, রোগ বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। কিন্তু সুস্থ মানুষের অবিশ্বাস দূর করা আরো কঠিন। বিশেষ করে প্রথম স্ত্রী বর্তমানেই যিনি আমাকে ভালো করে জেনেছেন—তাঁর মন থেকে।

মানুষ হিসেবে মনোহর ভার্মা কতটুকু খাঁটি কতটুকু মেকী, সে প্রশ্ন আমার মনে আসে নি। কলকাতা ফেরার সমস্ত পথে আমার চোখে শুধু একটা দৃশ্যই বার বার ভেসে উঠেছে। প্রাচুর্যের দুর্গপ্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত একটি মানুষ শুধু অবিশ্রান্ত মাথা খুঁড়বে।

যে শিল্পী। যার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই।

রাত ঠিক ন'টায় লোহার গেট পেরিয়ে গাড়িটা সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াতে বিধু দরজার ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সামনের চওড়া বারান্দায় জোরালো আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় গাড়ির ছিরি দেখে বিধু সরকার মনে মনে নাক সিঁটকেছেন। অত দেমাক না দেখিয়ে ফোনে একটা গাড়ি পাঠাতে বলে দিলেই তো হত। সেই তো সুড়সুড় করে আসতে হল আবার। মাঝখান থেকে এই আধবুড়ো মানুষটার নাজেহাল দশা ক'টা দিন।

তাঁর মুখ দেখে মনের কথা কেউ বুঝবে না এ তিনি নিজেও জানেন। বিগলিত অভ্যর্থনায় শশব্যস্তে এগিয়ে এসেছিলেন।

পাঁচ পাঁচটা মস্ত চাঁদোয়া সিঁড়ি টপকে এগিয়ে আসার আগে গাড়ির দরজা খুলে রমণী নিজেই নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝকমকে লালের ধাক্কায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত এই বয়সের মানুষটাও।

সামনে কমনীয় অথচ দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী মূর্তি যেন একখানা। পরনে টকটকে লাল দামী সিফন, গায়ে আরো গাঢ় লাল ভেলভেট ব্লাউস। এক-গা গয়না। আঙুলে হীরের আংটি। কানে হীরের দুল।

এই রমণীর জন্যেই উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় ছিলেন বিধু সরকার। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে টান হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে হকচকিয়ে গেছলেন কেমন। সামলে নিতে সময় লাগে নি অবশ্য। সস্নেহ অভ্যর্থনায় উপচে উঠেছেন, এসো মা এসো। একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়েই এসেছ।

রমণী জবাব দেয় নি। সিঁড়িতে পা দিযে একবার শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে তাঁর দিকে।

তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন বিধু সরকার। চক্ষুশূল ঝরঝরে গাড়িটা তখনো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলেছেন, গাড়িটা চলে যেতে বলি, আমাদের গাড়ি পৌঁছে দেবে'খন—

রমণী আধা-আধি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রসারিত দু'চোখ সোজা আবার তাঁর মুখে এসে থেমেছে। বিধু সরকার থতমত খেয়েছেন। গত দেড় মাসের মধ্যে কম করে দশবার এই মেয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর কথা হয়েছে। কিন্তু এ যেন সেই মেয়েই নয়।

—গাড়ি ওখানেই থাক।

আবার সামনে পা বাড়িয়েছে। বিধু সরকার শশব্যস্তে অনুসরণ করেছেন তাকে। ছোট বারান্দা পেরুলে সামনে দোতলায় ওঠার তকতকে মোজেক করা সিঁড়ি। পাশের

দেয়ালে খান তিনেক অয়েল পেন্টিং। বাড়ির মালিকের রুচির পরিচয় এগুলো। সিঁড়ি ভেঙে রমণী আগে আগে উঠছে। পিছনে বিধু সরকার। ভদ্রলোকের বয়েস এখন আটান্ন। ছয় রিপুর মধ্যে অন্তত কাম-মোহ-মাৎসর্য থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবেন এখন। তাঁর হিসেবী মন আর হিসেবী চোখ একটিমাত্র মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর তুষ্টির ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সজাগ। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মনের খবর রাখেন না বিধু সরকার, চোখ দুটোও সচলমন্থর লালের ঘোরে আচ্ছন্ন। আগে আর কখনো এই বেশে আর এই মূর্তিতে দেখেন নি একে। মঞ্চের বাইরে সাদাসিধে বেশ-বাস দেখেছেন, হাসিছোঁয়া কমনীয় মুখখানায় বুদ্ধির বিনম্র ছটা দেখেছেন। কিন্তু এই সাজ আর এই মূর্তি দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আচমকা ধাক্কায় সজাগ করে তোলার মতো, আবার তারপরেই নিষেধের এক অমোঘ ভ্রূকুটিতে পঙ্গু করে ফেলার মতোও।

...নিষেধ লঙ্ঘনের তাগিদ যাঁর তিনি দোতলার বারান্দার শেষ মাথার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। পুরুষ। বিধু সরকারের চোখে পুরুষকারের প্রতীক। বয়সে সাত আট বছরের ছোট হলেও ওই মানুষের মাথা হিমালয়ের মতো উঁচু। আজ তিরিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে বিধু সরকারের নিজেকে অসহায় মনে হয় কত সময়। তবু ওই লোকের মুখের প্রতিটি অদৃশ্য আঁচড় চেনেন। দূর থেকে এক নজর তাকিয়েই মনে হল নীরব গাম্ভীর্যের আড়ালে পরিতুষ্ট প্রতীক্ষার অবসান দেখলেন।

...নিষেধ-লঙ্ঘনও বুঝি ওই একজনেরই অনায়াসসাধ্য।

বিধু সরকার দোতলার বারান্দার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেছেন। রমণী নির্দ্বিধায় ওই কোণের ঘরের দিকে, ওই পুরুষের দিকে এগিয়ে গেছে। ...নীরব অভ্যর্থনায় পুরুষ দরজার শৌখিন পুরু পর্দাটা টেনে ধরেছেন। তারপর সেই পর্দা আবার সরে এসে দু'জনকেই আড়াল করেছে।

এতক্ষণে বিধু সরকারের চোখের লালের ঘোর কেটেছে। স্নায়ুগুলো সব বশে এসেছে। অগ্রহায়ণের গোড়ার দিক এটা। বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে। সুতির চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নীচে নেমে এসেছেন তিনি। বারান্দার এ-ধারে এসে বাইরে উঁকি দিয়েছেন। ঝরঝরে গাড়িটা সিঁড়ির গায়েই দাঁড়িয়ে আছে। বিহারী ড্রাইভারটা পিছনে মাথা ঠেকিয়ে একটু নিদ্রা দেবার মতলবে আছে বোধহয়। ভাবলেন ওকে ডেকে গাড়িটা আঙিনার ও-ধারে নিয়ে রাখতে বলবেন। সকালের আগে আর এ-গাড়ির দরকার হবে মনে হয় না। কিন্তু বললেন না। ওটাকে সচল করতে হলে যে শব্দ উঠবে সেটুকুও কাম্য নয় যেন।

বাইরের বারান্দার আলোটা নেভালেই ও-গাড়ি আর কারো নজরে পড়বে না। তাই করলেন।

এখনো কিছু কাজ বাকি। মালিক দু'জনার মতো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে বলেছিলেন। নির্দেশ মতো বাবুর্চি বেয়ারারা প্রস্তুত। তবু ভিতরে এসে আর এক দফা তদারক সেরে নিলেন বিধু সরকার। একজন বেয়ারাকে দোতলার বারান্দার সিঁড়ির

কাছে অপেক্ষা করতে বললেন। সাহেব ঘরের বোতাম টিপলেই ওপরে-নীচে দু'জায়গাতেই প্যাঁক করে মিষ্টি শব্দ হয় একটু। কিন্তু নীচে থেকে লোক ছুটে যাওয়ার চেয়ে একজনের ওপরে অপেক্ষা করাই ভালো।

ঠাণ্ডার আমেজ বাড়ছেই। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে খুব বেশি রাত হবে মনে হয় না। মালিকের শৃঙ্খলাবোধ আছে, অযথা কাউকে কষ্ট দেন না বড় একটা। ক'টা রাত ভালো ঘুম হয়নি। এই মেয়েটাই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আজ ছুটি পেলেই নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় গিয়ে টান হতে পারবেন।

বয়েস আটান্ন কিন্তু এই মুহূর্তে ভিতরটা উন্মুখ একটু। এই গোছের প্রতিক্রিয়া আগে কখনো হয় নি। নীচের বারান্দায় পায়চারি করছেন নিজের মনেই হাসছেন অল্প অল্প। আর এক-একবার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। চোখ দুটো তাঁর দোতলার বারান্দার কোণের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরের দিকে ধাওয়া করছে। আগে এ-রকম কখনো হয় নি। বিকেল থেকে এই রাতের সবটুকুই যেন স্বতন্ত্র।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিষম চমক আবার। অদূরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছেন বিধু সরকার। ঠিক দেখছেন কিনা সেই সংশয়। সিঁড়ির সাদা আলোয় হঠাৎ লালের আভা। তারপরেই নির্বাক বিমূঢ় বিধু সরকার। ...রমণী নেমে আসছে। তেমনি দৃপ্ত আত্মস্থ মূর্তি। নেমে এলো। পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগুলো। ধীর অবিচলিত পদক্ষেপ। ঠিক চার দিন আগে প্রায় এই সময় এই মেয়েই এখান দিয়ে ভীত ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে পালিয়েছিল।

খানিক আগে আলো নিভিয়েছিলেন। তাই বাইরেটা অন্ধকার। নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন বিধু সরকার। এনজিনে স্টার্ট পড়ার শব্দ কানে এলো। অন্ধকারে হেড-লাইট জ্বেলে গাড়িটা ফটক পেরিয়ে চলে গেল।

বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি বিধু সরকারের। কি ব্যাপার ঘটল হঠাৎ তিনি জানেন না—কিন্তু এ-সব-কিছু যেন তাঁরই অযোগ্যতার নজির। পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলেন। বেয়ারাগুলো হাঁ করে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। ওই কোণের ঘরের দিকে এগোলেন বিধু সরকার। পা যেন আর চলে না। গিয়ে কোন্ মূর্তি দেখবেন মালিকের?

পুরু পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিলেন। মালিক শয্যায় বসে আছেন স্থাণুর মতো, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে একটু। কি-রকম যেন অস্বাভাবিক লাগছে। এ-রকম দেখবেন আদৌ আশা করেন নি। পর্দা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু মালিক টের পেয়েছেন কিনা বোঝা গেল না, মাথা তেমনি নীচু।

তারপরেই হতচকিত বিধু সরকার। হ্যাঁ, অস্বাভাবিকই বটে এমন অস্বাভাবিক যে কল্পনা করা যায় না। এই ঠাণ্ডায়ও মালিক দরদর করে ঘামছেন। ঘামে সমস্ত মুখ জবজবে ভিজে। গায়ের বিলিতি আদ্দির পাতলা জামাটাও গেঞ্জির ওপর দিয়ে ভিজে উঠেছে।

আজ দেড় মাস হল পেশাদার মঞ্চরাজ্যে বড় রকমের ওলটপালট হয়ে গেছে একটা। শহরের একটা প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের এত কালের জীবন-শিখা এবারে সত্যিই নিভু-নিভু। নির্বাণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কোনো কাগজে বেরোয়নি এখনো কিন্তু দেড় মাস হয়ে গেল মঞ্চের নাটক বন্ধ। মঞ্চের মালিক বছর খানেক আগে বিগত হবার পর থেকেই নানান গোলযোগের সূত্রপাত। অনেক সরিকের মধ্যে মনোমালিন্য দুর্নীতির দায়ে তাদের আসল পৈতৃক ব্যবসার অবস্থাই টলোমলো। মঞ্চের দিক সামলায় কে? এর মধ্যে সুপরিচালনার অভাব, খরচপত্রের নানান অবস্থার দরুন মঞ্চের শিল্পী আর কর্মচারীরাও বিক্ষুব্ধ। বাড়তি দাবিদাওয়া ছেড়ে তারা নিয়মিত বেতন আর ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না। অতএব তাদেরও চোখ হামেশাই লাল। প্রায় আচমকাই মালিকরা এখনি মঞ্চের দরজা বন্ধ করে দিলেন। শিল্পী টেকনিসিয়ান আর কর্মচারীরা অবশ্য আশ্বাস পেলেন মালিকদের পারিবারিক ঝামেলা মিটলে শিগগীরই আবার মঞ্চের দরজা খোলা হবে এবং তখন সমস্ত রকমের সুব্যবস্থাও হবে কিন্তু এ-আশ্বাসের দাম কতটুকু সকলেই জানে। তারা প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বসল। পরে ছোট-বড় সকলে দল বেঁধে ছুটল অঞ্জলি চক্রবর্তীর কাছে।

আজ প্রায় বারো বছর যাবৎ এই মঞ্চের প্রধান অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তী। এই মঞ্চের প্রধান তো বটেই, মহানগরীর আর কোনো মঞ্চেই অভিনেত্রী হিসেবে তার জুড়ি নেই। সমস্ত পশ্চিমবাংলায় মঞ্চশিল্পী অঞ্জলি চক্রবর্তী উজ্জ্বলতম নাম।

নামের আরো কারণ আছে। মঞ্চানুরাগের এমন নজির আর দুটি নেই। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে তার মঞ্চে পদার্পণ। বয়েস এখন বত্রিশ-তেত্রিশ। কিন্তু এই বয়সটা আজো যেন তার সেই বাইশ-চব্বিশের যৌবনমন্ত্রে স্থির, অনড়। অভিনেত্রী জীবনের প্রায় শুরু থেকেই সে নায়িকা। তার আগে গোটা কয়েক অ্যামেচার ক্লাবের নায়িকা ছিল সে। এই রূপ-যৌবন আর তীক্ষ্ণ অভিনয়-ক্ষমতা নিয়ে কালে দিনে সে কোন পর্যায়ের শিল্পী হয়ে উঠবে বর্তমান মঞ্চের সেদিনের মালিকের সেটুকু আঁচ করার ক্ষমতা ছিল। পাঁচ বছরের শর্ত সাপেক্ষে বেশ চড়া মাশুল গুনেই তিনি তাকে সবথেকে জনপ্রিয় মঞ্চটিতে তুলে এনেছিলেন। তাঁর হিসেবে ভুল হয়নি। অভিনয়ে অসামান্য সাফল্যের দরুন প্রতি বছর শর্তের থেকেও ঢের বেশিই দিয়েছেন তাকে। আর প্রত্যেক বারই শর্তের একটা বিশেষ অংশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ অঞ্জলি চক্রবর্তী সেই মালিককে সত্যিই ভক্তি শ্রদ্ধা করত, আর তার শর্তের কথা শুনে মনে মনে হাসত। আসলে ভদ্রলোকের ভয়। অঞ্জলির কাছে সিনেমার দল তখন ভিড় করে আসছে। একের পর এক লোভনীয় টোপ ফেলছে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে শর্ত নাকচ করার মতো মুরুব্বিরা তখন ওর পিছনে লেগে আছে।

অঞ্জলি চক্রবর্তী একদিনের জন্যেও লুব্ধ হয়নি। যে মঞ্চ তাকে ঝড়ের মুখে কুটো হয়ে ভেসে যাওয়ার মতো দুর্দিন থেকে টেনে তুলেছে, সম্মান দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে—সেই মঞ্চকে সে ভাল-বেসেছে। লোভের বশে মঞ্চ ছেড়ে যাওয়াটাকে

স্বামীর ঘর থেকে অপরের ঘরে চলে যাওয়ার মতোই ভেবেছে সে। ভেবেছে বলেই আজ সে সমস্ত পশ্চিমবাংলার মঞ্চ সম্রাজ্ঞী।

সহশিল্পী আর কর্মচারীরা তার কাছে এসে ধর্ণা দেবে না তো আর যাবে কোথায়। তাদের সানুনয় অনুরোধ এবং মিনতি সে যেন আরো কিছুকাল অপেক্ষা করে, চট করে অন্য কোনো মঞ্চের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হয়। কারণ এই মঞ্চের দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'-তিনটে মঞ্চের মালিকেরা যে সোল্লাসে তার কাছে ছুটে এসেছে, দেড়গুণ বেশি পারিশ্রমিক দিয়ে তাকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে—এ খবর তারা রাখে। তা ছাড়া সহজ অনুমান সাপেক্ষও বটে এটা। অঞ্জলি চক্রবর্তী যদি সত্যিই চলে যায় তাহলে আর কোনো আশা নেই, গেলই এটা।

অঞ্জলি চক্রবর্তী হাসিমুখেই আশ্বাস দিয়েছে তাদের। বলেছে অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই কিন্তু কি দিয়ে কি করবেন আপনারা বুঝছি না।

প্রবীণ ম্যানেজার ভদ্রলোক একটু আশার কথা শুনিয়েছেন। বিরাট বিত্তবান এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নাকি মঞ্চসুদ্ধ এই এলাকা সোজাসুজি কিনে নেবার ইচ্ছেয় মালিক পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। খবরটা প্রথম কানে আসতে সকলে ঘাবড়ে গেছল। কেনার পর ভদ্রলোক এটাকে তাঁর গোডাউন বানাবেন, কি মঞ্চ চালাবেন কে জানে। কিন্তু তাঁর নাম শুনেই ম্যানেজার আশ্বস্ত কিছুটা। এতদিনের ম্যানেজারীর কল্যাণে ওই ভদ্রলোকটিকে তিনি ভালই চেনেন। সত্যিকারের মঞ্চানুরাগী। এখানকার প্রতিটি নাটক অনেক বার করে দেখে থাকেন। আর তখন সব থেকে চড়া মাশুলের বকস্-এর স্বতন্ত্র আসন তাঁর জন্য বুক করা হয়।

মঞ্চানুরাগী মানুষটির নাম দেবেশ মজুমদার। বিলেত জার্মানী ফেরত মস্ত এঞ্জিনীয়ার কিন্তু ব্যবসা একসপোর্ট-ইমপোর্টের। বছরের মধ্যে তিন-চার মাস বিদেশে কাটান।

নামটা শোনা এবং জানা অঞ্জলি চক্রবর্তীরও। বর্তমান মালিকদের একজনের মুখেই শুনেছে। যা বলত, প্রকারান্তরে তারই প্রশংসা সেটা। তার অভিনয়ের টানে ওমুক মালটিমিলিয়নিয়ার ভদ্রলোক এক-একটা শো অনেকবার করে দেখে থাকেন। ঠাট্টার ছলে মাঝে-মাঝে একসপোর্ট-ইমপোর্টার এঞ্জিনীয়ার প্রেমিক নাটক দেখতে এসেছেন, ভালো করে কোরো।

না, অঞ্জলি চক্রবর্তী সেই ভদ্রলোকের কথা শুনেছে শুধু, তাঁকে চোখে দেখেনি। কারণ ভদ্রলোক সকলের সঙ্গে নীচের আসনে বসতেন না কখনো। আর আদিখ্যেতা দেখিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও আসেননি। তাছাড়া এই নামের সঙ্গে পরিচয়ের আরো বিশেষ কারণ আছে। দু'বছর আগে একটা নাটকের হাজার রজনী অভিনয়ের অনুষ্ঠান জাঁকজমক করে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেও সকলের আপ্যায়নের প্রধান সম্রাজ্ঞী অঞ্জলি চক্রবর্তী। সেই রাতে প্রধান মালিক তার হাতে কম করে বিশ ভরি ওজনের একটা অদ্ভুতসুন্দর সোনার কাপ তুলে দিয়ে মাইকে ঘোষণা করেছিলেন, শিল্পীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে এটি দিয়েছেন শিল্পপতি ওমুক মজুমদার। সন্ধ্যার সেই অনুষ্ঠানে অঞ্জলি চক্রবর্তীর অনুসন্ধিৎসু দুই চোখ ভদ্রলোককে খুঁজেছিল। তিনি আসেননি।

সেই সোনার কাপ এখনো তার ব্যাঙ্কের ভোল্টে মজুত।

প্রবীণ ম্যানেজার জানালেন দেবেশ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি বা কথা হয়নি। নিজে তিনি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না বা কথা বলেন না। সব কিছুই তাঁর সেক্রেটারির মারফৎ হয়ে থাকে। সেই সেক্রেটারির সঙ্গে ম্যানেজারের দেখা হয়েছে কথা হয়েছে। তিনি নাকি আশ্বাস দিয়েছেন মঞ্চের মালিকানা খুব শিগগীরই হাতবদল হবে। আর নাটকই হবে এখানে। তবে এর ভবিষ্যৎ কতটা সফল বা কতটা উজ্জ্বল সেটা নির্ভর করছে এখানকার প্রধান অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তীর ওপরে। শুধু অভিনয় নয় এদিকের সবকিছু ম্যানেজ করার দায়-দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে।

এতটা শোনার পরেই আশান্বিত হয়ে সকলে তার কাছে ছুটে এসেছে।

এই স্তুতির কথা শুনে অঞ্জলি চক্রবর্তীর মুখ একটু লাল হয়েছিল। এই প্রস্তাবনার পিছনে অনুক্ত ইঙ্গিত কিছু আছেই। অবাক খুব হয়নি। সে-রকম রমণীর কারণে অনেক মহাজনের ধূলোয় গড়াগড়ি খাওয়ার কথা শোনা আছে আর নিজের অভিজ্ঞতায় জানাও আছে কিছু। নগ্ন প্রত্যাশার অনেক কাণ্ডকারখানা দেখেছে সে। হাসিমুখেই বিদায় করেছে সকলকে। বলেছে খুব ভাগ্যি দেখি আমার। ঠিক আছে, অপেক্ষা করব—দেখা যাক।

এত শিগগীর মঞ্চ কিনে নেবার খবরটা কানে আসবে কেউ ভাবেনি। দেবেশ মজুমদারের সেক্রেটারি তিন চার দিনের মধ্যে এসে সোজা অঞ্জলি চক্রবর্তীর সঙ্গেই দেখা করে খবরটা জানিয়েছেন। মালিকের নির্দেশও পেশ করেছেন। পাবলিসিটি দিয়ে যথাশীঘ্র আবার মঞ্চ চালু করার নির্দেশ। খরচপত্র ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে। পাবলিসিটি অফিসার থেকে শিল্পী টেকনিসিয়ান এবং কর্মচারীরা আগে যেভাবে যুক্ত ছিল তেমনিই থাকবে। অদলবদল কিছু করার দরকার হলে সে স্বাধীনতাও অঞ্জলি চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ আছে। নতুন নাটক দিয়ে শুরু করা হবে কি আপাতত পুরনো নাটকই চলবে সে বিবেচনাও অঞ্জলি দেবীরই।

সহজাত হাসি মুখে অঞ্জলি চক্রবর্তী শুনেছে আর নিরীক্ষণ করে দেখেছে লোকটাকে। তারপর আরো একটু হেসে বলেছে, যতটা পারি চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ওপর মিস্টার মজুমদার এতটা নির্ভর করছেন দেখে ভয় করছে...।

সেক্রেটারি বিধু সরকার। এই আটান্ন বছর বয়সে অনেক দেখেছেন অনেক জেনেছেন। আতিশয্যবর্জিত অন্তরঙ্গ সহজতায় অনায়াসে কাছে এগিয়ে আসতে পারেন। কোনরকম ভনিতা না করে সোজা জবাব দিলেন, সাহেব নির্ভর যখন করেন তখন সবটাই করেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে যা কিছু সবই তোমার জন্যে মা—

অঞ্জলির কানের ডগা লাল হবার উপক্রম একটু। কিন্তু এ লাইনে এতদিন কাটিয়ে এ-সব কথা গায়ে না মেখে অভ্যস্ত। ঈষৎ কৌতুকে চেয়ে রইল।

বিধু সরকার বললেন, আমার সাহেবের বিলাস বলো ব্যসন বলো ওই একটি জিনিস—নাটক। ছেলেবেলা থেকেই তাই। এখন ব্যবসা এত বেশি ফেঁপে উঠেছে যে সময় বেশি পান না। তবু এরই মধ্যে সময় করে তোমার এক-একটা নাটক

কতবার করে দেখেছেন ঠিক নেই। সেই তোমাদেরই মঞ্চের দরজা বন্ধ হতে দেখে আমার ওপর সোজা হুকুম, কিনে নিয়ে আবার চালু করার ব্যবস্থা করো।

এই সেক্রেটারিটি মালিকের কোন পর্যায়ের বশংবদ অঞ্জলি চক্রবর্তী অনায়াসে সেটুকু আঁচ করে নিতে পেরেছে। নিজেকে তুচ্ছ করে এইসব মানুষ সর্বদাই তাদের মনিবকে এগিয়ে দিয়ে থাকে, মনিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

হেসেই বলল, তাঁর অসীম অনুগ্রহ আর আমাদের ভাগ্য।...কিন্তু তাঁর সঙ্গেই দেখা করে একটু কথাবার্তা কইলে ভালো হত না?

বিধু সরকারের সাদাসাপটা জবাব, দেখাও অনেক হবে, কথাও অনেক হবে, তার জন্য ভাবনা কি...তবে এ ব্যাপারে সাহেব একবার গ্রীন সিগন্যাল যখন দিয়েছেন তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাজে এগিযে যাও মা, আমাকে টেলিফোনে তলব করলেই যা লাগবে নিয়ে হাজির হব। তাছাড়া সাহেব তো আজ ভোরেই সিঙ্গাপুরে রওনা হযে গেছেন। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ফিরবেন অবশ্য।

মুখে যা বললেও সরাসরি যেভাবে ভদ্রলোক ভবিষ্যতে অনেক দেখা আর অনেক কথা হওয়ার আশ্বাস দিলেন তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কিছু আছেই। কিন্তু অঞ্জলি চক্রবর্তী এ নিযে খুব একটা মাথা ঘামায় না। এ যাবৎ সে অনেকরকমের জটিলতার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আবার কখনো সখনো সাময়িকভাবে আটকেও গেছে। অতএব এতগুলো লোকের সুখদুঃখ ভালোমন্দ যেখানে জড়িত সেই সংস্থাকে আবার টেনে তোলাটাই প্রধান বিবেচনার ব্যাপার। নিতান্ত বেগতিক দেখলে অথবা না পোষালে সরে আসতে কতক্ষণ। অঞ্জলির ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন নেই। এখানকার কাজ ছাড়লে আর পাঁচজন তাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েই আছে। সে-ক্ষেত্রে বিপাক বরং ওই বিত্তবান পুরুষের। বহু টাকার বিনিময়ে এই সংস্থার মালিকানা পেয়েছে। কাজ শুরু হবার আগেই আরো অনেক ঢালতে হবে।

গত দেড় মাসের মধ্যে সেক্রেটারি বিধু সরকার আরো অনেকবার এসেছেন। অঞ্জলির বাড়িতেই অন্যান্য শিল্পী টেকনিসিয়ান আর কর্মচারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। অঞ্জলির পরামর্শ মতো সকলের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন। আপাতত যে নাটক বন্ধ হয়েছিল সেটাই আবার চলবে স্থির হয়েছে। কিন্তু তার সাজ-সরঞ্জাম বদলানো হয়েছে। সংস্কারে আর নতুন রঙে মঞ্চ-গৃহের ভোল পাল্টে গেছে। বিধু সরকার অম্লানবদনে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। খোদ মালিককে কেউ দেখেনি এর মধ্যে। ফলে সকলের কাছে বিধু সরকারের মস্ত খাতির। খাতির তাকে একটু-আধটু অঞ্জলিও করছে। একান্ত বিশ্বাসযোগ্য লোক না হলে খরচের এমন ঢালাও পরোয়ানা কেউ ছেড়ে দেয় না। আরো একটা জিনিস অঞ্জলি চক্রবর্তীর ভালো লেগেছে। লোকটার আচরণে রাখা-ঢাকা ব্যাপার কিছু নেই। মনের কথা মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে আসে।

একান্ত আলাপের সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মালিকের প্রসঙ্গেও অনেক কথা জেনে

নিয়েছে। কৌতূহল অঞ্জলিরও কিছু আছেই। বিশ ভরি ওজনের অমন সুন্দর সোনার কাপ উপহার দেবার সময়ও নিজেকে জাহির করার জন্য কাছে এগিয়ে আসেনি। আর এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে এখনো ওই লোক চোখের আড়ালে। অঞ্জলির মনে মনে ধারণা মানুষটা দাম্ভিক এবং নিজের সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। বিধু সরকার অবশ্য বলেন মাটির মানুষ অক্লান্ত কাজের মানুষ। একদিকে যেমন অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অন্যদিকে তেমনি শিশুর মতো সরল। তারপর হেসে যোগ দিয়েছেন, তুমি তো জানবেই তখন মিলিয়ে দেখো।

এঁই নতুন মালিকটিকে অঞ্জলি জানবে এবং বিশেষভাবে এ যেন ধরা-বাঁধা ব্যাপার। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ফুটিয়ে অঞ্জলি চক্রবর্তী এই লোকটাকেই একদফা দেখে নিয়েছে।

কথায় কথায় আরো শুনেছে। মানুষটা অর্থাৎ এই নয়া মালিক নাকি বিয়েই করেননি। বিয়ের মতিও হয়নি, ফুরসতও হয়নি।

ভাইয়েরা আছে, তাদের ঘর-সংসার আছে, মাস গেলে সাহেব তাদের অনেক টাকা দেন—এ ছাড়া আর কোনো সংশ্রব নেই। বয়েস তো এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, নিজের ঘর সংসার আর হবেও না কোনদিন।

এই কথাগুলোও প্রচ্ছন্ন টোপের মতোই মনে হয়েছে অঞ্জলির। হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করেছে, ঘর-সংসার হল না বলে আপনাদের সুবিধে হয়েছে না অসুবিধে?

নির্বিকার জবাব দিয়েছেন বিধু সরকার, আমাদের সুবিধেই হয়েছে। কারণ কি জানো মা, এ-রকম বিরাট মানুষের যোগ্য সঙ্গিনী হতে পারে এমন মেয়ে তো বড় একটা দেখলাম না। যেমন তেমন একজন এলে কোনদিন সাহেবের নাগাল পেতেন না, মাঝখান থেকে আমরা নাজেহাল হতাম।

এত সব শোনার পর অঞ্জলি চক্রবর্তীর কেমন মনে হয়েছে। সে নিজেই যেন কোনো একটা পরিণতির অনিশ্চিত মোহনার দিকে পা বাড়াতে চলেছে। ভিতরে ভিতরে এক ধরণের চাপা অস্বস্তি শুরু হয়েছে তার।

ঠিক চারদিন আগে এই গোছের আমন্ত্রণের জন্য অঞ্জলি চক্রবর্তী একটুও প্রস্তুত ছিল না। সে ধরেই নিয়েছিল নাটক শুরু হবার পর মালিকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয় থেকে নিজের ভবিষ্যতের আঁচটা ভালো মতো পাবে।

জানান না দিয়েই বিধু সরকার এলেন। সেইরকমই সংকোচশূন্য সাধাসিধে আচরণ তাঁর। বললেন, আজ তো একবার আসতে হচ্ছে গো মা।

অঞ্জলি অবাক একটু। —কোথায়?

—আমাদের...মানে সাহেবের বাড়িতে।

অঞ্জলি থমকে তাকালো মুখের দিকে। —সাহেব বলেছেন?

—হ্যাঁ, এই তো খানিক আগে তাঁর টেলিফোন পেয়ে ছুটে আসছি।

—টেলিফোন পেয়ে!

—হ্যাঁ গো...সাহেব তো দিল্লীতে এখন। ট্রাঙ্ককল করেছিলেন, এখানকার সব

খবরাখবর নিলেন...আজই রাতের প্লেনে ফিরছেন। বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় ন'টা হবে। তোমাকে সাড়ে নটায় আসতে বললেন। আমি ঠিক সময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব...ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবে।

শোনামাত্র ভিতরটা বিরূপ হয়ে উঠল অঞ্জলির। যেভাবে ওই মালিক তার কর্মচারীকে হুকুম বা নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত এও অনেকটা সেইরকম। ওর নিজের সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন নেই যেন। আমন্ত্রণ বাতিল করার তাগিদটা ঠোঁটের ডগায় এসেও ফিরে গেল। এত বছরের অভিনয় জীবনে অনেক রকমের সংযমও শিখেছে। এত বড় একটা দায়িত্ব তার মাথায়। এতগুলো মানুষ তার মুখ চেয়ে আছে—শুরুর আগেই সব ভেস্তে দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

স্বাভাবিক বিড়ম্বনার আড়াল নিয়ে বলল, অত রাতে গেলে ফিরব কখন।

বিধু সবকার লক্ষ্যটাই বড করে দেখেন। আলগা ছলাকলার ধার ধারেন না বড। যেভাবে তাকালেন তাব একটাই অর্থ। অর্থাৎ তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে বাজে ভাবনা ভেবে লাভ কি। মুখে বললেন, সে ব্যবস্থা যখন চাইবে তখনই হবে তাব জন্যে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তৈরি থেকো। আমি এই ধরো সোয়া নটা নাগাদ গাড়ি পাঠাব।

চলে গেলেন। ভিতবের রাগটা একটা যন্ত্রণার মতো ঠেলে উঠতে লাগল অঞ্জলির। মঞ্চের এই নযা মালিক এমনিই কলাকৌশলবর্জিত মানুষ ভাবতে পারেনি। বরং এত দিন একটিবাবের জন্যেও সামনে এসে দাঁডায নি বলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ঘোরালো মানুষ বলে ধরে নিযেছিল। কিন্তু এ যেন সবটাই দম্ভ। আমাব ডাকার সময হয়েছে, এবার তুমি এসো। কি করবে অঞ্জলি চক্রবর্তী এখন? ম্যানেজারকে ডেকে সহ-শিল্পীদের ডেকে সব বানচাল কবে দেবে? বলবে এই মঞ্চের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই?

কিন্তু অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তী হঠাৎ ঝোঁকের বশে কোনো কাজ করে না। রাগ চেপে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে জানে। সেই চিন্তার ফলে একটা বিপরীত সংকল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ক্ষমতাবান প্রবল পুরুষের আচরণ ওই অদেখা মানুষটার। যাচাই করে দেখতে আপত্তি কি? তাতে নতুন করে আর কতটুকু ক্ষতি তার?

...এ যাবৎ পুরুষের নগ্ন প্রত্যাশার আঁচে কলজে পোড়ে নি এমন নয়। খানিক আগে রাগের আকারে সেই যন্ত্রণাই অনুভব করেছে। সত্যিকারের মানুষ পেলে তার যৌবনের দোসর হতে আপত্তি ছিল না। সেই ভুলের ফাঁদেই পা দিয়েছিল অঞ্জলি চক্রবর্তী। একে একে তিনবার। প্রথম আর শেষের ভুলের ফসল শুধুই ঘৃণা। আর মাঝের স্মৃতি তিক্ত বেদনার।

...ভদ্র এলাকার প্রায় বস্তিঘরের উনিশ বছরের এক রূপসী মেয়ে প্রলোভনের ছটায় মুগ্ধ হয়ে অতি বিশ্বস্তজনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল। সেই গতানুগতিক প্রলোভন। ফোটো স্টুডিওর এক ক্যামেরাম্যান সিনেমা-জগতের নায়িকাদের পুরোভাগের আসনে

বসানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাকে। আর সেই সঙ্গে তাকে গ্রহণের ব্যাপারটা তো স্বতঃসিদ্ধ। তার সর্বস্ব গ্রাস করে সেই কাপুরুষ নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে ওকে তার এক অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবের পরিচালক বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়েছিল। বলেছিল অভিনয় রপ্ত হোক তারপর ছায়াছবির রাস্তা সুগম হবে।

সত্যি সুগম হয়েছে একদিন কিন্তু ঘৃণায় সে রাস্তা মাড়ায়নি অঞ্জলি চক্রবর্তী। পেশাদার মঞ্চে দিনে দিনে ওর সেই উন্নতির মুখে লুব্ধ পতঙ্গের মতোই যৌবনের সেই প্রথম দোসর আবার এসেছিল। অঞ্জলি চক্রবর্তী কিছুদিন তার সঙ্গে প্রেম-প্রীতির নিখুঁত অভিনয় করেছে, তারপর চিবুনো ছিবড়ের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

...হ্যাঁ সত্যিকারের ভালও বোধহয় বেসেছিল ওই অ্যামেচার ক্লাবের আধপাগল বন্ধুটিকে। অভিনয় জীবনে ওই মানুষটিই গুরু তার। হাতে ধরে আর কড়া শাসন করে অভিনয় শিখিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদের নেশাই কাল হোল লোকটার। সেই আধ-পাগলা প্রতিভাধর মানুষটার কাছে অঞ্জলি নিঃশেষে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। তার ভালবাসার জোর বড় কি লোকটার মদের নেশা—সেটা যাচাইয়ের অনাপোস পণ নিয়েই ওই লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। হেরে গেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। লিভারের ব্যামোয় অকালে চোখ বুজেছে লোকটা। এই স্মৃতির সবটুকুই তিক্ত বেদনার।

...শেষের পুরুষটি এই মঞ্চের একসময়ের সহ-অভিনেতা। সেই লোকের এখনো নামডাক খুব। অন্য একটি মঞ্চে কাজ করছে। তার সঙ্গে অঞ্জলি চক্রবর্তী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল আর তারা দুজনে মিলে একদিন কোনো একটি মঞ্চের মালিক হবে—এই সিদ্ধান্তও স্থির হয়েই ছিল। মানুষটা বেপরোয়া। কিন্তু তার ওই বেপরোয়া দিকটাই অঞ্জলির ভালো লাগত। অন্ধ সরল বিশ্বাসে রোজগারের বহু টাকা ওই লোকের হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে দুজনার নামে সেই টাকা জমা পড়েছেও ঠিকই। ভবিষ্যৎ মঞ্চের মূলধন। লোকটা হাসত আর বলত তা না—আসল মূলধন তুমি। এই মূলধন দখলদারির ব্যাপারেও তেমনি বেপরোয়া এই লোক।

...একদিন আচমকা প্রকাশ পেল সে বিবাহিত। চারটি সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী বছরের পর বছর দেশেই পড়ে আছে। নিরুপায় হয়েই শেষপর্যন্ত সেই স্ত্রী মঞ্চের মালিকের শরণাপন্ন হয়েছে—তাঁকে চিঠি লিখেছে। মালিক যথাযথ যাচাই করে জেনেছেন চিঠির এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

ঠাণ্ডা কঠিন মুখে অঞ্জলি চক্রবর্তী তার টাকা ফেরত চেয়েছে। কিন্তু জবাবে সেই লোক হাসি মুখে আশ্বাস দিয়েছে তাকে নিয়েই সে ঘর বাঁধবে—আগের স্ত্রীকে ডিভোর্স করবে।

যা দিয়েছিল তার একটি কপর্দকও ফিরে পায়নি। কারণ মঞ্চের মালিককে অঞ্জলি শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল এই মঞ্চে হয় সে থাকবে নয়তো ওই লোক থাকবে—দুজনের এক সঙ্গে জায়গা হবে না। মালিক ওই লোককেই জবাব দিয়েছেন।

রাত তখন সাড়ে আটটা। অঞ্জলি উঠল। প্রস্তুত হবার সময় হয়েছে। তার মন স্থির। যাবে। গেলে নতুন করে খুব বড় ক্ষতির সম্ভাবনা আর কিছু নেই। ক্রমশ একটু আগ্রহ বোধ করছে বরং। এ পর্যন্ত দেবেশ মজুমদারের আচরণ কিছুটা স্বতন্ত্রই বটে। বয়েস পঞ্চাশ শুনেছে। তা নিয়েও মাথা ঘামায় না। পুরুষের ওই বয়েসটাই বরং বিশ্বাসযোগ্য। ...বিধু সরকারের মুখে অঢেল বিত্তের মানুষটার যে পরিচয় শুনেছে তার সবটুকু সত্যি হলে যাচাইয়ের আগে বাতিলের প্রশ্ন ওঠে না। সত্যিকারের কোনো পুরুষের সঙ্গে তার বোঝাপড়া এখনো হয়নি। প্রয়োজনে তাকে পতঙ্গের মতো দগ্ধ করেই জীবনের এতগুলো খেসারতের জবাব সে দিতে পারবে। পুরুষ জাতটার কাছে তার কিছু প্রাপ্য আছে।

স্বল্প প্রসাধন আর প্রায় সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন বেশবাসে অভ্যস্ত সে। এটুকুই তার ব্যক্তিত্বের প্রধান মাধুর্য এ-সে নিজেও জানে। প্রস্তুত হতে খুব একটা সময় লাগল না।

দোতলায় এসে কোণের ঘরের পুরু শৌখিন পর্দা সরিয়ে বিধু সরকার আর একবার গলা বাড়ালেন। শয্যার ডবল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দেবেশ মজুমদার একটা বিলিতি ট্রেড জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখে বাড়তি প্রত্যাশার একটা আঁচড়ও চোখে পড়ল না তাঁর। মালিকের এই চিরকালের স্থিতধী মূর্তিটি বরাবর পছন্দ। এই মূর্তিই তাঁর চোখে পুরুষকারের প্রতীক।

...এই ঘরে রমণীব পদার্পণ আরো ঘটছে। দু মাস চার মাস ছ মাসে একবার। বড জোর দুবার। এ-যেন প্রাকৃতিক বিধানের অতি তুচ্ছ অথচ স্বাভাবিক অঙ্গ একটা। তার বেশি কিছুই নয়। তবু আজ একটু ভাবান্তর দেখবেন আশা করেছিলেন হয়তো বিধু সরকার। কারণ যে রমণীটি আসছে এই রাতে তার জন্য সাহেব বিরাট একটা পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছেন। কিন্তু আজও ওই পুরুষোচিত নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে এতটুকু আতিশয্যের ফাটল চোখে পড়ল না।

নীচে নেমে এলেন। খানিক বাদেই বাড়ির সব থেকে বড় বিলিতি গাড়িটা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াল।

অঞ্জলি চক্রবর্তী গাড়ি থেকে নামল। হাসি মুখে দাদার অভ্যার্থনায় বিধু সরকার তাকে দোতলায় নিয়ে চলল। অঞ্জলি চক্রবর্তীরও ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

চারদিন আগের এই মেয়ের সেই প্রথম পদার্পণে বিধু সরকারের মনে হয়েছিল এই সাদাসিধে বেশবাশে মেয়েটাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে বটে তবু আর একটু চকচকে বেশ বিন্যাস করে এলেই ভালো হত।

দোতলার কোণের ঘরের পর্দা ঠেলে তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দেবেশ মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন একটু। হাতের জার্নাল পাশে সরিয়ে রেখে সৌম্য স্মিত মুখে তাকালেন।

দুহাত বুকের কাছে জুড়ে অঞ্জলি সপ্রতিভ মুঁখে নমস্কার জানালো। জবাবে তেমনি

হাসিমুখে সামান্য মাথা নাড়লেন দেবেশ মজুমদার। এটুকুই তাঁর অভ্যর্থনার রীতি।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বিধু সরকার ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঈষৎ তুষ্ট মুখে দেবেশ মজুমদার অঞ্জলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। ভালো লাগছে। বললেন, আজ দশ এগারো বছর হয়ে গেল তুমি খুব চেনা আমার। তোমার অভিনয় ভালো লাগে। সামনের নরম গদিমোড়া সোফাটা দেখিয়ে দিলেন, বোসো—।

হঠাৎ কিরকম যেন অস্বস্তি বোধ করছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। ঠিক বুঝছে না। সামনের সোফায় এসে বসল। মুখ তুলে তাকালো। অস্বস্তিটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

মৃদু হেসে দেবেশ মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, থিয়েটারের কাজ ঠিক ঠিক এগুচ্ছে?

অঞ্জলির কালো দুটো চোখের তারা স্থির তাঁর মুখের ওপর। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

—কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে না?

আবারও সামান্য মাথা নেড়েছে। তাঁর মুখের ওপর অপলক দুটো চোখ কি যেন খুঁজছে।

দেবেশ মজুমদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সামনের মাসের গোড়া থেকেই শুরু করা যাবে?

এবারে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অঞ্জলি চক্রবর্তী। চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। চেয়েই আছে। চোখের কালো তারার শূন্যতা ঠেলে সে যেন কোথায় কোন্ দূরে পাড়ি দিতে চাইছে।

অস্বাভাবিক লাগছে একটু দেবেশ মজুমদারেরও। হেসেই বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে ভালো করে দেখব এ অনেক দিনের ইচ্ছে আমার—কিন্তু কি ব্যাপার, উল্টে তুমিই আমাকে এত অবাক হয়ে দেখছ কি?

জবাবে অঞ্জলি চক্রবর্তী আচমকা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন চেয়ার ঠেলে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। সমস্ত চোখে মুখে একটা আর্ত ত্রাস। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সামলাবার চেষ্টায় ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল বারকয়েক। তারপর একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে এসেও ছুটে পালাবার দিশেহারা আকুতি! নীচে নামল। সামনে বিস্মিত বিধু সরকার। তার পাশ কাটিয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতোই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। গাড়ির জন্য দাঁড়াবার ধৈর্য নেই। কোনরকমে ওই ফটক পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যেতে পারলে বাঁচে যেন।

...চার দিনের দিন এই সকালে শুকনো বিস্মৃত মুখে থিয়েটার ম্যানেজার আর আরো জনাকতক বাড়িতে এলো অঞ্জলির সঙ্গে দেখা করতে। দেখা পেয়েই ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার? অঞ্জলি ফিরে জিজ্ঞাসা করল। তখনো থমথমে লালচে মুখ।

—থিয়েটার কি সেই বন্ধই থেকে গেল নাকি?

—কে বলল বন্ধ থাকল? গলার স্বর চাপা তীক্ষ্ণ।

—সেক্রেটারি বিধু সরকার, গত সন্ধ্যায় দেখা করতে গেছলাম তিনি বললেন। বললেন আপনাদের থিয়েটারের বারোটা বেজে গেল। ...তুমি নাকি দেবেশ মজুমদারকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাঁর বাড়ি থেকে চলে এসেছ?

গলার স্বর ঈষৎ অসহিষ্ণু অঞ্জলি চক্রবর্তীর। দেবেশ মজুমদার নিজে আপনাদের কি বলেছেন?

বুড়ো ম্যানেজার বললেন, না তাঁর দেখা আমরা পাব কি করে!

অঞ্জলি ভাবল একটু। তেমনি গম্ভীর। তেমনি লালচে মুখ। বলল, আমি কাউকে অপমান করিনি। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে কাজে এগোন, থিয়েটার ঠিক দিনেই শুরু হবে।

ম্যানেজার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে মালিকের কথা হয়েছে কিছু?

গলার স্বর আরো অসহিষ্ণু অঞ্জলির। বললাম তো সব ঠিক আছে, আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যান।

তারা চলে যেতে অঞ্জলি ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। ওধারে বিধু সরকার। বলল, আপনার সাহেবকে বলবেন আমি জানি আমার কিছু কৈফিয়ৎ দাখিল করার আছে। তাঁকে জানাবেন আজ রাত্রে আগের দিনের ওই সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ...না কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমি যাচ্ছি বলে দেবেন...না গাড়ি পাঠানোরও দরকার নেই।

রিসিভাব নামিয়ে রাখল।

ওদিকে হন্তদন্ত হয়ে বিধু সরকার ছুটলেন তাঁর মনিবের কাছে। সমাচার শুনে দেবেশ মজুমদার ভাবলেন দুই এক মুহূর্ত। বললেন, ঠিক আছে।

রাত সেই সাড়ে নটা।

বিধু সরকারেব দুচোখে ঝকমকে লালের বিভ্রম ছড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দোতলায় উঠেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। দেবেশ মজুমদার তাঁর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বেশ-বাসের সেই লালের ধাক্কা তাঁর চোখেও লেগেছে। তারপর মনে মনে হেসেছেন তিনি। আগের দিনের ওই আচরণ আর আজ নিজে থেকেই এই বেশে পুনরাগমনের মধ্যে অভিনয় চাতুর্যের চড়া ব্যাপার কিছু আছে কিনা একটু বাদেই বুঝতে পারবেন। নিজেই শৌখিন পর্দাটা টেনে ধরেছেন, অভিসারিকা ভিতরে ঢুকেছে। পোশাকের আভায় সম্ভবত সুন্দর মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে। চোখ ফেরানো সহজ নয়।

দেবেশ মজুমদার শয্যার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। তাকেও বললেন, বসো।

অঞ্জলি বসল। শুধু লালচে নয় সমস্ত চোখে মুখে একটা অদ্ভুত সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছে যেন। না, এরকম মূর্তি দেবেশ মজুমদার আগের দিন দেখেন নি।

সোফায় বসে অঞ্জলি সোজা তাকালো তাঁর দিকে। বলল, তুমি এখন বেশ ভালই আছ তাহলে?

তুমি! এ আবার কোন্ পর্যায়ের অভিনয় চাতুর্য! চোখে লালের ঘোর লাগছে একটু তাঁরও, কিন্তু তা বলে এই গোছের আচরণও প্রত্যাশিত নয়। জবাব দিলেন এখন কিরকম, আমি তো বরাবরই ভালো আছি।

অঞ্জলি বলল, বরাবর খুব ভালো ছিলে না। আজও পলক পড়ছে না চোখে, কিন্তু আজকের চাউনি স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ। বেশ স্পষ্ট স্বরেই অঞ্জলি আবার বলল, শোনো আমার সেদিনের ব্যবহারে তুমি খুব অবাক হয়েছ জানি, অবাক হবারই কথা। —আট বছরের একটা মেয়েকে হঠাৎ মনে পড়ে গেছল আমার। তার কথা শুনলে আর অবাক লাগবে না তোমার, রাগও থাকবে না।

নড়েচড়ে বসলেন দেবেশ মজুমদার। অভিনয় দেখছেন কিনা জানেন না কিন্তু এই দৃপ্ত লালিমা ছড়ানো ভঙ্গীটুকু ভালো লাগছে।

অঞ্জলি বলল, আট বছরের সেই মেয়েটা ফুটফুটে সুন্দর ছিল দেখতে। পাড়ার সকলে জলি বলে ডাকত। গরিবের সেই মেয়েটা বস্তিঘরে থাকত কিন্তু পাড়ার গরিব বড়লোক সকলেই খুব ভালবাসত তাকে। উল্টোদিকে প্রাসাদের মতো মস্ত বাড়ি একটা, অত বড়লোক হলেও মেয়েটা সেই বাড়িতেও হরদম যাতায়াত করত, সেখানে তার আদর খুব। সেই বড়লোক বাড়ির এক ছেলের নাম খোকাবাবু তাঁর পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস তখন—তিনিও মেয়েটাকে খুব ভালবাসতেন, কাছে পেলে আদর করতেন লজেন্স বিস্কুট খেতে দিতেন—

চোখে চোখ রেখে একটু থমকেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। হঠাৎ বিমূঢ় মুখ দেবেশ মজুমদারের। সোজা হয়ে বসে ভালো করে তাকালেন।

—খুব ধর্ম-কর্মের বাড়ি সেটা। খোকাবাবুর ঠাকুরদা ঠাকুরমা পূজো আর্চা যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতেন। তাঁর বাবা-মাও ধার্মিক। খোকাবাবু এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন কিন্তু কোনো কাজ করতে পারছেন না—মাথায় যখন তখন সাংঘাতিক যন্ত্রণা হয়—বড় বড় ডাক্তার বদ্যিরা আসছে যাচ্ছে। কিছু হচ্ছে না। তাঁর ঠাকুরদা ঠাকুরমার গুরুদেব বিধান দিলেন কুমারী পূজা করতে হবে খোকাবাবুকে, কুমারী গৌরী পূজা—তাতে সবদিকে মঙ্গল হবে।

সোজা হয়ে বসেছেন দেবেশ মজুমদার। বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছেন অঞ্জলির দিকে।

সে বলে গেল, বড়বাড়ির সেই কুমারী পূজার মেয়ে ঠিক হল—পাড়ার ওই জলি মেয়েটাই। মেয়েটা অবাক যেমন খুশিও তেমন—তাকে পূজো করা হবে, শাড়ি পরিয়ে সাজানো হবে—কত কি খেতে দেওয়া হবে। খোকাবাবুর ঠাকুরদা ঠাকুরমা তিনদিন ধরে মেয়েটাকে বোঝালেন নিজেকে সত্যিকারের গৌরী মা বলে ভাবতে হবে। তাঁদের নাতির সমস্ত অমঙ্গল দূর হওয়ার মতো করে আশীর্বাদ করতে হবে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে দেবেশ মজুমদারের। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়েই আছেন।

আর এক নজর তাকে দেখে নিয়ে অঞ্জলি বলে চলেছে, পূজোর দিন কত আদরে জলিকে বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। গুরুর কথা মতো খোকাবাবু নিজে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন। মুছে দিলেন। তাঁর মা পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। তারপর পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে ঝকমকে লাল একখানা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিলেন। মেয়েটা তারপর পূজোর আসনে বসল। গুরুদেব অনেকক্ষণ ধরে খোকাবাবুকে পূজো করলেন তারপর মেয়েটার পায়ে কপাল ঠেকিয়ে খুব ভালো করে প্রণাম করতে বললেন।

খোকাবাবু তাই করলেন।

...আর আশ্চর্য, মেয়েটা সেই মুহূর্তে যেন তাঁর কুমারী মা হয়ে গেল, তাঁর গৌরী মা হয়ে গেল। একমনে সত্যি সে মনে মনে বলতে লাগল, তোমার খুব ভালো হবে—খুব-খুব ভালো হবে তোমার—তোমার কক্ষনো কোনো অমঙ্গল হবে না। কোন অমঙ্গল হতে পারে না—

সমস্ত কপাল ঘেমে উঠেছে দেবেশ মজুমদারের। এ কোন্ দৃপ্ত রমণীমূর্তি দেখছেন তিনি চোখের সামনে জানেন না। ঘরের সমস্ত আলোও যে সেই আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

অঞ্জলি চক্রবর্তী সোফা ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। অপলক দু চোখ দেবেশ মজুমদারের ঘর্মাক্ত মুখের ওপর স্থির তখনো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নীচে নেমে এলো। লালের আভা ছড়িয়ে হতচকিত বিধু সরকারের পাশ কাটিয়ে বাইরে এলো। নিজের গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়িটা গেট পেরুতেই ছুটে দোতলায় উঠে এসেছেন বিধু সরকার। আজও আবার কি বিভ্রাট হল! বুকের তলায় কাঁপুনি শুরু হযেছে তাঁর। কিন্তু ঘরে ঢুকে স্তব্ধ নির্বাক তিনিও।

...পুরুষকারপ্রতীক দেবেশ মজুমদার শয্যায় বসে আছেন স্থাণুর মতো। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে একটু। এই ঠাণ্ডায়ও দরদর করে ঘামছেন তিনি।

সদয় সংহার

আজ ষোল বছর হল প্রমীলা শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যাযের ঘরে এসেছে। এই ষোল বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মত-বিরোধ হয়নি, প্রমীলা উপাধ্যায় আজও সেটা হতে দেবে না। তার হাতে এমন কিছু জিনিস এসেছে যেটা পাওয়ার পর থেকে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন সির-সির করে পা বেয়ে নামছে, শুধু নামছেই। তবু না। কিছুতে না।

উঠে পায়ে পায়ে বারান্দায় এল সামনের ওই ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। এটা ওদের স্টাডি। এ-ঘরের বাতাস অনেক বিতর্ক আর যুক্তির জালে ভরাট। কিন্তু ক দিন প্রমীলা উপাধ্যায় এ-ঘরে আসেনি। স্বামীর ডাকাডাকি সত্ত্বেও এড়িয়ে চলেছে।

শুকনো কঠিন মুখে প্রমীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর আস্তে আস্তে ভারী পর্দাটা সরালো একটু। ...ওদিকে ফিরে বসে লিখছে মানুষটা। নিবিষ্টচিত্ত। গোছা গোছা লেখা কাগজ পাশে পড়ে আছে। কি লেখা, বহু দৃষ্টান্তসহ কিসের যুক্তি-জাল ছড়ানো হয়েছে ওগুলোতে, প্রমীলা জানে। এই বিষয়বস্তুটির ওপর আজই সন্ধ্যায় একটা ঘরোয়া মিটিং আছে। বেশ জনাকতক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন আলোচনার আসরে। বিশেষ করে ডক্টর খোসলা তো সবার আগে ছুটে আসবে হয়তো। আইন সভার সে একজন বিশেষজ্ঞ সভ্য। এই পরিবারের সহৃদয় বন্ধু। তারই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সব থেকে বেশি। শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায় সমস্ত বিষয়টা যুৎসই ভাবে সাজিয়ে দিতে পারলে এবং আজকের মিটিংয়ের আলোচনায় সেটা প্রণিধানযোগ্য ভাবে উত্তীর্ণ হলে অ্যাসেমবলিতে এ-ব্যাপার নিয়ে সে একটা ঝড় তুলবে, সন্দেহ নেই। সকলকে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ করে শুনতে হবে—বিল শেষ পর্যন্ত এ-দেশে অনুমোদন লাভ করবে কি করবে না, ডক্টর খোসলা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সংস্কারান্ধ এই দেশের মানুষের ওপর খুব একটা আস্থা তার নেই।

...ঠিক এই কারণেই হয়তো ঘরের মানুষটির সঙ্গে ওই লোকের এমন অন্তরঙ্গ মিতালি। শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায় এমন এক-একটা অভিনব ব্যাপার ভাবতে পারে যা সহস্রসাধারণের মাথায়ও আসে না, এমন চমকপ্রদ কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে ভদ্রলোক—যা শুনলে অনেকে যথার্থই চমকে উঠবে। আজ এত বছর ধরে প্রমীলা উপাধ্যায় তাই দেখে আসছে। গুণীজনের আর সত্যিকারের মগজঅলা মানুষের সপ্রশংস স্বীকৃতি পেলেই স্বামীটি খুশি, এর বেশি কিছু চায় না।

স্বামীর সমস্ত ব্যাপারে প্রমীলা যোগ্য দোসর। প্রমীলার বয়েস এখন চল্লিশ। শ্রীবিষ্ণু ছেচল্লিশ। কিন্তু ষোল বছরের ছেলেটির মতোই সে সর্বব্যাপারে স্ত্রীটির ওপর নির্ভরশীল। প্রমীলার সুচিন্তিত অনুমোদন পেলে তবে ভদ্রলোক চোখ কান বুজে যে-কোন অগ্নিপরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে পারে। প্রমীলা বড় একটা নিরাশ করে না তাকে। প্রতিভার স্বীকৃতি সবার আগে তার কাছ থেকেই মেলে। প্রমীলা তার কথা মন দিয়ে শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে, তারপর সে-ও তার সমর্থনেই সংগতি এবং যুক্তি খুঁজে বার করে। পাকা-পোক্ত নজির সংগ্রহ করে। স্ট্যাটিস্টিক্স-এ স্কলার প্রমীলা উপাধ্যায় এ ব্যাপারে করিতকর্মা মেয়ে। দিল্লীর এক মহিলা কলেজের এ বিষয়ের নামী প্রোফেসারও সে। সুবক্তা। এ-দিক থেকেও স্বামীর মস্ত সহায়। শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায় প্লানিং ডিভিশনের মস্ত অফিসার, তার মাথা খেলে, কলম চলে—কিন্তু জিভ তেমন নড়ে না। সীরিয়াস হলে বা উত্তেজনা বাড়লে কথার তোড় আরো বেশি ব্যাহত হয়। তোৎলামির চিকিৎসাও কম করেনি এ-যাবৎ, কিন্তু ফল বলতে গেলে কিছুই হয়নি। অতএব বে-সরকারী

সভায় বা আলোচনায় প্রমীলা উপাধ্যায় তার যোগ্যতম সেক্রেটারি। প্রমীলার মিষ্টি অথচ স্পষ্ট বাচনভঙ্গি চোখ চেয়ে দেখার মত, কান পেতে শোনার মত।

চেষ্টা করেও মুখের টান-ধরা রেখাগুলো নরম করা গেল না, প্রমীলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। টেবিলের কাছে শ্রীবিষ্ণুর পাশে এসে দাঁড়াল। মানুষটার হুঁশ নেই, জানতেও পারল না। প্রমীলার এই খরখরে মুখের দিকে তাকালে তার ঘাবড়ে যাওয়ার কথা।

পাশ থেকে লেখা কাগজগুলো টেনে নিল প্রমীলা উপাধ্যায়। পাতার নম্বর মিলিয়ে কাগজগুলো গোছগাছ করতে লাগল। এই-বার তার উপস্থিতি টের পেল শ্রীবিষ্ণু। মুখ না তুলেই বলল, এই স্লিপটা শেষ হলেই আজকের মত শেষ—ওদেরও আসার সময় হল বোধহয়।

—হ্যাঁ।

ঈষৎ বিরক্তির সুরে শ্রীবিষ্ণু বলল, পাঁচ দিন ধরে খেটে-খুটে এবারে যা দাঁড় করালাম তুমি তো ভাল করে পড়েও দেখলে না, আজ না নাজেহাল হতে হয় আমাকে।

পাতার নম্বর মিলিয়ে প্রমীলা বলল, পড়েছি। আজকেরটাই বাকি।

শ্রীবিষ্ণুর লেখা থেমে গেল। উৎসুক, খুশি। —কখন পড়লে?

—দুপুরে। তুমি যখন আপিসে। সদ্য লেখা কাগজে প্রমীলার মুখ আড়াল।

—দুপুরে! কলেজে যাওনি?

প্রমীলা পড়া শুরু করেছে। জবাব দিল না।

হৃষ্টচিত্তে শ্রীবিষ্ণু রচনার সমাপ্তির দিকে মন দিল আবার। কিন্তু আবারও কি মনে পড়ল তার। —খবরের কাগজের গ্যালপ পোলের ওপিনিয়ান আর চিঠিপত্রগুলো ঠিক ঠিক সাজানো হয়েছে?

—হুঁ।

—বাঃ! তুমি কখন যে কি করে রাখো আমি টেরই পাই না। ক'দিন তোমাকে কাছে না পেয়ে আমি ভাবছিলাম কি হল।

লেখা কাগজে মুখ আরো ভাল করে আড়াল করল প্রমীলা। এখন গলার স্বর বিশ্বাসঘাতকতা না করে। ঠাট্টার সুরটাই ফুটল। —আমার কথা তোমার ভাবার সময় হয় তাহলে।

হালকা একটা শিস দিয়ে উঠল শ্রীবিষ্ণু, তারপরেই লেখায় মন দিল।

কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা দেখছে প্রমীলা। তবু চেষ্টা করছে পড়ে নিতে।

পড়ছেও। কিন্তু মাথায় যেন কিছু ঢুকছে না, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শেষ করল। বোর্ড ফাইলটা টেনে নিয়ে আগের লেখার পরে সেগুলো সাজিয়ে রাখল। শ্রীবিষ্ণু তখন সমস্ত মন ঢেলে শেষের আঁচড় টানছে।

প্রমীলা চুপচাপ কয়েক নিমেষ তার দিকে চেয়ে রইল আবার। চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে। নিঃশব্দে ফাইলটা পাশে রেখে দরজার দিকে এগুলো।

—বা রে, কি-রকম হল না হল কিছু বলে গেলে না?

যথাসম্ভব হাল্কা করেই জবাবটা দিতে চেষ্টা করল প্রমীলা। বলল, সেটা তুমি খুব ভালই জানো।

কলম না তুলে শ্রীবিষ্ণু হেসে উঠল একটু। —এই পেপারটা পাবলিশড্ হলে খুব সেনসেশ্যনাল ব্যাপার হবে বলছ?

—হবে। কিন্তু আইন সভায় তোলার আগে তোমার খোসলা এটা পাবলিশ করতে দেবে?

—এখন না দিক, পরে তো দেবে।

প্রমীলা বেরিয়ে এল। রাগ নিজের ওপরেই হচ্ছে। কেন সহজ হতে পারছে না? স্বাভাবিক পাঁচটা কথাও বলতে পারছে না? বৃহৎ স্বার্থ যদি শুভ হয়, তার কাছে ওর একার ব্যথা একার বিপর্যয় কণার কণা। সেটা উল্টে যাবার কোন কারণ ঘটেছে?

...একেবারে যেন আকাশ থেকে হঠাৎই একটা বিপর্যয় নেমে এসেছে বটে। পায়ে পায়ে প্রমীলা নিজের ঘরে এল। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেকেই দেখছে। বয়েস চল্লিশ। কিন্তু চল্লিশ কেউ বলে না। শাড়ির আঁচলটা সরাল। ব্লাউজ আর অন্তর্বাসের আড়াল ঘোচাল। নগ্ন পুষ্ট বক্ষ। এই বুকের দিকে এখনো কি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির চোরা কটাক্ষ চোখে পড়ে না?

...বাঁ দিকের স্তনের ঠিক মাঝামাঝি একটা জায়গা শক্ত হয়ে একটু উঁচিয়ে আছে। অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছিল। এত দিন ব্যথা-বেদনার নাম-গন্ধও ছিল না, তাই তেমন গা করে নি। কিন্তু ইদানীং কেন একটু অস্বস্তি বোধ কবছিল, আব জায়গাটা একটু টন-টনও কবে। তবু মনের কোণে বিপর্যয়ের আভাস মাত্র ছিল না। নিজেই পরিবারের বন্ধু ডাক্তার দাগার কাছে গেছে। এ-সব ব্যাপাবে যা করার নিজেই করে, স্বামীকে বলেও না। সামান্য একটু কিছু হলে স্বামীটিই বরং অসহায় শিশুর মত স্ত্রীর মুখাপেক্ষী।

ডাক্তার দাগাকেও তেমন বিচলিত মনে হয নি, তবে পরীক্ষার পর একটু গম্ভীব দেখা গেছল বটে তাকে। মুখে বলেছে, সীস্ট্ গোছের কিছু হতে পারে, মাইনর অপারেশনের ব্যাপার, তবু সিওর হওয়া দরকাব—তোমার আগে দেখানো উচিত ছিল ম্যাডাম।

প্রমীলার ধারণা ডাক্তার দাগা ডাকাত গোছের পাজির শিরোমণি। এ-সব জায়গা আগে দেখানো যেন কত সহজ। হাত লাগিয়ে বেশ করে পরীক্ষা করছিল যখন প্রমীলার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখনো ধারণা, ইচ্ছে করেই বেশিক্ষণ ধরে পরীক্ষার প্রহসন চলেছে।

দাগার সিওর হওয়ার ধকলে পরে বেশ একটু যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। হাসপাতালে কোন একজন স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে গেছে তাকে। তার মন্তব্য শুনেছে 'বায়পসি' করা দরকার। ফলে সামান্য একটু কাটা ছেঁড়া হয়েছে ওই জায়গায়। বায়পসির নামে মুখ শুকিয়েছিল প্রমীলার। দাগা আশ্বাস দিয়েছে, নার্ভাস হয়ো না ম্যাডাম, জাস্ট

এ রুটিন অ্যাফেয়ার।

না, তখনো প্রমীলা স্বামীটিকে কিছু বলার দরকার বোধ করেনি। বলা না বলা সমান, মাঝখান থেকে ব্যস্ত হয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দেবে।

কিন্তু ভিতরটা উতলাই ছিল একটু। আজই সকালে সেই স্পেশ্যালিস্টের কাছে চলে গেছে। দাগার শরণাপন্ন হয় নি—কারণ খারাপ কিছু পেলে সে বেমালুম চেপে যেতে ওস্তাদ। চিকিৎসা যা করার করবে, কিন্তু মুখে একটা দিয়ে আর একটা বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে।

স্পেশ্যালিস্ট দুঃখ প্রকাশ করেছে, আশ্বাস দিয়ে নার্ভাস হতে বারণ করেছে। প্রমীলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল তার দিকে। হাতে বায়পসির রিপোর্ট। অবধারিত মৃত্যুর পরোয়ানা কি?

অন্তর্বাস আর ব্লাউসের বোতাম এঁটে শাড়ির আঁচল কাঁধে তুলে নিল। ...দুনিয়ায় এমন বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটে কি করে? যার স্বামী এমন একটা চমকপ্রদ পরিকল্পনার উদ্ভাবক তারই ঘরে এমন কাণ্ড ঘটে কি করে? ঈশ্বরের কাজ? কৌতুক? ঈশ্বর আছে কি নেই প্রমীলা জানে না। মাথাও ঘামায নি কোনদিন। কিন্তু এমন এক আশ্চর্য মর্মান্তিক যোগাযোগের নাম কি দেবে সে?

স্টাডিরুমের বাতাস তপ্ত। আলোচনার আসবে আইন সভার ডক্টর খোসলা তর্ক করতে জানে, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তারই সব থেকে বেশি। কিন্তু বিপক্ষের ভূমিকায় আর যে-সব অতিথি এখানে উপস্থিত, গুণীজন হিসেবে তারাও ফেলনা নয় কেউ। কেউ দার্শনিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ অর্থনীতিবিদ—এ ছাড়া শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায়ের সতীর্থ পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞও তিন-চারজন আছে।

আলোচনার বিষয়বস্তু, সদয় সংহারের নীতিগত এবং আইনগত অনুমোদন লাভের দাবি। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার স্বপক্ষেই অনেক দিন ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায়। নিজের বক্তব্য পেশ করে ভদ্রলোক বিষয়টি আলোচনার মুখে ফেলে দিয়েছে।

আমাদের দেশের মানসিকতা সদয সংহার সম্ভব নয়, আলোচনায় এই যুক্তিটাই জোরাল হয়ে উঠছিল। এক খোসলা ছাড়া আর সকলেই নানা জটিল প্রশ্নবাণে শ্রীবিষ্ণুকে জর্জরিত করে তুলেছিল। কিন্তু ভদ্রলোক একসঙ্গে বেশি কথা বলতে পারে না। কথা আটকে খেই হারিয়ে ফেলছিল। যতটা সম্ভব জোরাল জবাব দিচ্ছিল ডক্টর খোসলা। শ্রীবিষ্ণু উপাধ্যায় ঈষৎ বিস্ময়ে বার বার স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল—এমন একটা সময়ে সে চুপচাপ বসে কেন ভেবে পাচ্ছিল না।

তার নীরব সকাতর আবেদনে প্রমীলার হুঁশ ফিরল যেন এক সময়ে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সে। স্বামীর লেখা ফাইলটা নিজের কাছে টেনে নিল। অন্যান্য তথ্যের ফাইল ক'টাও। তারপর এ-দেশের মোট অথর্ব পঙ্গু অতি জরাজর্জর জীবন্মৃত মানুষদের স্ট্যাটিসটিকস দাখিল করে, খবরের কাগজের গ্যালপ পোলে বিদগ্ধ-জনের

মতামত পেশ করে, বিভিন্ন দেশের নানা নজির দেখিয়ে, এবং মাঝে মাঝে স্বামীর লেখার উদ্ধৃতি তুলে ধরে নাতিদীর্ঘ এমন একটা বক্তৃতা সু-সম্পন্ন করল প্রমীলা উপাধ্যায় যা কান পেতে শোনার মতো, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো, আর মাথা দিয়ে বিশ্লেষণ করার মতো। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আর আকুতি ঢেলে যেন এই কাজটি করে উঠল সে। তার বক্তব্য, এই দেশেই সব থেকে বেশি সদয় সংহারের স্বাগত লাভ করা উচিত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্ধ পঙ্গু অথর্ব চির-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ মৃত্যুর চতুর্গুণ যন্ত্রণা নিয়ে অস্তিত্বের বোঝা টেনে চলেছে। কিন্তু একদিকে আত্মহত্যা যেমন ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক, আইনবিরুদ্ধ, অন্যদিকে তার সুযোগ সুবিধেও অতি পরিমিত। এক দশক আগে ব্রিটেনে এই আইনের খসড়া উঠেছিল কিন্তু অনুমোদন মেলে নি। সেখানেও এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, কারণ দেখা গেছে চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে সামান্য সরকারী কৃপায় জীবন টেনে চলেছে এমন জবাজর্জব বেকার বৃদ্ধের সংখ্যাই কয়েক লক্ষ। এ ছাড়া শারীরিক কারণে পঙ্গু এবং অশক্তের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে তাদের বেশির ভাগই জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। ব্রিটেনের তুলনায় আমাদের চেহারা দশগুণ ভয়াবহ। এমন চিত্র পৃথিবীর এই জন সংকটের যুগে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তাই, যে জীবন অনায়াসে যাপন করা যাচ্ছে না, যে জীবন নিজের বা অপরের কাছে ব্যর্থ, যে জীবন নিজের এবং পরিবারবর্গের কাছে শুধু দুর্বিষহ বোঝা মাত্র, সেই জীবনকে জোর করে টিকিয়ে রেখে লাভ কি? একসময় গণপরিষদের সংবিধান রচনা কালে আত্মহত্যার মৌলিক অধিকার দাবি করা হয়েছিল। ছাব্বিশ বছরের স্বাধীনতার পরেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবন-বিড়ম্বিত মানুষদের সদয় সংহারের পথে স্বস্তি দেবার দাবি সোচ্চার হবার সময় কি আসে নি? যাদের কাছে জীবন তার সমস্ত রং ও রস হারিয়ে শুধুই দুর্দশার বোঝা, যারা একান্ত ইচ্ছুক, বেদনাদায়ক আত্মহত্যার পথে নয়—ঘুমের মধ্যে এমন কোন ওষুধ যদি প্রয়োগ করা হয় যা যন্ত্রণাহীন চিরনিদ্রার সহায়ক হবে—তাহলে আমরা তাদের অভিশাপ পাব না আশীর্বাদ লাভ করব? শান্তি স্বস্তি স্বাচ্ছন্দ্য বা সুস্থ নীরোগ জীবনের সুযোগ যারা পেল না, তাদের যন্ত্রণাশূন্য মৃত্যুর দাবি আমরা নাকচ করব কোন্ অধিকারে?

ঘরের বাতাসও স্তব্ধ যেন। প্রতিটি মানুষ নির্বাক। শেষের দিকে প্রমীলার সমস্ত মুখ আর চোখ যেন জ্বল জ্বল করছিল, গলার স্বরও কাঁপছিল একটু একটু।

ডক্টর খোসলাই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করল। সে বলে উঠল, ম্যাডামের এই ভাষণ আমি আবার শুনব, টেপ করব, আর তারপর হাউস মাত করে দেব। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!

বিষয়টা সাড়া জাগানোর মত একটা ব্যাপার যে হতে পারে সে-ব্যাপারে সকলেই এর সায় দিয়েছে।

প্রমীলা উপাধ্যায় নিজের ঘরে শয্যায় বসে। স্তব্ধ কঠিন সমস্ত মুখ। চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে।

অতিথিদের একে একে বিদায় দিয়ে শ্রীবিষ্ণু অন্দরের দিকে পা বাড়াল। ঘরে ঢোকার মুখে বাধা পড়ল। ভিতরের বারান্দার ও-ধারের টেলিফোন বেজে উঠল। স্টাডি ছাড়া অন্দরেও একটা কানেকশন আছে। পরিতৃপ্ত হাসিমুখে শ্রীবিষ্ণু টেলিফোন ধরতে এগিয়ে গেল। আদরে সোহাগে স্ত্রীটিকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, এ-সময় টেলিফোন বিরক্তিকর।

টেলিফোন বাজার আওয়াজ প্রমীলারও কানে এসেছে। কেন যেন ভিতরটা আরও সজাগ আরো তীক্ষ্ণ কঠিন হয়ে উঠল তার। টেলিফোনে পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলার পরেই রিসিভারটা আছড়ে ফেলল শ্রীবিষ্ণু। এই পাঁচ-সাতটা মিনিটের মধ্যেই ঠিক তার মগজের মধ্যিখানে যেন আচমকা প্রচণ্ড মুগুরের ঘা পড়েছে একটা। টলতে টলতে ঘরে এসে দাঁড়াল। চোখে ঝাপসা দেখছে, রক্তশূন্য মুখ, বিস্ফারিত নেত্রে স্ত্রীর কঠিন স্তব্ধ মূর্তির দিকে চেয়ে আছে।

অস্ফুট ঠাণ্ডা স্বরে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার দাগার ফোন?

শ্রীবিষ্ণু জবাব দিল না, চেয়েই আছে। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল। খুব কাছে। প্রমীলার তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টি।

হঠাৎ ঝুঁকে উদভ্রান্তের মতো শাড়ির আঁচল সরিয়ে একটা অসহিষ্ণু হ্যাঁচকা টানে ভিতরের জামাসুদ্ধু ব্লাউসটা ছিঁড়ে দু'দিকে সরিয়ে দিল। বাধা দেবার সুযোগও না পেয়ে প্রমীলা বলে উঠল, আঃ, ঘরের দরজা খোলা!

শ্রীবিষ্ণুর কানেও গেল না। বায়পসির দরুন ঈষৎ ক্ষতজোড়া ফোলা জায়গাটা দেখতে লাগল। চেয়েই রইল। আবার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মূর্তি। প্রমীলার দৃষ্টি তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি কঠিন।

টলতে টলতে শ্রীবিষ্ণু সামনের টেবিলটার কাছে গেল। কাঁপা হাতে ড্রয়ার খুলল। হাতে বায়পসির রিপোর্ট। হাত কাঁপছে। পড়তে চেষ্টা করল। চোখে ঝাপসা দেখছে। রিপোর্ট ফেলে টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নিশ্চল কঠিন পাথরের মত বসে ছিল প্রমীলা উপাধ্যায়। কতক্ষণ কেটেছে জানে না। এক ঘণ্টা হতে পারে। তার বেশিও হতে পারে।

বাইরে বারান্দার কোণ থেকে বেশ বড় লাল আভা চোখে পড়ল একটা। সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল। তারপর নির্বাক আবার।

মাঝারি সাইজের ইলেকট্রিক হীটারে সদয় সংহারের ফাইলসুদ্ধু নিজের সমস্ত লেখা, গ্যালপ পোলের সমস্ত নথিপত্র আর তথ্যাদি পোড়াচ্ছে মানুষটা। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেল। আগুনের আভায় মুখখানা লাল দেখাচ্ছে। দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।

প্রমীলার শক্ত কঠিন মুখখানা নরম হতে লাগল। দেখতে দেখতে ওই মুখ কমনীয় হয়ে উঠল। অদ্ভুত এক প্রশান্তির স্পর্শ অনুভব করছে। চোখের কোণ দুটো তারও চিক চিক করছে।

এগিয়ে এসে পিছন থেকে একখানা বাহু ধরে টানল। —ওঠ, খুব হয়েছে।

ফাইল-পত্র সব দাউ-দাউ জ্বলছে। জলে ভেজা আরক্ত চোখে শ্রীবিষ্ণু ফিরে তাকাল।

প্রসন্ন কমনীয় ঝাঁঝে আবার তার বাহু ধরে টানল প্রমীলা। বলল, অত ঘাবড়াবার কি আছে, এসো না—

ভাদ্রের রবি

তেরো বছরের অবুঝ ছেলেটা ঘুরেফিরে এসে সেই একই বায়না নিয়ে হাজির হচ্ছে আর হিসেবে তন্ময় চিন্ময়বাবুর দুই ভুরুর মাঝে বিরক্তির খাঁজ পড়ছে। ছেলের সাতটা টাকা চাই, ওদের স্কুল থেকে ছোট ছেলেদের বাসে ডায়মণ্ডহারবার না কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। মাথাপিছু সাত টাকা চাঁদা। সকালে যাওয়া আর সেই সন্ধ্যায় ফেরা। গতকালই ছেলের টাকা আর পারমিশনের তাগিদে স্কুলের ওই মাস্টারগুলোর ওপর বেজায় চটেছিলেন চিন্ময় ধর। কদিন ধরেই ভেতরটা বিক্ষিপ্ত তাঁর, অদূর ভবিষ্যতে পায়ের নীচের নিরাপদ মাটিতে একটা ফাটল ধরার আশঙ্কা মনের তলায় ছায়ার মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর জ্যোতিষী-বন্ধুর মতে অবশ্য আশঙ্কাটা একেবারে অহেতুক এবং তুচ্ছ। যে-কোনো কারণে অথবা অকারণে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটলে নিজের ঠিকুজি নিয়ে বসার বাই চিন্ময়বাবুরও। তবে গোনাবাছার ব্যাপারে নিজের থেকে অপেশাদার জ্যোতিষী-বন্ধুটির ওপর ঢের বেশি আস্থা। তিনি সদ্য বর্তমানের আর অদূরভবিষ্যতের গোচর-ফলের হিসেব কষে রায় দিয়েছেন, সিংহ লগ্ন, নিজের ঘরে ভাদ্রের চড়া রবি, তার ওপর টানা একবছর থাকবে বৃহস্পতির সপ্তম দৃষ্টি, তোমার আবার মান খোয়াবার ভয়! আসলে চাঁদের ওপর বক্র শনির চোখ পড়ে আছে তাই যত আজগুবি ভাবনা—ও কিছু না।

এই ভাষ্যই শুনতে চেয়েছিলেন চিন্ময়বাবু এবং তখনকার মতো একটু আশ্বস্তও হয়েছিলেন। কিন্তু দুদিন না যেতে আবার সেই অস্বস্তির ছায়া। নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে ওটা, নিরিবিলি অবকাশের ফাঁকে হুট করে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে নড়ছে দুলছে আবার যুক্তির ঘা খেয়ে সেই নিভৃতেই পালাচ্ছে। এর মধ্যে ছেলের ওই বায়না। মাস্টারগুলোর যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত। ছেলেগুলোর পড়াশুনা নিয়ে মাথাব্যথা নেই এক-একটা হিড়িক তুলে দিলেই হল। এক গাড়ি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে যাবে সঙ্গে দুজন মাত্র মাস্টার। এর মধ্যে কোনটা পড়ে থাকবে, কোনটা হাড়গোড় ভাঙবে, কোনটা জলে ডুববে ঠিক নেই। বাড়ির একটা দুরন্ত ছেলেকে সামলাতেই কাহিল তাঁরা। তাছাড়া সাত টাকা যেন খোলামকুচি, ফতোয়া দিলেই হল।

শোনামাত্র চিন্ময়বাবু সাফ জবাব দিয়েছেন, যেতে হবে না।

মা-কে এড়িয়ে ছেলে বাবাকে ধরেছিল। তার বিবেচনায় বাবার থেকে মা ঢের

শক্ত মানুষ। বাবা এ-রকম মুখ করবে ভাবেনি। ফলে সেও ক্রুদ্ধ। —হবে না মানে! সব ছেলেরা যাচ্ছে—

—সব গেলেও তুই যাবি না!

না, তেরো বছরের ছেলেটা বাবার এরকম চিন্তাচ্ছন্ন বিরক্ত মুখ বেশি দেখেনি। এরপর মায়ের কাছেও ধন্না দিয়েছে। কিন্তু এক-কথা নিযে বার বার বিরক্ত করলে মা মুখে কিছু বলে না চডচাপড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু ছেলেও না-ছোড, কাল থেকে ঘুরেফিরে সেই বাবার কাছেই বায়না নিয়ে আসছে। তার চাই-ই সাতটা টাকা, ডায়মণ্ডহারবারে যাবেই যাবে।

সকাল থেকে একটা হিসেবে তন্ময় হয়ে আছেন চিন্ময়বাবু। দুদিন ছুটি নিযেছেন। আপিসের তাড়া নেই। দুটো ফুলস্ক্যাপ কাগজ হিসেবে ভরাট হয়ে গেল। তখনো হিসেবের কিনারায় পৌঁছুতে পারেননি।

বাবা, দাও না সাতটা টাকা!

সকালের মধ্যে বার চারেক হল এই নিয়ে। কিন্তু এবারে আর তাঁকে কিছু বলতে হল না। ভিতর থেকে মনোরমা এসে হাত আর কান ধরে ছেলেকে হিড়হিড় করে ও-ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর বড়সড় গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে চাপা গর্জন করে উঠলেন দেব আচ্ছা করে ঘা কতক বসিয়ে? বাবা আপিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেই হুঁশ পর্যন্ত নেই? ফের যদি ও-ঘর মাডাবি আমি আস্ত রাখব না বলে দিলাম!

মায়ের হাত ছাডিয়ে ছেলে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রাগের মাথায় চেঁচিয়ে ঘোষণা করল, যাবই আমি ডাযমণ্ডহারবার; তোমরা টাকা না দিলে অন্য ছেলেদের থেকে টাকা ধার করে নিয়ে যাব—যাব যাব যাব।

ছুটে পালালো।

এ-ঘরে চিন্ময়বাবুর হিসেবের কলম থেমে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠি-উঠি করেও রাগ সামলালেন শেষ পর্যন্ত।

মনোরমা বলছিলেন, আপিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তাই ভেবেছেন। আপিসের বাড়তি কাজ অনেক সময় বাড়ি বয়ে আনতে হয়। মোটামুটি একটা ভালো ফার্মের চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট চিন্ময় ধর। মাস গেলে সব মিলিয়ে তেরোশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পান এখন। কিন্তু মনোরমার ধারণা খাটুনির তুলনায় ও-টাকা কিছুই নয়। বিশেষ করে দুর্দিনের বাজারে। কিন্তু আপিসের অত খাটুনির কিছুটা অন্তত চিন্ময়বাবুর আত্মসম্মানরক্ষার তাগিদের ব্যাপার। কর্তাব্যক্তিরা কেউ কোনদিন এতটুকু অপ্রীতিকর ইঙ্গিত করলে স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা নীরব সোরগোল পড়ে যায়। মুখ লাল হয়, জিভ খরখরে হয়। অসম্মানের এতটুকু আঁচড় বরদাস্ত করতে পারেন না। জ্যোতিষী বন্ধু বলেন, জন্মলগ্নে নিজের ঘরে ভাদ্রের চড়া রবি—বরদাস্ত হবে কি করে! তার সঙ্গে কর্মপতি শুক্রের যোগ, মাথা উঁচিয়ে চুটিয়ে কাজ করবে তুমি। তাই করে

এসেছেন এতকাল ধরে। তাঁর কাজের গলদ কেউ খুঁজে পায়নি কোনদিন। নিজের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কাজ ছবির মতো সাজানো থাকে তাঁর। এ-ব্যাপারে নিজের অধস্তনদের কাছে কড়া মানুষ তিনি। আর ওপরঅলাদের কাছে সম্মানিত আদরের মানুষ।

সসম্মানে দিনযাপনের চিন্তাটাই অনেকটা রোগের মতো আঁকড়ে আছেন সেই নতুন বয়সের সময় থেকেই। পিতৃপুরুষের এই বাড়িটার মালিক ছিলেন তাঁর বাবা আর জ্যাঠা। তাঁদের মৃত্যুর পর বাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে। এক অংশ পেয়েছেন জ্যাঠার তিন ছেলে বাকি অংশ চিন্ময় ধর। জ্যাঠতুত দাদারা মস্ত মস্ত লোক এক-একজন। তাঁরা তাঁদের অংশ বেচে দিয়ে যে-যার নিজের বাড়ি করেছেন। সকলের ছোট এই খুড়তুতো ভাইটাকে অনুকম্পার চোখে দেখে থাকেন তাঁরা। চিন্ময় ধর সাদামাটাভাবে বি-কম পাস করে একটা সাধারণ ফার্মে চাকরিতে ঢুকল এও জ্যাঠতুতো দাদাদের আক্ষেপের কারণ।

অতএব স্নায়ুতে টান-ধরা এই আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদটা বলতে গেলে সেই প্রথম বয়েস থেকেই বুকে চেপে আছে। একই কারণ বেশি বয়সের বিয়ে। তেইশ থেকে চৌত্রিশ—এই এগারোটা বছর নিজে রেঁধে খেয়েছেন আর মুখ বুঁজে চাকরি করে গেছেন। গোটা দুই প্রমোশন আর নিয়মিত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের পর মাইনেটা যখন তাঁর বিবেচনায় মোটামুটি ভদ্র আকার নিয়েছে তখন মনোরমাকে ঘরে এনেছেন। মাসির ভাসুরঝি। একটু আধটু আলাপ পরিচয় আগেই ছিল। ওঁদের তরফের সক্রিয় চেষ্টায় বিয়েটা ঘটেছে। বয়েস মনোরমারও সাতাশ পেরিয়েছে তখন। দেখতে সুশ্রী কিন্তু ততদিনেও বিয়ে হয়নি কারণ বাপের টাকার জোর ছিল না। মেয়ে পছন্দ হবার পরেও একে একে তিন জায়গায় ওই জোরটুকুর অভাবে তাঁর বিয়ে বাতিল হয়েছে। বাপের অপমান মেয়ের বুকে লেগেছে, এরপর বিয়ের চেষ্টাই নাকচ করে দিয়ে নিজের চেষ্টায় একটা মেয়ে স্কুলের মাস্টারি জোগাড় করেছিলেন মনোরমা। এখানে দেনা-পাওনার কোনো প্রশ্নই নেই শোনার পর বিয়েতে আপত্তি হয়নি। তাছাড়া মানুষটার যতটুকু জানা, অপছন্দ হবার কোনো কারণও ছিল না।

বিয়ের পর সেই একই সম্মানের প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে চিন্ময় ধরের। লোকে ভাববে বিশেষ করে জ্যাঠতুতো দাদারা ভাববে বউয়ের চাকরির ভরসায় বিয়েটা করা হল। অতএব মনোরমার স্কুলের চাকরি বাতিল। চিন্ময়বাবু বলেছেন, তুমি বরং এম-এটা পাশ করে নাও তারপর দেখা যাবে। কিন্তু এম-এ পরীক্ষাও মনোরমার শেষপর্যন্ত আর দিয়ে ওটা হয়নি। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে প্রথম আগন্তুক এসেছে। মেয়ে। এখন তার বয়েস একুশ বাইশ। গেল বছর বেশ ঘটা করে সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়ের পর আট-ন বছর বাদে এই ছেলে। এও চিন্ময়-বাবুর হিসেবের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। অনটনের দিকটা ভেবে মনে মনে ওই একটি মেয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মনোরমার ছেলের আকাঙ্ক্ষা ছিল। চিন্ময়বাবুর

ধারণা এই দ্বিতীয় সন্তান স্ত্রীর ইচ্ছাকৃত অনবধানতার ফল। গোড়ার দিকে এই ছেলে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল। তার পর বারকয়েক সংকটাপন্ন ব্যাধির ধকল গেছে। তখন থেকেই ঠিকুজি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন চিন্ময়বাবু। তাঁর প্রোফেসার বন্ধুও সেই সময় জ্যোতিষচর্চার ফলে ছোটখাট ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মিলিত গণনায় ছেলের আট বছর বয়েস পর্যন্ত একাধিক প্রাণসংকটের যোগ দেখা গেছে। আট পেরুলে তবেই আশার কথা। কিন্তু আট পেরুতে তখনো তিন বছব বাকি। অতএব ভিতবটা সর্বদাই দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত ছিল মনোবমার। ছেলের ভবিষ্যৎ গণনাব সময় তিনিও সাগ্রহে কাছে থাকতেন। সেই সময় মনোরমার মনে হযেছিল একটা মাত্র ছেলে থাকা কোনো কাজের কথা নয সর্বদাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা।

তাঁব মনোভাব বুঝে চিন্ময ধর আঁতকে উঠেছিলেন। স্ত্রীর তখনো সুশ্রী সুডৌল স্বাস্থ্য ছিল। আর চিন্ময ধরেরও চোখে লোভ ছিল। কিন্তু সভযে সমস্ত দুর্বলতা ঠেলে সবিযেছেন। আবার সন্তান! মেয়েকে লেখাপডা শিখিযে ভালো বিযে দিতে হবে। এই ছেলেটা বেঁচেবর্তে থাকলে তাকে মানুষ করতে হবে। সসম্মানে এই দুই কর্তব্য শেষ কবতেই তো কাহিল অবস্থা। তাছাডা তাঁব তখন পঞ্চাশ ছুঁয়েছে, আটান্নয বিটাযাবমেন্ট—ফেব সন্তান এলে তার আব ভবিষ্যৎ কি! বেঁচে থাকলে এই এক ছেলেই তো তখন পর্যন্ত একেবারে নাবালক! না, স্ত্রীটিকে এতখানি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আগে তিনি কখনো ভাবেননি। যাই হোক, ছেলে আট ছাডিযে তেরোয পা ফেলতে ফাডা-টাডা সম্পর্কে দুজনেই নিশ্চিন্ত এখন। তবে আরো নিশ্চিন্ত হতে পারতেন যদি ওই দুরন্ত ছেলের স্বাস্থ্য একটু ভালো হত। দুরন্তপনা আর গোঁ যত বাডছে ততো হাড-জিরজিরে হয়ে উঠেছে।

এই আটান্নয় পা দেবার কিছুকাল আগে থেকেই চিন্ময়বাবুর ভিতরে ভিতরে একটা মানসিক সঙ্কটের ছায়া পড়েছে। এই সঙ্কটের সঙ্গে তাঁর আত্মসম্মানের যোগ। যত দিন যাচ্ছে ছায়াটা পুষ্ট হয়ে উঠছে, হুটহুট করে কাছে এগিযে আসছে। এখন তাঁর আটান্ন চলেছে। আর ন' মাস বাদে আটান্ন সম্পূর্ণ হবে। চাকরির ধরা-বাঁধা মিয়াদ সেখানেই শেষ। তারপর এক্সটেনশনের প্রশ্ন। বেসরকারী আপিস। রেকর্ড মোটামুটি ভালো থাকলে এক বছরের এক্সটেনশন সকলেই পেয়ে থাকে। রেকর্ড বেশি ভালো হলে আর সুপারিশের জোর থাকলে একে-একে তিন চার বছরের এক্সটেনশনও অনেকে পায়। আগে তো হামেশাই পেত, কিন্তু এখন জমানা বদলাচ্ছে, ফার্মের কর্তৃত্বের অনেকখানি রদবদল হয়েছে। এখন এক বছরের বেশি এক্সটেনশন পেতে হলে কিছু তোয়াজ-তোষামোদের কাঠখড় পোড়াতে হয়।

সে যাই হোক আটান্ন পুরোলে চিন্ময় ধর রিটায়ার করে যাবেন এমন চিন্তা কারও মনের কোণে ঠাঁই পায়নি। চিন্ময়বাবুর নিজেরও না। সকলেরই ধারণা কোম্পানী নিজের স্বার্থে কম করে চার-পাঁচ বছর ধরে রাখবে তাঁকে। কাজের সুনামের জোরে মাথা উঁচিয়ে আছেন ভদ্রলোক আর চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট হবার মতো অমন যোগ্যতা নিযে

তাঁর পিছনে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কর্তাবাবুরাই চট করে এই পোস্ট-এ অপর কাউকে বিশ্বাস করে উঠতে পারবেন না। এ সবই ঠিক কিন্তু বছর দুই হল চিন্ময়বাবুর মনের কোণে একটা অস্বস্তি জমাট বেঁধে উঠেছিল। তারপর চারদিকের পরিস্থিতি দেখে সেই অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। কর্তৃত্বের জমানা বদল হবার পর থেকে এক্সটেনশন পাওয়া মানুষগুলোর আর কদর নেই আগের মতো। তারা যেন অনেকখানি করুণার পাত্র কর্তাদের চোখে। আগের দাপটের কর্মচারীদেরও আটান্নর মিয়াদ ফুরোবার পরেই বিনম্র বিভ্রান্ত মুখ। এক্সটেনশন পাবে কি পাবে না সেই ভাবনা। এক বছর পাবে কি দু বছর পাবে সেই ভাবনা। মিয়াদ ফুরোলেই এক্সটেনশনের লিখিত আবেদন পেশ করার রীতি। সেই আবেদন-পত্র নিয়ে ওপরের কর্তারা বিচার-বিশ্লেষণে বসেন। মিয়াদ-ফুরনো কর্মচারীটি তখন যেন তাঁদের হাতের মুঠোর মানুষ। এক বছর বা দু বছরের পর আবার এক্সটেনশন চাইতে গেলে কাউকে তাঁরা সরাসরি নাকচ করেন কাউকে বা পাঁচবার ঘুরিয়ে পাঁচরকমের নীতিবাচক উপদেশ শুনিয়ে তারপর অনুগ্রহ করেন। এইসব দেখেশুনে ভিতরে ভিতরে মেজাজ বিগড়চ্ছে চিন্ময় ধরের। ভাদ্রের চড়া রবি থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে শেষ বয়সে, আত্মসম্মানরক্ষার প্রশ্ন অশান্তি আর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেছে তাঁকে।

দিন গড়াচ্ছিল। চিন্ময় ধর এই দিনে এসে পা ফেলেছেন। চাকরির বাঁধা মিয়াদ আর ন'মাস। এরই মধ্যে আবার এক মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেল। তাঁর বিভাগের সিনিযর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হরেনবাবুর একে একে দুবছরের এক্সটেনশনের মিযাদ ফুরিয়েছে। তিনি তৃতীয় দফায় আবেদন পেশ করেছেন। চিন্ময় ধর জোরালো সুপারিশ করেছেন। লোকটি যথার্থ কাজের তাছাড়া ভদ্রলোকের দু-দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি তখনো।

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে চিন্ময় ধর নিজেই তাঁর ওপরঅলার ঘরে খবর নিতে গেছলেন। এই ওপরঅলাটি আগের কর্তাবাবুর ছেলে, বছর বিয়াল্লিশ বয়স। চিন্ময়বাবুর বক্তব্য শুনেই তিনি খিটখিটে গলায় বলে উঠলেন, আমারা কি দানসত্র খুলে বসেছি এখানে, বছরের পর বছর সব পুষতে হবে! দু-বছর দেওয়া হয়েছে আর হবে না, যান—

কান দুটো তপতপে গরম হয়ে উঠেছে চিন্ময় ধরের। তবু সংযত বিনয়ে বলেছেন, হরেনবাবুর যোগ্যতা আপনি জানেন, তিনি গেলে আমার অসুবিধে হবে।

ওপরঅলা আরো অসহিষ্ণু জবাব দিলেন, উনি সেকেণ্ড এক্সটেনশনে আছেন জেনেও তাঁর কাজের ভার নেবার মতো যোগ্য লোক আপনি তৈরি করেননি কেন, ইট্‌স্ ইওর ফল্ট!

আবার নিজেকে সংযমে বাঁধতে সময় লাগল একটু। বললেন, ঠিক আছে আমার যখন দোষ, অসুবিধেও আমিই সামলাব।

বেরিয়ে এসেছেন। তার দু-ঘণ্টার মধ্যে হরেনবাবুর তৃতীয় দফা এক বছরের এক্সটেনশনের অনুমোদন এসেছে। হরেনবাবু খুশি। বিভাগের সকলে খুশি।

কিন্তু ভাদ্রের রবি দাউ দাউ করে মাথায় জ্বলছে শুধু চিন্ময় ধরের। পরের দুটো

দিন ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। সেই দিনই মনস্থির করে ফেলেছেন নিজের উঁচু মাথা এভাবে হেঁট হতে দেবেন না। ন-মাস বাদে চাকরির বাঁধা মিয়াদ ফুরোলে আর একটা দিনও বাড়তি থাকতে চাইবেন না তিনি। মিয়াদ ফুরোলে আবেদনের প্রথম দরখাস্তও পেশ না করে নিঃশব্দে চলে আসবেন।

কিন্তু প্রশ্ন, চলবে কি করে?

এদিক থেকেও তেমন বেপরোয়া সবল মানুষ নন চিন্ময় ধর। ঠিকুজি নিয়ে জ্যোতিষী-বন্ধুর কাছে গেছেন। ভাদ্রের মাথা উঁচু চড়া রবির আশ্বাস নিয়ে ফিরেছেন। কিন্তু নিজের অবস্থার একটা পাকা হিসেব চোখের সামনে দাঁড় করাতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করছেন না। তিনি পাকা অ্যাকাউন্টেন্ট, একটা পাকা হিসেবের খসড়াই করবেন। আজও বেশ সকালে উঠে প্রথমে ঠিকুজিটাই চোখের সামনে খুলে এক দফা ভাগ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর সেটা মুড়ে রেখে হিসেব নিয়ে বসেছেন।

...লাইফ ইন্সিওরেন্স থেকে যা পাবার গেল বছরই পেয়ে গেছেন। সে টাকার আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। মেয়ের বিয়ে দিতেই তাঁর বেশি খরচা হয়ে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বই আর ব্যাঙ্কের পাশ-বই বার করেছেন। ব্যাঙ্কে হাজার দেড়েক টাকা মাত্র আছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বইয়ে গেল বছরের আগের বছর পর্যন্ত মোট হিসেব তোলা আছে। এই দু-বছরে অর্থাৎ সামনের ওই ন-মাস পর্যন্ত কত জমেছে আর কত জমতে পারে তাঁর প্রতি মাসের হিসেব লিখেছেন। প্রাপ্য সুদ কষে সেই অঙ্কও বসিয়েছেন। তারপর তেমনি নির্ভুল হিসেব করে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির অঙ্কও লিখেছেন। আর এই তন্ময়তার মধ্যেই ছেলেটা বারতিনেক এসে ডায়মণ্ডহারবার যাবার জন্য সাত টাকার তাগিদ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষের বারে তার মায়ের ওই ধমক আর তার বদলে ছেলের ওই জবাব।

নির্ভুল হিসেবই করেছেন চিন্ময়বাবু। অবসর নেবার পর চুরাশি হাজার টাকা সর্বসাকুল্যে হাতে থাকবে তাঁর। দশ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট-এ ফিকসড ডিপোজিট রাখলে বছরে আট হাজার টাকা রোজগার।

এবার খরচের হিসেব। এ-যাবতকালের প্রতি মাসের হিসেব তাঁর নখদর্পণে। ক-মাস ধরে সাড়ে ন-শ টাকার ওপরে লাগছে। অবসর নেবার পরেও স্বাধীনভাবে কিছু তিনি রোজগার করতে পারবেন এ বিশ্বাস আছে। তাঁর কোম্পানীর ক্লায়েন্ট অন্য দু-চারটে ফার্মই হয়তো পার্টটাইমার হিসেবে সসম্মানে ডেকে নেবে তাঁকে। এদিক থেকে সুনামের জোর আছেই। কিন্তু আসল জায়গায় ধাক্কা খেয়ে সেটা তিনি কর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। ওই সাতশ' টাকার মধ্যেই কি করে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করছেন। চালডাল তেল নুন ঝি-চাকর থেকে শুরু করে যাবতীয় খাতের বর্তমান খরচ আর ভবিষ্যতের টানের খরচ পাশাপাশি সাজিয়ে চলেছেন।

—বাবা!

রুক্ষ মূর্তিতে অবাধ্য ছেলের আবির্ভাব আবার। চিন্ময়বাবু ভুরু কোঁচকালেন। জবাব

দিলেন না। হিসেব লিখছেন।

—ও বাবা! ডাকের সঙ্গে এবার পিঠে ধাক্কা। হিসেবের পাতায় কলম ঘষ্টে গেল—ডায়মণ্ডহারবার যাবই আমি, সাত টাকা তুমি দেবে কি দেবে না?

সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কি যে হয়ে গেল চিন্ময়বাবুর, নিজেই জানেন না। এক ঝটকায় বসার চেয়ারটা একটু সরিয়ে ছেলের গাল মাথা বেড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে মেরে বসলেন তিনি। এত জোর যে নিজেও কল্পনা করতে পারেন না। ছেলেটা সজোরে ছিটকে পাশের শো-কেসটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। ঝনঝন শব্দে শো-কেসের কাঁচ ভাঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ। শো-কেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে সে।

ভিতর থেকে মনোরমা ছুটে এলেন। ছেলের অবস্থা দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন তিনিও।

চিন্ময় ধর স্তব্ধ নিস্পন্দ, কয়েক মুহূর্ত। চোখে অন্ধকার দেখছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। ছেলের চোখ মুখ কপাল রক্তে ভেজা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। যন্ত্রণায় বুকের পাঁজরও দুমড়ে যাচ্ছে। গলা দিয়ে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে শুধু।

পরদিন।

চিন্ময় ধর আর মনোরমা নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে ন-টার পর। কারো মুখে কথা নেই। বিগত ছত্রিশ ঘণ্টার একটা ঝড়ের অবসান। একাধিক আর্টারি কেটে গেছল। সেগুলোর মেরামত হয়েছে। অনেক রক্ত কিনে দিতে হয়েছে তার জন্য। বুকের দুটো রিব ভেঙেছে, এক হাতের কনুইয়ের হাড়ও জখম হয়েছে। সে-সবও মেরামত হবে। নামজাদা ডাক্তার আর নামজাদা সার্জনের হেপাজতে রাখা হয়েছে ছেলেকে। চব্বিশ ঘণ্টার নার্সও রাখা হয়েছে।

এই ঝড়ের মধ্যে আবারও একটু ছোটখাট হিসেব করতে হয়েছে চিন্ময়বাবুকে। সবশুদ্ধ সাড়ে চার হাজার টাকার মতো খরচ হবে। ট্যাক্সি করে আজই একবার আপিসে গিয়ে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে থোক চার হাজার টাকা তুলে নিয়ে এসেছেন।

মুখ হাত ধুয়ে নিঃশব্দে আহার সারলেন দুজনে। চিন্ময়বাবু এ-ঘরে এসে বসলেন। একটু বাদে মনোরমা এলেন। চিন্ময় ধর টের পেলেন। মুখ ফেরালেন না। স্ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখলেন খানিক। তারপর কাঁচ-ভাঙা শো-কেসের মাথা থেকে কতগুলো লেখা কাগজপত্র তুলে নিয়ে তাঁর সামনে টেবিলে রাখলেন। বললেন, কাল যা-সব লিখছিলে আমি সেই রাতে এসে তুলে রেখেছি—কিছু উড়ে-টুড়ে গেল কিনা দেখে রাখো।

নির্বাক চিন্ময় ধর তাঁর সেই হিসেবের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন। ঠিকুজিটাও আছে এই সঙ্গে।

একটু থেমে মনোরমা আবার বললেন, অমন রাগ করা তো তোমার স্বভাব নয়, তবু হঠাৎ এত রেগে গেলে কেন...কি লিখছিলে, খুব দরকারী হিসেব-নিকেশ নাকি

কিছু ?

চিন্ময় ধর আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালেন। ...না, মমতামাখা অবসন্ন মুখ। কিসের হিসেবনিকেশ লেখা এতে দেখেনি অথবা দেখার অবকাশ মেলেনি। আবার সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন চিন্ময় ধর। মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনোরমা বললেন, ভেবে আর কি করবে, ইচ্ছে করে তো আর করোনি, কপালের লেখা। অনেক ধকল গেছে, শুযে পড়ো এসে।

তিনি ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

তারপরেও আধ ঘণ্টা স্থাণুর মতো বসে চিন্ময ধর।

তারপর উঠলেন। ঠিকুজিসহ লেখা কাগজগুলো দুমড়ে হাতে নিলেন। সন্তর্পণে পা টিপে এ-ঘরের ভিতর দিযে বাথরুমের দিকে এলেন। মশারির নীচে স্ত্রী এমনি শুযে কি ঘুমিযে ঠিক ঠাওব হল না। জেগে থাকলেও বাথরুমেই গেছেন ধবে নেবেন। শোবার ঘর থেকে বেরুবাব সময সময শব্দ না করে ও-দিকের দরজা দুটো ভেজিযে দিযেছেন।

বাথরুমে না গিয়ে সোজা চলে এলেন উল্টোদিকের রান্নার জাযগায়। আরো সন্তর্পণে দেশলাই ধরিয়ে গ্যাসটা জ্বাললেন। তারপর লেখা কাগজগুলো তার ওপর ধরলেন।

সেই সঙ্গে ঠিকুজিটাও।

জ্যোতির্ময়

আমাব মেয়ের বয়েস একুশ। কলেজে পড়ে। ও জানে মায়ের তাডা খেযে আমি তলায় তলায ওর বিযের চেষ্টা দেখছি। কারণে-অকারণে ও যে আজকাল মায়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগডা করে সেটা কিছুটা এই জন্যে।

কিন্তু সেদিন বিকেল থেকে দেখি একেবারে গুম হয়ে আছে মেযেটা। সন্ধ্যাব আগে পর্যন্ত ওকে বন্ধ ঘর থেকে টেনে বার করা গেল না। একমাত্র মেযে, আমার আর স্ত্রীর ওর দিকে একটু বিশেষ নজর থাকাই স্বাভাবিক। হঠাৎ কি হল বুঝলাম না।

ঘণ্টাখানেক আগে ওর প্রাণের বন্ধু শিউলি এসেছিল। সেই মেযেও খুশি মুখেই বাডি ঢুকেছিল, মিনিট পনের বাদে খুশি মুখেই বিদায নিযেছে। তারপর থেকেই মেযের এই থমথমে মুখ। আমার কোনো কথার জবাব দেয় না। মায়ের টানাটানিতে বিরক্ত।

যাই ঘটে থাকুক, তার সঙ্গে ওই শিউলি মেয়েটার যোগ আছে সন্দেহ নেই।

শিউলিকে আমরাও পছন্দ করি খুব। দেখলে চোখ জুড়োয়—এমন রূপ। নিখুঁত নাক মুখ চোখ। চাঁপাবরণ রঙ। একটু ছিপছিপে গড়নের। অমন রূপের মেয়ে আমাদের ঘরে থাকলে ত্রাসে কণ্টকিত হয়ে থাকতাম। মেয়েটাকে আরো ভালো লাগে তার চালচলন দেখে। ভালো খেতে-পরতে পায় না, কিন্তু মুখে সরল হাসি লেগেই আছে।

মেয়ে কতদিন আমাকে চুপিচুপি বলেছে, ওকে নিয়ে পাড়ার আর কলেজের পাজী ছেলেগুলো যে কি কাণ্ড করে বাবা জানো না—আমার এক-এক সময় এত ভয় করে না!

আমি একদিন বলেছিলাম, বাপ বিয়ে দিয়ে দেয় না!

—পয়সার জোর কোথায় যে বিয়ে দেবে! তাছাড়া জ্যোতিকাকাকে তো জানো, আঁকতে বসল কি সকাল থেকে রাত, আবার রাত থেকে সকাল।

জ্যোতিকাকাকে জানি বলতে মেয়ের মুখেই শুনেছি। বেশ নামী শিল্পী। কিন্তু মেয়ের মতে জ্যোতি চৌধুরীর মতো শিল্পী এ-দেশে নেই। কোনো খবরের কাগজঅলা, কোনো মাসিক সাপ্তাহিকের সম্পাদক বা কোনো কমার্সিয়াল ফার্মের সঙ্গে শিল্প নিয়ে আপোস করতে পারল না বলেই এই দশা। মেয়ে কাব্য করে বলত, জ্যোতিকাকার দারিদ্র্য শিবের গায়ের ছাইয়ের মতো। আর হামেশাই বলে, শিউলিকে কি দেখছ, চেহারা হল গিয়ে জ্যোতিকাকার—দশ হাজার লোকের মধ্যেও আলাদা একজন।

জ্যোতিকাকা মেয়ের মতোই ভালবাসে ওকে এই গর্ব ধরে না।

নিজের হাতে এঁকে ভদ্রলোক ওকে তিন-চারখানা ছবি দিয়েছে, সেগুলো যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছে।

শিউলি মেয়েটার ওপর ওর এত টানের আরো একটা বিশেষ কারণ আছে। মেয়েটার জীবন বড় দুঃখের। তার মা থেকেও নেই। মেয়ের মুখে শুনেছি, শিউলির দেড় বছর বয়সে তার বাবা-মায়ের ভালবাসার বিয়ে ভেঙে যায়। জ্যোতি চৌধুরীর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটি শিক্ষিতা মেয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু আসলে তার রূপের টান থেকে রুপোর টান বড়। আর একজনের হাত ধরে চলে গেছে। পরে ডিভোর্স হয়েছে। এর পরেও রূপমুগ্ধ অনেক মেয়ে ভদ্রলোকের জীবনে আসতে চেয়েছে। কিন্তু এই সাতচল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আর কোনো মেয়ের দিকে ফিরে তাকায়নি। আঁকা নিয়ে আর মেয়ে নিয়ে থেকেছে।

আমার মেয়ের এই মুখ দেখে আমরা ভাবছিলাম, শিউলির কোনো বিপদ-আপদ হল নাকি আবার। সুখের ঘরে রূপের বাসা তো নয়, তাই চিন্তা। কিন্তু সেই মেয়েও তো খুশিমুখে এলো আর খুশিমুখে চলে গেল দেখলাম। তাহলে কি হতে পারে?

সন্ধ্যার পরে মেয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো। সেইরকমই মুখ। আমি আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বল্ না, শিউলি কেন এসেছিল?

—বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

ওর মা বলে উঠল, এ তো ভালো কথা—শিউলির কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে?

গম্ভীর মুখে মেয়ে জবাব দিল, শিউলির বিয়ে নয়। তার বাবার বিয়ে।

আমরা হতচকিত। এমন একটা ধাক্কা কল্পনা করা যায় না। আমাদেরও সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল।

পরে আরো শুনলাম। শিউলির হবু মায়ের তেত্রিশ বছর বয়েস। শিউলি আগে ভাগে দেখে এসেছে, মজা করে গল্পটল্প করে এসেছে। মেয়ের বাবা ওদের খুব দূরসম্পর্কের আত্মীয় নাকি। যাতায়াত ছিল না, কারণ তাদের অঢেল বিত্ত আর এরা গরীব। তাদের অনেক বাড়ি, অনেক গাড়ি, অঢেল টাকা। বিয়েতে জ্যোতি চৌধুরী পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পেয়েছে। আর জিনিসপত্র সোনাদানা যে কত পাবে তারও ঠিক নেই। মেয়ের বাপের শর্ত, ঘটা করে বিয়ে হবে, ঘটা করে বউভাত হবে। শিউলি বলেছে, তার নতুন মা দেখতে ভালো না, কিন্তু তাতে আর কি আসে যায়।

শিউলি ওকে বিয়েতেও নেমন্তন্ন করেছে, বউভাতেও। মেয়ে রেগে গিয়ে বলেছে কোথাও যাবে না। শিউলি তখন মাথার দিব্যি দিয়েছে। —বউভাতে না গেলে আমার মরা মুখ দেখবি।

মেয়ে বলল, একে শিউলিটা দিনকে-দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে—যখন-তখন মাথা ঘোরে, মাথা টলে, ওর বাবা এই জন্য চিকিৎসাও করেছে—ডাক্তার নাকি বলেছে অ্যানিমিয়া—তার মধ্যে ও এই দিব্যি দিয়ে গেল, আমি কি করি বলো তো?

আমি বললাম, তার মেয়ে যখন মেনে নিয়েছে—যাবি, কি আর করবি।

গোমড়া মুখ করে বউভাত গেছল। কিন্তু ঘণ্টাতিনেক বাদে ফিরে এসেই তার সে-কি কান্না। আমরা যতো থামাতে চেষ্টা করি ও ততো ফুলে ফুলে কাঁদে। শেষে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন।

লিখতে বসেছি। একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে মেয়ে আমার কাছে এসে বসল। জলছিটানো চোখ-মুখ এখনো বেশ ফোলা। কিছু না বলে একবার দেখে নিয়ে আবার লেখায় মন দিলাম।

—বাবা।

—বল্।

—একটা গল্প বলব লিখবে?

কলম থামিয়ে মুখের দিকে তাকালাম। এখন কাঁদছে না, কিন্তু কান্না ফেটে পড়ছে যেন। বললাম, আচ্ছা পরে শুনব'খন।

—না এক্ষুনি শোনো।

কলম রেখে বললাম, বেশ বল্।

ও বলে গেল, আমি শুনে গেলাম।

এবারে যা লিখছি, তার এক বর্ণ-ও আমার নয়। মেয়ে যা বলেছে হুবহু তার

বয়ানে সেইটুকুই লিখে দিলাম।

শোনো বাবা, বেশ একটা জেদ নিয়েই জ্যোতিকাকার বিয়ের বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে গেছলাম। চেনা-লোকের ধিক্কার জ্যোতিকাকার গায়ে কতটা বেঁধে তাও দেখব। বউভাতের জন্য বড় বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। রঙ-বেরঙের আলোয় সমস্ত বাড়িটা সাজানো হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতিকাকার গায়ে কিসের চামড়া কে জানে। দিব্যি হেসে হেসে সব তদারক করে বেড়াচ্ছে। আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার তেত্রিশ বছরের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। জ্যোতিকাকা এমনিতে খুব রসিক মানুষ, নিজের মেয়ের সঙ্গেও রসিকতা করে, আমার সঙ্গেও করে।

আজ তার হাসিখুশি বিষের মতো লাগছিল। যদি বলতে পারতাম, জ্যোতিকাকা, টাকার জন্যে তুমি এই করলে শেষে?

বউ দেখার পর চুপ করে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। পিছনে শিউলির হি-হি হাসি। বলল, আমার বাবার বিয়েতে তুই কার ধ্যান করছিস?

জ্যোতিকাকা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে বলল, এই মেয়ে, তোর কি হল আবার? যা শিউলির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব জিনিসপত্র দেখে আয়।

শিউলি আমাকে হাসিমুখে টেনে নিয়ে গেল। শিল্পী বাপের মেয়ে, ওর এই হাসিটাকে আমি বিশ্বাস করছিলাম না। আর মনে মনে ঠিক করেছিলাম, জ্যোতিকাকার আর মুখ দেখব না কোনদিন।

একটা আলাদা ঘরে আমার আর শিউলির খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বেশি লোকজনের ভিড়ে ওর মাথা ঘোরে, খাওয়ার সময় অত হৈ-চৈ, ঠাস-ঠাস করে মাথায় লাগে। তাই একটু নিরিবিলিতে তার খাওয়ার ব্যবস্থা। সঙ্গে আমারও।

রাগের চোটে আমি কিছুই খাচ্ছিলাম না। কিন্তু শিউলি লোভীর মতো গপগপ করে খাচ্ছিল। আর আমাকে খাবার তাগিদ দিচ্ছিল। আর হাসছিল। হঠাৎ বলল, এরকম করিস না, ভালো করে খা, কেন মিথ্যে রাগ করছিস, তোর জ্যোতিকাকার ভিতরটা এখন আগের থেকেও বেশি জ্যোতিতে ঠাসা—বুঝলি?

বোঝার জন্য আমি শিউলির দিকে তাকালাম।

আবার দুটো রসগোল্লায় গাল বোঝাই করে শিউলি বলল, আসলে আমি আমার বাবার শিল্পীসত্তার শ্রাদ্ধের খাওয়া চেটেপুটে খাচ্ছি। আর এই শ্রাদ্ধটা বাবা নিজের হাতেই করল শুধু আমার জন্যে। নইলে আমার ছোটবেলায়ও অনেক মেয়ের বাপ লোভ দেখিয়ে মেয়ে গছাতে চেয়েছিল। বাবা ফিরেও তাকায়নি।

আমি ঝাঁঝের মাথায় বললাম, এখন ফিরে তাকালো কেন, টাকার অঙ্কটা খুব বেশি বলে?

শিউলি বলল, না, এখন দরকার হল বলে। আমার জন্যেই হল।

আমার ছেঁদো কথা মনে হল। হয়তো শিউলিকে বুঝিয়েছে তার বিয়ের জন্যই টাকা দরকার।

শিউলি বলল, তোকে বলছি, কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায়। বিয়ের জন্য বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পেয়েছে জানিস তো...সঙ্গে এত জিনিস। এখানেও বাবার চেহারাটাই ট্রাম্প কার্ড। ওরা জানত বাবা কত গরীব, আর এ-ও জানত এই মুহূর্তে বাবার কি প্রচণ্ড টাকার দরকার। ...এত বড়লোক হয়েও ওই মেয়ের বিয়ে তারা সহজে দিতে পারছিল না...দু'-দু'বার অ্যাবরশনের ফলে তার মাথায় ছিট দেখা দিয়েছে—তার মধ্যে ওই চেহারা—

আমি আঁতকে উঠলাম। —বলিস কি রে?

শিউলি বলল, হ্যাঁ, বাবার পকেট থেকে আমি এইব্যাপারে পাঁচখানা উড়ো চিঠি পেয়েছি—সবাই একই কথা লিখে বাবাকে সাবধান করতে চেয়েছে। তাদের ডাক্তারদের পরামর্শ হল, সুন্দর অথচ গরীব একজনের সঙ্গে বিয়ে হওয়া দরকার—যে-লোক সর্বদা তাদের মেয়ের হাতের মুঠোয় থাকবে।

রাগে দিশেহারা হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম কি একটা। দেখি শিউলির দু'চোখ জলে চিকচিক করছে। ও আবার বলল, তার আগে বাবার পকেটে আমি আরো কিছু কাগজপত্র দেখেছি। ...সেগুলো সব ডাক্তারের প্রেসকৃপশন—আমারই। সকলেই এক রায় দিয়েছে—আমার লিউকিমিয়ার ফার্স্ট স্টেজ এখন।

বাবাগো, আমার সর্বাঙ্গে কি-যে কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর সমস্ত বুকটা এমন দুমড়েমুচড়ে উঠতে লাগল।

শিউলি আবার বলল, দু'টো মাস ধরে বাবাকে দেখেছি পাগলের মতো টাকা যোগাড় করতে চেষ্টা করছে। যেটুকু পাচ্ছে তার পঞ্চাশগুণ দরকার। পাগলের মতো বাবা তখন টাকার আশায় ছুটল আমাদের দূর-সম্পর্কের এই মস্ত বড়লোক আত্মীয়ের কাছে। বাবাকে তারা তখন এই বিয়ের কড়ারে বেঁধে ফেলল। এবারে বাবা রাজি হয়ে টাকা নিয়ে ফিরল।

একটু থেমে শিউলি আবার বলে গেল, বাবা এসে জানালো, তুই বড় হয়েছিস, এখন আমার নিজের দেখাশুনার জন্য একজন দরকার। কবে হুট করে তোর বিয়ে হয়ে যাবে ঠিক নেই। তাই আমি বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি। তারপর বলেছে, তোর খারাপ টাইপের অ্যানিমিয়া, তোর নতুন মা এলে তোকে কিছুকাল হাসপাতালে থেকে মাসে এক বোতল করে রক্ত নিতে হবে।

...বাবা গো, আমার গলা বেয়ে একটা কান্না ঠেলে উঠছিল। আমি শুধু ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

শিউলি বলল, কিন্তু আমি তো জানি প্রথমে মাসে এক বোতল, এরপর মাসে দু'বার তিনবার চারবার শেষে সপ্তাহে দু'বার তিনবার করে বোতল বোতল রক্ত লাগবে...বাবার পঞ্চাশ হাজার টাকা ফুরোবার আগে আমার যাবার সময় হয়ে যাবে।

আমি বলে উঠলাম, শিউলি শিউলি, তুই থাম এবার!

শিউলি বলল, আর একটু শুনে নে না। ...যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন তো জ্যোতিকাকা এ-স্ত্রীর কেনা গোলামের মতো হয়ে থাকবে। আমি চলে গেলে তারপর?

ততদিনে টাকাও প্রায় ফুরিয়ে আসবে...ওই পাগল স্ত্রী তখনো বোঝার মতো কাঁধে চেপে থাকবে—তোর জ্যোতিকাকা তখন কি করবে ভেবে দেখেছিস? তার শিল্পী-সত্তাটা যে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী হয়ে গেছে।

আসার সময় আমি আর শিউলিকে একটি কথাও বলে আসতে পারিনি বাবা। জ্যোতিকাকা আমার পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ঠিকমতো খেয়েছিস তো? বলেই আবার অন্য অতিথির দিকে হাসিমুখে এগিয়েছে। তারা হাতের কব্জি ডুবিয়ে খাচ্ছে আর মনে মনে নিশ্চয় বিদ্রূপ করছে।

বেরিয়ে এলাম।

ঢোকার সময়, বুঝলে বাবা, বাড়ির ঝলমলে রঙ-বেরঙের আলোগুলো আমার চোখে আগুনের গোলার মতো লাগছিল। আর যখন বেরিয়ে এলাম বাবা, আমার মনে হচ্ছিল ওই আলোগুলোতে যেন শুচিতার ছটা। সত্যি যেন এক শিল্পী-সত্তার শ্রাদ্ধের পবিত্র অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

রোগচর্যা

সকালের কাগজটা খুলেই চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠলেন অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য। —শুনছ? শুনছ? ওরে কে কোথায় আছিস, শুনছিস?

স্ত্রী মনোরমা ছুটে এলেন। ও-দিক থেকে বড় দুই ছেলে দীপক আর প্রণব দৌড়ে এল। বাবার জন্য চা করছিল ছোট মেয়ে দীপিকা, বাবার চিৎকার শুনে সব ফেলে সে-ও উঠে এল।

আনন্দে আর উত্তেজনায় কাগজ হাতে থর-থর করে কাঁপছেন অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য। —ওরে তোরা সব খবরটা দেখেছিস, সকালের কাগজ পড়েছিস কেউ? তোদের কারো যদি কোন হুঁশ থাকত। সুদীপ এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় সমস্ত গ্রুপের মধ্যে প্রথম হয়েছে—সায়েন্সে রেকর্ড মার্ক পেয়েছে—এই দেখ্ এই দেখ্—ছবিও বেরিয়েছে। হাসতে লাগলেন, খবরের কাগজের ফোটো, কি চেহারার কি মূর্তিই না ওঠে! ...এ ছবি ওরা পেল কি করে? তোরা পাঠিয়েছিলি? নাকি সুদীপই দিয়ে এসেছে?

হাসলে বা আনন্দ হলে ভারী দুই গালের খাঁজে খাঁজে প্রসন্নতা যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে, বড় বড় দুই চোখ আরো বড় হয়ে সকলের মুখের ওপর চক্কর খায়। কিন্তু সকলের দিকে চেয়ে তাঁর আনন্দ আর উত্তেজনায় টান ধরতে লাগল। সেই সঙ্গে চোখে-মুখে এক দুর্বোধ্য বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল। —তোরা সব হাঁ করে

চেয়ে আছিস কি? আনন্দ করছিস না কেন? কথা বলছিস না কেন? স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, তুমিই বা এমন চুপ মেরে আছ কেন? কাগজটা তাঁর সামনে তুলে ধরলেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ নাম, এই দেখ ছবি! দেখেছ?

মনোরমা দেখলেন। গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। পরে ছোটমেয়ের দিকে ফিরে বললেন, দীপু, ওঁর চা এনে দিলি না এখনো? যা নিয়ে আয়।

দীপিকা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করে বাঁচল। এই সকালে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাড়িটার হাওয়া বদলে গেছে যেন। বিষাদের ছায়া পড়েছে।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য প্রসন্ন বদনে হাসতে লাগলেন আবার। ছেলেদের আর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি বরাবরই বলিনি, ভাল মত খাটলে ও-ছেলেকে কেউ রুখতে পারবে না—বলিনি? বরাবর বলে এসেছি! হাসছেন। —সুদীপ গেল কোথায়...ও হরি আমার কিছু যদি মনে থাকত, ও বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে এখনো ফেরার সময় হল না? কোথায় আছে ঠিকানা-পত্র জানিস? একটা টেলিগ্রাফ করে দে না, এ-সময় বাইরে থাকলে চলে! কি পড়বে, কোন্ কলেজে পড়বে—এখন কি বেড়াবার সময় ওর!

দরজার দিকে চোখ পড়ল। দরজার দু'দিকে দুই ছেলের বউ দাঁড়িয়ে। তাদের বেলায় ঘুম ভাঙে—চেঁচামেচি শুনে একটু আগেই উঠে পড়েছে। মুখ থেকে ঘুম-ভাঙার দাগ মিলায়নি এখনো, চোখে নীরব শঙ্কা।

একগাল হেসে অর্ধেন্দুবাবু বললেন, কি বউমা-রা খবর শুনেছ? সুদীপ একেবারে ফার্স্ট, রেকর্ড মার্কস পেয়ে আবার—এই দেখ কাগজে ছবিসুদ্ধু খবর!

বড় দুই বউ কি বলবে বা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কি-রকম একটা হাঁস-ফাঁস অবস্থা তাদের। বড় দুই ছেলে দীপক আর প্রণব মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল একবার, তারপর মা-কে ইশারা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বউরাও দোর-গোড়া থেকে সরল।

দীপিকা বাবার চা আর জলখাবার নিয়ে এল। ইশারায় তাকে ঘরে থাকতে বলে মনোরমাও ঘর থেকে বেরুলেন। বড়ছেলে দীপকের ঘরে এলেন। মেজছেলে প্রণবও দাদার মুখোমুখি বসে। অদূরে দুই বউ দাঁড়িয়ে। চিন্তাচ্ছন্ন মুখ সকলেরই। মনোরমা ঘরে ঢুকতে সকলে সচকিত একটু। এ-বাড়িতে আর এই সংসারে এই মা-টির ব্যক্তিত্ব অপরিসীম। সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে ভয় করে ভক্তি করে। মায়ের গর্বে ছেলে-মেয়েরা উদ্ভাসিত, বউরাও শাশুড়ীর মুখের ওপর অবাঞ্ছিত একটি রা-কাটাতেও সাহস করে না কখনো।

...তার কারণও আছে। এক দরিদ্র পরিবারে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিতালি ঘটিয়েছেন তিনি। তিনি একা।

বড়ছেলে দীপক ড্রেসিং টেবিলের সামনের কুশনটা টেনে দিয়ে বলল, বোস মা—

মনোরমা বসলেন। গম্ভীর মুখ। চিরদিনই সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি তিনি। আজও সংযমে বেঁধে রেখেছেন নিজেকে।

একটু ইতস্তত করে দীপক বলল, সব বুঝতেই তো পারছ মা, এর পরেও দো-টানার মধ্যে থাকা মানে চোখ বুজে থেকে সত্য অস্বীকার করা...আমার মনে হয় ডক্টর মালিককেই এক্ষুনি খবর দেওয়া দরকার, এ তাঁরই কেস।

মনোরমা বললেন, খবর দে...।

দ্বিতীয় ছেলে প্রণব বলল, কিন্তু সেই ভদ্রলোক তো গেলবারে এসেই এন্‌ভিরন্‌মেন্ট বদলাবার জন্য বাবাকে নিজের ক্যাবিনে রেখে ওয়াচ করতে চেয়েছিলেন, এবারে এলেও তো প্রথমেই বাবাকে সরাতে চাইবেন এখান থেকে...

মনোরমা শান্ত মুখে জবাব দিলেন, চিকিৎসার প্রয়োজনে সরানো দরকার হলে সরাবেন...এ-যে তারই কেস এ-তো আজ স্পষ্টই বোঝা গেল। তোরা ফোন করে তাকে খবর দে, আমার কথা বলিস—

এত বড় বাড়ির সর্বত্র বিষাদের ছায়া ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

এ-বাড়ির কর্তা আসলে কেউ নন, কর্ত্রী একজন। মনোরমা।

পঞ্চান্ন বছর বয়েস হতে চলল, নিজের ছেলের বউদের থেকেও শক্ত-সমর্থ এখনো। ঋজু লম্বা দেহ, টান হয়ে হাঁটেন। বয়েস যত বাড়ছে তাঁর ব্যক্তিত্বও তত বাড়ছে। এই ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ রূপ আছে যা সকলের চোখেই পড়ে।

ছোটমেয়ে দীপিকাকে বললেন তার দিদিকে একটা চিঠি লিখে দিতে। যদি দিন কয়েকের জন্যে এসে ঘুরে যেতে পারে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে বর্ধমানে থাকে, দীপিকার ভগ্নিপতি সেখানকার কলেজের প্রফেসর। দীপিকাকে আজ য়ুনিভার্সিটি যেতেও বারণ করে দিলেন তিনি। এবারেই বি. এ. পাস করে এম. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বাবার দেখাশুনার জন্যে একমাত্র তাকেই রেখে যাওয়া যেতে পারে। বিকেলের আগে ডাক্তার আসবে না। ততক্ষণ রোগীকে একলা রেখে যাওয়ার কথাই ওঠে না। মনোরমার বেরুতে হবে; কারণ স্কুলের অনেক দরকারী কাগজ-পত্র সই করার আছে, তাছাড়া স্কুল কমিটির ছোট মিটিংও আছে একটা। বউমা-রা স্কুল কামাই করে বাড়িতে বসে থাকবে এও চান না তিনি। বিশেষ করে বড়বউ রমলা তাঁর ডান হাত। কখন কোন্ কাজে দরকার হয় ঠিক নেই। ভেবে-চিন্তে ছোটবউ বিনতাকেও স্কুলে যেতে বললেন তিনি। এই অসুখবিসুখের সময় কয়েকজন টিচার এমনিতেই অ্যাবসেন্ট। লিভ-রিজার্ভ থেকে টিচার আনতে হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে কোনরকম অনিয়ম অথবা বিশৃঙ্খলা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ...তাছাড়া বউমা-রা থেকেও কোন লাভ নেই। শ্বশুরকে সামলানো তাদের কর্ম নয়—দু-কথার পর তিন কথাতে ধমক খেয়ে তারা পালাবার রাস্তা খোঁজে। কিছুটা পারে একমাত্র দীপিকা, বাপের আদরের মেয়ে সে, ধমক খেলে ফিরে ধমক দিতে ছাড়ে না। এই জন্যেই তাকে বাড়ি রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন মনোরমা।

...না, আজকের এই ঘটনার পরে রোগটা কি সে সম্বন্ধে কারো মনে আর এতটুকু সংশয় নেই। বাড়ির এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেশ কিছুদিন ধরেই উল্টো-পাল্টা

কথা বলা শুরু করেছেন। দপ্ করে প্রায় অকারণে রেগে ওঠেন, সেই মুখেই হয়তো হাসেন আবার। কিন্তু আবার যখন সুস্থ মাথায় কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তখন কারো চোখে বা কানে বিসদৃশ ঠেকে না কিছু।

দীর্ঘদিন ধরে ভদ্রলোক হাইপারটেনশনে ভুগছেন—চড়া ব্লাডপ্রেসার। দুই একবার রক্ত বার করে দিতে হয়েছে। তাই অনেক সময় ছেলেদের সঙ্গে মনোরমাও ভেবে পান না, আসল রোগটা শরীরের না মাথার। একটা থেকে আর একটার উপসর্গ দেখা দিয়েছে এমনও হতে পারে। তাই দুই তরফেরই ডাক্তার আনা হয়েছে। এতকাল ধরে অ্যালোপাথি চিকিৎসাই চলছিল—শেষের বারে একজন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছিল। তিনি আবার কোন মানসিক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে বলে গেছেন। সে অনেকদিন আগের কথা।

সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী ডক্টর মালিককে আনা হয়েছিল। ঘুম-টুম হয় আর মন-মাথা ঠাণ্ডা থাকে এমন কোন ডাক্তার আনার দরকার শুনে ডক্টর মালিকের নামটা অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যই করেছিলেন। —তোরা নরেনকে খবর দে না, নরেন মালিক, সে তো এই—কি-সব ব্যাপারে খুব নাম-টাম করেছে, অনেক বিলিতি ডিগ্রী আছে—আমার নাম শুনলেই আসবে হয়তো...তবে এখনো মনে রেখেছে কিনা কে জানে...বড় ভাল ছেলে ছিল, আর এককালে কী শ্রদ্ধাই না করত আমাকে।

কোন ছাত্র কত বড় হয়েছে, কে জজ হয়েছে, কে ম্যাজিস্ট্রেট, কে বড় ডাক্তার হল বা কে বড় অ্যাডভোকেট—সব অর্ধেন্দুবাবুর নখদর্পণে। ওই সব কৃতী ছাত্রের নামে আনন্দে বুক ভরে ওঠে তাঁর। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে নিজে গিয়ে এক একজন পুরনো ছাত্রর বাড়ি গিয়ে হানা দিয়েছেন।

বড় দুই ছেলে তাদের মায়ের স্কুলের সর্ববিধ ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক। মনোরমা দুজনকেই খুব ভাল মত এম. এ. পাস করিয়ে আর চাকরি-বাকরি করতে দেন নি। স্কুলের বৈষয়িক এবং অ্যাডমিনিসট্রেশনের ব্যাপার আস্তে আস্তে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। দিয়েছেন বটে, কিন্তু সকলের ওপরে নিজের দুটি চোখ রেখেছেন। স্কুলের সেক্রেটারী স্বয়ং মনোরমা দেবী, জয়েন্ট সেক্রেটারী দুই ছেলে। তাদের সময় সব থেকে কম, সাড়ে ন'টায় বেরোয়, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারে না।

তবু মায়ের নির্দেশে এরই মধ্যে তারা মানসিক-বিশেষজ্ঞ নরেন মালিকের খোঁজ করেছে। না, তাদের বাবা কিছু-মাত্র অত্যুক্তি করেন নি। ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মাত্র, কিন্তু এ লাইনের কর্ণধারদের মধ্যে একজনই বটে। বাবার পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে ডক্টর নরেন মালিক সেই বিকেলেই চলে এসেছিলেন। অবশ্য বাড়িতে ঢোকার আগে ভাবতেও পারেন নি তাদের সেই অতি সজ্জন মাষ্টারমশাইয়ের দিন এতটা ফিরেছে। পুরনো ছাত্রকে দেখে অর্ধেন্দুবাবু আনন্দে আটখানা।

...সেই প্রথম দিন বহুক্ষণ বসে থেকে আর বহু রকমের গল্প করে ডক্টর মালিক ছেলেদের আর তাদের মা-কে আড়ালে ডেকে প্রস্তাব করেছিলেন, মাষ্টারমশাইকে দিন কতক তাঁর নার্সিংহোমে রাখতে পারলে মন্দ হয় না। তাতে রোগীর মতিগতি

ভাল বোঝা যাবে আর পরিবেশ-বদলের ফলেও উপকার কিছু হতে পারে।

কিন্তু মনোরমা পরিবেশ বদলের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভব করেন নি। তাঁর ধারণা, এ বাড়িতে যে-রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী আছেন, তার থেকে ভাল ব্যবস্থা আর কোথাও হতে পারে না। তাঁর অনুরোধে ডক্টর মালিকই এখানে এসে কিছুদিন চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু তারপর অর্ধেন্দুবাবুই এ চিকিৎসা বাতিল করে দিয়েছেন।

...প্রায় আটত্রিশ বছর আগের কথা। মনোরমার বয়েস তখন সতেরো, অর্ধেন্দুবাবুর তেইশ। বনেদী বড়ঘরের এক অতি রক্ষণশীল পরিবারে অর্ধেন্দুবাবু তখন নতুন আগন্তুক। মনোরমার দাম্ভিক দাদার সহপাঠী ছিলেন ভদ্রলোক। দুজনেই এম. এ. পরীক্ষা দেবেন সেই বছর। কিন্তু অর্ধেন্দুবাবুর তখন দিন চলে না এমন অবস্থা। পরীক্ষার ফী-ও কোথা থেকে জোটাবেন ঠিক নেই।

সেই সময় উদার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বাড়িতে ঢুকিয়ে ছিলেন মনোরমার দাদা। বন্ধুর প্রতি একটু টান ছিল কারণ ছাত্র হিসেবে বন্ধুর অনেক বেশি সুনাম ছিল তাঁর থেকে। যাই হোক, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য মনোরমার একটি ছোট ভাইয়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে ওই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। খাওয়া-পরা বা পরীক্ষার ফী জোটানোর ভাবনা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

...সেই রক্ষণশীল মুখুজ্যে-বাড়িতে কুল-মেল-কুষ্ঠি মিলিয়ে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় ষোল-সতেরো বছরের মধ্যে। কিন্তু মনোরমার, ঠিকুজিতে জ্যোতিষীর মতে কি ফাঁড়া ছিল যার দরুন উনিশ পেরুবার আগে তাঁর বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানোর উপায় ছিল না। মনোরমার দাদা এবং দাদুর ভাইয়ের উৎসাহের কল্যাণে মনোরমা ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে পড়ছিলেন। বাড়িতে সেটা কারো পছন্দ ছিল না, কিন্তু দাদা বা দাদুর ভাই সেই দাদু কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারেন নি।

মনোরমার মুখখানা সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু গায়ের রং কালো। এই কারণে তাঁর বাবা মা বা নিজের দাদু বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তার ওপর উনিশ না পেরুলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া মেম-সাহেবের স্কুলে পড়ার দরুন মেয়েটার মতি-গতি চাল-চলনও তাঁদের তেমন পছন্দ ছিল না।

যাই হোক, সেই সতেরো বছর বয়েস থেকেই মনোরমা অনুভব করতে পারতেন বাইরের এক ছেলের তাঁর প্রতি আগ্রহ দানা বাঁধছে। ভাইয়ের মাস্টারের কাছে তিনি কোন পড়া বুঝতে এলে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা আর গোপন থাকত না। সকলের অলক্ষ্যে দুটি জীবনে প্রজাপতির কৌতুকবর্ষণ শুরু হয়েছিল।

অর্ধেন্দুবাবুকে সেই বনেদী বাড়ির মানুষেরাও অপছন্দ করতেন না কেউ। ফর্সা রূপবান ছেলে, অথচ গরিব বলে কোনরকম দেমাক বা হীনমন্যতা নেই। বাড়ির অন্দরমহলেও তাঁর গতিবিধি সহজ হয়ে গেছল। মা-কাকীমারা অন্যকে দিয়ে না পারলে তাঁকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটাতেন।

অর্ধেন্দুবাবু এম. এ. পাশ করলেন। যতটা ভাল ফল হবে আশা করা গেছল

ততটা হল না। কিন্তু মনোরমার সিনিয়র কেম্ব্রিজের ফল আশাতীত রকমের ভাল হয়েছিল। আর মনোরমার ধারণা, তার প্রশংসার আধাআধি অন্তত ভাইয়ের মাষ্টারটির প্রাপ্য।

...এর পর ওই বনেদী বাড়িতে আরো দু'বছর ছিলেন অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য। একটা স্কুল-মাস্টারি নিয়েছিলেন আর বাড়িতে পড়াশুনা করে কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তেমন কৃতকার্য হতে পারেন নি। ততদিন প্রজাপতির কৌতুক আরো অনেক বেড়েছে। মনোরমা মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবতেন। তাঁর ধারণা এই কারণেই কমপিটিটিভ পরীক্ষার ভদ্রলোক তেমন কৃতকার্য হতে পারছেন না। অথচ তাঁরই সহায়তায় বি.এ. পরীক্ষাযও আশাতীত ভাল করলেন মনোরমা।

এবারে তাঁর বিয়ের প্রশ্ন! এতদিনে মা-বাবা-দাদা-কাকা-কাকীমাদের মনে একটু খটকা লেগেছে। বাড়ির আশ্রিত ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের মেলামেশাটুকু এখন আব খুব সহজ চোখে দেখছেন না তাঁরা। এ এমনই এক জিনিস যা খুব বেশিদিন খুব গোপনে থাকে না। তবে সত্যিই কিছু গোলযোগ উপস্থিত হতে পারে সেটা কেউ ভাবেন না। একে তো স্কুল-মাষ্টার তায় ভট্টাচার্য। স্কুল-মাষ্টার ছেড়ে ডাকসাইটে চাকুবে হলেও মুখুজ্যের মেয়েকে ভট্চাযের হাতে দেওয়াটা মেয়েব হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওযারই সামিল ভাবেন তাঁরা।

টাকার জোব আছে, তার ওপর বিদুষী মেয়ে—ভাল সম্বন্ধই এল একটা। জানাব পর অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য আর স্থিব থাকতে পারলেন না। মনোরমাকে ডেকে এই প্রথম সোজাসুজি নিজের মনের অবস্থা ব্যক্ত করলেন। তিনি যোগ্য নন, কিন্তু মনোরমার প্রতিশ্রুতি পেলে প্রাণপণে যোগ্য হতে চেষ্টা করবেন সে-কথাও বললেন।

মনোরমা মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে ছিলেন শুধু। আর ভিতরে ভিতরে কি-রকম অসহায় বোধ করেছিলেন। তখকার মত অন্তত কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি।

এদিকে দেনা-পাওনা ঠিক করে নির্ধারিত দিনে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলেন। দেখলেন। মেয়ে তেমন ফর্সা নয় এ তাঁরা জেনেই এসেছিলেন, কিন্তু যা দেখলেন তার থেকে ফর্সা হবে ভেবেছিলেন। অতএব পণের অঙ্ক তাঁরা অনেক চড়িয়ে দিলেন।

বাবা-মায়ের আপত্তি ছিল না, কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসলেন। টাকা পেলে যাদের বিবেচনায় রংয়ের ঘাটতি পূরণ হয়, সেখানে তিনি বিয়ে করবেন না।

...আর সেদিনই অর্ধেন্দুবাবুকে পরামর্শ দিলেন এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। দু'বছর অর্থাৎ তাঁর এম. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর বিয়ে হবে।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য তাই করেছেন। ও-দিকে বড় হবার জন্য প্রাণপণ সঙ্কল্পও করেছেন। কিন্তু একটি একটি করে দুটো বছর কাটাবার তাগিদ যাঁর, তিনি আর কোন্ কাজে মন দিতে পারবেন? মনোরমা সেটুকু উপলব্ধি করতে পারতেন, আর মনে মনে হাসতেন। যুনিভার্সিটিতে পড়তে বিকেলের দিকে রোজই প্রায় দেখা হত দু'জনার। মনোরমার ধারণা, তিনি তাঁর ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত এ-লোকের দ্বারা আর কিছু

হবে না। এ-ছাড়া বড় রকমের একটা দুর্ঘটনাও ঘটে গেল ভদ্রলোকের জীবনে। তাঁর পরের ভাইটি ব্যবসা করত। প্রাণপাত পরিশ্রম করে প্রায় শূন্য পুঁজি নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠেছিল। ওই ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই বড় হবার স্বপ্ন দেখতেন অর্ধেন্দুবাবু। অবকাশ সময়ে ওতেই লেগে থাকতেন। সেই ব্যবসা ফেল করল। ভাইটি আত্মহত্যা করে বসল। শোকে আর হতাশায় ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লেন অর্ধেন্দুবাবু। সেই দুঃসময়ে মনোরমার সান্ত্বনা এবং আশ্বাস তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ওদিকে মনোরমারও অনেক গঞ্জনা সহ্য করে দিন কাটাতে হয়েছে। বিয়েতে আপত্তি কেন সেটা বাড়ির লোকের আর জানতে বুঝতে বাকি থাকেনি। অর্ধেন্দু ভট্টচার্যকে তাঁরা বেইমান বলেছেন, বিশ্বাসঘাতক বলেছেন। মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, রাগারাগি করেছেন, অনেক রকম হুমকিও দিয়েছেন।

কিন্তু মনোরমার সঙ্কল্প অটুট। এম.এ. পাশ করার পর কথা রাখলেন। অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের ঘরে এলেন। রোষে ক্ষোভে বাড়ির মানুষ ত্যাগ করলেন ওঁদের দুজনকেই।

একজন ছাড়া।

দাদুর সেই ছোট ভাই। তাঁকে ছোটদাদু ডাকতেন মনোরমা। তিনি রিটায়ার্ড প্রিন্সিপাল। নিজের বাড়িতে থাকেন। স্ত্রী নেই। দুই ছেলেই বিদেশে বড় চাকুরে।

তিনি পথ দেখালেন। ওদের ডেকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা ছোটখাট স্কুল করো একটা—এই বাড়িতেই হতে পারে। আমি তোমাদের পিছনে আছি।

কমলার পদক্ষেপ সেই থেকে শুরু। ছোট স্কুল বড় হয়েছে, বড় থেকে আরো ঢের ঢের বড়। ছোটদাদুর বাড়ি ছেড়ে স্কুলের নিজের বাড়ি হয়েছে। এখন তিন-তিনটে প্রাসাদভবন। তাও ভর্তি হতে না পেরে প্রতি বছর শ'য়ে শ'য়ে ছেলে-মেয়ে ফিরে যায়। স্কুলের প্রতি বছরের রেজাল্ট দেখার মত। মোটা মাইনেয় প্রতিটি বিষয়ের সেরা অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা বহাল আছেন এখানে।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য কত সময়ে বলেছেন, আমি কিছু না, সব তোমার জন্যে—

মনোরমা পাল্টা প্রসন্ন জবাব দেন, কেবল তুমি আমার জন্য।

...বছর পাঁচ-ছয় হল হাই ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন অর্ধেন্দুবাবু। মনোরমা আর তাঁকে স্কুলে পড়াতে দেন না। তাঁর ব্যবস্থা হুকুমেরই সামিল। কেউ সেটা অমান্য করার কথা ভাবে না।

...তিন ছেলে আর দুই মেয়ে ছিল অর্ধেন্দুবাবুর। ভর-ভরতি সংসার। মনোরমা বড় দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছেন নিজের স্কুলে দুটি শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে। একজনও বামুনের মেয়ে নয় তারা। ছেলেদের পছন্দের আঁচ পেয়ে নিজে এগিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। নিজের বাপ-মায়ের ওপর যে অভিমান জমাট বেঁধেছিল, এ যেন তারই জবাব। অর্ধেন্দুবাবু অবশ্য এ নিয়ে রীতিমত খুঁতখুঁত করেছিলেন। মনোরমা সাফ জবাব দিয়েছেন, আমাকে তোমার হাতে দেওয়াটা এর থেকেও বেশি দোষের ভাবতেন আমার বাবা-মা। জাত নিয়ে মাথা ঘামিও না।

অতএব প্রসন্ন মনেই তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে অর্ধেন্দুবাবুর। তাছাড়া বউমা-রা

মেয়ে ভাল। তাদের তিনি হামেশাই বলেন, এ-বাড়ির যা-কিছু দেখছ সব তোমাদের শাশুড়ীর জন্য—তাঁর প্রিয় হতে পারাটাই সব থেকে বড় কথা জেনো।

প্রাণপণে দুই বউ শাশুড়ীর প্রিয় হবার চেষ্টা সর্বদাই করে থাকে। বড়মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ দেখে-শুনে অর্ধেন্দুবাবুই দিয়েছেন। প্রোফেসর। কিন্তু তার রোজগারপাতি তেমন নেই, কলেজের মাষ্টারীর কতই বা মাইনে। এ বিয়েটা খুব মনঃপূত হয়নি মনোরমার। কারণ বড়জামাইয়ের বড় হবার দিকে তেমন মন নেই। ও-দিকে বাড়ির অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয়। মাসের শেষে পাঁচশো টাকা করে বড়মেয়ের নামে পাঠিয়ে দেন মনোরমা।

বড় দুই ছেলে আর বড়মেযের পরে দীপিকা। তার পরে আর একটি ছেলে সুদীপ। সব ছেলেমেয়েই আদরের, কিন্তু এই ছোট মেযে আর ছোট ছেলেটা যেন চোখের মণি অর্ধেন্দুবাবুর। তার কারণ বোধহয় দু'জনেরই হুবহু তাদের মায়ের আদল। গায়ের রঙও তেমন ফর্সা নয়। বিশেষ করে দীপিকার মুখে যেন তার মায়ের সেই ছেলেবেলার মুখখানাই বসানো।

...বছর তিনেক আগে এই সুখের সংসারে আচমকা যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল একটা।

দিনকাল খারাপ। চারদিকে মারামাবি কাটাকাটির মৌসুম চলেছে। রাজনীতির নামে হত্যাকাণ্ডের উৎসব শুরু হয়েছে। খবরের কাগজ হাতে নিলেই অর্ধেন্দুবাবুর মেজাজ বিগড়ে যায়—কেবল খুনের হিসেব আর মৃত্যুর হিসেব।

হঠাৎ ব্লাডপ্রেসারে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। রক্ত টেনে নেওয়া হতে লাগল। সেই সময়ে ওই অকল্পিত দুর্যোগ। মনোরমা আর দুই ছেলের কাছে খবর এল সুদীপকে পুলিসের গুলিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেদের নিয়ে মনোরমা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন সব শেষ।

অর্ধেন্দুবাবুকে এ-খবর জানানো হয়েছে প্রায় মাস খানেক বাদে—তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর। ডাক্তারের নির্দেশে প্রাণপণে একটা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে সকলকে। অর্ধেন্দুবাবু জেনেছেন, ছোটছেলে সুদীপ তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গেছে। তাঁর অসুখের মধ্যে মনোরমা ছেলেকে বাইরে যেতে দিলেন কি করে তিনি ভেবে পাননি।

কিন্তু মাসখানেকের বেশি আর গোপন করা সম্ভব হয়নি।

বেশ কয়েক মাস গুম হয়ে কাটিয়েছিলেন অর্ধেন্দুবাবু তারপর। কিন্তু মনোরমার সহিষ্ণু সজাগ তত্ত্বাবধানে শোক অনেকটা সামলেও উঠেছিলেন আবার।

—এখন একটা মাত্র কাজ বাকি। ছোটমেয়ে দীপিকাকে সুপাত্রস্থ করা। তারও সময় ঘনিয়ে এসেছে মনে হয়। উল্টোদিকের বাড়ির বাসিন্দা ডাক্তার অনিমেষ সরকার। মোটামুটি নামী ডাক্তার। তবে ভদ্রলোক খুঁতখুঁতে একটু। বছর দেড়েক হল ওই বাড়িতে উঠে এসেছেন। তারপর থেকেই এ-বাড়ির সঙ্গে হৃদ্যতা। কারো কোন অসুখ-বিসুখ

হলে আগে অনিমেষ সরকারের ডাক পড়ে। তারপর প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য ডাক্তার ডাকা হয়। ভদ্রলোক খুঁতখুঁতে প্রকৃতির বলেই এ-ব্যাপারে নিরভিমান। কোন্ রোগের কোথা থেকে উৎপত্তি এ নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামান ভদ্রলোক।

তাঁরই ছেলের সঙ্গে ইদানীং বাড়ির সকলের একটু বেশি সদ্ভাব দেখছেন আজকাল। ছেলেটি চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট—বাপের কিছু টাকার জোর আছে তাই পাস করার কিছুদিনের মধ্যে নিজে ফার্ম খুলে বসেছে। উন্নতিও অবধারিত। এরই মধ্যে মনোরমা তাঁর স্কুলের কাজ তাকে দিয়েছেন।

ছোটমেয়ের বিয়ের চেষ্টার শুরুতেই মনোরমা স্বামীকে থামিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, সময় যখন হবে আমি দেব, তোমাকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

অর্ধেন্দুবাবু আর মাথা ঘামান নি। কিন্তু সময় এগিয়ে আসছে সেটা তিনি অনুভব করছেন। ডাক্তার সরকারের ছেলে অজয় সরকারকে মনোরমার পছন্দ, আর তাঁর পছন্দ মানেই ছেলেদেরও পছন্দ। অর্ধেন্দুবাবুর ধারণা, পছন্দ একটু-আধটু দীপিকারও। অনেক সময় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতে দেখেন তাকে। ছেলেটাকেও ওদের বাড়ির বারান্দায় দেখেন মাঝে মাঝে।

কিন্তু নিজের শরীরটা নিয়েই দেখতে দেখতে বেশি অস্থির হয়ে পড়লেন অর্ধেন্দুবাবু। সর্বদাই মনে হয় ব্লাডপ্রেসার বেড়ে চলেছে। প্রেসার কিছুটা বাড়তির দিকে বটে, কিন্তু যতটা তিনি মনে করেন ততটা নয়। অনিমেষ সরকার সময় পেলে সন্ধ্যার দিকে একবার করে আসেন। শরীর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ অর্ধেন্দুবাবুর তাঁর কাছে। ঘুমের ওষুধ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, বলেন, ঘুম হয় না।

মনোরমা বলেন, কিন্তু ঘুম যে একেবারে হয় না তা তো না, আমি দেখি তো...

ও-টুকুতেই ইদানীং অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন অর্ধেন্দুবাবু। —আমি কি মিছে কথা বলছি তাহলে?

মনোরমা চুপ করে যান। মনে মনে উতলা হন। কারণ এই সুরে কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন্।

সেবারে ডক্টর মালিককে এনে দেখানোর পর কিছুটা সুস্থ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই আবার বাড়াবাড়ি শুরু হল। ব্লাডপ্রেসার বাড়তির দিকে। তিন রাত্রি পর পর ঘুম নেই। ডক্টর সরকার বড় ডোজের ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, তাতেও ফল হয়নি।

সমস্ত রাত এক-রকম পায়চারি করে কাটাচ্ছেন। চোখ লাল, মুখ লাল। মনোরমা ঘাবড়েই গেছেন একরকম। ডক্টর সরকার আসতে সেই সন্ধ্যায় ঘোরালো চোখে তাকালেন তাঁর দিকে, আপনাদের শাস্ত্রে একটু ঘুমের ব্যবস্থা আছে কি নেই? না হয় মরফিয়া দিয়ে ফেলে রাখুন আমাকে!

ডক্টর সরকার চিন্তিত।

অর্ধেন্দুবাবু আবার বললেন, দেখুন, নিজেকেই আমার কেমন ভয় করে আজকাল...নিজের ছোটভাইটার কথা মনে পড়ে।

তাঁর মন ঘোরাবার জন্যেই ডক্টর সরকার জিজ্ঞাসা করেন, ভাইয়ের কি হয়েছিল?

—ব্লেডে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছিল।

বড় দুই ছেলেও ঘরে ছিল তখন, শুনে তারা চমকে উঠেছিল।

মনোরমা প্রসঙ্গ বাতিল করার জন্যেই গম্ভীর তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন, তার ব্যবসা ফেল করেছিল বলে মাথার ঠিক ছিল না, তোমার কি হয়েছে? তুমি নিজে একটু চেষ্টা না করলে ভালো হবে কি করে? তাছাড়া ডক্টর সরকারও এমন কিছু খারাপ দেখছেন না...

সেই রাতে তাঁকে ইঞ্জেকশন দিয়েই ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন ডাক্তার।

তার চারদিন বাদে এই ঘটনা। হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বেরিয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম যে হয়েছে ঘটনাক্রমে তারও নাম সুদীপ ভট্টাচার্য। আর সেই কাগজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেন্দুবাবুর এই অবস্থা।

বিকেলের দিকে মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ ডক্টর মালিককে ছেলেরা ধরে নিয়ে এল। আড়ালে বসে ডক্টর মালিক নতুন উপসর্গের কথা শুনলেন। তারপর রোগী দেখতে ঘরে ঢুকলেন। অর্ধেন্দুবাবু প্রথমেই নিজের ছোটছেলের কৃতিত্বের কথা বললেন তাঁকে।

ডক্টর মালিক বললেন, চমৎকার খবব।

সেই সন্ধ্যার মধ্যেই রোগীকে নিজের নার্সিংহোমে নিয়ে যাওযার ব্যবস্থা করলেন ডক্টব মালিক। অর্ধেন্দুবাবু এবাবে আর তেমন আপত্তি করলেন না। চেঞ্জের ফল ভাল হবে বলে তাঁকে বোঝাতে তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রির ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

—খুব ভাল ব্যবস্থা করব।

রাত্রি।

সুন্দর ঝকঝকে একটা ছোট ক্যাবিনের শয্যায় একলা বসে আছেন অর্ধেন্দুবাবু। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই হয়। ঘুম পাচ্ছেও খুব। কিন্তু একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। ভারী দুই গালের খাঁজে খাঁজে হাসি চুঁয়ে পড়ছে। আসার আগের মুহূর্তেও ছেলেদের আর ছেলের বউদের আর দীপিকাকে বার বার বলে এসেছেন, সর্ব ব্যাপারে মায়ের কথা শুনে আর মায়ের পরামর্শ নিয়ে চলে যেন তারা।

—বাড়ি থেকে গাড়িতে ওঠার আগে উল্টোদিকের দোতলার বারান্দায় ডাক্তার সরকারের বিমর্ষ মুখখানাও চোখে পড়েছে তাঁর। না, তাঁর ঘুমের ওষুধ তিনি কোনদিনই ব্যবহার করেন নি। ...লোক-চরিত্র সম্পর্কে যদি এতটুকু জ্ঞান থাকে অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের, তাহলে, মানসিক বিকারে ছোটভাইয়ের আত্মহত্যার খবর শোনার পর আর তাঁকে নিজের এই অবস্থায় মানসিক চিকিৎসক ডক্টর ম্যালিকের ক্যাবিনে চলে আসার পর নিজের ছেলের বিয়ে আর দীপিকার সঙ্গে দেবেন না, এ-সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়।

দীপিকা ভট্চায আর সরকার-বাড়ির বউ হবে না।

...দরকার হলে এর পর তিনি তাঁর এই বানানো রোগের মূল কারণও ডক্টর মালিককে বুঝতে দেবেন—যেটা মনোরমার কানে যাবেই। তারপর আর কোনরকম বিঘ্ন হবে না—স্ব-ঘরে দীপিকার নিশ্চয় খুব ভাল বিয়ে হবে।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য হাসছেন বটে কিন্তু সব-কিছুর জন্যে একজনকেই দায়ী করছেন তিনি। এই মুহূর্তে অন্তত তাঁকে ক্ষমা করতে পারছেন না।

তিনি তাঁর স্ত্রী মনোরমা।

আত্মনিগড়

যখন বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ান বিশাখা বোস, ঘরে তখন আর কেউ থাকে না। আর কেউ বলতে বাপের আমলের প্রায় বুড়ো চাকর রতন, আর মাঝবয়সী ঝি বীণা আর বিশ বছরের ভাইপো অরবিন্দ। থাকে না কারণ ঘরের দরজা তখন বন্ধ থাকে। দরজা বন্ধ দেখলেই এরা ধরে নেয় বাড়ির কর্ত্রী কাজে মগ্ন। অর্থাৎ লেখায় মগ্ন। নেহাৎ গণ্যমান্য কেউ হঠাৎ বাড়িতে এসে না গেলে এ তন্ময়তা ভঙ্গ করার সাহস কারো নেই। এই তো, মাত্র দিন চারেক আগের কথা, বন্ধ দরজার ওধার থেকে টকটক শব্দ হয়েছিল। বিরক্ত গম্ভীর মুখে বিশাখা দরজা খুলেছিলেন। গণ্যমান্য ছাড়াও কেউ কেউ হুট্ করে এসে হাজির হয়। ...অমুক নতুন কাগজে লেখা দিতে হবে, অমুক সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে হবে, ইত্যাদি ঝামেলা লেগেই থাকে। অরবিন্দ বাড়ি থাকলে এবং ঘরের দরজা বন্ধ দেখলে এ-সব আগন্তুককে পত্র-পাঠ বিদায় করে দেয়। এ-সবের জন্য দেখা করার নির্দিষ্ট একটা সময় আছে জানিয়ে সে-সময়ে আসতে বলে। কিন্তু ও বাড়ি না থাকলে রতন বা বীণা সব সময় সকলকে এঁটে উঠতে পারে না। অসময়ে বাজে লোকের উৎপাতের জন্য পরে অনেক সময় ওদের ধমক খেতে হয়।

অরবিন্দ বাড়ি নেই এবং না-ছোড় কোন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে ধরে নিয়েই সেদিন দরজা খুলেছিলেন বিশাখা বসু। তারপরেই অবাক। দরজার বাইরে বিমর্ষ উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে তাঁর ড্রাইভার অনাদি ভঞ্জ। অদূরের দরজার আড়ালে অরুর ঈষৎ বিড়ম্বিত মুখখানা দেখা যাচ্ছে আর অন্য দিকে বীণার মুখও। ড্রাইভারের দোতলায় ওঠার নজির নেই বললেই চলে। সে বাড়িতে থাকে না। সকালে আসে রাতে ছুটি মিললে ঘরে যায়। দু'বেলার খাওয়া আর টিফিন এখানেই মেলে। কিন্তু তার জন্য দোতলা মাড়ানোর দরকার হয় না। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে আর কোথাও বেরুনোর সম্ভাবনা একেবারেই নেই বুঝলে কর্ত্রীই ড্রাইভারকে ছেড়ে দেন। সপ্তাহে কম করে দিন তিনেক

অন্তত এমনি টানা ছুটি মেলে। কিন্তু হুকুম না হলে হাজিরা বা ছুটির ব্যাপারে কড়া মনিব তিনি। তবু আরামের চাকরি। আর পাঁচটা ড্রাইভারের মতোই ভালো মাইনে তার ওপর বাড়িয়ে দু'বেলা খাওয়া আর টিফিন আর মাঝে মাঝে এই গোছের ছুটি—ড্রাইভার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই ডিউটি হৃষ্ট চিত্তেই মেনে নিয়েছে।

দরজায় টোকা দেবার সময়েই হাত প্রায় আড়ষ্ট অনাদি ভঞ্জর। কর্ত্রীর গুরুগম্ভীর চাউনি দেখে বিমর্ষ মুখ আরো চুপসে গেল।

কি ব্যাপার?

কাতর মুখে অনাদি যা নিবেদন করল তার সারমর্ম, তার তৃতীয় ছেলেটার ক'দিন ধরে একশ দুই তিন জ্বর চলছিল, আজ প্রায় চার হতে ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার বলেছে ভালো জ্বর না—আজ থেকেই দু'বেলা দুটো করে ইনজেকশন দিতে হবে, মাসের শেষ, গোটা পঁচিশেক টাকা এক্ষুনি না পেলে বিপদ...।

বিশাখা থমকে চেয়ে রইলেন খানিক, মুখের অপ্রসন্ন ভাব তরল হল না একটুও। ঘুরে একবার টেবিলের টাইম-পীস্‌টার দিকে তাকালেন। সকাল ন'টা বাজে। আটটায় ওব ডিউটি। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এক্ষুনি এলে না কি?

শুকনো মুখে জিভে করে ঠোঁট ঘসল অনাদি ভঞ্জ। ওটুকুই জবাব।

বিশাখা বসু ভিতরে চলে গেলেন। হ্যাঁচকা টানে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। একটু বাদে সশব্দে আবার সেটা বন্ধ করলেন। তারপর তেমনি গম্ভীর মুখেই দু'টো দশ টাকার নোট আর একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিলেন। —তুমি তাহলে আজ আব আসছ না?

আজ্ঞে আসব, ওষুধটা কিনে নিযে যাব আর আসব।

আপাতত পালিয়ে বাঁচল সে। বিশাখার দু'চোখ ওদিকের দরজার আড়ালে ভাইপোর দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ভিতরে সরে গেল। অর্থাৎ ড্রাইভারের বিপদটাকে ও (এবং হয়তো বীণাও) পিসিমনির কাজের থেকে বড করে দেখার অপরাধে অপরাধী।

বিরক্তিতে বিশাখা নিজের মনেই অস্ফুট গলায বিডবিড করে বলে উঠলেন, সংসার করছে সব—সংসার!

ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করলেন আবার।

কিন্তু লেখার কাজ ছাডাও বিশাখা বসু মাঝে মাঝে ঘরের দরজা বন্ধ করেন। সে-খবর একমাত্র তিনি ছাড়া বোধহয় আর কেউ রাখে না।

বন্ধ করেন, যখন ঘরের ড্রেসিং টেবিলের অথবা ওই আলমারির বড় আয়নার সামনে দাঁড়ান। সে-রকম পরিতুষ্ট নিবিষ্টতার ঝোঁক এলে কতক্ষণ দাঁডিয়ে আছেন হুঁশ থাকে না। কোথা থেকে কোন্ রাজ্যে চলে যান সে সম্পর্কেও সচেতন নন সর্বদা।

কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে এমন নিবিষ্ট চিত্তে কি দেখেন বিশাখা বসু? আর অমনি দেখতে দেখতে তাঁর চোখে মুখে মাঝে মাঝে বেশ একটু পরিতৃপ্তির হাসির আভাসও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন?

নিজেকে দেখেন?

কিন্তু বিশাখা বসুর তো এখন চুয়াল্লিশ, খুব সুপটু প্রসাধনেও যে-বয়েসটা এখন আর আদৌ ঢাকা যায় না। রূপসী কোন কালে ছিলেন না, তবু নতুন বয়েসের শ্রীটুকুও এখন আর খুঁজে পেতে বার করা সম্ভব নয়। এককালে ভালো স্বাস্থ্য ছিল, তার বাঁধুনি এখন ঢিলে-ঢালা। লক্ষ্য করলে গলার চামড়ায় দুই একটা ভাঁজ দেখা যায়। আর লক্ষ্য না করলেও মাথার চুলে রুপালি রেখাগুলো এখন আপনিই চোখে পড়ে। এক কালে এক-পিঠ চুল ছিল বটে। ওই চুল আর সুঠাম স্বাস্থ্যের বেশ একটা আলগা শ্রীও ছিল বটে—যে শ্রী দেখে একটা ছেলে অন্তত মুগ্ধ হয়ে আর শেষে হতাশ হয়ে আর সব শেষে মরীয়া হয়ে দস্তুরমত তাঁর ওপর হামলাই করে ছিল এক রাতে। কিন্তু সে কোন্ একদিনের কথা, বাইশ বছর আগের কথা।

সে হামলার ঝোঁকে নিজেও তিনি মুখ থুবড়ে পড়লে কি হত দশাখানা, কি হতে পারত সেই সম্ভাব্য চিত্রটা মনে এলেও অনেক সময় শিউরে ওঠেন তিনি।

যাক, রূপের প্রতি তাঁর একটু লোভ ছিল। আর সে লোভের রেশ যে এখনো একটু-আধটু আছে সেটা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু তা বলে ঘন্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো সত্যিও নয়। চুলে পাক ধরতে তাঁর একটু দুঃখই হয়েছিল সত্যি কথা। ভালো কলপ লাগানোর কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিন্তাটা বাতিল করেছেন সে-ও সত্যি কথাই। কলপ লাগালে একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হয়—সে লজ্জার ঊর্ধ্বে ওঠার মানসিক বল তাঁর আছে।

তবু, দরজা বন্ধ করে এক একদিন বহুক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়ান বিশাখা বসু, তার একটাই বিশেষ কারণ। ওই ভাবে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যান তিনি। ছাড়িয়ে গিয়ে কোন্ এক আনন্দ জগতে পদার্পণ করেন। সেখানে নিজের মধ্যেই আর একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেন—যে মেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বদিকে সম্পূর্ণ। যার দীপ্তি আর সত্তা আর রমণী-রীতি সর্বত্র পুরুষের চোখে বড় লোভনীয় রকমের ব্যতিক্রম। ভিন্ন ভিন্ন প্রহসনে তার বাইরের চেহারাটা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু তেমনি লোভনীয়, তেমনি অপ্রতিহত, তেমনি বিচিত্ররূপিণী। চির-নায়িকার সেই সব রূপে নিজেকেই দেখতে পান। তারপর অক্ষরের বুনটে সেই সব চিত্রগুলো মূর্ত করে তোলেন।

সমালোচকরা বলেন তাঁর লেখা বাস্তব নয়। লেখকরাও কেউ কেউ তাঁদের সুরে সুর মেলান। এ-ব্যাপারে সব থেকে বেশি নাক উঁচু অবিনাশ বিশ্বাসের। বাস্তব সাহিত্যের রাস্তায় গড়িয়ে নিজের তো হা-ভাতে অবস্থা এখন। কোঁচা দিতে গেলে কাছার কাপড়ে টান পড়ে। অথচ দেমাক ডগমগ। সাহিত্যের বলি ভাবে নিজেকে। ওরই মতো হা-ঘরে কতগুলো মাসিক সাপ্তাহিক প্রশংসা করে করে মাথাখানা বিগড়ে দিয়েছে একেবারে। না, বিশাখা বসুর লেখা নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলেন না অবশ্য। বলেন না তার কারণ, বিশাখার ধারণা, তাঁর লেখা সমালোচনার যোগ্যও ভাবেন না তিনি।

ঈর্ষা। ঈর্ষা ছাড়া আর কি। বিশাখা বসুর বই বাজারে না বিকোলে প্রকাশকরা মুখ দেখে তাঁর লেখা ছাপত না। এই লেখার দৌলতেই আজ তিনি অনেকখানি

প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ঈর্ষার পাত্রী। বাজারে বেরুনো মাত্র তাঁর বই ঝটপট বিক্রী হয়ে যায় না বটে, তবু যাকে বলে 'স্টেডি সেল্' সে-তালিকায় তাঁর নাম ওপরের দিকে। তাছাড়া বছরে একটা দুটো সিনেমা হয়ই তাঁর গল্পের। সেখান থেকে মোটা টাকা আসে। বাড়িখানা পৈতৃক, কিন্তু নিজের টাকায় এ-বাড়ির তিনি আমূল সংস্কার করে নিয়েছেন, বাড়িতে টেলিফোন এনেছেন। গোটা চারেক ব্যাঙ্কে এ-যাবৎ নগদ টাকাও মন্দ জমেনি। বাংলা দেশের লেখিকা, এর বেশি আর তিনি কি আশা করতে পারেন?

তাই ওই আয়না, ওই আয়নাটাই তাঁর দুনিয়ার সব থেকে বেশি প্রিয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ইদানীং কেমন একটু ক্লান্তি অনুভব করছেন তিনি। আর মেজাজটাও যেন সব সময়ে তেমন ভালো থাকে না। ...বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা...তারপর কি? তারপর আরো যেন কিছু একটু থাকলে ভালো হতো। না সংসার নয়, সংসারের মায়া তাঁর নেই। এই মায়া তিনি সময়ে ছেঁটে দিতে পেরেছিলেন বলেই আজ এটুকু সার্থকতার মুখ দেখেছেন। নইলে ওই অবিনাশ বিশ্বাসের মতোই তাঁরও সব স্বপ্ন যে ধুলিসাৎ হত তাতে একটুও সন্দেহ নেই। ...তবে কি? হয়তো কিছুই নয়। বযসের ক্লান্তি। অথবা শরীরটাই খারাপ হয়েছে। সময় করে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

বন্ধ দবজায বেশ জোরেই শব্দ হল ঠক ঠক করে। বাড়ির কেউ এত জোরে শব্দ কবে না। ভুরু কুঁচকে চেয়ার ঠেলে উঠলেন বিশাখা বসু।

দরজা খুলে অবাক একটু। অবিনাশ বিশ্বাস।

বাংলা দেশের বাস্তব সাহিত্য-শহিদ অবিনাশ বিশ্বাস। শহিদ-মূর্তিই বটে। প্রায় মাস ছয বাদে দেখলেন তাঁকে বিশাখা। এই ছ'মাসে কম করে ছ'বছর বযেস বেড়ে গেছে। চোযালের হাড় বেড়িযে এসেছে, চোখ দুটো গর্তে।

কি ব্যাপার, এ সমযে?

সামনের ইজি-চেযারটায় গা ছেড়ে দিযে বসলেন অবিনাশ বিশ্বাস। —এলাম একবার। সামনের টেবিলের লেখা-পত্রের দিকে চোখ গেল। লিখছিলে বুঝি...ডিসটার্ব করলাম?

বিশাখা জবাব দিলেন না। প্রশ্নের মধ্যে ব্যঙ্গের সুর বাজল কি না ধরতে চেষ্টা করছেন। ভালো কথা, অসুখের মধ্যে তোমার নতুন বইখানা হাতে এল...কি যেন নাম...ফাগুনের আগুন...পড়ে ফেললাম।

ভালো বিক্রীর নতুন বই, মোটা বই। কেমন লাগল শোনার আগ্রহ বিশাখার। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে রাজি নয়। হেসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বল কি! এতটা সময় বাজে খরচ করে ফেললে!

হাসলেন একটু অবিনাশ বিশ্বাসও। —না...পড়তে মন্দ লাগে না, তবে কি জানো, তোমার লেখার বয়েসটা তোমার ওই রোমাণ্টিক নায়ক-নায়িকার মধ্যেই আটকে রইল—

ভিতরে বড় রকমের একটা আঁচড় পড়ল বিশাখার। তবু হেসেই বললেন, বয়েস

বাড়লে মূর্তিখানা কেমন হয় সে-তো সামনেই দেখছি, ওরকম হলে ভালো হত?

অবিনাশ বিশ্বাসের কোটরগত চোখে কৌতুকের আভাস ছড়াল একটু। জবাব দিলেন, ভালো হোক না হোক ইচ্ছে করলেই ও রকম হওয়া যায় না। ...গ্যাস্ট্রিক আলসার না কি বলে তাইতে ভুগছি, দু'দিন ভালো থাকি তো চারদিন বিছানায়। যাক, শ'খানেক টাকা আমাকে দিতে পারো? খুব দরকার...

বিশাখার দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকাল একটু। তারপরেই রূঢ় জবাব দিতে ইচ্ছে করল, না দিতে পারেন না, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল, না-বালিকা লেখিকার টাকা হাত পেতে নেবে কি করে? নায়ক-নায়িকার মধ্যে লেখিকার বয়েস আটকানোর খোঁচা দিয়ে প্রকারান্তরে এই কথাই তো বলা হয়েছে তাঁকে।

মুখের এপর সহিষ্ণুতার আবরণটাই ধরে রাখলেন তবু। সহজ সুরেই বলে উঠলেন, হঠাৎ এমন টাকার দরকার পড়ল কেন?

রোগজীর্ণ মুখখানা আরো বিচ্ছিরি দেখাল মানুষটার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি দেখেও বুঝতে পারছ না অবিনাশ বিশ্বাস মরেছে,—আবার জবাবদিহি করতে হবে? যাক, লেখ তুমি, চলি—

ভিতরে ভিতরে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ হচ্ছে বিশাখার। বললেন, বোসো বোসো, দিচ্ছি, একটু চা খাবে?

চা? দিতে পারো। তবে ডাক্তার ব্যাটারা বারণ করে—

থাক, চা খেয়ে কাজ নেই তাহলে। আধাআধি ঘুরে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ টেনে খুললেন। এক গোছা নোট বার করলেন ভিতর থেকে। তারপর গুণে দশ টাকার দশটা নোট রেখে বাকি-গুলো তাচ্ছিল্য ভরে দেরাজে ফেলে দিলেন।

নাও।

টাকা নিয়ে বাংলা দেশের বাস্তব সাহিত্যের পুরোধা অবিনাশ বিশ্বাস চলে গেলেন।

দরজা খোলা। সেদিকে চেয়ে বিশাখা বসুর দু'চোখ জ্বলছে। আবার সেই সঙ্গে উৎকট রকমের একটা আনন্দও হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। এই সেই একজন, তার বয়েস কালের শ্রী দেখে একদিন যে মুগ্ধ হয়েছিল। আর শেষে হতাশ হয়ে এবং সব শেষে মরীয়া হয়ে এক রাতে যে তার ওপর দস্তুরমত হামলাই করেছিল।

দু'জনেরই সামান্য অবস্থা তখন। অবিনাশদের আরো খারাপ অবস্থা। বিশাখার বয়েস তখন বাইশ, অবিনাশের সাতাশ। উনি তখন বিদ্রোহীর মতোই সাহিত্যের আসরে ঢুকে পড়েছেন, আর বিশাখা সবে সাহিত্য চর্চা শুরু করেছেন। অবিনাশ বিশ্বাস বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আর বিশাখা সভয়ে সেটা নাকচ করেছেন। কারণ তিনি তখন সাহিত্য রচনার নয়া স্বপ্নে বিভোর। বলেছেন, বিয়ে করলে সব যাবে, তার থেকে দু'জনেরই অবিবাহিত থাকা ভালো, অভাবে কুঁকড়ে গেলে সাহিত্য চুলোয় যাবে। অবিনাশ বিশ্বাস বলেছেন, সিলি! বিশাখার মত বদল হচ্ছে না দেখে তাঁর অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। শেষে এক রাতে নিরিবিলিতে তাঁকে এই বাড়ির ছাদে পেয়ে আচমকা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা ধরাশায়ী। আঘাতের

ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আরো করতেন কিন্তু ওই নৃশংস মানুষ নিজের মুখ দিয়ে তার মুখ চেপে রেখে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর শরীরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছিলেন। আর বলছিলেন, শুধু স্বপ্ন দেখে সাহিত্যিক হওয়া যায় না...

প্রাণপণ চেষ্টায় এক অন্তিম মুহূর্তেই বুঝি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন বিশাখা বসু। হাত আর পায়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় বুকের ওপর থেকে লোকটাকে ছিটকে পড়তে হয়েছিল। তারপর চোখের পলকে আলুথালু বেশেই বিশাখা নীচে ছুটে পালিয়েছিলেন।

তারপর বাস্তবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অবিনাশ বিশ্বাস। খুব একটা সাধারণ মেয়েকে ধরে এনেছেন। এখন তাঁর চার ছেলে দুই মেয়ে। বাস্তবে ঝাঁপ দেবার ফলে অবস্থা কোন্ চরমে ঠেকেছে সে-তো নিজের চোখেই দেখলেন।

মাসখানেক পরের কথা।

টেলিফোনে এক সাহিত্যিকের মুখ থেকে শুনলেন অবিনাশ বিশ্বাস আবার শয্যা নিয়েছেন। অবস্থা খুব ভালো না। তার ওপর ছেলেমেয়ের ভাবনায় চোখে ঘুম নেই। বলছিলেন না কি চোখ বুজলে ওদের ভিক্ষে করতে বেরুতে হবে।

বিকেল পর্যন্ত থমথমে মুখ বিশাখার। কি ভাবছেন তিনিই জানেন। তারপর গাড়ি নিযে বেরিয়ে পড়লেন।

ঠিকই শুনেছিলেন। এমন দুরবস্থা তিনি কল্পনা করতে পাবেননি। সর্বত্র যেন প্রেতছায়া পড়ে আছে একটা। চাদর-শূন্য ছেঁড়া বিছানায় উবুড় হয়ে আছে এক কঙ্কাল মূর্তি। অবিনাশ বিশ্বাস। লিখছেন তিনি।

তাঁকে দেখে কলম ফেলে সোজা হয়ে বসলেন। মুমূর্ষু মুখে খুশির অভিব্যক্তি। —এসো, দু'দিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম...তোমার টাকটা বোধহয় আর এ জীবনে শোধ করা গেল না।

হাত দশেক দূরে কঙ্কালসার আর একটি নারী মূর্তি। তাঁর স্ত্রী। এ দিকেই চেয়ে আছেন। থতমত খেয়ে বিশাখা বললেন, অসুখ শুনে দেখতে এলাম, শরীর তো খুব খারাপ দেখছি।

হ্যাঁ। ঘাড় ফিরিয়ে অদূরের রমণীর দিকে তাকালেন। —কই গো, বিশাখা এলো,একটু চা বানাও দেখি।

মহিলা উঠে গেলেন। বিশাখা বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারলেন না।

অবিনাশ বিশ্বাস আবার বললেন, এই লেখাটা যদি শেষ করে যেতে পারি তাহলে কিছু টাকা পাব—শেষ হবে কি না কে জানে, এখনো অর্ধেক বাকি, হলে পাবলিশারকে বলে দেব, তোমার টাকা যেন আগে দিয়ে দেয়।

বিশাখা এ-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করলেন। সমূহ অসুখটার কথাই উঠল আবার।

অবিনাশ বিশ্বাস সখেদে বললেন, নিজের জন্যে তো ভাবি না, যা হয় হবে—ছেলেমেয়ে ক'টার জন্যেই চিন্তা।

বিশাখার ইচ্ছে হল ফস করে বলে বসেন, কেন, বাস্তব সাহিত্য শহিদের আবার এই দুশ্চিন্তা কেন? কিন্তু আঘাত দিতে মন সরল না। তিনি আঘাত দিতে আসেননি, বরং উদার হতে এসেছেন। উদার হয়ে লোকটার চোখ খুলে দিতে এসেছেন।

একটা অবিশ্বাস্য প্রস্তাবই শুনলেন যেন অবিনাশ বিশ্বাস। কোটরগত দু' চোখে কৃতজ্ঞতা উপচে উঠল। ঈষৎ আগ্রহে বললেন, তুমি তাহলে মেজ আর সেজ ছেলে দু'টোর ভার নাও—তাদেরই একটু আরামে থাকার দিকে ঝোঁক বেশি। ...বড় ছেলেটা একটু-আধটু লিখছে-টিকছে...ভালোই লিখছে...ও এখানেই থাক, জীবন দেখুক, নইলে লিখবে কি করে—বল।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন বিশাখা বসু জানেন না। চায়ের কথা মনেও ছিল না। হঠাৎ উঠে হন হন করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠেছেন। গাড়িতে বসে সমস্ত পথ জ্বলছিলেন।

নিজেই ঘরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করলেন।

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেন।

সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল কেন তাঁর হঠাৎ? নিজের দিকে চেয়ে আজ কি দেখলেন তিনি? কি দেখছেন?

দেখছেন, তাঁরই মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বদিকে পরিপূর্ণ পুরুষের চোখের লোভনীয় সেই এক চির-নায়িকা মেয়েকে। তাঁরই দিকে চেয়ে আজ সে যেন আর্তনাদ করছে। ...বিশাখা বসুর এই চুয়াল্লিশের কাঠামোয় সে চিরবন্দিনী। তার মুক্তি নেই।

প্রতিনিধি

স্মৃতিগুলো সব চোখের সামনে সারি বেঁধে এগিয়ে আসছে।

প্রাসাদপুরীর ওপর-নীচ সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হলে সময় লাগে। যথেষ্ট সময় হাতে নিয়েই এসেছে বিশাখা দত্ত। সবে সকাল ন'টা এখন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটি তার। ঝকঝকে বিলিতি গাড়িটা ছাল-চামড়া ওঠা ভাঙ্গা সিংহ-দরজা দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দাদারা আর বউদিরা আর তাদের ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে। আগ্রহ আর আনন্দে ডগমগ সকলে। কে এলো জানতে পারলে আশ-পাশ থেকেও

ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ছুটে আসত হযতো। জানতে পারেনি। ওই ঝকঝকে গাড়ির জানালায় আর পিছনের গ্লাসে মসলিনের পর্দা টাঙানো। তাছাড়া বিশাখা নিষেধ করে দিয়েছিল, ও আসছে কেউ যেন টের না পায।

দাদারা আর বউদিরা পরম আদরে গাড়ি থেকে নামিযে বাড়ির দোতলায় নিয়ে এসেছে তাকে। বিশাখা দত্তর নিজের দাদা আর তাদের স্ত্রীরা। তাদের ছেলেমেয়েরা। সকাল থেকে সকলে উন্মুখ প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছিল। বড়দা একবার টেলিফোনও করেছে। বিশাখা জানিয়েছে সে আসছে।

এসেছে। গাড়িটা সিংহ-দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই অদ্ভুত লাগছিল বিশাখার। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিযে উঠছিল। চোখের কোণ দুটো সির সির করছিল। গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে যেন শিহরণ অনুভব করছিল কিসের।

দীর্ঘ পনেরো বছব বাদে ঘোষাল-প্রাসাদের মাটিতে পা ফেলেছে বিশাখা—বিশাখা দত্ত। এই বনেদী বাড়ি বনেদী ঘরেব মেযে বিশাখা ঘোষাল। মাঝে বিশাখা রায় হযেছিল। এখন বিশাখা দত্ত। এত বড রক্ষণশীল যৌথ পরিবারেব সব ভেঙেছে একে একে। অনেক সংস্কার ঘুচে গেছে। এখানে এখন তার পদবী নিযে মাথা ঘামাবার লোক নেই একটিও। একজনের চোখেও আর তার পেশা অগৌরবের নয় একটুও। বরং ও এসেছে বলেই বাড়ির প্রতিটি প্রাণী ধন্য, কৃতার্থ।

এদের আদর-আপ্যাযনের ঘটা দেখে বিশাখার হাসি পাচ্ছিল। হাসছিলও। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে তির্যক বেখাপাত ছিল না। বরং সকলের জন্যেই মাযা হচ্ছিল তার। সময় অনেক গ্লানি মুছে দেয। আর অভাব অনেক কলঙ্কের মূল্য ঘোচায়। আজ বিশাখা দেবী সমস্ত ভারতে একটা নাম। সমগ্র রাজ্যের গ্রাম গ্রামান্তরের মেযে-পুরুষেরাও এই নাম জানে, এই মুখ চেনে। তার প্রতিভায মুগ্ধ কোটি কোটি মানুষ। রাষ্ট্রের কর্ণধারের হাত থেকে সেই প্রতিভাব পুরস্কার মিলেছে বারকয়েক। কাগজে কাগজে তার ছবির ছড়াছড়ি, সমালোচক তার স্তবে মুখর। আর টাকা? এক সার্থক শিল্পীর পাদমূলে কাঞ্চন-বৃষ্টির পরিমাণ কি-যে হতে পারে সেও এক বিস্ময়কর জটলার প্রসঙ্গ সহস্র সাধাবণের।

কিন্তু একুশ বছরের সেই বিশাখা এই সব নিয়েও আজ ছত্তিরিশ বছরে কতটা বদলেছে? রূপের ছটা আব দেহের বাঁধুনি বযেসকে হার মানিয়েছে। বাংলা আর হিন্দী সীরিয়াস ছবির অপ্রতিহত নায়িকা হিসেবে এখনো অনেক বছর সে জ্বলজ্বল করে টিকে থাকবে তাতে নিজেরও সংশয় নেই এতটুকু। ...দ্বিতীয় স্বামীটির সঙ্গে, মাঝে অবনিবনার ছায়া ঘন হয়ে উঠেছিল। তখন কম করে ডজনখানেক লোলুপ প্রত্যাশী মুখ সে দেখেছে—ছত্তিরিশ হোক আর যা-ই হোক, বয়েসটা তার তিরিশের এধারেই স্থির হয়ে আছে। আশ্চর্য, এ-বাড়ির আঙিনায পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই তার মনে হয়েছে বিগত শৈশব থেকে এ-বাড়ির সেই একুশ বছরের মেয়েটাও তার মধ্যে ঠিক তেমনি করেই বেঁচে আছে। অজস্র স্মৃতি যেন একসঙ্গে ভিড় করে ঠেলে

আসছে।

সংস্কারের একটা টান বিশাখার রক্তের মধ্যেও ছিল। তাই এখনো তার বাড়িটার প্রতি মায়া, আত্মজনদের প্রতি মায়া। বাবা মা আর দাদাদের কোনদিন সে ভোলেনি, ভুলতে চায়নি। বাবা-মা ক্ষমা করলে এই পনেরো বছরের বিচ্ছেদ কবেই ঘুচে যেত।

ঘোষাল-প্রাসাদের এক কালের জমজমাট দিন বিশাখা দেখেনি কোনদিন। কিন্তু অনুমান করতে পারত। ইংরেজ আমলে বহু আনন্দের স্রোত বয়ে গেছে এখানে। সন্ধ্যার পরে বিশাল ঝাড়বাতিগুলোর আলোয় ঘোষাল-প্রাসাদ ঝলমল করত। বিশাখারা সেগুলো জ্বলতে দেখেনি, ধূলো মাটি জমে জমে ওগুলোর কুৎসিত অস্তিত্ব দেখেছে। এখন আরো কুৎসিত হয়েছে। নাচ-ঘরের দামী আয়নাগুলোর বেশির ভাগই বিক্রী হয়ে গেছে, ভাঙাচোরা কিছু আয়না পড়ে আছে। ডাইনিং হলের আসবাবপত্রগুলো ও থাকতেই একে একে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। এখন সেই বিশাল দামী টেবিলটারও অস্তিত্ব নেই। অত বড লাইব্রেরিটা ও থাকতেই বিক্রি হয়ে গেছল। নোনা ধরা চুণ-বালি খসা বিশাল হলগুলো যেন গিলতে আসত। বিশাখার দম বন্ধ হবার দাখিল হত।

...আরো অনেক কারণে দম বন্ধ হয়ে আসত বলেই রক্ষণশীল পরিবারের এই রূপসী মেয়ে নিঃশব্দে এত বড় একটা বিদ্রোহ করে উঠতে পেরেছিল। বাবা-কাকাদের তখন অনেক জ্ঞাতি। ঘোষাল প্রাসাদ অনেক সরিকের সম্পত্তি। এত বড় বাড়ির ট্যাক্স গোনার কড়ি নেই ভাগীদারদের। যৌথ সম্পদ বিক্রী করে করে দিন গুজরান হয়। আশপাশের বাড়তি জমি হাতছাড়া হয়ে চলেছে। সরিকে সরিকে রেষারেষি ঠেসাঠেসি লেগেই আছে। সক্কলের মুখে অবিশ্বাসের বর্ম আঁটা। তারই মধ্যে বারো মাসে তেরো পার্বনের ঠাট বজায় রাখার দায়। ঋণে তলিয়েই যাচ্ছে সকলে।

বিশাখা প্রথম বিদ্রোহ করেছিল এম.এ পড়ার সময়। বাবার পুরনো গাড়িটা তখন একেবারে অচল, নতুন গাড়ি কেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ঘোষাল-প্রাসাদের মেয়ে ট্রামে বাসে য়ুনিভার্সিটি যাবে সে-লজ্জা বরদাস্ত করার মত নয়। তার থেকে রূপসী মেয়েকে পাত্রস্থ করা অনেক সুবিবেচনার কাজ। কয়েকটি অভিজাত পরিবার এই মেয়েকে নেবার জন্য উন্মুখও বটে।

বাবা সেই প্রথম রূপসী মেয়ের মধ্যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলেন। বিশাখা জানত তার বিয়ের জাক-জমকের ফাঁক দিয়ে বাবার ক্ষয়িষ্ণু বিত্তের অর্ধেক উঠে যাবে, আর ঋণের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া বাবার বিবেচনায় সুপাত্র বলতে তাদের মতই আর কোনো পরিবার—যাদের এক কালে অনেক ছিল এখন সব ঝাঁঝরা। না, এ-রকম ঘরের কানাকড়িও দাম দেয় না বিশাখা।

বাবার ইচ্ছে নাকচ করে ট্রামে বাসেই যাতায়াত শুরু করে দিল বিশাখা। বাবার সেই বিতৃষ্ণা-ভরা রাগত মুখ এখনো মনে আছে বিশাখার। তার ওপর অন্য সরিকদের টিকা-টিপ্পনী কানে আসতে বাবা ওর ওপর আরো ক্ষেপে গেছলেন।

এই রূপ নিয়ে বিশাখার ট্রামে বাসে যাতায়াত করাটা সত্যিই মুশকিলের ব্যাপার

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কতজন যে ওই ট্রামে বা ওই বাসে ওঠার জন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত সেটা ও অনায়াসেই আঁচ করতে পারত। য়ুনিভার্সিটিতেও ছেলে আর অল্পবয়সী মাস্টারগুলোর জ্বালায় শান্তি ছিল না। বি.এ পর্যন্ত মেয়ে কলেজে পড়েছে, বাড়ির গাড়িতে যাতায়াত করেছে। এই পরিস্থিতির বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে নাজেহাল হত, আবার মজাও পেত।

...এম.এ পাশ করা হয়নি বিশাখার। এরই মধ্যে ঋণের দায়ে ওদের যৌথ পরিবারের বাড়ির অনেক অংশ বাঁধা পড়ে গেছে, আরো অনেক বিত্ত বিক্রী হয়ে গেছে। এক অবধারিত নিম্ন স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে ঘোষাল বংশ। কিন্তু বাবার আর সরিকদের সমস্ত সমস্যা যেন বিশাখাকে নিয়ে। উড়ো চিঠি আসে মেয়ের নামে, বিরক্তিকর সব বিয়ের আবেদন আসে বাবার কাছে। বাবা রাগে স্তব্ধ হয়ে থাকেন, জ্ঞাতিরা মুখ মুচকে হাসেন।

এইবার বাবা ওর বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। বিশাখার ভিতর জ্বলে, চোখ জ্বলে। ঠিক এই সময় জীবনে এক অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে যায়। একজন নামী চিত্র-পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ। ভদ্রলোক একজন শিক্ষিতা রূপসী মেয়ের সন্ধানে ছিলেন। তার ভাইঝি বিশাখার বান্ধবী। সে-ই ওকে কাকার কাছে ধরে নিয়ে গেছল।

...সমস্ত সংস্কার আর ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহও সম্পন্ন করেছিল বিশাখা। কিন্তু এবারে আর বাবার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস হয়নি। খুব নিঃশব্দে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হযে গেছে সে। তার তখন এক ডুবন্ত পরিবারকে টেনে তোলার উদ্দীপনা। পরে বাবাকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছে। দাদার মারফত সেই চিঠির জবাবও পেযেছে। বিশাখা বাবার চোখে মৃত।

বাবার সেই রাগ সেই ঘৃণা আর সেই স্তব্ধ মূর্তি কল্পনা করতে পারে বিশাখা।

বছর কয়েক বাদে দাদাকে আবার চিঠি লিখেছিল বিশাখা। বক্তব্য, তার উপার্জনের টাকায় কোন রকম পাপের আঁচ লাগেনি। সানুনয়ে সে লাখ তিনেক টাকা বাবাকে পাঠাতে চেয়েছিল। আশা করেছিল, সংসারের যা অবস্থা, বাবা নরম হবেন।

জবাব এসেছে, প্রেতের অন্ন বাবা গ্রহণ করেন না।

আবার বছর ঘুরেছে একটা দুটো করে অনেকগুলো। বিশাখা বাবা-মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে। কেঁদেছে। ভিতরটা ছুটে যেতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি।

কালের চাকা ঘুরেছে।

বছর দুই আগে প্রথমে দাদাদের ছেলেমেয়েরা এসে পিসীর সঙ্গে দেখা করেছে। পিসীকে নিয়ে তাদের গর্বের শেষ নেই এটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর একে একে বউদিরা এসেছে। তারপর দাদারাও। আনন্দে আটখানা হয়ে বিশাখা সক্কলকে কাছে টেনেছে। একটিও অপ্রিয় কথা বলেনি। তারা তো নয়ই। বিশাখার জীবনে ততদিনে প্রথম স্বামী নাকচ হয়ে দ্বিতীয় স্বামী এসেছে—এও সর্বজনবিদিত। কিন্তু দাদা বউদি বা তাদের ছেলেমেয়েদের আসার ব্যাপারে তাও কিছু মাত্র অন্তরায় নয়।

তিন দাদার মধ্যে বড় দুই দাদা অনেক বড় বিশাখার থেকে। তাদের ছেলেমেয়েরা

কেউ কলেজে পড়ে কেউ য়ুনিভার্সিটিতে। সংসারের খবর তাদের কাছ থেকেই সোজাসুজি জেনে নিয়েছে বিশাখা। দাদা জোড়াতাপ্পি দিয়ে কিছু রোজগার করে, ভাইপোরা টিউশনি করে নিজেদের পড়া চালায়—এক ভাইঝি গানের স্কুলে গান শেখায় আর নিজে পড়ে।

যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গেই এদের সমস্ত রকম খরচের দায় বিশাখা নিয়েছে। এখন আর কেউ আপত্তি করেনি। আর ওদের নাম করে যে টাকা বিশাখা পাঠায় তাতে এই বছর দুই যাবৎ তিন দাদারই সংসার কিছুটা সুখের মুখ দেখেছে। ভাইপোভাইঝিরা পিসীর টাকার অঙ্ক নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে।...

...এক একখানা হিন্দী ছবিতে সাত লক্ষ করে পায় পিসী, আর বাঙলা ছবিতে দেড় লক্ষ—তাহলে কত টাকার মালিক সে? বছরে কম করে দুটো বাঙলা আর দুটো হিন্দী ছবি তো করছেই—আর সই করছে তার ডবল। এখন যা সই করছে সে নাকি চার বছর পরের কনট্রাক্ট। ওদের জল্পনা-কল্পনার প্রসঙ্গ হাসি মুখেই ফাঁস করে দেয় বউদিরা। বিশাখাও হাসে।

মাস কয়েক আগে খবর পেল, অন্য সরিক আর জ্ঞাতিরা ঘোষাল সৌধ বেচে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বেচে না দিলে ঋণের দায়েই ঘোষাল-প্রাসাদ বিকিয়ে যাবে। বেচে দিলে তবু ঋণ শোধ করে সকলের ভাগেই কিছু টাকা আসবে।

শোনা মাত্র বিশাখা দাদাদের ডেকে পাঠাল। জিজ্ঞাসা করল, যা শুনছি, সত্যি?

তারা সায় দিল, সত্যি।

বিশাখা বলল, দাম ঠিক করে সব তোমরা তিন ভাইয়ের নামে কিনে নাও। আগে দেনা শোধ হবে তারপর জ্ঞাতিরা যে-যার ভাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

দাদারা জানালো, বেশির ভাগই চলে গেছে। যারা আছে তারাও টাকা পেলে চলে যাবে। ...কিন্তু কম করে বারো তেরো লক্ষ টাকা দাম হবে যে ওই অত জমিসমেত বাড়ির!

যা লাগবে আমাকে জানিও।

যথা সময়ে বাড়ি বিক্রী হয়েছে। ঋণমুক্ত হয়ে জ্ঞাতিরা যে-যার ভাগ নিয়ে চলে গেছে।

বিশাখার প্রস্তাব মত এরপর ঘোষাল-প্রাসাদ আমূল সংস্কার আর নতুন কনস্ট্রাকশনের জন্য এক নামী এনজিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আরো চার লক্ষ টাকা খরচ করলে প্রাসাদপুরীর ভোল বদলাবে। নিজেদের বসবাসের ঢালা ব্যবস্থা করেও তাহলে এখানে ব্যাঙ্ক বসবে, সরকারী আপিস বসবে আর কিছু রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার হবে। সব বিলি-ব্যবস্থা ঠিক-মত হলে মাসে কম করে পনেরো ষোল হাজার টাকা রোজগার হবে।

বিশাখা সানন্দে রাজি হয়েছে। বলেছে, যা করার চটপট করে ফেল, টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

কিন্তু এনজিনিয়ারদের কাজ শুরু করার আগে দাদাদের আর বউদিদের আর সব থেকে বেশি ভাইপোভাইঝিদের সনির্বন্ধ তাগিদে আজ সময় করে এক বেলার জন্য তাকে এখানে আসতে হয়েছে।

ঘোষাল-প্রাসাদে তাই আজ আনন্দের হাট বসেছে। সকলে খুশি, বিশাখাও কম খুশি নয়। থেকে থেকে আজ বাবার মুখখানা মনে পড়ছে তা। কল্পনায় ওই মুখেও যেন হাসির আঁচড় দেখছে আজ।

বিকেলের দিকে ঘুরে ঘুরে নীচতলাটা দেখছিল সকলের সঙ্গে।

শ্রী ফিরলে কোথায়, কি হবে না হবে দাদারা বোঝাচ্ছিল।

একতলা দেখা শেষ করে মাটিতে পা ফেলল বিশাখা। পিছনের দিকে বাগান। এখন জঙ্গলই বলা চলে। আবার সেই পুরনো স্মৃতি চোখের সামনে ভিড় করে আসছে। ছেলেবেলায় কত হৈ-হুল্লোড়ই না করেছে ওখানে!

আশ্চর্য! ওই বিশাল আমডালে দোলনাটা যে আজও ঝুলছে! লোহার শেকল জং ধরে কালিবর্ণ হয়েছে, কিন্তু আজও ওটা সেখানেই আছে। ওর দোলনা। ওর জন্য দশরথ ওই দোলনা টাঙিয়ে দিয়েছিল।

পুরনো চাকব, বিশাখাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। কি ভালই না বাসত।

পরক্ষণে আরো চমক। ওই ওধারে দশরথের সেই ঝুপড়ি ঘর এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর বাইরে ময়লা ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে একটা। তবে কি...

উৎসুক আগ্রহে বিশাখা বড়দার দিকে ফিরল। —দশরথ?

মৃদু হেসে বডদা বলল, আছে এখনো।

আছে? কোথায় আছে? এখানেই?

বড়দা তেমনি হাসি মুখে সায় দিল।

কি আশ্চর্য, আমি সেই সকালে এসেছি, আর আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটিবার দেখা করল না!

আগ্রহে আনন্দে সেই ঝুপড়ি ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিশাখা। পিছনে দাদারা আর বউদিরা।

ছোট মেয়ের মতই বিশাখা ডাকল, দশরথ! দশরথ!

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। চুলগুলো শনের মত সাদা। লম্বা দেহ বেঁকে গেছে। পরনে হাঁটুর ওপর শতচ্ছিন্ন একটা ময়লা ধুতি।

বিশাখা সানন্দে বলে উঠল, একেবারে যে বুড়ো হয়ে গেছ দশরথ, আমাকে চিনতে পারছ?

দুমড়নো দেহটা সোজা হল। নিষ্প্রভ চোখে তাকাল ওর দিকে। মাথা ঝাঁকাল। চিনতে পারছে।

সেই সকালে আমি এসেছি, আর তুমি জানোই না—

বলতে বলতে আচমকা বিষম একটা আঘাত পেয়ে যেন থমকে গেল বিশাখা।

বিমূঢ় পরক্ষণে। এ কি দেখছে সে? দেখছে, বৃদ্ধ তার দিকেই চেয়ে আছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলছে এখন, আর তার তলা থেকে একরাশ ঘৃণা ঠেলে উঠে আসছে। মুখের বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজেও যেন সেই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা উপচে উঠছে।

তার এই মূর্তি দেখে দাদা-বউদিরাও যেন নির্বাক হঠাৎ।

আত্মস্থ হতে সময় লাগল বিশাখার। স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে সে চেয়ে ছিল। আর মনে হচ্ছিল, ওই পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিদ্বেষ আর ভর্ৎসনা নিয়ে বাবাই যেন ওর দিকে চেয়ে আছে।

হাসি আনন্দ মুছে গেছে। কোন রকমে শরীরটাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে এল বিশাখা। অবসন্ন লাগছে ভয়ানক, নিজের ঝকমকে গাড়িটার দিকে এগলো। তকমা-পরা ড্রাইভার শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল।

দাদারা ব্যস্ত, বউদিরাও, বড়দা বলল, এক্ষুনি যাবি, নাকি?

হ্যাঁ! ..ওই বুড়োকে এখনো ধরে রেখেছ কেন?

হঠাৎ কি হয়ে গেল সকলেই বুঝেছে। রাগে দাদা-বউদিদের মুখ লাল। দাঁতে দাঁত চেপে বড়দা বলল, আজই তাড়াব ওকে।

স্থির চোখে দাদার দিকে তাকাল বিশাখা। ওর মনে হল, এমনি তাড়াবে না, হয়তো চাবকেই তাড়াবে ওকে। বিশাখা বলল, দরকার নেই, ওর কোনরকম অসম্মান কোরো না, আর নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে ওরও একটু ভাল ব্যবস্থা করে দিও, আমার কথা ওকে বলার দরকার নেই।

শ্রান্ত অবসন্ন দেহে গাড়িতে উঠে বসল দেশের কোটি মানুষের পরম সমাদরের চিত্রতারকা বিশাখা দত্ত।

শেষ পর্যন্ত

স্বামীটিকে সামনে পেয়ে গিন্নি আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। গলার নীল শিরা বার করে চেঁচিয়ে বললেন, সনাতনকে তুমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে দূর করে দেবে কিনা আমি জানতে চাই।

ঘামে ভেজা আধময়লা পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে শীতল ঘোষ জবাব দিলেন, দিলেই হয়, তার জন্য আমার মুখ চেয়ে বসে থাকার দরকারটা কি...বিনে মাইনের লোক, বললেই চলে যাবে...যাক, কি করেছে ও?

স্বামীর নির্লিপ্ত জবাব আর প্রশ্ন শুনে চারুদেবী আরও ক্ষেপে গেলেন। তেমনি তারস্বরে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, খাওয়া-পরা দিয়ে বিনে মাইনের লোক এনে আমার তিন পুরুষ উদ্ধার করেছ! আবার মুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কি করেছে—

যেমন মনিব তেমন তার চাকর—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, ও বাড়িতে থাকলে আমি আজ জলস্পর্শ করব না বলে দিলাম।

দরজার কাছে বিব্রত মুখে মেয়ে দাঁড়িয়ে। শীতলবাবু তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে?

মেয়ে বলল, এমন কিছুই হয়নি বাবা, মা একটুতেই তুমি এমন হৈ-চৈ কাণ্ড কর, বাবা রোদ থেকে তেতে পুড়ে এল—

সরোষে মহিলা মেয়ের মুখের ওপর একটা আগুনের ঝাপটা মারলেন, পরের বাড়িতে মোসায়েবি করতে বেরিয়ে তেতে পুড়ে এসে আমাকে উদ্ধার করেছে একেবারে—ওর আবার বাপের জন্য দবদ উথলে উঠল! বলি এই কি একদিন—ওঁর পেযারের হাবামজাদা আমাকে ভালমানুষ পেযে সবসময় এই রকম জোড়াতাপ্পি দিযে চলেছে—কিছু বলতে গেলে উল্টে আমাব দোষ হয, আমি কেবল বিনে মাইনেব লোকের ওপর দিন-রাত কচকচ করি—চুপ করে না থেকে এখন বুঝিয়ে দে, কেন করি—

অভিযোগের সারমর্ম, ব্যস্ততা সত্ত্বেও জামাই এসেছিল এক চুপি-দেখা করে যেতে। (ছুটিব দিনেও তার ছুটি নেই, নিজেব স্টেশনারি দোকান, ছুটিব দিনে উল্টে খদ্দেরেব ভিড বেশি) তাব চিনি বা মিষ্টি চলে না, তাই চারুদেবী তাডাতাডি সনাতনকে পাঠিযেছিলেন মধুব দোকান থেকে দুখানা গরম কাটলেট আনতে। শুধু জামাই কেন, মধুর দোকানের কাটলেট এ অঞ্চলেব সকলেরই প্রিয়। জামাই নিষেধ করেছিল, কিন্তু শাশুড়ী শোনেননি, কতক্ষণ আব লাগবে, যেতে আসতে বড জোর কুড়ি মিনিট।

কিন্তু একঘণ্টা কাটতে চলল, সনাতনেব কাটলেট নিয়ে আসার নাম নেই। জামাই ওদিকে যাবাব জন্যে ছটফট করছে। ঝি আসতে চারুদেবী তাডাতাডি তাকে পাঠিয়েছেন কি হল দেখতে। কিন্তু সে তো আর পয়সা নিযে যাযনি। সে ঘুরে এসে খবব দিল, দোকানের ত্রিসীমানায সনাতনের টিকির দেখা নেই। চারুদেবী জিজ্ঞাসা কবেছেন, দোকানে কাটলেট নেই?

—ও মা, থাকবে না কেন ঝাঁকে ঝাঁকে গরম কাটলেট নামাচ্ছে আর বেচছে।

চারুদেবী আবার ছুটে টাকা বাব করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জামাইকে আর কিছুতে আটকানো গেল না—তার ভযানক দেরি হযে গেছে।

একঘণ্টা পঁচিশ মিনিট বাদে সনাতন পান চিবুতে চিবুতে কাটলেট নিযে ফিরেছে। তার বগলে বাবুর লণ্ড্রির কাচা ধুতির প্যাকেট, বাঁ হাতে শুসনি শাক, আর ডান হাতে কাটলেটের ঠোঙা।

গিন্নিমায়ের মুখোমুখি হতেই সনাতন আঁচ করে নিল ভাল রকমেব কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ঠাকরোনের চোখ দুটো যেন আগুনেব গোলা। মেযে ধমকের সুরে বলল, এত দেরি করলে কেন, জামাইবাবু তো চলে গেছেন—

সনাতন ভ্যাবাচাকা খেল একটু। তারপর অম্লান বদনে বলল, কি কবব দিদিমণি, ছুটির দিন, সব কাটলেট শেষ—আমি ব্যাটাদের বাজারে পাঠিযে মাংস কিনিযে কুচিযে

কিমা পাকিয়ে কাটলেট ভাজিয়ে তবে নিয়ে এলাম।

এর পর অবশ্যই তপ্ত খোলায় ভাজা-ভাজা হতে হতে সনাতনকে পালাতে হয়েছে। আর সেই মুখে বাড়ির কর্তার পদার্পণ।

সব শোনার পর শীতলবাবু সনাতনের উদ্দেশে বাজখাঁই হাঁক দিলেন একটা। সে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের থেকে চটি খুলে হুংকার দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন! মাঝে মেয়ে ছিল বলে রক্ষা, সে বাপের হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে তাঁকে নিরস্ত করলে। গিন্নিও থতমত খেয়ে গেলেন। কর্তা এতটা ক্ষেপে যাবেন তিনি কল্পনাও করেননি। যে দিনকাল, চাকর-বাকরের গায়ে হাত তুললেও রেহাই নেই, লোকটা তার ওপর আপিসের বেয়ারা।

শীতল ঘোষ হাত থেকে চটি ফেললেন বটে, কিন্তু রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন, বাড়ি থেকে এখুনি দূর হয়ে যা—এক্ষুনি! আপিসের চাকরিও তোর কি করে থাকে আমি দেখছি!

সনাতন পালালো। অগ্নিমূর্তিতে শীতল ঘোষ স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, ও এক্ষুনি যাবে আমি বলে দিলাম, দূর দূর করে তাড়িয়ে তারপর এসে বোসো।

অগত্যা চারুদেবীকে স্বামীর উদ্দেশেই এবারে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠতে হল—আমাকে বসতে হবে না, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো তো! একটা লোক না খেয়ে দেয়ে চলে যাক আর গৃহস্থের অকল্যাণ হোক, এমনিতেই তো সুখের অন্ত নেই—তা ছাড়া আর একটা লোক না আনা পর্যন্ত শুধু একটা ঠিকে ঝি দিয়ে কাজ চলবে!

গজগজ করতে করতে গৃহিণী সরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অখুশি নন খুব। সনাতন পাজির পাঝাড়া, কিন্তু কর্তার খুব পেয়ারের। তার ওপরেও কর্তা এতটা ক্ষেপতে পারেন ভাবেননি।

শীতল ঘোষ এক মস্ত প্রতিষ্ঠানের স্টোর কীপার এবং সমস্ত বেয়ারাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। ইচ্ছে করলেই তিনি সনাতনকে সরিয়ে আপিসের আর কোন বেয়ারাকে বাড়িতে এনে রাখতে পারেন। চারুদেবী অনেক দিন সেই পরামর্শ দিয়েছেন, এখন আশা করছেন মেজাজ ঠাণ্ডা হলে কর্তা তাঁর কথা শুনবেন। সনাতনকে এভাবে তাড়ালে আপিসে দুর্নাম হতই।

...কিন্তু দুপুরের প্রহসনটা চারুদেবীর গোচরে এলে মেজাজ কোন্ স্তরে চড়ত কে জানে। শীতল ঘোষের রাতেই ভালো ঘুম হয় না, দুপুরে ঘুমনোর কোন প্রশ্নই নেই। দুখানা খবরের কাগজ নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করছিলেন তিনি। গিন্নি মেয়ের সঙ্গে অন্য ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন।

কর্তার ঘরে ঢুকে সনাতন সোজা বিছানার দিকে এগিয়ে এল, তারপর মেঝেতে হাঁটুর ওপর বসে বাবুর পা টিপতে লেগে গেল। শীতল ঘোষ কাগজের ফাঁকে একবার ওর মুখখানা দেখে নিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপরে বললেন, কি রে ব্যাটা, এখন আমাকে তোয়াজ করতে এসেছিস

অভিমানের সুরে সনাতন বলল, আমাকে আজ বড় কড়া বকেছেন হুজুর—

না বকলে তোকে আজ রাখা যেত? তাছাড়া তোর এত বাড় বেড়েছে কেন, দুটো কাটলেট আনতে সোয়া ঘণ্টা কাবার করে দিলি!

একটা পা ছেড়ে হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে সনাতন জবাব দিল, জামাইবাবু ছুটির দিনে অত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ভাবিনি...ডাইংক্লিন থেকে আপনার জামাকাপড় আনার সময় সামনে বাজারটা পড়তে মনে পড়ে গেল ক'রাত ধরে আপনার ঘুম হচ্ছে না, শুসনির শাকও তিন দিন হযে গেল কেউ যোগাড় করতে পারছে না—ভাবলাম যেমন করে হোক আপনার ঘুমের শাক আজ যোগাড় করবই—

হেসে মুখ থেকে কাগজ সরালেন শীতল ঘোষ। বললেন, তুই পাজির শিরোমণি একটা, ডাইং ক্লিনিং আর বাজার ঘুরে আসতে সোয়া ঘণ্টা লাগে, বড় বেশি আড্ডাবাজ হয়েছিস আজকাল।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু এইভাবে তোষামোদ আর ম্যানেজ করতে পারে বলেই সব ক'টা বেয়ারার থেকে সনাতন তাঁর প্রিয়পাত্র। ওর জন্যে এই কারণে দপ্তরীর কাজে প্রমোশনের সুপারিশ করেছেন তিনি সেক্রেটারির কাছে।

ঠিক এই বিশেষ গুণটির ফলেই শীতল ঘোষও তাঁর আপিসের বড় মেজ সেজ ছোট সব কর্তারই প্রিয়জন। কোন কর্তার সঙ্গে কোন কর্তার বনে না, তাই বিপাকে পড়লে শীতল ঘোষ চোখ-কান বুজে নিজেব গাফিলতিব দায অন্য কর্তার কাঁধে চাপিযে দেন।

সর্ব ব্যাপারে এবং সর্ব সমস্যায় তাঁর ম্যানেজ করতে পারার অপবিসীম ক্ষমতা। স্টোবেব মাল পাওযাব ব্যাপাবে সব কর্মচারীরই নালিশ তাঁব বিরুদ্ধে। কিন্তু সব দিক ম্যানেজ কবে সমস্ত নালিশের জাল ছিঁড়ে বেবিয়ে আসতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু নালিশ যাবা করে, দরকারের সময তাবাই আবাব এসে এই লোকের কাছে ধরণা দেয়। কাব বাড়িতে পৈতে, কার মেযে বা বোনেব বিযে, কার বাবা বা মাযের শ্রাদ্ধ—শীতল ঘোষ কোমর বেঁধে এসে না দাঁড়ালে চোখে অন্ধকার দেখে সকলে। তাঁর ম্যানেজমেণ্টে সব থেকে কম খরচে সর্বাঙ্গ-সুন্দব ভাবে কাজ সম্পন্ন হয় বলে সকলের ধাবণা। শুধু কর্মচারীরা নয, অফিসারদের বাড়িব কাজকর্মের ব্যাপারেও তাই—শীতল ঘোষ দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ালে তবে নিশ্চিন্ত। এই জন্যেই আফিসের সেক্রেটারি অপরেশ সান্যাল তাঁব প্রধান সহায। ভদ্রলোকের বটগাছেব মত বিশাল একান্ন পরিবার, বছরের মধ্যে পাচ-সাতবার তাঁর বাড়িতে একটা না একটা কাজ লেগেই আছে।

শীতল ঘোষের এটুকুই বোধ করি জীবনের সব থেকে বড তৃপ্তি। তাঁর স্বচ্ছল অবস্থা নিযে আড়ালে এমন কি সামনা-সামনিও যে যতই ঠেস দিক আর টিকা-টিপ্পনী কাটুক, প্রয়োজনের সময তাঁকে ছাড়া কারো চলে না। এই তৃপ্তিটুকু এক মস্ত নেশার মত। সাতান্ন বছব বয়সেও এই তৃপ্তিটুকুই তাঁর যৌবনসদৃশ উদ্যমের মূল উৎস। সকলে জানে তিনি রাতকে দিন করেন, দিনকে রাত—তবু তাঁর কাছেই সকলকে ছুটে আসতে হয়। কিন্তু এ-হেন প্রসন্ন জীবনেও বড় আচমকা বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমস্ত উদ্যমের মূল উৎসটা শুকিয়ে খরখরে

হয়ে গেল। শীতল ঘোষ বুড়িয়ে গেলেন।

...একমাত্র ছেলের জ্বর চলছিল। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু জ্বরের উপশম হচ্ছে না। সেদিন বিকেলে বড় ডাক্তার দেখানো হল। তিনি মোটামুটি অভয় দিয়ে নতুন প্রেসক্রিপশন করে গেলেন। সেই প্রেসক্রিপশন নিয়ে শীতল ঘোষ ওষুধ আনতে গেলেন। বড় ডাক্তার দেখানোর পর তাঁর দুশ্চিন্তা কিছু কমেছে। মাথায় তখন অন্য চিন্তা ছেয়ে আছে। আপিসের বুড়ো কেরাণী অবনীবাবুর মেয়ের বিয়ে এই রাতেই। এমনিতেই উনি নার্ভাস লোক, শীতল ঘোষের দুটো হাত ধরে অনুনয় করে বলেছিলেন, উদ্ধার করে দিতে হবে। শীতল ঘোষ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলেন। কেনা কাটার সমস্ত ব্যাপারেই সাহায্য করেছেন, কিন্তু ছেলের অসুখের দরুন কাল থেকে আর পারেননি। আজই বিয়ে, কি কাণ্ড হচ্ছে কে জানে।

সনাতনকে অবশ্য সকালেই সেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গিন্নিকে বলেছেন, সেক্রেটারির বাড়িতে দরকার, ওকে যেতে হবে। কেরানীর বাড়ি পাঠানো হচ্ছে বললে গিন্নির মুখ ভার হত, গজগজ করে কথা শোনাতেন।

ওষুধ আনতে বেরিয়ে শীতল ঘোষ অবনীবাবুর কথাই ভাবছিলেন। তাঁকে না দেখে ভদ্রলোকের এতক্ষণ হয়তো প্যালপিটেশন শুরু হয়েছে। ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন দিতে তারা জানালো সব ওষুধ রেডি হতে ঘণ্টাখানেক লাগবে...কিছু কিছু এক্ষুনি নিয়ে যেতে পারেন।

শীতল ঘোষ চট করে কি ভেবে নিলেন। বললেন, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে এসে সব নিয়ে যাচ্ছি।

বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি নিলেন। সোজা অবনীবাবুর বাড়ি কিন্তু সেখানে অব্যবস্থার বহর দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। অবনীবাবু তাঁকে দু'হাতে জাপটে ধরলেন। শীতল ঘোষ বললেন, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, ছেলের অসুখ। তাঁর সে-কথা অবনীবাবুর কানে গেল কিনা কে জানে। কিন্তু খানিক বাদে ছেলের অসুখের কথা শীতল ঘোষ নিজেই ভুলে গেলেন। তাঁর তদারকে বিয়ে এবং বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হতে রাত সাড়ে দশটা।

বাড়ির কথা মনে পড়তে চমকে উঠলেন শীতল ঘোষ। তক্ষুনি বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলেন। ভগবান সহায়, ওষুধের দোকান তখন সবে বন্ধ হতে যাচ্ছিল। ওষুধ নিয়ে ওই ট্যাক্সিতেই বাড়ি।

দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। সিঁড়ি ধরে উঠে দরজার কড়া নাড়তে ওধার থেকে মেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, বাবা তুমি কোথায় ছিলে? শানুর একশ' ছয় জ্বর, একধার থেকে জল ঢালতে একটু নেমেছে, এখনো ভুল বকছে—কোথায় ছিলে তুমি সমস্ত দিন?

মেয়ের পিছনে পাংশু বিবর্ণ মুখে তার মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে উগ্র কঠিন চাউনি তাঁর। ব্যস্তসমস্ত মুখে শীতল ঘোষ বলে উঠলেন, আর বলিস না, এবারে চাকরিই ছেড়ে দেব আমি—ওষুধের দোকান থেকে সেক্রেটারির

বাড়িতে একবাব ফোন কবতে তিনি শাসালেন, একবাব না এলে চাকবি থাকবে না, চট কবে ছেড়ে দেবেন কথা দিযেও এতক্ষণে ছাড়া পেলাম, যত সব—বলতে বলতে দ্রুত ঘবেব দিকে পা বাডালেন।

কিন্তু দোবগোডায এসেই মাথায আকাশ ভেঙে পডল। শানুব মাথায জোবে জোবে বাতাস কবছেন স্বযং সেক্রেটাবি—অপবেশ সান্যাল। তাঁকে দেখে ভদ্রলোক চাপা ঝাঁঝে বলে উঠলেন, ওষুধ আনতে গিযে কোথায ছিলে তুমি এতক্ষণ, অ্যাঁ? তোমাব মত এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অপদার্থ আব দুটো আছে? ছেলে যায়-যায আব এতক্ষণে তুমি পান চিবুতে চিবুতে ওষুধ নিযে ফিবলে? ...বউমা পাগলেব মত হযে আছে, তোমাব মেযেব ফোন পেযে আমি ছুটে এলাম—আব তোমাব দেখা নেই!

বিবর্ণ মুখে শীতল ঘোষ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ...না, কোন বমণীব এমন কঠিন মুখ আব সেই মুখেব দুটো চোখে এত ঘৃণা আব বুঝি তিনি দেখেননি।

নির্বাক শীতল ঘোষেব মাথাটা বুকেব ওপব ঝুলে পডল।